খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার (৬৩২-১২৫৮ খ্রিঃ)

গবেষক

মোঃ নুরুল আমিন

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

নভেম্বর-২০২০

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার (৬৩২-১২৫৮ খ্রিঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ নুরুল আমিন

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর-২০২০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি মো: নুরুল আমিন, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত **খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার (৬৩২-১২৫৮ খ্রি.)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন। আমি এ অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করেছি কিন্তু অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি। আমার জানা মতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কোথাও পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

(মো: নুরুল আমিন)
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজি. নং- ১০২, সেশন- ২০১১-২০১২ (পুনঃ)
ও
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ নুরুল আমিন কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য *খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার (৬৩২-১২৫৮ খ্রি:)* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত। এই অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি আমি সম্পূর্ণ পড়েছি। আমার বিবেচনায় এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এতে ব্যবহৃত তথ্য উৎসসমূহ নির্ভরযোগ্য। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি লাভ বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করেন নি।

পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাদানের জন্য গবেষক জনাব মোঃ নুরুল আমিনকে অনুমতি প্রদান করা হলো।

(প্রফেসর ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

আমার পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভের শিরোনাম *খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার (৬৩২-১২৫৮ খ্রি:)*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী-এর তত্ত্বাবধানে আমি উপর্যুক্ত শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভের কাঠামো বিন্যাস এবং বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও জ্ঞানগর্ভ দিক-নির্দেশনা আমার গবেষণা কাজকে বোধগম্য করতে বিশেষভাবে সহায়ক এবং অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজতর করেছে। অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী তাঁর সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার গবেষণা কর্মের প্রতিটি অধ্যায়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে পূর্ণ গবেষণা সম্পাদনে সুচিন্তিত পরামর্শ ও মত প্রদানসহ মূল্যবান সময় ও শ্রম দিয়ে যেভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত রেখেছিলেন, তা ছিল আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। বস্তুত আমার নিজের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাকে তাঁর সানুগ্রহ প্রশ্রয়দান এবং সর্বোপরি তাঁর অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা ও উপর্যুপরি তাগিদের ফলেই বিলম্বে হলেও আমার গবেষণা কর্মের সমাপ্তি ও অভিসন্দর্ভ রচনা সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর স্নেহে ধন্য। গবেষক হিসেবে আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি গবেষণার নীতিমালার শর্তপূরণের জন্য আমাকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে “খিলাফত আমলে অমুসলিম সমাজঃ শ্রেণী বিভাগ ও নাগরিকত্ব লাভের উপায়” এবং “খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের মর্যাদা ও অধিকার” শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে হয়েছে। উপস্থাপিত এ দুটি প্রবন্ধের উপর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়েছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক এ কে এম ইদ্রিস আলী, অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ড. নাজমা খান মজলিস, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিকুল হায়দার, অধ্যাপক মো: মাহফুজুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মো: মোশাররফ হোসেন ভূইয়া, অধ্যাপক মো: আতাউর রহমান বিশ্বাস, অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানসহ বিভাগীয় অনেক সহকর্মী শিক্ষকের কাছ থেকে। এই সুযোগে আমি তাদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার গবেষণা কর্মকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে যারা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তারা হলেন আমার বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, ড. এ টি এম সামছুজ্জোহা ও জনাব এ কে এম ইফতেখারুল ইসলাম। তাঁরা গবেষণার শুরু থেকে শেষাবধি গবেষণা সহায়ক তাদের অবারিত পরামর্শ, অনুপ্রেরণা এবং নানা সহযোগিতা প্রদান করে আমাকে কাজে উদ্দীপনা জুগিয়েছেন। তাদের প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। প্রসঙ্গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. মো: আবুল কালাম সরকার ও ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এম এ কাউসার আমাকে অনেক তথ্য ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করায় কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করছি। মো: মাছুম সাইফুল্লাহ আমার গবেষণা কর্মের মুদ্রণজনিত ত্রুটি সংশোধনীসহ নানান কাজে আমাকে সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছেন।

সুষ্ঠুভাবে গবেষণা সম্পাদনে ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, জাতীয় গণগ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ সেমিনার লাইব্রেরি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি (কলকাতা), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, কলকাতাস্থ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অভিলেখাগার, মাওলানা আজাদ লাইব্রেরি (আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি), ইসলামিক স্টাডিজ লাইব্রেরি (আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি) থেকে সহায়ক গবেষণা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য তাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মকর্তা জনাব মো: ছরোয়ার হোসেনসহ কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণায় যার অবদান কখনো ভুলবার নয় সে হলো আমার সহধর্মিনী ফাতেমা পারভীন। গবেষণা কর্ম সম্পাদনে তার উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও অপরিসীম ত্যাগ আমাকে এ গবেষণা কাজে সাহস জুগিয়েছে এবং গবেষণাকে সহজতর করেছে। তার জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভ কামনা। আমার দুই মেয়ে নূরে তাসনিম ও নূরে তাযকিয়া আমার গবেষণা কর্মে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে আমার কাছ থেকে তাদের কাঙ্ক্ষিত অনেক প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আজকে এই শুভক্ষণে তাদের জন্য রইল আমার অনেক অনেক দোয়া ও শুভ কামনা।

এ সময়ে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা রহিমা বেগম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় বাবা হাজী মো: জয়নাল আবেদীনের প্রতি যিনি সবসময় আমার গবেষণা কর্মের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। আমার শ্বশুর জনাব আকবর আলী ও শাশুড়ি মিসেস হাজেরা আকবরসহ আমার ভাই-বোন ও পরিবার-পরিজন সকলের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ-সংক্ষেপণ

স.	: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আঃ	: আলাইহিস সালাম
রা.	: রাদিয়াল্লাহ আনহু
র.	: রহমাতুল্লাহি আলাইহি
ইং	: ইংরেজি
বাং	: বাংলা
হি.	: হিজরি
খ্রি.	: খ্রিস্টাব্দ
ড.	: ডক্টর
খ.	: খণ্ড
পৃ.	: পৃষ্ঠা
তা. বি.	: তারিখ নেই
অনু.	: অনুবাদ
ইফাবা	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
p.	: Page
Ibid	: (Ibidem) in the same place; from the same source.
Op.cit	: Operac-citrae
Ed.	: Edited/ Editor

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ কথা	i-ii
শব্দ-সংক্ষেপন	iii
প্রথম অধ্যায়	
ভূমিকা	১-৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
খিলাফতের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	৩৪-১০০
তৃতীয় অধ্যায়	
মৌলিক মানবাধিকার	১০১-১৯২
চতুর্থ অধ্যায়	
অমুসলিমদের নাগরিকত্ব লাভ ও বাতিল সম্পর্কিত নীতিমালা	১৯৩-২১৪
পঞ্চম অধ্যায়	
অমুসলিম জনগোষ্ঠী, মর্যাদা ও অধিকার: খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল	২১৫-২৪৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	
উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার	২৪৪-২৮৩
সপ্তম অধ্যায়	
খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের দায়-দায়িত্ব	২৮৪-৩১৬
অষ্টম অধ্যায়	
উপসংহার	৩১৭-৩২৫
পরিশিষ্ট	৩২৬-৩৩২
গ্রন্থপঞ্জি	৩৩৩-৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

গবেষণাকর্মের ক্ষেত্র ও পরিসীমা

'খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার (৬৩২-১২৫৮ খ্রি:)' শীর্ষক আলোচ্য গবেষণাকর্মের কেন্দ্রবিন্দু খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিক। আলোচ্য গবেষণায় ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতে অমুসলিম নাগরিকগণ মুসলিম রাষ্ট্রে কী ধরনের মর্যাদা লাভ করেছিল এবং কী অধিকার ও কর্তব্য সম্পাদন করতেন সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর প্রতিনিধি হিসেবে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইহলৌকিক নেতৃত্বের একটি প্রতিষ্ঠান হলো খিলাফত।[১] রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রধান হিসেবে যিনি 'খিলাফত'[২] নামক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দান করেন তাকে 'খলিফা'[৩] বলা হয়। খলিফা হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ। তাঁর কোনো ধর্মীয় কর্তৃত্ব ছিল না। খলিফা ইসলাম ধর্মের কোনো বিধি-বিধান পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার অধিকার রাখতো না।[৪] খিলাফতের দীর্ঘ ইতিহাসে নানারকম বিবর্তন লক্ষ করা যায়। ধর্মবেত্তা, আইন-নির্দেশক, ধর্মীয় নেতা, প্রধান বিচারক, প্রধান সেনাপতি ও রাষ্ট্রপ্রধান হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর ইন্তেকালের পর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)। হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.), হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.), হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) ও হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.) এ চারজন খলিফা (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) পর্যন্ত মোট ত্রিশ বছর কাল হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর প্রতিনিধিরূপে আরব রাষ্ট্র ও মুসলিম জাহানের খিলাফতের পদ অলংকৃত করেছিলেন বলে তাঁরা

---

[১] মুহাম্মদ আল খাদ্দুরী বেগ, *তারিখুল উমাম আল ইসলামিয়া*, দারুল কলম, বৈরুত, ১৯৮৬, পৃ. ২১৫

[২] খিলাফত আরবি শব্দ। খিলাফত শব্দটি খুলফুন মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা, স্থলাভিষিক্ত হওয়া, উত্তরাধিকারী হওয়া বা কারো অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করা। ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকে পারিভাষিক অর্থে খিলাফত বলা হয়। খলিফাদের দপ্তরকে খিলাফত বলা হয়। খিলাফত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাজতন্ত্র নয়। নির্বাচন বা মনোনয়ন উভয় পদ্ধতিই খিলাফত ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল। বায়'আত ব্যতীত খিলাফত স্বীকৃত নয় বলে খিলাফতের সাথে বায়'আত অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত। নবুয়তের পর খিলাফতই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র দায়িত্বের পদ হওয়ায় ইসলামি শরিয়াত ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান খিলাফতের উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিস্তারিত দেখুন, Rafi Ahmad Fidai, *Concise History of Muslim World*, Vol. I, Kitab Bhavan, New Delhi, 2004, p. 64; মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা*, আহসান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫৮৬-৫৮৮

[৩] খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। বিশেষ অর্থে খলিফা বলতে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতিনিধিকে বলা হয়। ইসলামি সরকার ব্যবস্থাপনায় খলিফা, ইমাম ও আমির খিলাফত নামক প্রতিষ্ঠানের যিনি দায়িত্বে থাকেন তাঁর উপাধি। খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের শাসনামলে খলিফাদের তিনটি উপাধি ছিল। ত াহলো- খলিফা, আমিরুল মু'মেনিন ও ইমাম। নবিগণের পথ, মত ও আদর্শের ভিত্তিতে তাঁদের অবর্তমানে প্রতিনিধি হিসেবে যাঁরা কাজ সম্পন্ন করেন তারা খলিফা বা প্রতিনিধি। এ কারণে খলিফা খেতাবটি মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে যারা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে তাদের প্রতি বর্তায়। খলিফা ছাড়াও আমির অথবা আমিরুল মুমেনিন (বিশ্বাসীদের অধিকর্তা) উপাধি সর্বপ্রথম হযরত উমর (রা.) ধারণ করেন। আমিরুল মুমেনিন উপাধিটি শাসক হিসেবে সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ বা বেসামরিক শাসনের প্রধান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ইমাম খেতাব রাষ্ট্রপ্রধানের ধর্মীয় কার্যাবলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন সর্বপ্রথম ইমাম উপাধি গ্রহণ করেন। তবে শিয়াগণ তাঁদের নেতার জন্য বিশেষভাবে ইমাম খেতাবটি গ্রহণ করেন। বিস্তারিত দেখুন, Sir Thomas W. Arnold, *The Caliphate*, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1965, pp. 39-40

[৪] S. A. Q. Husaini, *Arab Administration*, M. Abdur Rahman, Madras, 1949, p. 29

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম জাহানের ইতিহাসে 'খোলাফায়ে রাশেদিন'[৫] নামে পরিচিত। Philip K. Hitti বলেন, "This was a period in which the lustre of the Prophet's life had not ceased to shed its light and influence over the thoughts and acts of the caliphs."[6]

খোলাফায়ে রাশেদিনের খলিফাগণ বংশ পরম্পরায় খলিফা নির্বাচিত হননি। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (স.) উত্তরসূরী নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি বলে তাঁর ইন্তেকালের পর মুসলিম বিশ্ব নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মহানবি (স.) সকল প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি কোনো উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি, যা তিনি সহজেই করতে পারতেন।[৭] খলিফা নির্বাচন প্রশ্নে মহানবির ইন্তেকালের পর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দল গঠন শুরু হলেও মদিনার অদূরে 'সাকিফায়ে বনি সায়েদা' নামক স্থানে আনসার ও মুহাজিরদের সমাবেশে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মুসলিম বিশ্বের প্রথম খলিফা হিসেবে বয়োজ্যেষ্ঠ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, ইসলামে অবদান ও প্রভাবের কথা চিন্তা করে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর দেখাদেখি উপস্থিত লোকজন কোনো প্রকার চাপ, প্রভাব ও প্রলোভন ব্যতীত হযরত আবু বকর (রা.) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।[৮] তাঁর এ নির্বাচন প্রাক-ইসলামি যুগের গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিরই প্রতিফলন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) প্রথম খলিফা কর্তৃক ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচিত হয়েছিলেন যা সর্বসাধারণ কর্তৃক সমর্থন লাভ করে। খলিফা উসমান (রা.) একটি নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচিত হলে সর্বসাধারণ দ্বারা সমর্থিত হয়। উসমান হত্যাকাণ্ডের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মতামতভিত্তিক খোলাফায়ে রাশেদিনের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচিত হন।[৯] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদিনের বাকি তিনজন খলিফাও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে সময় মুসলিম জাহানের শাসন ব্যক্তি-কেন্দ্রিকরূপ লাভ করলেও খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল পর্যন্ত তা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে পরিণত হয়নি। বস্তুত, খিলাফতে রাশেদা

---

৫ খোলাফায়ে রাশেদিন বলতে ইসলামের ইতিহাসে মূলত: প্রথম চার খলিফা হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.)-এর শাসনকালকে বুঝানো হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত সময়ের প্রয়োজনে পবিত্র কোরআন শরিফ নাযিল করেন। আর এ কোরআন হলো ইসলামের পবিত্র সংবিধান। এ সংবিধান অনুসারে রাসূল (স.) ইসলাম ধর্ম ও মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর প্রদর্শিত নির্দেশনা অনুসারে উপরিউক্ত চারজন খলিফা তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও রাজ্যের শাসন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে গেছেন বলে তাঁদেরকে 'খোলাফায়ে রাশেদিন' বলা হয়। তাঁদের খেলাফত কালকে 'খিলাফতে রাশিদা' বলা হয়ে থাকে। খিলাফতে রাশিদা (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) পর্যন্ত মোট ত্রিশ বৎসর সময় কালকে বলা হয়ে থাকে। Philip K Hitti, *History of the Arabs,* Macmillan St Martin's Press, London, Tenth edition, Reprinted 1972, p.140

৬ Philip K. Hitti, *op.cit,* p. 140

৭ উদ্ধৃতি মুরাদ হফম্যান, *ইসলাম দি অলটারনেটিভ*, বাংলা অনু. মঈন বিন নাসির, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৩১

৮ A. H. Qasmi, *Islamic Governments,* Isha Books, Delhi, 2008, p. 88; Al-Haj Mahomed Ullah, *The Administration of Justice in Islam,* Kitab Bhavan, New Delhi, 1990, p. x; কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, অনু. মাওলানা লিয়াকত আলী, *খেলাফতে রাশেদা*, মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৯

৯ বিস্তারিত বিবরণের জন্য আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, *তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক*, খণ্ড- ০৩, দারুল মা'রিফ, মিসর, ১৯৬৭, ভলিউম ৩-৫

Dhaka University Institutional Repository

কেবল রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না, তাতে স্বেচ্ছাচারিতা ছিল না বরং তা ছিল নবুয়তের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল একটি ব্যবস্থা।

খোলাফায়ে রাশেদিনের খলিফা হযরত আলী (রা.) এর মৃত্যু এবং তাঁর পুত্র ইমাম হাসানের খিলাফত ত্যাগের পর স্বঘোষিত খলিফা হয়ে মুয়াবিয়া ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। উমাইয়া খিলাফত ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৯০ বছর স্থায়ী ছিল। খলিফা মুয়াবিয়া ইসলামি গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়ে নিজের অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে মনোনীত করে মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম একটি বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রবর্তন করেন। আমীর আলী বলেন,

> The accession of the Ommeyades did not simply imply a change of dynasty; it meant the reversal of a principle and the birth of new factors which, as we shall see, exercised the most potent influence on the fortunes of the Empire and the development of the nation.[10]

ইসলামের ইতিহাসে আমির মুয়াবিয়া সর্বপ্রথম স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করার মধ্যে দিয়ে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলেও পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি প্রথম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন নি। তাঁর পূর্বে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যসহ বিভিন্ন স্থানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। খলিফা মুয়াবিয়া খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলের সাম্য, ন্যায় ও গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার পরিবর্তে বাইজান্টাইন প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সিংহাসন, রাজদরবার, জৌলুস ও মুকুট ইত্যাদির প্রচলন করে রাজতান্ত্রিক ধারাকে শক্তিশালী করেন।[১১] উমাইয়া বংশের খলিফাগণ স্বীয় পুত্র কিংবা তাদের ভ্রাতাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। অবশ্য উমাইয়া খিলাফতে মোট ১৪ জন খলিফা রাজত্ব করেন এবং তাদের মধ্যে সরাসরি ৪ জন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করে খলিফা মনোনীত হন।[১২]

উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জাবের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠা হয়। আব্বাসীয় খিলাফত ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৫০৮ বছর স্থায়ী ছিল। উমাইয়া খিলাফতের পতনে আরব শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তদস্থলে প্রশাসনে ইরানি প্রভাবের যাত্রা শুরু হয়। P. K. Hitti বলেন,

> The original Arabian aristocracy was replaced by a hierarchy of officers drawn from the whole gamut of nationalities under the caliphate. The old Arabian

[১০] Syed Ameer Ali, *A Short history of the Saracens*, Kitab Bhawan, New Delhi, 1977, p. 72
[১১] এ. বি. এম, মোহ্সীন উল্লাহ, *ইসলামের আলো ও বিশ্বে মুসলমান*, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩০০
[১২] A. H. Qasmi, *op.cit*, p. 90

Dhaka University Institutional Repository

Moslems and the new foreign converts were beginning to coalesce and shade off into each other. Arabianism fell, but Islam Iranianism marched trimphantly on.[13]

উমাইয়া খিলাফতের রাজতন্ত্র ও উত্তরাধিকারী নীতি একই রকমভাবে আব্বাসীয় খিলাফতে অপরিবর্তিত থাকে। আব্বাসীয় খলিফাদের মনোনয়ন দান প্রথাকে ধারণ করে তাঁরা উমাইয়াদের অনুসরণে পুত্র কিংবা ভ্রাতাকে মনোনয়ন দান করতেন। এ বংশে মোট ৩৭ জন খলিফা রাজত্ব করেন। এদের মধ্যে সরাসরি ১৬ জন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন।[১৪] এ সময় খিলাফতের শাসনব্যবস্থায় ও রাজনীতিতে জনগণের কোনো ভূমিকা ছিল না। এ সময় খলিফাগণ তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মনোভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন উপাধি যেমন 'খলিফাতুল্লাহ্' ও 'আমিরুল মুমেনিন' উপাধি ধারণ করতেন।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতে একই রকম পদ্ধতিতে খলিফা নির্বাচন হতো না এবং খিলাফতের কার্যধারা ও প্রকৃতিও একই রকম ছিল না। খিলাফতের প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায় খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে ছিল ইসলামি গণতন্ত্র, উমাইয়া খিলাফতে ছিল আরবদের গোত্রগত ও জাতিগত রাজতন্ত্র আর আব্বাসীয় খিলাফতে ছিল ইসলামি সাম্রাজ্য তথা মুসলিম রাজতন্ত্র। তবে আলোচ্য গবেষণার সামগ্রিক আলোচনায় শুরু থেকে শেষাবধি উপরোল্লিখিত তিন শাসনামলকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নাই। কাজেই খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক মর্যাদা ও অধিকারসহ অন্যান্য সকল অধিকার যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কিন্তু প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত আরোহণের সময়কাল থেকে অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ খলিফা সুলতান আবদুল মজিদের রাজত্বকাল ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খিলাফত বজায় ছিল। নব্য তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা কামাল আতাতুর্ক ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে আইন জারি করে খিলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তন করলে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১৫] ফলে প্রস্তাবিত গবেষণার সময়সীমা হিসেবে তিনটি মহান খলিফাদের শাসন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনকালকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

---

১৩ Philip K Hitti, *op.cit*, p.287
১৪ R. P Tripathi, *Some Aspects of Muslim Administration*, Central Book Depot, Allahabad, 1964, p. 3
১৫ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought,* Macmillan Press, London, 1982, p. 55

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণার খিলাফতের ক্রমবিবর্তন যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আব্বাসীয় খিলাফতের শাসনামলে মুসলিম বিশ্বে আরো দুটি খিলাফতসহ মোট তিনটি খিলাফত রাজত্ব করতে থাকে। তিনটি খিলাফত হলো বাগদাদে আব্বাসীয় খিলাফত, কর্ডোভায় উমাইয়া খিলাফত এবং উত্তর আফ্রিকায় শিয়া ফাতেমীয়গণ অর্থাৎ ফাতেমীয় শিয়া খিলাফত। প্রস্তাবিত গবেষণায় কর্ডোভার উমাইয়া খিলাফত এবং উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয় শিয়া খিলাফত সম্পর্কিত আলোচনাকে সঙ্গতকারণেই স্থান দেওয়া হয় নি। কর্ডোভার উমাইয়া খিলাফত এবং উত্তর আফ্রিকার ফাতেমীয় শিয়া খিলাফত শাসনামলে অমুসলিমদের সম্পর্কে আলাদা গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া পরবর্তীতে যে খিলাফত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা আলোচ্য গবেষণার শিরোনামের সাথে সংযুক্ত না থাকার কারণে সে সম্পর্কিত আলোচনাও বাদ দেওয়া হয়েছে।

ধর্ম ও রাজনীতি তথা ইহলোক ও পরলোক সম্পর্কিত সমন্বিত কার্যাবলির একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত নামক প্রতিষ্ঠানের যাত্রা ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে একটি অনন্য ঘটনা। কারণ এ বছর ইসলামি শাসনব্যবস্থায় প্রধান প্রশাসনিক কাঠামো খিলাফত নামক সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের যাত্রা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ইন্তেকাল ও হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার মাধ্যমে শুরু হয়।[১৬] হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মৃত্যুতে ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি খলিফা নিযুক্ত হয়ে ভণ্ডনবিদের দমন, যাকাতবিরোধী আন্দোলন ও স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন দমন করে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করে পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মতো দুইটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে পর্যুদস্ত করে মদিনার শিশু রাষ্ট্রকে বহিরাক্রমণের হাত থেকে রক্ষার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করেন।[১৭] ইসলামে নবুয়তের পরিসমাপ্তি আর খিলাফতের সূচনা হিসেবে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও মাইলফলক ঘটনা বিবেচনায় আলোচ্য গবেষণার যাত্রা বিন্দু স্থির করা হয়েছে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দকে এবং আলোচ্য গবেষণার সমাপ্তিকাল ধরা হয়েছে আব্বাসীয় শাসনামল পর্যন্ত। কেননা ইসলামি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় রাজবংশ আব্বাসীয় খিলাফতের পরিসমাপ্তি হয়েছিল শেষ আব্বাসীয় খলিফা আল মুসতাসিম বিল্লাহ্‌কে সপরিবারে হত্যা করার মাধ্যমে। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল নেতা হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করে আব্বাসীয় শেষ খলিফা আল মুসতাসিম বিল্লাহ্‌কে পরিবারসহ হত্যার মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চার বছর মুসলিম ধর্মজগতকে নেতৃত্ব শূন্য করেন। আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের ফলে একটি বিশ্বজনীন খিলাফতের অধীনে শাসিত নাগরিকদের ঐক্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ে। খিলাফতের রাজনৈতিক ঐক্যের স্থলে ভাঙ্গন শুরু হয়ে বিশাল বিশাল অঞ্চলজুড়ে অসংখ্য মুসলিম সালতানাতের জন্ম হয়।[১৮] কাজেই ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ খিলাফত

[১৬] Dr. Mehboob Desai, *Islam and Non-violence*, Gyan Publishing House, New Delhi, 2009, p. 97
[১৭] Jurji Zayadan, *History of Islamic Civilization Umayyads and Abbasids,* Tr. D.S. Margoliouth, Kitab Bhavan, New Delhi, 2006, p. 36
[১৮] John L. Esposito, *Islam and Politics*, Syrcunse University Press, New York, 1991, p. 25

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থার আইনত ইতি না ঘটলেও হালাকু খান যে ধ্বংস ও তাণ্ডবলীলা চালিয়ে খিলাফত নামক প্রতিষ্ঠানের ছেদ চিহ্ন একে দিয়েছিলেন সেজন্য ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজকরূপে আমলে এনে একে আলোচ্য গবেষণার শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণার বিষয়বস্তু

খিলাফত আমলের অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী গভীর অধ্যয়ন আলোচ্য গবেষণাকর্মের বিষয়বস্তু। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে ইসলাম, হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানপূর্বক আলোচ্য গবেষণাকর্মের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ, পরিপূর্ণ, শান্তিময়, শাশ্বত কল্যাণকামী, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সর্বগ্রাহী, পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। পবিত্র কোরআন মজিদে ইসলামকে আল্লাহর একমাত্র দীন বা জীবনবিধান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে,

ان الدين عند الله الاسلام-

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন।"[১৯] জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে ইসলামের সঠিক, বাস্তবমুখী, সহজবোধ্য ও কল্যাণকর দিক-নির্দেশনা। পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবি হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে সকল নবি ও রাসূলগণের নিকট মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একই জীবনবিধান পাঠিয়েছেন আর খাতিমুন নাবিয়্যান তথা শেষ নবি হযরত মুহাম্মদের (স.) মাধ্যমে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ মানুষের নিকট উপস্থাপন করেছেন। অতীতে যে সকল নবি ও রাসূলগণের নিকট আসমানি কিতাব ও সহিফা প্রেরণ করেছিলেন তা পরে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের কোনো নিশ্চিত ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট প্রেরিত মহাগ্রন্থ আল কোরআনের রক্ষার দায়িত্ব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত জীবনবিধানের পরিপূর্ণতাদানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আল্লাহ পবিত্র কোরআনে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم السلام دينا-

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম।"[২০]

[১৯] *আল-কুর'আন*, ০৩:১৯ (বি. দ্র. এ অভিসন্দর্ভে পবিত্র আল্-কুরআনুল করীমের অনুবাদের ক্ষেত্রে সকল উদ্ধৃতি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সম্পাদনা পরিষদ, ৫৮ তম মুদ্রণ, জুন ২০১৮ এর রীতি-নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য সূত্র উল্লেখ করার ক্ষেত্রে প্রথমে সূরা নম্বর এবং পরে আয়াত নং ব্যবহার করা হয়েছে।)

[২০] *আল-কুর'আন*, ০৫:৩

Dhaka University Institutional Repository

আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগি থেকে শুরু করে দৈনন্দিন লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, আহার-বিহার, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, নৈতিক জীবনের রূপরেখা, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তজার্তিক বিষয়সহ ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সবকিছুই ইসলামের বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সকল যুগ, দেশ ও সব মানুষের কল্যাণকামী ধর্ম ইসলাম নির্দিষ্টভাবে কোনো বিশেষ জাতি, দেশ বা সমাজের জন্য আসেনি। পৃথিবীতে যতগুলো প্রচারিত ধর্ম আছে তার মধ্যে ইসলামই একমাত্র যুক্তিবাদী ধর্ম। T. W. Arnold বলেন, "Islam is a religion that is essentially rationalistic in the widest sense of this term considered etymologically and historically."[21]

ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। দেশ, গোত্র, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা। সমগ্র মানব জাতি একই পরিবারভুক্ত। কেননা, আমরা সবাই আদম ও হাওয়া (আঃ) এর সন্তান। কোরআন মজিদে এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا-

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হইতে পার।"[২২]

সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, বিশ্বমানবতাবোধ ও কল্যাণকামী সৌন্দর্যের জন্যই ইসলাম সমগ্র বিশ্বে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও দ্রুত সম্প্রসারণশীল একটি ধর্ম হিসেবে নন্দিত। সামাজিক, সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দিক থেকে মুসলিম সমাজ একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা। এরূপ সমাজ ধর্ম স্বাতন্ত্রিক স্বায়ত্তশাসিত কোনো এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না বরং সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধর্ম প্রবিষ্ট হয়।[২৩] ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে যারাই বসবাস করছে তারা যে মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করেছে তা অন্য কোনো ধর্মে কখনও কেউ লাভ করেনি বা করবে না। এর একমাত্র কারণ এই যে, ইসলাম হলো বিশ্বের সার্বজনীন ধর্ম এবং রাসূল (স.) কে পাঠানো হয়েছিল বিশ্বমানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে। হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলামি জীবনাদর্শের ভিত্তিতে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অন্ধকার যুগে মক্কায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর নির্দেশে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন।[২৪] হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় আবির্ভূত হয়ে ধর্মীয় অনাচার, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা দূর করার জন্য এবং মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সম্ভাব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে একটি লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করেন যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনার সনদ' বা

---

[২১] T. W. Arnold, *The Preaching of Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1999, p. 386

[২২] *আল-কুর'আন*, ৪৯:১৩

[২৩] Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development*, Little Brown, Boston, 1970, p. 59

[২৪] হিজরত ৬২২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছে এতে কারো মাঝে কোনো মতপার্থক্য নেই। তবে হিজরতের তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকে ৮ রবিউল আউয়াল ৬২২ খ্রি. আবার অনেকে ১২ রবিউল আউয়াল ৬২২ খ্রিস্টাব্দ বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

Charter of Medina নামে পরিচিত। এ সনদের মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে M. Muhammad Ali বলেন, "The foundation of the state laid down by the prophet were thus spiritual. They were at the same time democratic in the truest sense of the word."[25]

আদর্শবাদ ছাড়া কোনো রাষ্ট্র চলতে পারে না। ইসলামি রাষ্ট্র মূলত একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের আইন-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান কোরআন ও সুন্নাহর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ এর মতে, "যে ভূখণ্ডে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য, সরকার, জনগণ ও আল্লাহর আইন তথা কোরআন ও সুন্নাহর পরিপূর্ণ নীতির বুনিয়াদে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা ব্যবস্থাকে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকেই বলা হয় ইসলামি রাষ্ট্র।"[২৬] অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের মূল পার্থক্য হলো অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সরকার যেখানে 'সার্বভৌমত্বের'[২৭] বিষয়টি মানুষের হাতে সেখানে ইসলামি রাষ্ট্রে তা আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান আইনপ্রণেতা নয়, ঐশ্বরিক বিধানের ধারক হিসেবে কাজ করে। ইসলামি রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করে, যা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করে না। ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব হলো সকলের মৌলিক প্রয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করা। ইসলামি রাষ্ট্রে খলিফা বলা হয় রাষ্ট্রপ্রধানকে। কারণ খিলাফতের সামগ্রিক রূপ রাষ্ট্রীয় খিলাফত। খিলাফতের তত্ত্বাবধানে জনগণ যদি নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম না হন, তাহলে খিলাফত রাষ্ট্রকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ মৌলিক দায়িত্বগুলো গ্রহণ করতে হবে।[২৮]

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জানমালের নিরাপত্তা, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ অন্যান্য সমঅধিকার যে রকম নিশ্চিত করেছিলেন, তাঁর ইন্তেকালের পর খিলাফত আমলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলে একই রকম অধিকার ভোগ করতো। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি বিধায় ইসলামি রাষ্ট্রে সকলের জন্য আইন সমান।

---

[২৫] Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, The Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam, Lahore, 4th edition,1951, p, 626

[২৬] আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, *ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র*, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৪০

[২৭] সার্বভৌমত্ব শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Sovereignty। এটি লাতিন শব্দ Superanus থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ হলো একক, অবিভাজ্য, ইত্যাদি। পারিভাষিক ভাবে সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝায়, রাষ্ট্রশক্তির আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের একক, অবিভাজ্য, সর্বোচ্চ ও চরম ক্ষমতাকে সার্বভৌমত্ব বলা হয়। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের রূপ এক নয়। রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। রাজতন্ত্রে সাধারণত রাজাই আইনের একমাত্র উৎস। তাঁর হাতে সকল ক্ষমতা। যেহেতু তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না সেজন্য তিনি রাষ্টের সকল ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো দেশের অধিবাসীরাই দেশের প্রকৃত মালিক নয়। ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ইসলামি রাষ্ট্রে তিনিই হচ্ছেন মৌলিক আইনের উৎস এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি মাত্র। ইসলাম কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে না। গতানুগতিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির আদেশ রাষ্ট্রের সকল নাগরিককেই বিনা বাধায় মেনে নিতে হয়। ইসলামে জনগণের সার্বভৌমত্ব নয়, জনগণের প্রতিনিধিত্বই কাম্য। সার্বভৌম ক্ষমতাকে হস্তান্তর করা যায় না। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৬-২৫৪; ড. আহমদ আলী, *সার্বভৌমত্ব ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭-৬৭

[২৮] শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৭১

আর ইসলামি রাষ্ট্রের বিশেষত্ব এখানেই। অমুসলিমদের অধিকার তাই, যা মুসলমানদের জন্য রয়েছে তবে ব্যতিক্রম ঘটবে তখনই, যখন শরিয়তের আলাদা নস (নির্দেশ প্রদানকারী দলিল), কিংবা ইজমা থাকবে। মুসলিম-অমুসলিমদের আইন ইসলামি রাষ্ট্রে শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত একই নিয়মে প্রচলিত আছে। তাদের জান-মাল, মান-সম্মান মুসলমানদের জান-মাল, মান-সম্মানের ন্যায় পবিত্র। ফলে অমুসলিমকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, সমালোচনা করা, নিন্দা করা, মান-সম্মান কিংবা জান বা মালের ক্ষতি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[২৯] সুতরাং কোনো অমুসলিমের সাথে যে কোনো প্রকার মান-হানিকর আচরণ করা অবৈধ। রাসূলে করিম (স.) বলেন,

من أذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله-

"যে ব্যক্তি যিম্মিকে কষ্ট দেয়, সে যেন আমাকে কষ্ট দেয়। আর যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দেয়।"[৩০] কোনো মুসলিম যদি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তবে এ অন্যায় হত্যার জন্য তার উপর কিসাসের আইন প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষেত্রে আইন মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য সমান। বেঁচে থাকার অধিকারের প্রশ্নে সকল মানুষের অধিকার সমান হওয়ায় ইসলামের আইনের দৃষ্টিতে একজন অমুসলিম নাগরিকের প্রাণ একজন মুসলমান নাগরিকের প্রাণের সমতুল্য।[৩১]

খিলাফত রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের উপর কোনো বহিঃআক্রমণ হলে তা রাষ্ট্রপ্রধানকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে হবে এবং তাদেরকে রক্ষা করতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজনে অমুসলিমদের রক্ষার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ওয়াজিব। সামরিক শক্তি ব্যয় করা ছাড়া রাজনৈতিক কৌশল করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে তা রোষ্ট্রের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। তবে রাজনৈতিক কৌশল হোক বা সামরিক শক্তি ব্যয়ে হোক যে কোনো একটি উপায়ে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপত্তা কোনোভাবেই বিঘ্নিত করা যাবে না। মুসলমানদের রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন ঠিক একই রকম ব্যবস্থা অমুসলিমদের জন্যও গ্রহণ করতে হবে। যাদের সাথে যিম্মাহ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তাদের রক্ষার জন্য প্রয়োজনে জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে দিতে হবে। জিয্ইয়া নামক প্রতিরক্ষা কর দেওয়ার মাধ্যমে অমুসলিম নাগরিকগণ ইসলামি রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে যোগদান হতে অব্যাহতি পেত। যুদ্ধ করতে সক্ষম ব্যক্তিদের উপর এ কর ধার্য করা হতো। হযরত আলী (রা:) বলেছেন,

انما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا و دمائهم كدمائنا-

[২৯] ড. আহমদ আলী, *ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৩

[৩০] মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী, *গায়াতুল মারাম ফি তাখরিজী আহাদিসীল হালাল ওয়াল হারাম*, হাদিস নং-৪৬৯, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ১৯৮০, পৃ. ২৬৯

[৩১] সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিক্হুস সুন্নাহ*, অনু. আকরাম ফারুক, খণ্ড ২, শতাব্দী প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪২১

“অমুসলিম নাগরিকরা জিয্ইয়া আদায় করে এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের ধনসম্পদ ও জানপ্রাণ মুসলিম নাগরিকদের মতোই সংরক্ষিত হবে।”[৩২]

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় স্ব স্ব ধর্ম পালন ও কৃষ্টি রক্ষার পূর্ণাঙ্গ অধিকার পাবে। ধর্মীয় নিয়মকানুন পালনের ক্ষেত্রে তাদের উপর কোনো প্রকার চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। ইসলাম ধর্ম গ্রহণে কোনো রকম বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে না। তাদেরকে তাদের ইচ্ছেমতো যে কোনো ধর্ম অবলম্বন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অমুসলিমরা স্বাধীনভাবে দেশের যে কোনো স্থানে, এমনকি মুসলিম জনপদেও যেমন মিলেমিশে বসবাস করতে পারে ঠিক তেমনি স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম পালনের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পালন করতে পারবে এবং নিজেদের ধর্মীয় প্রয়োজনে নিজস্ব পরিমণ্ডলে তারা নতুন উপাসনাগৃহ নির্মাণ করতে পারবে। তবে মুসলিম জনপদের অভ্যন্তরে অমুসলিমদের প্রাচীন উপাসনালয় থাকলে প্রয়োজনে তারা প্রতিষ্ঠানাদির সংরক্ষণ, তা নষ্ট হয়ে গেলে পুনঃনির্মাণ করার অধিকার তাদের রয়েছে কিন্তু মুসলিম জনপদের অভ্যন্তরে নতুন করে উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে না।[৩৩] প্রকাশ্যে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নিজেদের পরিমণ্ডলে ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারলেও মুসলিম জনপদের অভ্যন্তরে তারা কেবল ক্রুশ ও প্রতিমাবাহী শোভাযাত্রা বের করতে পারবে। প্রকাশ্যে ঢাক-ঢোল পিটানোর ক্ষেত্রে ইসলামি রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে করলে কড়াকড়ি আরোপ করতে পারবে। ইসলামি রাষ্ট্র একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র হওয়ার কারণে অমুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণে অতুলনীয় উদারতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবার ও চাকুরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের মতো অমুসলিমদেরও সমান স্বাধীনতা রয়েছে। জীবিকা উপাজর্নের জন্য কর্ম গ্রহণ বা পেশা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়াহ্ যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী যিম্মিদের যে কোনো পেশা বা কর্ম অবলম্বনে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারিগরি, কৃষি, মানি একচেঞ্জ, বিভিন্ন পেশা ও চাকুরিতে যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও কর্মনিষ্ঠার শর্তে মুসলিমরা যে সকল সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, অমুসলিমরাও তা ভোগ করবে। অমুসলিমদেরকে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ, সেনাপ্রধানের পদ ও সামরিক বিভাগে প্রত্যক্ষ যুদ্ধসংক্রান্ত কর্মকর্তা, মুসলিম আদালতের কাযী, সদকা বিতরণের পদ ব্যতীত বাকি প্রশাসনের বড় বড় সকল পদে নিয়োগ দেওয়া যাবে। তবে সামরিক বিভাগে যুদ্ধের সাথে সরাসরি লিপ্ত নয় এমন সকল পদে তাদেরকে নিয়োগ দিতে কোনো বাধা নেই। নিজের অর্থে গড়া প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনভাবে একাকী কিংবা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজে তারা আত্মনিয়োগ করতে পারবে। তাদের

---

[৩২] মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী, *ইউরাউল গালীল ফি তাখরিজী আহাদিসি মানারিস সাবিল*, পঞ্চম খণ্ড, হাদিস নং- ১২৬৪, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ১৯৭৯, পৃ. ১০৩

[৩৩] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল কা'সানী, *বাদায়েউস সানা'য়ে ফী তারতীবিশ শারা'য়ে*, খ.৭, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৮৬, পৃ.১১৩-১১৪

ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো পেশা বা কর্ম অবলম্বনে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। ইসলামি রাষ্ট্রে সুদি কাজ-কারবার পরিচালনা মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য নিষিদ্ধ। ইসলামি রাষ্ট্র মদ ও শূকরের ব্যবসা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ করলেও অমুসলিমদের জন্য মদ ও শূকরের আর্থিক বিনিময় মূল্য থাকায় তারা নিজেদের মধ্যে লেনদেন করতে পারবে। তবে মদের ব্যবসা তারা প্রকাশ্য করতে পারবে না।[৩৪] ইসলাম অমুসলিমদেরকে পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও মালিকানার অধিকার দিয়েছে।

ইসলামি রাষ্ট্রে সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে সরকার, সরকারের শাসননীতি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকার প্রধানের সমালোচনা করার অধিকার মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা , স্বাধীন মতামত ও বিবেকের স্বাধীনতা কখনোই অমুসলিমদের খর্ব করা হতো না বরং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে তাদের স্বাধীন মতামত দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হতো। অমুসলিমদেরকে কখনও শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামি শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয় নি। ইসলাম, অমুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিদের পরিচর্যা ও পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত না থাকলেও পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়। সে সময়ে মূলত শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মকেন্দ্রিক ছিল বিধায় তারা নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষা করার পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিলেন।

ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের জন্যই বিচারের ক্ষেত্রে সমঅধিকার ছিল। অমুসলিমরা মুসলিম আইনের বাইরে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিধান অনুসারে তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় প্রধানগণের মাধ্যমে নিজেদের বিচারের মীমাংসা করতেন।[৩৫] নিজেদের উপর নিজস্ব আইন প্রয়োগ করার নির্দেশনা ও স্বাধীনতা ইসলাম তাদেরকে দিয়েছে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ফৌজদারি ও দেউয়ানি আইনে মুসলিম-অমুসলিমের অধিকার সমান ও অভিন্ন ছিল। ইসলামি রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায় রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব, আরব-অনারব, মুসলিম-অমুসলিম, আশরফ-আতরফ কোনো ভেদাভেদ ছিল না। এ প্রসঙ্গে M. Muhammad Ali বলেন, “All people, including the ruler, had equal rights and obligations and were subject to the same law.”[36]

কোনো নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসচর্চার জন্য সে সময়কার অমুসলিম শ্রেণির বিভাজন, তাদের রীতি-নীত, সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণ খলিফাদের রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক নীতির মতোই

---

[৩৪] আলাউদ্দীন আবূ বকর ইব্‌ন মাস’উদ আল কা’সানী, খণ্ড-৭, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩

[৩৫] Philip K Hitti, *op.cit*, p.170

[৩৬] Maulana Muhammad Ali, *op.cit*, p, 626

সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়কে বিবেচনায় রেখে খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের শ্রেণিবিভাগ ও নাগরিকত্ব লাভের উপায়, তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন মর্যাদা ও অধিকার এবং অমুসলিম নাগরিকদের দায়-দায়িত্বের অনুসন্ধানী বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তু খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার : (৬৩২-১২৫৮ খ্রি.) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে ইসলামে মানবাধিকার ও খিলাফতের ক্রমবিবর্তনসহ অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার নির্ণয়ের জোরালো প্রয়াস থাকবে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

অমুসলিমদের জন্য ইসলাম সংরক্ষিত করেছে বিশেষ অধিকার। মুসলিমরা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়, এমনকি বিজয়লাভের পরও অমুসলিমদের প্রতি যে অবিশ্বাস্য ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রমাণ রেখেছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। অমুসলিম নাগরিকদের রক্তের মূল্য মুসলমানদের রক্তের সমান। অথচ বর্তমানে জোরেশোরে প্রচার করা হয় যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সংখ্যালঘুদেরকে সমানাধিকার ও মর্যাদা দান করে, আর ইসলাম এ ব্যাপারে সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়। আর এ কারণেই অমুসলিমরা খিলাফত আমল ও ইসলামি শাসনের কথা শুনলেই আতঙ্কিত হয়। আবার অনেকেই দাবি জানাতে থাকে যে, সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এটা দীর্ঘকাল ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের ফল। কাজেই খিলাফত আমলের ইতিহাস অধ্যয়ন ও সে সময়কার অমুসলিমদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ, খলিফা ও মুসলিম নাগরিকদের তাদের সাথে আচার-ব্যবহার বিষয়ে অনুসন্ধানী অধ্যয়ন জরুরি। আলোচ্য গবেষণার শিরোনামে খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও সমকালীন মুসলিম সমাজের আলোচনা ও খলিফাদের ক্ষমতার পালাবদলে রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি সমভাবে গুরুত্ব পাবে। কেননা খলিফা ও খিলাফত ছাড়া সমকালীন মুসলিম-অমুসলিম সমাজ চিন্তা করা যাবে না।

খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামল নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এ সময়কালকে উপজীব্য করে অনেক গবেষণা এবং বেশ কিছু মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল গবেষণা ও গ্রন্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ড. ইউসুফ কারযাভী এর *গাইরুল মুসলেমীন ফীল মুজতামায়িল ইসলামি*, ড. এডওয়ার্ড গালী আদ দাহবী এর *মুয়ামেলাতু গাইরুল মুসলিমীন ফিল মুজতামিউল ইসলামি*, Dr. Ghulam Nabi, এর *Khilafat in Theory and Practice*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2008, Danial C. Dennett রচিত *Conversion and Poll tax in Early Islam*, Idarah-i-Adabyat-i Delhi, Reprinted 2000, Sadar Bazar, Delhi, Dr. Shaikh Shaukat Hussain প্রণীত *Human Rights*

in Islam, Kitab Bhavan, New Dheli, 2001, A. Yusuf Alqarzavi, A Azhar Nadvi, রচিত *Islam, Muslims and non Muslims*, Adam publishers & distributors, Delhi, 2010, Philip k Hitti, এর *History of the Arabs,* Macmillan St Martin's Press, London, Tenth edition, Reprinted 1972, মুসা আনসারী, *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, ইত্যাদি। তবে এসব গবেষণাকর্ম ও গ্রন্থাদির পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এদের কোনোটি খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা, কোনোটি খিলাফতের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস, কোনোটি খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়কার অমুসলিম আবার কোনোটি উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলের অমুসলিম আবার কোনো গ্রন্থে মুসলিম-অমুসলিমের কর নির্ধারণ তথা জিয্ইয়া, খারাজ, উশর, আল ফে ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত, এ সকল গ্রন্থের আলোচনা বহুলাংশে খলিফাদের ক্ষমতায় আরোহণ ও তাদের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পর্কিত আলোচনা নির্ভর। খিলাফত আমলের অমুসলিম নাগরিকদের নাগরিকত্ব লাভ, শ্রেণিবিভাগ ও নাগরিকত্ব বাতিল সম্পর্কিত নীতিমালা, নিরাপত্তা, অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বাত্মক সমন্বিত গবেষণাকার্য সম্পাদিত হয় নি। তবে A. S. Tritton রচিত *The Caliphs and their non-Muslim Subjects*, Frank Cass and Company Limited, London, 1970, Dr. Sheikh Mohammad Iqbal এর *Islamic Toleration & Justice* : Non-Muslims under Muslim Rule, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2007, T.W.Arnold এর *The Preaching of Islam,* Kitab Bhavan, New Delhi, 1999. গ্রন্থগুলোতে খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ক লেখা এসব সীমাবদ্ধতা পূরণ করতে না পারলেও রাজনৈতিক ইতিহাসের অভাব পূরণের সার্থক চেষ্টা করেছেন। কাজেই সার্বিক বিবেচনায় বলতে হয় যে, খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার: (৬৩২-১২৫৮ খ্রি.) পর্যন্ত আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণে হয় নি এবং অনেকটা অবহেলিতই রয়ে গেছে। এরূপ বাস্তবতায় খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার বিষয় সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী অধ্যয়ন ও গবেষণা সময়ের দাবি। তাছাড়া খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদার উপর বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা হয় নি বিধায় বিষয়টি যুগোপযোগী ও এ বিষয়ে অনুসন্ধানী অধ্যয়ন জরুরি।

গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি

ইতিহাস গবেষণায় সমাদৃত দুটি গবেষণা পদ্ধতি হলো পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ ও তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান (Analytical & Empirical)। ইতিহাসের গবেষণা হিসেবে এতে বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা প্রাধান্য পেয়েছে এবং বহু জ্ঞাত বিষয়কে নতুন যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য-উৎস পর্যালোচনা

‘খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার: (৬৩২-১২৫৮ খ্রি.)’ শীর্ষক আলোচ্য গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তসমূহকে প্রধানত দু’ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: প্রাথমিক উৎস (Primary Source) ও দ্বৈতীয়িক উৎস (Primary Source)। খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কিত বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎসের গ্রন্থগুলো পরবর্তী ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ায় আলোচ্য গবেষণায় তথ্য উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

খিলাফত আমলে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের অধিকার ও কর্তব্য জানার অপর বিখ্যাত আকর গ্রন্থ হলো *কিতাব আল খারাজ*। এ গ্রন্থটি মূলত: একই শিরোনামে ২১ জন ঐতিহাসিক ও গবেষকের বিবরণীতে ২১ টি আলাদা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল কিন্তু কালের আবর্তে আমাদের হাতে এর মাত্র ৩ টি গ্রন্থ বর্তমান রয়েছে। এ গ্রন্থগুলো একই নামে প্রকাশিত হওয়ায় তা অনেক ক্ষেত্রে পাঠকদের বিভ্রান্তও করে থাকতে পারে। বর্তমানে যে তিনটি গ্রন্থ আমাদের হাতে রয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রথম ও প্রাচীনতম গ্রন্থ হলো ইয়াহিয়া বিন আদম আল কুরাইশি কর্তৃক রচিত *কিতাব আল খারাজ* বা *কিতাব রিসালা ফি আল-খারাজ* (*Taxation in Islam*, Vol. I, Edited, Translated and Provided with an Introduction and Notes by A. Ben Shemesh with a forewarded by S. D. Goitein, Leiden, E. J. Brill, 1958)। ইয়াহিয়া বিন আদম তাঁর বিখ্যাত এ গ্রন্থে জিয্ইয়া, খারাজ, উশর ও খারাজি ভূমির প্রকরণ এবং করারোপ ও কর মুক্তির বিষয়াবলি আলোচনা করে প্রথমবারের মতো আমাদের সামনে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের আর্থিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করেছেন। তিনি এ গ্রন্থের আলোচনায় বিভিন্ন অমুসলিম নাগরিকদের (বনু নাজির, বনু তাগলিব ইত্যাদি) সাথে মুসলিমদের নানামুখী সম্পর্ক বিষয়ে ইসলামের ধারণা ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে খারাজি ভূমি ক্রয়সংক্রান্ত নীতিমালার আলোচনা করে সমকালীন অমুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। ইবনে আদম ভুমি বরাদ্দ, ভুমির প্রকরণ, কর আদায়ের পদ্ধতি ও এতদ্সঙ্গে খিলাফত আমলে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম প্রজাদের অর্থনৈতিক অধিকার ও কার্যক্রম এবং রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরে আরব ইতিহাস গবেষকদের সামনে অমূল্য তথ্য প্রদান করেছেন। কিন্তু এ গ্রন্থে আরব খিলাফতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস স্থান না পাওয়ায় এটিকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ইতিহাসের আকর উৎস হিসেবেই বিবেচনা করা যেতে পারে।

A. Ben Shemesh তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে অপর বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবু আল-ফারাজ কুদামা বিন জাফর আল কাতিব কর্তৃক *কিতাব আল খারাজ ওয়া-সানিয়াত আল কিতাবাহ*-এর অনুবাদ (*Taxation in Islam*, Vol. II, Edited, Translated and Provided with an Introduction and Notes by A. Ben

Shemesh, Leiden, E. J. Brill, 1965) স্থান দিয়েছেন। কুদামা বিন জাফর রচিত এ গ্রন্থে সমকালীন আরবদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের নানা বিষয়াবলির উল্লেখপূর্বক এখানে অমুসলিম নাগরিকদের বিষয়েও অনেক তথ্য বিধৃত রয়েছে। এ গ্রন্থে ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের নানা উৎসের উল্লেখসহ খারাজি ও সুলহি ভূমি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থে গ্রন্থাকার জাফর আল কাতিব খিলাফত আমলে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম প্রজাদের উপর ধার্যকৃত খারাজ ও জিয্‌ইয়া আদায় ও আরোপের পদ্ধতির উল্লেখপূর্বক প্রসঙ্গক্রমে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রদান করেছেন যা এতদ্‌বিষয়ে পরবর্তী গবেষকদের নিকট মূল্যবান উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম রচিত *কিতাবুল খারাজ* (আরবি), দারুল মারেফা, লেবানন, বৈরুত, ১৯৭৯ গ্রন্থটি আরব গবেষকদের নিকট অতি মূল্যবান আকর উৎস হিসেবে পরিচিত। তিনি এ গ্রন্থে খিলাফত আমলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নানা দিকের উল্লেখের সাথে সাথে খিলাফত আমলে বসবাসরত অমুসলিম প্রজাদের বিশেষতঃ খারাজ, জিয্‌ইয়া, যিম্মি ও অমুসলিম প্রজাদের উপর আরোপিত অন্যান্য কর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এতে ইসলামি রাষ্ট্রের ভুমি ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব, কৃষির সম্প্রসারণ, অমুসলিম প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও কার্যক্রম স্থান পেয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা বিবর্তনময়। বিবর্তনের এ ধারায় এর অর্থনীতি ও সংস্কৃতি নানাভাবে আবর্তিত হয়েছে এবং সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আরব রাষ্ট্রীয় কাঠামো গতিময়তা লাভ করেছে। আর এ গতিময়তার প্রধান নিয়ামক ছিল আরবদের ভুমি ব্যবস্থাপনা। কিন্তু খাইবার বিজয়ের আগে আরবদের ভুমিসংক্রান্ত তেমন কোনো অভিজ্ঞতা ছিলনা। পরবর্তীতে খোলাফয়ে রাশেদিনের আমলে রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হলে ভুমিসংক্রান্ত বিষয়গুলো জটিল আকার ধারণ করে। ফলে এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়ে। উমাইয়া শাসনামলে দ্বিতীয় উমরের সময় আমরা এ সংক্রান্ত পদক্ষেপ নিতে দেখি। আব্বাসীয়রা ছিল আরো এক ধাপ এগিয়ে। রাষ্ট্রের চরিত্রগত পরিবর্তন ভুমিব্যবস্থার নীতিতে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। আরব-অনারব, মুসলিম-অমুসলিম ইত্যাদি বিভক্তি রাষ্ট্রের চরিত্রের সাথে সমানতালে বেড়ে উঠতে শুরু করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কীভাবে রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে এ সংক্রান্ত আলোচনা আবু ইউসুফ অত্যন্ত সাবলীলভাবে এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। আবু ইউসুফ আলোচ্য গ্রন্থে উৎস হিসেবে চলমান ঘটনার ঐতিহ্যকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। সমাজে চলমান বিভিন্ন Tradition থেকে তথ্য সমন্বয়ের চেষ্টা তাঁর লেখায় পরিদৃষ্ট হয়। লেখক অত্যন্ত নির্মোহভাবে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সময় থেকে শুরু করে অমুসলিম প্রজাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এ আলোচনায় খুলাফায়ে রাশেদুনের সময়কালে গৃহীত পদক্ষেপের উল্লেখপূর্বক উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকগণ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদান করে আরবদের অর্থনৈতিক ইতিহাস বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। খিলাফত আমলের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনা

তেমনটা স্থান না পেলেও আবু ইউসুফের আলোচনায় অমুসলিম প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যথাযথভাবে বিধৃত হওয়ায় মুসলিম ইতিহাস গবেষকদের নিকট এ গ্রন্থটি মহামূল্যবান উৎস হিসেবে সমাদৃত।

আহমাদ ইবন্ ইয়াহইয়া ইব্‌ন জাবির আল বাগদাদী আল-বালাযুরী রচিত গ্রন্থ *ফুতূহুল বুলদান (আরবি)*, তবউল কুতুব আল আরাবিয়্যাহ, কায়রো, ১৯০১ গ্রন্থটি আরব ইতিহাসের আকর উৎস হিসেবে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। এ গ্রন্থটিতে জাজিরাতুল আরবের পরিচয় দিয়ে শুরু করে বালাযুরী মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের ঘটনা আলোচনার পর মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে বসবাসরত অমুসলিম গোত্র বনু নজির ও বনু কুরায়জার সাথে মুহাম্মদ (স.)-এর সম্পর্ক, ঐ গোত্রগুলোর আচরণ ও কার্যক্রম এবং মহানবি (স.)-এর নীতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মূলত এটি গাযওয়া (যুদ্ধের বিবরণ) ভিত্তিক গ্রন্থ হলেও এ গ্রন্থে খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়কার নানা বিজয়াভিযান, বিভিন্ন গোত্রের সাথে স্বাক্ষরিত সন্ধি এবং বিজিত এলাকাগুলোতে মুসলিমদের গৃহীত নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে মুসলিম অধিকৃত এলাকাসমূহের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি, বিশেষ করে খারাজি ভূমি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে যা এ গ্রন্থটিকে খিলাফত আমলে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে এবং মুসলিম প্রশাসকগণের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এ গ্রন্থে আরব খলিফাদের অধীনে বসবাসরত খ্রিস্টান, সাবিয়ান ও অন্যান্য ধর্মানুসারীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও লক্ষ করা যায় যা আকর উৎস হিসেবে আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটির বিষয়বস্তু মুহাম্মদ (স.) থেকে শুরু হয়ে উমাইয়া আমলে আরবদের সিন্ধু বিজয় পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত আমলে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য হলেও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদানে সক্ষম নয়।

আধুনিক বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী (জ. ১৯২৬ খৃ.)। ইসলামের সঠিক ও স্বচ্ছ জ্ঞানচর্চা এবং এর আলোকে সমসাময়িক জটিল সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে রক্ষার একজন প্রবক্তা। তার প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম একটি গ্রন্থ হচ্ছে- *“গাইরুল মুসলিমীনা ফিল মুজতামি‘ইল ইসলামি”* (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي)। অবয়বের দৃষ্টিতে গ্রন্থটি ছোট হলেও বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থটি প্রথম ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। এর ৩য় সংস্করণ ১৯৯২ সালে মিসরের কায়রোর “মাকতাবাতু ওয়াহবাহ” থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি আল-কুরআন ও হাদিছের আলোকে ইসলামি সমাজব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের অবস্থান, অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক এবং ইসলামি সমাজব্যবস্থায় অমুসলিমদের অধিকার, কর্তব্য ও দায়-দায়িত্বের বিবরণী প্রদান করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে যিম্মিদের আভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ বিরোধীদের থেকে জান-মাল ও মান-সম্মানের

নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থানের স্বাধীনতার দিকটি; আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে এদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিবৃত হয়েছে। তৃতীয়ে অধ্যায়ে উদারতা ও মহানুভবতা; চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামি সমাজব্যবস্থায় তাদের অবস্থানের ঐতিহাসিক চিত্র ফুটে উঠেছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামি সমাজব্যবস্থায় অমুসলিমদের অবস্থান বিষয়ের সংশয়ের নিরসন এবং সর্বশেষ ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। সার্বিক দিক বিবেচনা করে তিনি তাঁর গবেষণায় মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.), খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার বর্ণনার পাশাপাশি ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অমুসলিম নাগরিকরা তাদের অধিকারের বিনিময়ে ইসলামি রাষ্ট্রে যে সকল দায়-দায়িত্ব পালন করেন তা সীমিত পরিসরে উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত ড. ইউসুফ কারযাভী তার গ্রন্থে খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামল সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত তবে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন যা বর্তমান গবেষণার তথ্য উৎস হিসেবে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তবে পূর্ণাঙ্গ নয়।

ড. এডওয়ার্ড গালী আদ-দাহাবীর অনন্য রচনা হচ্ছে "*মু'আমিলাতু গাইরিল মুসলিমীনা ফিল মুজতামি'ইল ইসলামি*" (معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) গ্রন্থ। অন্যান্য ধর্মালম্বী ও ভিন্ন মতাদর্শের অধিকারীদের প্রতি ইসলামের উদারতার বিষয়ে এটি একটি অনন্য গ্রন্থ। এ বিষয়ের উপর রচিত গ্রন্থের অস্তিত্ব খুবই বিরল। গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ ১৯৯৩ সালে কায়রোর মাকতাবাতু গারীব থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৯৩ সালে মিসরীয় দাওয়াহ ওয়াল ফিকহুল ইসলামি বিষয়ক প্রতিযোগিতা "ওয়াকফুল ফিনজিরি" ১ম পুরস্কারে ভূষিত হন। এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তিনি আল-কুরআন ও হাদিসের দলিলসহ ইসলামে মানবতার অবস্থান; মানবতার প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ; কিরূপে মানবজাতি পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হবে এবং ইসলামে মানুষের মাঝে সাম্যের প্রকৃতি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার বিষয়টি ফুটে ওঠেছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি আল-কুরআন ও রাসূল (স.)-এর জীবনী থেকে উদাহরণসহ ইসলামে 'আদল' তথা ন্যায়বিচারের চিত্রটি উপস্থাপন করেছেন। আর চতুর্থ অধ্যায়ে "আহলে কিতাব"-এর মর্যাদা এবং পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামি সমাজব্যবস্থায় তাঁদের অধিকার বিশেষত: জান-মাল, মান-সম্মান অধিকারের নিরাপত্তার বিষয়টি উঠে এসেছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইতিহাসের কিছু চিত্র, বিশেষত: মিসরে ইসলাম ও খিস্টধর্মের ১ম সম্মেলন এবং উমর ইবন আল-আস ও পপ বেঞ্জামিনের সাক্ষাতকারটি বিবৃত হয়েছে। সর্বশেষ উপসংহারে সভ্যতা ও কল্যাণ রাষ্ট্রে (আদ-দাওলাহ আল-'আদিলাহ) সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণের মানদণ্ড বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক গ্রন্থটিতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ঘটনাবলির বিবরণী আলোকপাত করেছেন যা আলোচ্য গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিশ্ব ইতিহাসে যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে মেধা ও মননশীলতার মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে পারসিক খ্যাতনামা পণ্ডিত, ইতিহাসবিদ ও মুফাসসির আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ খ্রি.) অন্যতম। তিনি মূলত জন্মস্থান আত-তাবারী নামেই খ্যাতি লাভ করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আত-তাবারী তাফসির ও ইতিহাস বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য সেকাল থেকে বর্তমানেও সমাদৃত হয়েছেন। ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অমর কীর্তি হচ্ছে *"তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক"* (تاريخ الرسل والملوك) বা *"তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক"* (تاريخ الأمم والملوك) গ্রন্থটি। তবে তা *"তারিখুত তাবারী"* (تاريخ الطبري) নামেই সমধিক পরিচিত। বহুমুখী ও বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী এ ব্যক্তিটির ইতিহাস ও তাফসির ছাড়াও ফিকহ, কবিতা, অভিধান, ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, গণিত, ঔষধ ও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনী রয়েছে। তবে আরবি ভাষায় রচিত তাঁর *"তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক"* গ্রন্থটি বিশ্ব ইতিহাস বিষয়ের উপর রচিত পূর্ণাঙ্গ ও প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে মানব সৃষ্টির সূচনা তথা আদি মানব হযরত আদম (আ.) থেকে ৯১৫ খ্রি. পর্যন্ত বিভিন্ন নবি-রাসূল, প্রাক-ইসলামি আরব, রাসূল (স.)-এর জীবনী, খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসি বংশের সুবিস্তৃত ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে তিনি গ্রন্থটিকে বিশ্ব ও ইসলামের ইতিহাস দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগে বিশ্ব ইতিহাস, বিশেষত রাজা-বাদশাহ, বিভিন্ন জাতি (সাসানি, রোম) ও নবিদের ইতিহাস (হযরত আদম আ. থেকে ঈসা রা. পর্যন্ত) সন্নিবিষ্ট করেছেন। তবে তিনি সময় অনুযায়ী না সাজিয়ে ঘটনা বা বিষয় অনুযায়ী সাজিয়েছেন। আর দ্বিতীয়ভাগে ইসলামের ইতিহাসটি হিজরি সনের ধারাবাহিকতায় রাসূল (স.) জীবনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে ৩০২ হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন প্রবাহ উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর এ গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ ১৯৬৭ খ্রি. ১০ খণ্ডে মিসরের দারুল মা'রিফ থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি পরবর্তী ইতিহাসবিদ, বিশেষত ইবন মিসকাওয়াইহ (মৃ. ১০৩৭ খ্যি.), ইবনুল আসির (১১৬০-১২৩৪ খ্রি.), আবুল ফিদা (১২৭৩-১৩৩১ খ্রি.), আয-যাহাবি (১২৭৪-১৩৪৮ খ্রি.) ও ইবন খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.) প্রমুখ ইতিহাসবিদদের নিকট আকর গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। সঠিক ও বিশ্বস্ত তথ্য উপস্থাপনই ছিল আত-তাবারির মূল বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি এ গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ও তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন। এ ক্ষেত্রে নিজস্ব অভিমত পেশ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রয়েছেন। ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনার শৈল্পিক উপস্থাপনায় তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থটিতে ইতিহাস উপস্থাপনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় পণ্ডিতদের নীতিজ্ঞান, আইনশাস্ত্রবিদদের সচেতনতা, বিচারকদের নির্ভুলতা এবং অধ্যবসায়ীদের উদারতাকে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম হয়েছেন। মোটকথা তাঁর এ গ্রন্থের আগাগোড়া ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা, নির্ভুল উপস্থাপনা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্যের জন্য স্বাতন্ত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। তাই অতীতের ন্যায় ভবিষ্যত ইতিহাস অনুরাগীদের নিকটও তথ্যের ভাণ্ডার ও মানদণ্ড হিসেবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

আব্বাসীয় যুগ ইসলামের ইতিহাসে সোনালী যুগ হিসেবে খ্যাত। এ যুগে খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতি ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করে। ফলে মুসলিম পণ্ডিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখাতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এ সকল পণ্ডিতদের মধ্যে বাগদাদের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং ভূগোলবিদ আবুল হাসান আলী ইবন আল-হুসাইন আল-মাসউদী (৮৯৬-৯৫৬ খৃ.) অন্যতম। তিনি আরবের হেরোডোটাস হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মধ্যযুগের এ বিখ্যাত ঐতিহাসিকের এক অনবদ্য গ্রন্থ "*মারুজুয জাহাব ওয়া মা'আদিনুল জাওয়াহিরি*" (مروج الذهب ومعادن الجوهر)। আরবি ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটিতে সৃষ্টির সূচনা আদি মানব হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতী লিল্লাহ (৯৭৩ খৃ.) পর্যন্ত সময় কালের ইতিহাসটি বিবৃত হয়েছে। এ গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ ৯৪৭ খৃ. সম্পন্ন হয়। আধুনিক যুগে ইংরেজি ও ফরাসিসহ প্রায় অনেক ভাষাতেই এ গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। এ গ্রন্থটি ২০০৫ সালে বৈরুতের "আল মাকতাবাতুল আছরিয়া" থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে তিনি বিশ্বের প্রাচীন যুগের ইতিহাস, খবরা-খবর, নবি-রাসূল, রাজা-বাদশাহদের জীবনী ও ইতিহাস এবং বিভিন্ন জাতি ও তাদের অবস্থানের ইতিহাসটি উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটিকে মাসউদী বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগে পৃথিবীর সৃষ্টি, নবিদের কাহিনী, নদী ও সাগর এবং এর আশ্চার্যাবলি, প্রাচীন জাতি বিশেষত: পারসিক, রোমান, গ্রিক ও প্রাচীন আরবদের ইতিহাস; তাদের ধর্ম বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও চিন্তা-চেতনা স্থান পেয়েছে। এ ভাগে নবিদের প্রেরণ, রাসূল (স)-এর সময় থেকে তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.) পর্যন্ত ইসলামি আবর রাজ্যের ইতিহাস উঠে এসেছে। আর দ্বিতীয় ভাগে চতুর্থ খলিফা আলী (রা.) থেকে শুরু করে উমাইয়া খেলাফত ও আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতী লিল্লাহ পর্যন্ত ইতিহাসটি স্থান পেয়েছে। আলোচ্য গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গ্রন্থটি এক অমূল্য উৎস। Professor Shibli Nu'mani- এর লিখিত *Al-Farook* গ্রন্থটি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর উপর লিখিত জীবনীগ্রন্থ। লেখক গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচনা করেছেন। Maulana Zafar Ali Khan গ্রন্থটি *Al-Farooq The Life of Omar The Great*, International Islamic Publishers, New Delhi, 1992 নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। হযরত উমর (রা.)-এর আমলে এসে ইসলামি খিলাফত একটি সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে এবং এর পাশাপাশি এই মহান খলিফার আমলেই ইসলামি প্রশাসন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। তিনি প্রশাসনে নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশাসনকে একটি অনুসরণীয় কাঠামো প্রদান করেন। এই কাঠামোই পরবর্তীতে অন্য খলিফা কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল। ফলে হযরত উমর (রা.)-এর জীবনী পাঠ গবেষকদের জন্য অবশ্য করণীয়। শিবলী নোমানী আলোচ্য গ্রন্থে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে হযরত উমর (রা.)-এর জীবন ও কর্ম আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি ১ম ভাগে হযরত উমর (রা.)-এর প্রাথমিক জীবন এবং প্রাথমিক বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির ২য় ভাগে আলোচ্য গবেষণার জন্য অধিকতর

গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে হযরত উমর (রা.)-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে অমুসলিম ও যিম্মিদের মর্যাদা এবং অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি অমুসলিম নাগরিকদের ইসলামি খিলাফত আমলে মর্যাদা এবং অধিকার বিষয়ক আলোচনার জন্য এক অমূল্য উৎস।

Dr. Ghulam Nabi এর *Khilafat In Theory and Practice,* Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2008, গ্রন্থটি খিলাফত-সংক্রান্ত পঠন-পাঠনের জন্য এক আকর উৎস। গ্রন্থটি যথাযথ যুক্তির মাধ্যমে খিলাফত হলো সরকারের ইসলামি রূপ যা মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক একতার প্রতিনিধিত্ব করে- এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করেছে। এছাড়া লেখক শরিয়াহ্‌র দৃষ্টিকোণ এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে খিলাফতের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। খিলাফত সম্পর্কে কোরআন-হাদিস এবং শরিয়াহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি গ্রন্থটিতে খিলাফত সম্পর্কে মুসলিম চিন্তাবিদদের ধারণাও সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি গ্রন্থটিকে এক অনন্য উচ্চতা প্রদান করেছে। সমসাময়িক গ্রন্থসমূহে এ রকমভাবে একসাথে তাত্ত্বিক ও কাঠামোগত আলোচনা অনুপস্থিত। ফলে গ্রন্থটি গবেষকদের নিকট একটি বহুল উদ্ধৃত গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। এর পাশাপাশি গ্রন্থটির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে ১২৫৮ পর্যন্ত খিলাফতের ক্ষমতার ক্রমপরিবর্তন ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে। খিলাফতের ক্রমধারায় যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে, তা একটি পৃথক অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে যা খিলাফত সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এ ছাড়া গ্রন্থটির শেষে প্রাসঙ্গিকভাবেই খিলাফত এবং সম-সাময়িক মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বিদগ্ধ সমাজে চিন্তার খোরাক যোগায়।

ইসলাম মানবাধিকারের উপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এই ধর্মে মানবাধিকারের ধারণা শুধু ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এই ধারণাটি প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। Dr. Shaikh Shaukat Hussain এর *Human Rights in Islam,* Kitab Bhavan, New Dheli, 2001 গ্রন্থে এই ধারণাটিই বিবৃত করা হয়েছে । এর পাশাপাশি গ্রন্থটিতে মানবাধিকারের বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও মানবাধিকারসংশ্লিষ্ট আরও এমন কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যেগুলো এতদিন গুরুত্বহীন হিসেবে বিবেচিত হতো। গ্রন্থটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়সমূহ হচ্ছে: প্রথম অধ্যায়ে ইসলামে রাষ্ট্রের ধারণা যেখানে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ে আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামি সংবিধানের উৎসসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে যথাযথ উদ্ধৃতি এবং তথ্যনির্দেশসহ ইসলামে মানবাধিকার এর ধারণা, মানবাধিকারের স্বরূপ, প্রকার প্রকরণ এবং মানবাধিকার রক্ষার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৮ম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে পাশ্চাত্যে মানবাধিকারের ধারণা এবং বিশ্বের মানবাধিকার পরিস্থিতি আলোচনা করা

হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি ইসলামের মানবাধিকার বিষয়ক আলোচনার জন্য তথ্যবহুল এবং গবেষণার এক অমূল্য উৎস।

বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ ও গবেষক মজিদ খাদ্‌দুরী রচিত (*War and Peace in the Law of Islam,* Baltimore: The Johns Hopkings Press, 1955) গ্রন্থটি মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত একটি গবেষণা গ্রন্থ। এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ (*মজিদ কাদ্‌দুরী রচিত ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০১০) করেন বাংলাদেশের বিখ্যাত আর্ন্তজাতিক চিন্তাবিদ ও মুসলিম বিশারদ অধ্যাপক ড. হাসান জামান। এ গ্রন্থের আলোচনায় খাদ্‌দুরী মূলত যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে মুসলিম আইনের মৌলিক অবদান ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থে যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত আলোচনায় মজিদ খাদ্‌দুরী মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম যিম্মি প্রজাদের কার্যক্রম ও মুসলিম রাষ্ট্রের নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে যুদ্ধক্ষেত্র, ব্যবসায়-বাণিজ্যে পরিচালনা, সালিশি ব্যবস্থায় অমুসলিমদের প্রতি মুসলিম শাসকদের গৃহীত নীতি ও ইসলামের শিক্ষা বিষয়ে বিশ্লেষণী পর্যালোচনা করেছেন যা এতদ্‌বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছে। কিন্তু এ গ্রন্থটিতে খিলাফত আমলের অমুসলিম প্রজাদের ব্যাপকভিত্তিক ইতিহাস ফুটে ওঠেনি।

বিখ্যাত লেখক A.S. Triton কর্তৃক রচিত *The Caliphs and their non Muslim Subjects,* Frank Cass and Company Limited, London, 1970 গ্রন্থটি খিলাফত শাসনামল নিয়ে যে সকল মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম। গ্রন্থটিকে খিলাফত আমলের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাসূল (স.) এর ইন্তেকালের পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর হযরত আবু বকর (রা.) এর ক্ষমতায় আরোহণের সময়কাল থেকে খিলাফত আমলের যাত্রা শুরু। রাসুল (স.) রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করলেও এর মূল কাঠামো বিবর্তিত হয় খিলাফত আমলে। তাই ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাসে খিলাফত আমলের গুরুত্ব অপরিসীম। খিলাফত আমলের রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রের ধর্মীয় চরিত্র, অন্যান্য ধর্মালম্বী নাগরিকদের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, তাদের অধিকার, দায়িত্ববোধ, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে লেখক এখানে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন।

রাসূল (স.) এর হাত ধরে ইসলামি সভ্যতার বিকাশ ঘটলে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে একীভূত হয়ে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তা বিকশিত হয়। ধর্মাশ্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় মুসলমানদের প্রাধান্য থাকলেও রাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়টিও সমান গুরুত্ব হয়ে সামনে চলে আসে। ইসলামের সাম্যের জায়গাটি ক্রমশ বিস্তৃত হতে দেখা যায়। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের সাথে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কেমন হবে তা নিরূপণ জরুরি হয়ে পড়ে। ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তৃতি মূলত হযরত উমর (রা.)-এর সময় থেকে শুরু হয়, তাঁর সময়ে আরবের বাইরে মুসলমানদের কর্তৃত্ব বিস্তৃত লাভ করে। এ সময় দখলকৃত

অঞ্চলের বিপুল পরিমাণ অমুসলিম জনগোষ্ঠী মুসলিম শাসনের আওতায় আসে। এসব জনগোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধ নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। হযরত উমর (রা.) যিম্মিদের সাথে রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন আইন জারি করেন। আলোচ্য গ্রন্থে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

একথা স্বীকার্য যে, আরবরা ছিল যাযাবর, রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত তেমন কোনো অভিজ্ঞতা ছিলনা। তারা ছিল গোষ্ঠীকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় অভ্যস্থ। ইসলামের উত্থানের পর ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে উজ্জীবিত হয়ে আরবরা আশেপাশের অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলে যে রাষ্ট্রকাঠামোর সূচনা হয় তা পরিচালনা করতে গিয়ে স্থানীয়দের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। আর তার বেশিরভাগই ছিল অমুসলিম। কিন্তু এটাও স্বীকার্য যে, এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। নতুন কোনো সভ্যতার ভিত্তি গড়ে তুলতে অভিজ্ঞদের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক এবং এটি কোনো গর্হিত কাজ নয়। এ ব্যবস্থা ছিল সাময়িক। পরবর্তীতে মুসলমানরা নিজেরাই এ বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়েছেন। এখানে লেখক বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, অমুসলিমদের এরূপ সহযোগিতা না পেলে এমন বৃহৎ সভ্যতার ভিত্তি দাঁড় করানো সম্ভবপর ছিল না। যা কখনো মেনে নেওয়া যায় না।

লেখক তার রচনায় ইসলামের সাম্যবাদী নীতির বিবর্তন, শাসকদের সাথে অমুসলিম প্রজাদের সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। প্রথম দিকের ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সাথে যে আচরণ করা হতো কালের আবর্তে তাতে পরিবর্তন লক্ষণীয়। অমুসলিমদের প্রতি আরোপ করা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিধি নিষেধকে তিনি বড় করে দেখিয়েছেন। প্রশাসনসহ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতে যিম্মিদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি উল্লেখ করলেও তার বর্ণনায় মুসলিম শাসকদের চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলো উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষণীয়। যা লেখকের স্বভাবসুলভ দুর্বলতাকে সামনে নিয়ে আসে। এ রকম আরো অনেক বিষয়ে এ. এস ট্রিটনের বর্ণনার সাথে মত ভিন্নতা প্রকাশ করা যায়। রাসূল (স.) এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মূলকাঠামো ঐশ্বরিক বিধিবিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এতে আরব ও অনারব সংস্কৃতির মিশ্রণে নতুন ধারার সূচনা ঘটে। তথ্যের সন্নিবেশন ও ঘটনার পরম্পরার দ্বারা লেখক ইসলামি রাষ্ট্রের মৌলিক এ বিবর্তনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর এর দ্বারা খিলাফত আমলের ইসলামি রাষ্ট্রের মানদণ্ড নির্ণয় অনেক সহজতর হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের সাথে তার প্রজাদের সম্পর্ক ও অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র ফুটে উঠে। লেখকের বর্ণনায় আমরা সে প্রচেষ্টা লক্ষ করি।

লেখক বিভিন্নভাবে তার বর্ণনায় ইসলামের সাম্যবাদী চেতনার পতন ও এর বাইরে শাসক শ্রেণিকর্তৃক বিভিন্নভাবে অমুসলিম প্রজাদের ওপর নানা সামাজিক বিধিনিষেধের বিষয়ে আলোকপাত করলেও তৎকালীন সমাজের সার্বিক বিষয়কে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। অনেকটা অলক্ষে হলেও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন

যে, মুসলিম শাসনামলে অমুসলিমদের প্রশাসনসহ সকল ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণ ছিল। আর এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মুসলিম রাষ্ট্রে যোগ্যতা অনুসারে কর্মদক্ষতার নীতি প্রচলিত ছিল। অবশ্য খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ক আলোচনা আলোচ্য গবেষণায় গ্রন্থটির ব্যবহার অপরিহার্য করেছে।

বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক Muhammad Hamidullah কর্তৃক রচিত *Muslim Conduct of the State*, SH. Muhammad Ashraf, Lahore, 1977 মুসলিম আইন ও এর বিস্তৃতি সংক্রান্ত বিখ্যাত ও অনবদ্য গবেষণামূলক দলিল হিসেবে স্বীকৃত। লেখক তার সাবলীল বর্ণনা, প্রাঞ্জল উপস্থাপনা ও তথ্যের সন্নিবেশনের মাধ্যমে ইসলামি আইনের মৌলিক বিষয়গুলো উপস্থাপনার প্রয়াস চালিয়েছেন। ইসলাম একটি নিছক ধর্ম হিসেবে পৃথিবীতে বিস্তৃত হয় নি, একটি সামগ্রিক আইডিওলজি 'Ideology' বা আদর্শ হিসেবে জীবনব্যবস্থার সকল বিষয় এতে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে এর আবেদন কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা দেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, তা আমরা বৃহৎ পরিমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হতে দেখি।
ইসলাম ধর্ম বিশ্বের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের সামগ্রিক জীবন বিধান হিসেবে পৃথিবীতে বিবর্তিত হওয়ায় এর বিধি বিধানের সীমানা আর্ন্তজাতিক। ফলে একে আর্ন্তজাতিক আইনের স্বীকৃতি প্রদান করে। আর লেখক একে সেভাবেই এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছেন। ইসলামি আইনের পরিচয়, পরিধি এবং এর প্রকৃতি নিয়ে লেখক বিশদ আলোচনার দ্বারা ইসলামি আইনের বিভিন্ন শক্তিশালী দিক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। লেখক প্রাক ইসলামি যুগের সংস্কৃতি, প্রথা ও রীতিনীতি বিবর্তিত হয়ে ইসলামি আইনকে কীভাবে প্রসারিত করেছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

আইন হচ্ছে কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ, যাকে পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিত Command of the sovereign বলে অভিহিত করেছেন। যেখানে রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ আরোপ করে। কিন্তু ইসলামি আইন স্বর্গীয় এবং ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মাঝেই তা সীমাবদ্ধ থাকে নি, সকল ক্ষেত্রেই এর বিচরণ হওয়ায় সর্বত্র এর আবেদন লক্ষ করা যায়। লেখক ইসলামি আইনের সাথে আর্ন্তজাতিক আইনের আলোচনা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উপস্থাপনার দ্বারা এর অনন্য স্বাতন্ত্র্যবোধ তুলে ধরেছেন।

আধুনিক বিশ্বে আর্ন্তজাতিক আইনের নানা ব্যাখ্যা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্বায়নের এ যুগে মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকে নি, পৃথিবীর নানা প্রান্তে সংঘটিত ঘটনাবলি এখন মানুষের কাছে অজানা থাকছে না। ফলে মানবতাকে ধরে রাখতে, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে আর্ন্তজাতিক আইনের নানা খসড়া ও প্রয়োগ আমাদের নজরে পড়ে। আধুনিক যুগে এসে যেখানে এর প্রয়োজনীয়তা মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে, সেখানে ইসলাম হাজার বছর আগেই সার্বজনীন আর্ন্তজাতিক আইনের খসড়া প্রণয়ন

করে প্রমাণ করেছে শুধু ধর্ম ও দর্শন হিসেবে নয়, ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছে একটি সার্বজনীন ব্যবস্থা হিসেবে। রাষ্ট্রব্যবস্থার বিস্তৃতি, সরকারের দায়িত্ববোধ, জনগণের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, দ্বি-পক্ষিক আলোচনা, যুদ্ধকালীন অবস্থা, গৃহযুদ্ধ, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, নাগরিকত্ব লাভ, অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ, আশ্রিতের সাথে আচরণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ইসলামি আইনের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি। লেখক এসব বিষয়গুলোকে নিজস্ব আদলে সাজিয়ে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

নৈতিকতা হচ্ছে আইনের অন্যতম ভিত্তি। নৈতিক ভিত্তি ছাড়া আইনের পথচলা নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়, আইন হয়ে উঠে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মাধ্যম। ইসলামি আইনের নৈতিক ভিত্তি মহান আল্লাহর চিরন্তন বাণী আল কোরআন, রাসূল (স.)-এর হাদিস ও তাঁর অনুসারীদের যুক্তিসঙ্গত মতামত। লেখক তার রচনায় এ বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন।

মুসলিম প্রশাসন ও ন্যায়বিচার বিষয়ে আলাচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত মুসলিম গবেষক Al-Haj Mahomed Ullah (*The Administration of Justice in Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, India, Reprint, 1990) গ্রন্থে আরব খিলাফত আমলে ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা, খিলাফতের ক্রমবিবর্তন ও আব্বাসীয় শাসনামলের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমীয়, উত্তর আফ্রিকা, অটোমান, সুলতানী ও মুঘল শাসনামলের বিচারব্যবস্থা ও বিচারিক কর্মকাণ্ড আলোচনা করেছেন। খিলাফত আমলের অমুসলিম নাগরিকদের শ্রেণিবিভাগ, অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ক কোনো স্বতন্ত্র বিবরণ এ গ্রন্থে নেই, তবে ঘটনার ক্রমবর্ণনায় প্রাসঙ্গিকভাবে খিলাফতের ক্রমবিবর্তন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা রয়েছে। এ আলোচনায় মুসলিম বিচার প্রশাসনে বিচারিক প্রক্রিয়ার আলোচনায় মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করলেও মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন নি যা এ গ্রন্থের একটি দুর্বল দিক হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়।

ইসলামের ইতিহাসে ধারাবাহিকভাবে রাসূল (সা.) থেকে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনসহ অটোমান শাসন পর্যন্ত অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান, পরমতসহিষ্ণুতা এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির এক জ্ঞানগর্ভ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় Dr. Sheikh Mohammad Iqbal লিখিত *Islamic Toleration & Justice* : Non-Muslims under Muslim Rule, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2007 গ্রন্থে। এই গ্রন্থের আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে ‘সূচনা’ যেখানে লেখক অনেক যৌক্তিক শরিয়াহ্, যিম্মি, কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে সহমর্মিতা ও পরমতসহিষ্ণুতা এবং বর্তমান বিশ্বে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থটিতে বিস্তারিতভাবে ইসলামি আদর্শ এবং ইসলামি রাষ্ট্রে পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা

হয়েছে। গ্রন্থটিতে ধারাবাহিকভাবে রাসূল (সা.), খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া আমল ও আব্বাসীয় শাসনামলে ইসলামি খিলাফতে অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি গৃহীত আইন, প্রয়োগ এবং তাদের সামাজিক অবস্থান আলোচনা করা হয়েছে। আব্বাসীয়দের পতনের পর স্পেনে এবং অটোমান খিলাফতে অমুসলিমদের প্রতি প্রদর্শিত সামাজিক সুবিচারের কথাও এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এর পাশাপাশি ভারতীয় উপমহাদেশেও মুসলিম শাসনামলে অমুসলিমরা যে নাগরিক এবং সামাজিক অধিকার ভোগ করেছে, তার বিবরণও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশেষত: ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে অমুসলিমদের অবস্থান এবং অধিকার জানার জন্য আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হলেও খিলাফত শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Jurji Zayadan রচিত *History of Islamic Civilization Umayyads and Abbasids*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2006 গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন D. S. Margoliouth গ্রন্থটিতে প্রাক-ইসলামি আরব, খোলাফায়ে রাশেদিন এবং বিশেষত: উমাইয়া এবং আব্বাসীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে গড়ে উঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। তবে রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি লেখক তৎকালীন সমাজ ও বাস্তবতার এক রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। প্রাক-ইসলামি আরবের সমাজে দাস এবং 'যিম্মি'দের অবস্থান আলোচনা এই গ্রন্থের অমূল্য সংযোজন। এছাড়া তিনি গ্রন্থটি উমাইয়া এবং আব্বাসীয় আমলে সামাজিক সংগঠন ও কাঠামো, অমুসলিম নাগরিক, নাগরিক জীবন এবং ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তারের কারণে উদ্ভূত সমস্যাবলি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ফলে খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদাবিষয়ক গবেষণার জন্য আলোচ্য গ্রন্থটিকে একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

A. H. Qasmi রচিত *Islamic Governments,*Isha Books, Delhi, 2008 গ্রন্থটি ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থার প্রকৃতি এবং স্বরূপ সন্ধানের একটি প্রচেষ্টা। গ্রন্থটিতে লেখক বিস্তারিতভাবে ইসলামি সরকারব্যবস্থার ধারণা, অস্তিত্ব এবং কোরআন-হাদিসের আলোকে এর পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ করেছেন। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার এক অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হচ্ছে অমুসলিম নাগরিক। ফলে গ্রন্থটিতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব হচ্ছে, এতে মদিনা সনদের বিভিন্ন ধারা-উপধারা বিশ্লেষণ করে অমুসলিম বিশেষত: ইহুদিরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সকল সুবিধা ও সামাজিক সুরক্ষা ভোগ করত, তা বলা হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থটিতে খোলাফায়ে রাশেদিনের খলিফাদের খিলাফতে আরোহণের ঘটনা ও অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা আলোচ্য গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। তবে এসব ঘটনা বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে লেখক

বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারেন নি। কাজেই এ গ্রন্থে ব্যবহৃত তথ্য উৎস ব্যবহারে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

ইসলামি শাসনব্যবস্থায় ধর্মান্তর এবং প্রদেয় কর নিয়ে যে কয়েকজন গবেষক আলোকপাত করেছেন, তাদের মধ্যে Danial C. Dennett অন্যতম। তিনি *Conversion and poll tax in early Islam*,Idarah-i Adabyat-i Delli, Delhi, 1950 গ্রন্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকদের অবস্থা, ধর্মান্তর এবং কর প্রদান সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। আলোচনার অত্যাবশ্যকীয় অংশ হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই আলোচ্য সময়ে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার এবং মর্যাদার বিষয়টি এড়িয়ে যায় নি। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমি রাজস্ব, নিরাপত্তা করব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করা হলেও একসাথে প্রাথমিক ইসলামি রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ শাসিত অঞ্চলে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। ফলে গ্রন্থটি প্রাথমিক ইসলামি রাষ্ট্রের করব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটি মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিসর এবং খোরাসান অঞ্চলে অমুসলিম নাগরিকদের ইসলাম ধর্মগ্রহণ এবং নিরাপত্তা কর প্রদান বিষয়ক ধারণার জন্য এক অমূল্য উৎস।

বিখ্যাত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক উইলিয়াম ম্যুর (*The Caliphate Its Rise, Decline, and Fall,* Edinburg, John Grant, 1915)-এ মহানবি (স.)-এর ওফাতের সময় থেকে শুরু করে মহান খলিফাদের সময়কালের নানা রাজনৈতিক ঘটনাবলির উল্লেখপূর্বক উমাইয়া, আব্বাসীয়, স্পেনীয় উমাইয়া, ফাতেমীয়, মামলুকদের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে হযরত উমর (রা.)-এর সময়কালে ইরাকের ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলিম শাসকদের অ-মুসলিম নীতি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছেন। এছাড়া উমাইয়া শাসনামলে আরবদের গোত্রীয় সামন্তবাদ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলি আলোচনার সময় প্রসঙ্গক্রমে অমুসলিম প্রজাদের প্রতি মুসলিম নীতি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ রেখেছেন। খিলাফত আমলের নানা ঘটনাবলি সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা আধুনিক গবেষকদের মনে নানা প্রশ্নের যোগান দিয়েছে তাই আরব খিলাফত আমলে অমুসলিম প্রজাদের প্রতি মুসলিম শাসকদের নীতি ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিশদ গবেষণা প্রয়োজন।

Sayed Afzal Peerzade রচিত *On Islamic Taxation,* Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 2009 গ্রন্থে ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক করব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। এই বইটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে ইসলামি এবং প্রথাগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে অমুসলিম নাগরিকদের উপর সুনির্দিষ্ট আলোচনা করা না হলেও জিয্ইয়া কর এবং ভূমি রাজস্বব্যবস্থার আলোচনায় অমুসলিম নাগরিকদের বিষয়টি এসেছে। বিশেষত, পাঁচ নম্বর অধ্যায় : Reforming the tax

system : Lessons from Shariah -এ অমুসলিম নাগরিকদের রাজস্ব ও কর প্রদান বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। *Islamic Principles of Public Finance and Policy* সৈয়দ আফজল পারজেড রচিত আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থেও জিয্ইয়া, খারাজ ও উশর সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থকার অতি চমৎকারভাবে করেছেন যা বর্তমান গবেষণার তথ্য উৎস হিসেবে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম ইতিহাস গবেষকদের মধ্যে আরেকজন বিখ্যাত গবেষক হলেন T. W. Arnold। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ (*The Preaching of Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, India, Reprint, 1999)-এ ইসলামের প্রচার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থের আলোচনায় তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারে মুহাম্মদ (সা.)-এর নীতি ও আদর্শের আলোচনা দিয়ে শুরু করে খ্রিস্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে ইসলামের সম্প্রসারণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এ গ্রন্থের আলোচনায় সমগ্র বিশ্বে ইসলামের সম্প্রসারণের বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকদের বিষয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ পান নি। তিনি এ গ্রন্থে মুসলিম সম্প্রসারণ আলোচনা করতে গিয়ে অমুসলিম প্রজাদের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে কিছুটা দিক নির্দেশনা দান করেছেন। ফলে খিলাফত আমলে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ রয়েছে।

বিখ্যাত আরব গবেষক জার্মান ঐতিহাসিক Von Kremer এর আরব খিলাফত বিষয়ক গ্রন্থ *(Culturgeschichte des Orients)* গ্রন্থটি অনুবাদ করতে গিয়ে অপর বিখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ ও গবেষক S. Khuda Bukhsh বলেন, আরব ইতিহাসের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ অমুসলিম গবেষক অত্যন্ত নির্মোহভাবে গবেষণা করে মুসলিম প্রাচ্য খিলাফত সম্পর্কীয় বিষয়াবলিকে এ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। S. Khuda Bukhsh এ গ্রন্থটি ইংরেজি অনুবাদ করে (*The Orient under the Caliphs*, Idarah-I Adabiyat-I Delhi, New Delhi, India, Reprint, 1983) একটি মুখবন্ধ দিয়েছেন এবং এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করেছেন। Von Kremer এ গ্রন্থে প্রাচ্য খিলাফতের উদ্ভব এবং একটি সার্বভৌম শক্তি হিসেবে এর উত্থান সম্পর্কিত ধারণা দিতে গিয়ে তিনি প্রসঙ্গক্রমেই মুসলিম রাষ্ট্র বিস্তৃতির সাথে এর অমুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিয়েছেন। তিনি উমাইয়াদের দরবারি ও প্রশাসন ব্যবস্থা এবং আব্বাসীয়দের প্রশাসন ব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা এবং মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রগঠন অধ্যায় ও মুসলিম আইনের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেছেন। কিন্তু মুসলিম খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার, কর্তব্য ও মর্যাদা সম্পর্কিত ব্যাপকভিত্তিক বিষয় এতে স্থান পায়নি তবে এ গ্রন্থটি আলোচ্য গবেষণাকর্মে একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করবে।

বিখ্যাত ইউরোপীয় ঐতিহাসিক G. E. Von Grunebaum রচিত *(Classical Islam: A History 600-1258, Translated from original German by Katherine Watson, George Allen and Unwin Ltd., London, 1970)*- গ্রন্থে তিনি প্রাক্ ইসলামি আরব, হযরত মুহাম্মদ (স.), খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত এবং ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনায় আরব খিলাফতের শাসকবর্গের কর্মকাণ্ড আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অনেক স্থানে অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক এবং অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি কোনো কোনো স্থানে বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ রাখলেও অনেক ক্ষেত্রেই পুরোপুরি নির্মোহ হতে পারেন নি। ফলে তাঁর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই আরব ইতিহাসের গবেষকদেরকে দিকভ্রান্ত করতে পারে। ফলে খিলাফত আমলে অমুসলিমদের অধিকার, কর্তব্য ও অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ও নির্মোহ গবেষণা প্রয়োজন।

বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক Jalaluddin A's Suyuti রচিত গ্রন্থটি আরবি ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন অপর বিখ্যাত ইতিহাস চিন্তক Major M. S. Jarrett (*History of the Caliphs*, Kitab Bhavan, New Delhi, India, 2010)। Suyuti আলোচ্য গ্রন্থে মুসলিম খিলাফতের বিকাশধারা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটি মূলত মুসলিম খিলাফতের ইতিহাস অধ্যয়নের একটি আকর উৎস। এ গ্রন্থের আলোচনায় নানা ঘটনাবলির উল্লেখ করে লেখক মুসলিম খিলাফতের ঘটনাপ্রবাহ চিহ্নিত করায় প্রয়াস রেখেছেন। খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলের খলিফাদের ধারাবাহিক ইতিহাস জানার জন্য এটি একটি আকরগ্রন্থ। এ গ্রন্থে নানা ঘটনাপ্রবাহের ধারা নির্ণয়ে তিনি মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের সম্পর্ক বিষয়ে অনেকস্থানে দিক নির্দেশ করেছেন। এখানে তিনি মুসলিম শাসনাধীনে বসবাসরত অমুসলিমদের জীবনযাপন প্রণালির উল্লেখপূর্বক শাসকদের নীতি সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করেছেন কিন্তু সে আলোচনা অবিন্যস্ত ও বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

Dr. Mehboob Desai তাঁর (*Islam Muslims & Nonviolence*, GYEN, Delhi, India, 2009)-গ্রন্থে মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থান ও এর অসাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে খিলাফত আমলে বসবাসরত অমুসলিম প্রজাদের প্রতি ইসলামের নীতি ও আদর্শ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে ইসলাম, মুসলিম, ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান, ইসলামের বিস্তৃতিসহ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ও পবিত্র খলিফাদের সময়কালে অমুসলিমদের প্রতি ইসলামি রাষ্ট্রের পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছেন। তিনি এ আলোচনায় মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম প্রজাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। যদিও এ গ্রন্থটিতে খোলাফায়ে রাশেদিন ভিন্ন

উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি তারপরেও এ গ্রন্থটি গবেষণার প্রয়োজনে এবং খোলাফায়ে রাশেদিন সম্পর্কে অল্প তথ্য প্রদান করলেও এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত গবেষণার দাবি রাখে।

অপর মুসলিম গবেষক Allama Yusuf Alqarzavi and Abumasood Azhar Nadvi তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ (*Islam Muslims & Non Muslims*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, India, 2010)-এ ইসলাম, মুসলিম ও অমুসলিমদের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে অমুসলিম প্রজাদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এখানে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের প্রতি মুসলিম শাসকবর্গের আচরণ ও কিছু ভুল ধারণা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে অমুসলিমদের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করলেও নির্মোহ হতে পারেন নি তাই তাঁর আলোচনাগুলো পর্যালোচনার দাবি রাখে।

মুসলিম তথা আরব ইতিহাসের বিখ্যাত গবেষক ও বিশ্লেষক পি কে হিট্টি (*History of the Arabs,* Macmillan, 1961) তাঁর গবেষণায় আরব তথা মুসলিমদের উৎপত্তি থেকে শুরু করে এর বিকাশধারা অনেকটা নির্মোহভাবে তুলে ধরে ইসলামের ইতিহাসকে অনেক সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি ইতিহাসের একজন আকর গবেষক হিসেবে বিভিন্ন মৌলিক তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে আইয়্যাম আল জাহেলিয়ার সময়কালে অমুসলিম আরবদের জীবনচিত্র যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি মুসলিম শাসনামলে আরব শাসনাধীন জনগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নিয়েছেন। তিনি তাঁর গবেষণায় মহানবি (স.)-এর সময়, খিলাফত যুগ, উমাইয়া ও আব্বাসীয়, স্পেনীয়, আল-মাগ্রিবী, ফাতেমীয়, আয়্যুবি, মিসরের মামলুক, মোঙ্গল, অটোমান, সাফাভিসহ বিভিন্ন শাসকদের শাসনামলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিবৃত করেছেন। এ সুদীর্ঘ আলোচনায় তিনি রাজনৈতিক ঘটনাবলির সাথে অমুসলিম প্রজাদের প্রতি মুসলিম শাসকদের নীতি বর্ণনার লক্ষ্যে যিম্মি ও খারাজ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করে মুসলিম নীতি বিষয়ে একটি সাধারণ পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যা খিলাফত আমলে অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের নীতি সম্পর্কিত একটি টীকা হিসেবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। তাই খিলাফত আমলে (৬৩২-১২৫৮ খ্রি.) মুসলিম শাসনাধীনে অমুসলিমদের প্রতি মুসলমানদের আচরণ, নীতি, আদর্শ ও করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন।

অপর বিখ্যাত আরব গবেষক সৈয়দ আমীর আলী তাঁর (*A Short History of the Saracens,* Reprint Kitab Bhavan, New Delhi, 1977) বিখ্যাত গ্রন্থে মহানবি (সা.) থেকে শুরু করে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরব ও স্পেনীয় মুসলমানদের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার্থে তিনি মুসলিম শাসকদের সাথে অমুসলিম শাসকদের সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে মুসলিম রাজত্বে বসবাসকারী অমুসলিমদের বিষয়ে অল্প কিছু তথ্য প্রদান করলেও মুসলিম রাজত্বে বসবাসকারী অমুসলিমদের প্রতি শাসকগণ কেমন আচরণ করতেন, তাঁদের কোনো আর্থ-সামাজিক ও

রাজনৈতিক অধিকার ছিল কি-না বা থাকলেও সেটির স্বরূপ কেমন ছিল এ বিষয়ে কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। ফলে মুসলিম রাজত্বে বসবাসকারী অমুসলিমদের প্রতি মুসলমান শাসকদের নীতি ও ব্যবহার কেমন ছিল সে বিষয়ে বিশদ গবেষণা প্রয়োজন।

আরব ইতিহাসের বিখ্যাত গবেষক রবার্ট ডুরি অসবর্ন রচিত (*Islam Under the Khalifs of Baghdad*, Longman, London, 1878) গ্রন্থটি আব্বাসীয় শাসনামলের নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাপ্রবাহে পরিপূর্ণ। এ গ্রন্থে ইসলামের চারজন ইমামের বর্ণনা দিয়ে শুরু করে খারেজি, আরব ও পারসিকদের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণ, গৃহযুদ্ধের বর্ণনা, পবিত্র কুরআনের নানা বিষয়াবলির বিশ্লেষণ, বার্মাকী, সেলজুক ও এ্যাসাসিনদের বিভিন্ন কর্মপরিধি এবং বাগদাদের পতন পর্যন্ত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের দৃশ্যপট চমৎকারভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের শেষ পরিণতি এবং আব্বাসীয় খিলাফতের পতন ইতিহাস জানার জন্য এ গ্রন্থটি মূল্যবান গ্রন্থ। আব্বাসীয় শাসনামলের অমুসলিম প্রজাদের সম্পর্কিত ইতিহাস বিধৃত না হওয়ায় এর দুর্বল দিকটিও আমাদের সামনে ফুটে ওঠেছে।

বাংলাদেশে আরব গবেষকদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ মুসা আনসারি (*মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ২০০৭) গ্রন্থে আব্বাসীয় শাসনামলের শাসনতান্ত্রিক নানা বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে যিম্মিদের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে যিম্মিদের অন্তর্ভুক্ত খ্রিস্টান, ইহুদি, সাবীয় ও পৌত্তলিকদের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আব্বাসীয় শাসনামলে এ শ্রেণির অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে পর্যালোচনাভিত্তিক আলোচনা করেছেন। তিনি এখানে অমুসলিম প্রজাদের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকটা নির্মোহভাবে সমকালীন শাসক ও অভিজাতবর্গের অমুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন যা আলোচ্য গবেষণায় মৌলিক চিন্তার খোরাক দেবে।

আরব ইতিহাস নিয়ে সারা বিশ্বের গবেষকদের আকর্ষণ থাকলেও মুসলিম ইতিহাস রচনায় অনেক গবেষকই নির্মোহ হতে পারে নি। বিশেষত: মুসলিম শাসনামলে অমুসলিম প্রজাদের অধিকার ও কর্তব্য, মুসলিম শাসকদের আচরণ, রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান ও কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে অনেকেই সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেন নি। খিলাফত আমলে অমুসলিম প্রজাদের অধিকার ও কর্তব্য, তাদের প্রতি মুসলিম শাসকদের আচরণ, রাষ্ট্রপরিচালনায় অমুসলিমদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনায় অমুসলিম গবেষকদের অনেকেই যেমন বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তুলে ধরেন নি তেমনি মুসলিম গবেষকদের অনেকেই অমুসলিম নাগরিক সংক্রান্ত আলোচনায় অতিরঞ্জিত ও খণ্ডিত তথ্য প্রদান করেছেন। ফলে আরব খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্মোহ আলোচনাই আলোচ্য গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য।

অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস

খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার: (৬৩২-১২৫৮ খ্রি.) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও উপসংহারসহ মোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। আলোচ্য অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় **ভূমিকা**। এতে আলোচ্য গবেষণাকর্মের ক্ষেত্র ও পরিসীমা, বিষয়বস্তু এবং যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি ও গবেষণার সহায়ক তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এখানে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার রূপরেখা ও সম্ভাব্য ফল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অভিধা **খিলাফতের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ/খিলাফতের ক্রমবিবর্তন শিরোনামে**। ইসলামের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম খিলাফত যা মহানবি (স.)-এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় যে রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন তাঁর তিরোধানের পর উক্ত রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব না দিয়ে গেলেও উক্ত রাষ্ট্রের দায়িত্ব পরিচালনার জন্য যে ব্যক্তি নির্বাচিত হন তিনি হলেন খলিফা। ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি খলিফা নির্বাচিত হওয়ার কারণে ইসলামে খিলাফততন্ত্রের উদ্ভব হয়। কয়েকটি স্তরায়ণের মাধ্যমে এ খিলাফতব্যবস্থা সমৃদ্ধি লাভ করে। তা হলো খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফত, ফাতেমীয় খিলাফত এবং উসমানীয় খিলাফত। খিলাফততন্ত্র ১৯২৪ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হলেও খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত পর্যন্ত উক্ত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগের নির্বাচনপদ্ধতি ও নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উমাইয়া যুগে খিলাফত ব্যবস্থা থাকলেও খলিফা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মনোনয়ন দান প্রথা শুরু হয়। ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থা খিলাফত হতে রাজতন্ত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আব্বাসীয় খলিফারা তাদের পূর্বসূরী উমাইয়াদের মতোই উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ধারা অনুসরণ করায় খলিফা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মনোনয়ন দান প্রথা চালু থাকে। আলোচ্য অধ্যায়ে খিলাফতের উৎপত্তি, খলিফাদের নির্বাচনপদ্ধতি ও মনোনয়নদানের রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়টি বিন্যস্ত **মৌলিক মানবাধিকার** শিরোনামে। এতে মানুষের সে সকল অধিকারগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা মানুষ দেশ-কাল, বর্ণ-ভাষা ও জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে একই আদমের বংশধর হিসেবে জন্মসূত্রেই লাভ করে থাকে। মানুষের মৌলিক মানবাধিকার সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশনা আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবি ও রাসূল (স.)-এর নিকট প্রেরিত সর্বশেষ আসমানি কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে উপস্থাপন করেছেন। এ সকল অধিকারগুলো মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ায় মানুষ এতে কোনো প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারে না। এ অধিকারগুলো পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়টি বিন্যস্ত **অমুসলিমদের নাগরিকত্ব লাভ ও বাতিল সম্পর্কিত নীতিমালা** শিরোনামে। এতে খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল থেকে শুরু করে উমাইয়া খিলাফত এবং আব্বাসীয় খিলাফতের সমাপ্তি ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খলিফাদের শাসনাধীনে অমুসলিম সমাজ, তাদের শ্রেণিবিভাগ, স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভের পদ্ধতি, নাগরিকত্ব বাতিলের নীতিমালা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম **অমুসলিম জনগোষ্ঠী, মর্যাদা ও অধিকার: খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল।** বিশ্বের অধিকারবঞ্চিত, নির্যাতিত, অবহেলিত ও পথভ্রষ্ট মানবসমাজের মুক্তির পয়গাম নিয়ে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণকারী মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করে সেখানে বিশ্বের সর্বপ্রথম একটি কল্যাণধর্মী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনার ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক এবং মুসলিম সকলের সমন্বয়ে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাসখ্যাত যে সনদ প্রণয়ন করেন তা ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। এ সনদের ভিত্তিতে মদিনা রাষ্ট্র একটি সহনশীল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মহানবি (স.) ইসলামের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী মদিনা রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের সাথে যে আচরণ করেছেন তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফত নামক রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম চারজন খলিফার শাসনামলে একই রকম নীতি ও আদর্শ পরিচালিত হয়েছে। রাসূল (স.)-এর তিরোধানের পর প্রথম চারজন খলিফার শাসনামলকে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ বলা হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে অমুসলিম নাগরিকদের পরিচয়, তাদের নাগরিক মর্যাদা, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা আলোচ্য অধ্যায়ের লক্ষ্য।

গবেষণার ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য **উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার (৬৬১-১২৫৮ খ্রি.)**। উমাইয়া শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দেশ জয়, সাম্রাজ্য স্থাপন, আরবদের গোত্রগত ও জাতিগত রাজতন্ত্র আর আব্বাসীয় শাসনামলের বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞানচর্চা ও মেধার বিকাশসাধন। তবে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে মানুষের বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধার সৃষ্টি করা হয় নি। খলিফারা বিভিন্ন অঞ্চল জয় করলেও সে অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর ইসলামকে চাপিয়ে দেন নি। কোনো কোনো খলিফার শাসনামলে ধর্মীয় কোন্দল দেখা দিলেও এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ধর্মীয় কোন্দল ছিল একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় নতুবা উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে ইহুদি, খ্রিস্টান, সাবীয়, জেরোথুরোস্ট্রীয়, মানিকী ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস করা সম্ভব হতো না। উভয় শাসনামলে অমুসলিম লোকদের সহযোগিতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব হতো না। উভয় শাসনামলে প্রত্যক্ষ করা যায়, রাজ্যের পণ্ডিতবর্গ, অভিজাতশ্রেণি, সরকারের উঁচু পদে অমুসলিম লোকেরা আসীন।

আলোচ্য গবেষণাতে এ বিষয়ে সবিস্তার পর্যালোচনাসহ বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার মুসলমানদের ন্যায় ছিল এবং যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রাধান্য পেতেন এবং দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মানুষ মৌলিকভাবে এক হওয়ায় বর্ণ, গোত্র, সাদা-কালো এবং মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য ছিল না।

অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়টি বিন্যস্ত **খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের দায়-দায়িত্ব শিরোনামে।** খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে লক্ষ্য করা যায় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম সকলে একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। সে সময় ভাষা বর্ণসহ সকল ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনো প্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে অমুসলিমরা খিলাফত রাষ্ট্রে বসবাস করে মুসলমানদের ন্যায় সম-অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব তারা যথাযথভাবে পালন করে। আলোচ্য গবেষণায় অমুসলিমরা খিলাফত রাষ্ট্রে বসবাস করার কারণে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও আনুগত্য মেনে নেয়। রাষ্ট্রে বসবাস করার কারণে রাষ্ট্রকর্তৃক আরোপিত সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার বিনিময়ে আরোপিত বিশেষ কর জিয্ইয়া, খারাজ ও উশর আদায় করে এবং রাষ্ট্রের আইন-কানুনের প্রতি সর্বসময় আনুগত্য প্রদর্শন করে। আলোচ্য অধ্যায়ে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর সবিস্তার পর্যালোচনাসহ অমুসলিম নাগরিকগণ রাষ্ট্রকর্তৃক তাদের উপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে কিনা তা নিরূপণের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের অষ্টম অধ্যায় হলো **উপসংহার**। অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সার-নির্যাস স্থান পেয়েছে উপসংহারে।

এরপর পরিশিষ্টসমূহ এবং সবশেষে এ গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত তথ্য উৎস ও গ্রন্থপঞ্জির তালিকা রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খিলাফতের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও সমাজ দর্শন। ইসলাম রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে সুষ্ঠু কাঠামো প্রবর্তন করেছে তার মূল চেতনা হলো খিলাফত। ইসলামে 'খিলাফত' বলতে এমন ঐশী শাসনব্যবস্থাকে বুঝানো হয় যা আল্লাহর সৃষ্টিকুলের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের দায়িত্ব বহন করে, যা ঐশী বিধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঐশী প্রশাসনের প্রধানকে বলা হয় 'খলিফা'। সাধারণত আমরা খিলাফত বলতে বুঝি ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা (Religio-Socio-Political Institution) । 'খিলাফত তত্ত্বের' উপরই ইসলামি রাষ্ট্র ও তার কাঠামো ভিত্তিশীল। খিলাফতভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হলো তাওহিদ ও আল্লাহর আইন। হযরত নূহ (আ:) থেকে এ রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব। তাঁর অবর্তমানে কালক্রমে এ রাষ্ট্র বিকৃত হয়ে শিরকভিত্তিক তাগুতি রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। এভাবে শিরকবাদী রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটলেও যুগে যুগে নবিগণ (আ:) তাওহিদের কথা, ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দাওয়াত নিয়ে আসেন এবং স্বগোত্র, জাতি ও দেশে খিলাফত কায়েমের চেষ্টা করেন। কেউ কেউ বাস্তবে খিলাফত কায়েম করেছিলেন আবার কেউ কেউ আজীবন তা কায়েমের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কুরআন ও ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, পূর্বতন নবিগণের (আ:) সময়ে যারা খিলাফত রাষ্ট্র কায়েম করেন তাদের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ:), হযরত মুসা (আ:), হযরত দাউদ (আ:) ও হযরত সুলাইমান (আ:)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নেতৃত্বে মদিনায় নববি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এক অসাধারণ কীর্তি এবং ইসলামে নবুওয়াতের অব্যাবহিত পরে তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবি আবু বকর (রা.) এর খলিফা নিযুক্তির মাধ্যমে ইসলামে খিলাফত ব্যবস্থার সূচনা ঘটে। হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হওয়ায় পর থেকে মুসলিম জাহানে খিলাফত আল মিন হাযিহিন নবুওয়াতের সূচনা হয়। তাঁর খিলাফত আমল থেকে হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত আমল (৬৩২-৬৬১খ্রি.) পর্যন্ত মোট ত্রিশ বছরের শাসনকাল মুসলিম জাহানে যাঁরা রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদেরকে 'খুলাফা-ই-রাশিদুন' বলে অভিহিত করা হয় এবং তাঁদের পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই বলা হয় 'খিলাফতে রাশেদা'। ইসলামে নবুওয়াতের পর এই খিলাফতই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন, শ্রদ্ধাভাজন ও পবিত্র দায়িত্বের পদ। 'খুলাফায়ে রাশেদিনের' শাসন দীর্ঘস্থায়ী না থাকিলেও বিশ্বের ইতিহাসে তা সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। শুধু মুসলিম ঐতিহাসিকগণই নহেন, অমুসলিম ঐতিহাসিকগণও খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনকালকে মানব ইতিহাসের 'স্বর্ণ-যুগ' বলে অভিহিত করেন। খিলাফতে রাশেদার পরও ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ খিলাফত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে এবং পরবর্তীতে উমাইয়া, আব্বাসীয়া, ফাতেমীয়, উসমানীয় খিলাফত মুসলিম জাহানকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ১৯২৪ সালে তুর্কি নেতা মোস্তফা কামাল পাশা উসমানি খিলাফতের

উচ্ছেদের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে খিলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দেন। তখন থেকে খিলাফত ব্যবস্থা নামেমাত্রও আর বহাল থাকেনি। বর্তমানে আবার খিলাফত আলা মিন হাযিহিন নবুওয়াত প্রতিষ্ঠার জোর প্রয়াস চলছে। এ অধ্যায়ে খিলাফতের উদ্ভব ও বিকাশ, খিলাফতের মর্যাদা, নির্বাচন পদ্ধতি ও খিলাফত ব্যবস্থা রহিতকরণের উল্লেখসহ খিলাফতের মূল স্রোতে ফিরে যাবার প্রচেষ্টা বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের চেষ্টা করছি।

খিলাফতের সংজ্ঞা

খিলাফত শব্দটিকে আভিধানিক ও পারিভাষিক দুই অর্থে ব্যবহার করা যায়। নিম্নে খিলাফতের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

খিলাফতের আভিধানিক অর্থ

খিলাফত শব্দটি আরবি শব্দ খুলফুন মূলধাতু থেকে উৎসারিত। এর বহুবচন 'খুলাফা'।[১] এর আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব, স্থলাভিষিক্ত হওয়া, অন্য কারো অপসৃত হওয়ার পর তার স্থানে উপবেশন করা বা উত্তরাধিকার, কারো অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি।[২] মূলত খিলাফত হলো মূল পদের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। মূল পদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মিশনের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিই খলিফা। ইসলামি পরিভাষায় সর্বোচ্চ এ নির্বাহীর প্রতিনিধিত্ব বা উত্তরাধিকারীই হলো খিলাফত। খিলাফত শরিয়তের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের সমন্বয় ঘটিয়ে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়।[৩]

খিলাফতের পারিভাষিক অর্থ

খিলাফতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে বিশিষ্ট সাহাবি আবু মূসা আশআরী (রা.) বলেন,

إن الإمارة ما ئتمرفيها وإن الملك ما غلب عليه بالسيف-

"খিলাফত হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে শূরা বা পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। আর তরবারির জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহি বা রাজতন্ত্র।"[৪]

---

[১] Hans Wehr, (Ed. J M. Cowan) *A Dictionary of Modern written Arabic*, Third Edition, SLS, New York, 1976, p. 257

[২] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী, ৬ষ্ঠ সংস্করন, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৪৯; *আল-কাওসার*, (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান), ৩য় সং, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২১৫; মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাররাম ইব্ন মানযূর, *লিসানুল আরব*, খণ্ড-১, দারুল মা'আরিফ,কায়রো, তা.বি., পৃ. ১২৩৫

[৩] Gail Minault, *The Khelafat Movement, Religions Symbolism and Political Mobilization in India*, New Delhi, 1982, p. 2

[৪] মুহাম্মদ ইবনে সায়াদ ইবনে মুনী, *কিতাবুত তবাকাত আল-কাবীর*, খণ্ড-৪, মাকতাবাতুল খামজী, কায়রো, ২০০১, পৃ. ১০৬

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রশীদ রিযার মতে–

الخلافة والإمامة العظمى وإمارة المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحد ، وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا-

“খিলাফত, ইমামাতুল উজমা ও ইমারাতুল মু'মিনিন এই তিনের মর্মাথ এক। খিলাফত ইসলামি রাষ্ট্রের এমন একটি নেতৃত্বমূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যা জনসাধারণের পার্থিব ও ধর্মীয় কল্যাণের প্রতিনিধিত্ব করে।”[৫]

ড. আহমদ আবদুল কাদের বলেন, “ইসলামি রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার নামও খেলাফত এবং তার নেতৃত্বকে খলিফা বলা হয়। কাজেই পারিভাষিক অর্থে খেলাফত হচ্ছে এমন এক রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নাম যা মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতিনিধির মর্যাদা দিয়ে এবং প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বকে আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে তার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। অন্য কথায়, ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকে পারিভাষিক অর্থে খেলাফত বলা হয় আর খেলাফতের সর্বোচ্চ ব্যক্তিকে বলা হয় খলিফা।”[৬]

এককথায় খিলাফত হলো ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নাম। আর যিনি এ পদে স্থলাভিষিক্ত হন বা প্রতিনিধিত্ব করেন তাকে খলিফা বলা হয়। ইসলাম পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় খিলাফতই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন পদ।

খিলাফতের ক্রমবিবর্তন

উপরোল্লিখিত খিলাফতের পারিভাষিক সংজ্ঞার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত যে, মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ওফাতের[৭] পর মহানবি (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনার নববি রাষ্ট্রে খিলাফত নামক ব্যবস্থার সূচনা হয়। মহানবি (স.) মদিনাতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, তার উপর ভিত্তি করেই মহানবি (স.) এর ওফাতের কারণে খিলাফত নামক শাসনব্যবস্থার কাঠামো প্রবর্তিত হয়। মহানবি (স.) মদিনাতে একটি জাতি গঠন করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর উক্ত জাতি পরিচালনার জন্য কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাননি। রাসূল (স.) অনুপস্থিতিতে তাঁর অধিকাংশ বিচক্ষণ সহচর রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য একজনকে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করেন।[৮] খলিফার পদ যদি বংশ পরম্পরায় ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত

[৫] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রশীদ রিযা, *আল খিলাফত*, আল জাহরা লিল ইলামিল আরবী, কায়রো, তা.বি., পৃ. ১৬

[৬] ড. আহমদ আবদুল কাদের, *আধুনিক যুগে খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা*, বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, তা.বি., পৃ. ১৯

[৭] মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) রবিউল মাসের ১২ তারিখ সোমবার মোতাবেক ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে আগস্ট বিবি আমিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহানবি (স.) ৬৩ বৎসর ৪ মাস এই পৃথিবীতে হায়াত পেয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব জীবদ্দশায় সুসম্পন্ন করে ইন্তেকাল করেন। ইহকালীন জীবনের মিশন শেষ করে ৭ই জুন ৬৩২ খৃ. মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল ১১হিজরি রোজ সোমবার পরম বন্ধু মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সান্নিধ্যে গমন করেন। দ্র. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা : ৫ম সং, ১৯৭৮, পৃ. ৩৫৯; সিরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৭

[৮] S. Khuda Bakhsh, *Politics in Islam,* Kitab Bhavan, New Delhi, 2003, p. 9

হওয়ার বিষয় থাকতো, তবে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চাচা আব্বাস (রা.) কিংবা তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা হযরত আলী ইবনে তালিব (রা.) উক্ত পদ অধিকার করবার যোগ্য ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হইতেন। খলিফার পদ বংশ পরম্পরায় না হওয়ায় রাসূল (স.) তিরোধানের পর (৮ই জুন, ৬৩২ খ্রি.) সাহাবিরা মুসলিম উম্মাহর অগ্রগতি, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য নিজেরা কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হন যদিও প্রত্যেক সদস্যেই জানতো, ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী কোনো ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। মুসলিম জাতির নেতা নির্বাচন নিয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকায় রাসূল (স.)-এর অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে এমন একজনকে পছন্দ করার সিদ্ধান্ত নেন যিনি নবগঠিত মুসলিম শিশু রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে সক্ষম। এভাবেই খিলাফত তন্ত্রের উদ্ভব হয় যা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে কয়েকটি স্তরায়ণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। যেমন : খোলাফায়ে রাশেদিন, খিলাফতে উমাইয়া ও আব্বাসীয় প্রভৃতি। খিলাফততন্ত্র ১৯২৪ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হলেও আলোচ্য অধ্যায়ে খিলাফতের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫১-১২৫৮ খ্রি.) পর্যন্ত আলোচনা করা হবে।

খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর খলিফা নির্বাচন (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এটি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করেন যে, তিনি সর্বশেষ নবি ও রাসূল এবং তাঁর পরে আর কোনো নবি ও রাসূলের আগমন ঘটবে না। তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিম বিশ্ব সাময়িক সময়ের জন্য নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। তিনি সুযোগ্য কয়েকজন মুসলিম নেতা রেখে যান যারা সবাই তার অনুপস্থিতিতে মুসলিম জাহানকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম ছিল। কিন্তু তিনি সুযোগ্য মুসলিম নেতৃত্ব রেখে গেলেও কাউকে তার উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচিত করে যান নি। আরবের প্রথানুযায়ী গোত্রীয় প্রধানের পদ বংশানুক্রমিক ছিল না। আরবে সে সময় গোত্রীয় নেতা বা শাইখ নির্বাচিত হতো সার্বজনীন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। যিনি বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাশীল, বয়স্ক এবং সবদিকে মর্যাদার অধিকারী, সর্বজনগ্রহণীয় এমন ব্যক্তিকেই আরবের গোত্রগুলো তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করতো।[৯] ফলে আরব ঐতিহ্য অনুযায়ী মুসলিম নেতারা রাসূল (স.) এর মৃত্যুর পর নিজেদের মধ্যে থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচিত করতে মনস্থির করেন। এ সময়ে মুসলমানদের প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়-মুহাজির[১০] ও আনসার[১১]। মদিনার আনসারগণ সাকিফা

---

[৯] Sir Thomas W. Arnold, *The Caliphate*, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1965, p. 20; Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens,* Kitab Bhawan, New Delhi, 1977, p. 21; Abul Hasan Ali al-Nadvi, *Al-Murtadha,* Lucknow, 1989, pp. 131-133; S. Khuda Bakhsh, *Ibid,* pp. 9-10

[১০] আরবি মুহাজির শব্দটি এসেছে ‘হিজরাহ’ থেকে। এর অর্থ অভিবাসী, ত্যাগ করা, সম্পর্কচ্ছেদ করা। মুহাজির তারা যারা মহান আল্লাহ্ তাআ'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করেছিলেন। নিজের দীন ও ঈমানকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনে এবং আল্লাহর দ্বীনকে তাঁর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব মুসলমান নিজেদের দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধনসম্পদ পরিত্যাগ করে অন্য কোন এলাকায় গিয়ে বসবাস করে, যেখানে ইসলামি বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের বাধা নিষেধ ও প্রতিবন্ধকতা নেই।

বানু-সা'য়িদা নামক বৈঠকখানায় খলিফা নির্বাচন করার জন্য সমবেত হয়। খলিফা নির্বাচন করার পদ্ধতি নিয়ে তারা আলোচনা করতে থাকে। প্রথমে আনসার নেতা খায্‌রাজ প্রধান সা'দ ইব্‌নে উবাদা (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, খিলাফত পদের জন্য আমরাই বেশি উপযুক্ত। কারণ হযরত মুহাম্মদ (স.) কে আশ্রয় দান, মুহাজিরগণকে প্রতিপালন, ইসলামের রক্ষা তথা দীন সেবায় আমরাই সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছি। সুতরাং রাসূল (স.) প্রতিনিধিত্বের আমরাই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। ফলে আমাদের মধ্যে হতেই খলিফা বা নেতা নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কতিপয় আনসার এ বক্তব্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে খায্‌রাজ প্রধান সা'দ ইব্‌নে উবাদা (রা.)-এর নাম খলিফা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করলেন। সমাবেশ থেকে এক আওয়াজ এলো– যদি মুহাজিরগণ আমাদের এ প্রস্তাবের সাথে একাত্মতা ঘোষণা না করেন তাহলে কি হবে? তখন প্রস্তাব হলো যে দুই দল থেকে দুইজন নেতা নির্বাচিত করা হোক। আনসারদের কেউ কেউ বলল, দুই দল থেকে দুইজন নেতা নির্বাচন সম্ভব নয়। নেতা একজনই হতে হবে। এইভাবে আলোচনা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করলো আর আনসারদের এই সমাবেশের কথা হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর ফারুক (রা.) শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)সহ মুহাজিরদের সহযোগে সেখানে উপস্থিত হলেন।[১২] হযরত আবু বকর (রা.) ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে আনসারদের কথায় সায় দিয়ে বললেন যে, তোমাদের সকল দাবি ও কথা সত্য। দীনকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তোমাদের অবদান অনেক। তবে বক্তৃতায় তিনি মুহাজিরদের দীনি ত্যাগের কথা উল্লেখ করলেন। অতঃপর আনসারদের ত্যাগী মনোবৃত্তির অন্তর খুলে প্রশংসা করলেন অতঃপর বললেন, যদি মাহাত্ম্য ও গুণাবলি দেখা হয়, তাহলে দুদলের মর্যাদা, ত্যাগ, সম্মান কেউ অন্যের চেয়ে কম নয় কিন্তু নেতৃত্বের ব্যাপারে কুরাইশদের দাবি অগ্রগণ্য। কারণ যিনি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন, তিনি শুধু মদিনার শাসকই হবেন না বরং তিনি হবেন সমগ্র আরব দেশের শাসক। আর এ মুহূর্তে আরব দেশের নেতৃত্বের জন্য একমাত্র কুরাইশগণই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। এখন যদি কুরাইশ ব্যতীত অন্য কোনো গোত্রের লোকের হাতে শাসনভার ন্যস্ত করা হয়, তবে দেশে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দিবে। আরবের

মুজাজিরদিগকে আনসারগণ নিজেদের গৃহে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজসহ নিজেদের স্থাবর সম্পত্তিতেও তাদের অংশ দান করেছেন। নিজের জীবন ও মাল-সম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের পথে উৎসর্গ করেছিলেন। এককথায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সমর্থন দেওয়ার জন্য যারা মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে মদিনায় চলে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন মুহাজির। দেখুন, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২০শখণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৫১-৫৫৪ *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, অষ্টম-একাদশ খণ্ড, অনু. ডঃ মু. মুজিবুর রহমান, ৭ম সংস্করণ, মার্চ-২০০৮, পৃ. ৬২৬

[১১] আরবি আনসার শব্দটি মূলধাতু ‘নসর’ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো সহায়ক। যে সব মুসলমান নিজেদের জান ও মালের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সহচরদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং নিজেদের দেশ মদিনায় আমন্ত্রণ জানিয়ে দীনের আলোকবর্তিকা সমুজ্জ্বল করেছিলেন, তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে ধন-সম্পদের অংশ দিয়ে এবং তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাঁরা ছিলেন আনসার বা সাহায্যকারী। মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল (স.) এর সাহায্যকারী হিসেবে আবির্ভূত হন। আনসাররা নিজেদের সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে ইসলামের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আনসারদের অত্যন্ত পছন্দ করতেন। এককথায়, আনসারদেরকে আনসারুন নবি বা নবির সাহায্যকারী বলা হয়ে থাকে। বিস্তারিত দেখুন, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৪১-৩৪৫ *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, অষ্টম-একাদশ খণ্ড, অনু. ডঃ মু. মুজিবুর রহমান, ৭ম সংস্করণ, মার্চ-২০০৮, পৃ. ৬২৬

[১২] কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, অনু. মাওলানা লিয়াকত আলী, *খেলাফতে রাশেদা*, মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৯

জনগণ কুরাইশ ছাড়া অন্য কারও শাসন মানবে না। তখন আনসারদের খাযরাজ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, তাহলে দুই দল থেকে দুইজন নেতা নির্বাচিত করা হোক।[১৩] হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত কঠোরভাবে এর প্রতিবাদ করে বললেন এ সম্ভব নয়। মানুষ আনুগত্য করবে একজন নেতার। দুইজন নেতা হলে দলাদলি ও কোন্দল সৃষ্টি হবে। কাজেই মাত্র একজন নেতাকেই নির্বাচিত করতে হবে। আর আরবগণ কুরাইশ বংশের লোক ছাড়া অন্য কারো প্রাধান্য স্বীকার করবে না।[১৪] অতঃপর হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্ (রা.) বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আপনারা মুহাজিরদেরকে আশ্রয় প্রদান করে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন। এখন নেতৃত্ব নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাঁর দুর্বলতার ব্যবস্থা করবেন না। এ কথা শুনে খাযরাজ গোত্রেরই অপর ব্যক্তি হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রা.)[১৫] দাঁড়ালেন এবং নিজ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আমরা পার্থিব সম্পদ আহরণের জন্য ইসলামের সেবায় অংশগ্রহণ করিনি। আমরা আল্লাহ্ ও রাসূল (স.) এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামের সেবায় অংশগ্রহণ করেছি। আমরা নেতৃত্ব ও ধন-সম্পদের মোহ ত্যাগ করে মুহাজিরদের সহযোগিতা করেছি ইসলাম তথা দীনকে রক্ষা করার জন্য। আর নেতৃত্বের জন্য কোনো সন্দেহ নেই কুরাইশরা অধিক উপযুক্ত। এ নেতৃত্বের জন্য আমাদের বিবাদ করা উচিত নয়। আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাদের বিরোধিতা করবেন না।[১৬] সাকিফা বানু-সায়িদা বৈঠকখানায় আনসার ও মুহাজিরদের আলাপ-আলোচনার পর সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আবু উবাইদা এবং সা'দ ইবনে উবাদা এর নাম খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল।[১৭] কিন্তু বৈঠকের মাধ্যমে সর্বশেষ আনসার ও মুহাজির সাহাবিরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কুরাইশদের[১৮] মধ্য থেকেই খলিফা হবে। তবে এ পর্যায়টি অবশিষ্ট ছিল যে, কে হবেন তিনি ? আনসার ও

---

[১৩] Maulana Muhammad Ali, *Early Caliphate*, Ahmadiyya Anjuman-i-Isha'at-i-Islam, Lahore, 1947, pp. 15-16; কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০

[১৪] Jalaluddin A's Suyuti, *History of the Caliphs*, Tr. Major H.S. Jarrett, Kitab Bhavan, New Delhi, 2010, p. 85; শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *ইসলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৫৯

[১৫] খলিফা নির্বাচন প্রশ্নে মদিনার অদূরে 'সাকিফায়ে বনি সায়েদা' নামক হলে আনসার ও মোহাজেরদের সমাবেশে প্রায় ৪০ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সমাবেশে খাযরায গোত্রের হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রা.)-তাঁর বক্তৃতায় কুরাইশ বংশের প্রতিনিধিত্বের কথা উল্লেখ করলে আনসারদের মধ্যে একটি দল কুরাইশদের সমর্থক হয়ে যায়। আনসারদের ৪০ জনের মধ্যে প্রথমত: তিনজন খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে হযরত উমর (রা.) ও হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-কে অনুসরণ করে কুরাইশদের পক্ষাবলম্বন করেন অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। এ চল্লিশ জনের মধ্যে তিনজন হলেন যথা, বশীর ইবনে সা'দ, আহিদ ইবনে হাদির এবং সেলিম। পরবর্তীতে অন্যান্যরাও হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, এস. এ. কিউ হোসাইনী, অনু. প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক ও প্রফেসর সুরাইয়া জেবুন্নেসা, *আরব সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্র ও সরকার*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫২-৫৩

[১৬] কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০

[১৭] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, *তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক*, খণ্ড- ০৩, দারুল মা'রিফ, মিসর, ১৯৬৭, পৃ. ২০২-২০৬; ইবনুল আছির, আল কামিল ফিত-তারিখ, খণ্ড- ২য়, *বায়তুল আফকার আদ্ দাওলিয়্যাহ*, জর্ডান, আম্মান, তা. বি., পৃ. ৩৩০

[১৮] ইবনে কাছীর, তিরমিযী ও আবু দাউদসহ অনেক বর্ণনায় এরূপ উল্লেখ আছে যে, নবি করিম (স.) বলেছেন, খিলাফতের বিষয়টি কুরাইশ গোত্রের লোকদের অধিকারভুক্ত। নবি করিম (স.)-এর এ উক্তির প্রেক্ষাপট জানা যায়নি। তাছাড়া যোগ্যতা অর্জনের জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়ার ব্যাপারে যে শর্ত দেওয়া হয়েছে নবি করিম (স.)-এর গৃহীত ব্যবস্থা থেকে তা প্রমাণিত হয় না। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, নবি করিম (স.)-এর মদিনায় উপস্থিতি এবং সেখানে নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর বিভিন্ন কাজে অন্তত পক্ষে ২৫ বার তাঁকে রাজধানীর বাইরে যেতে হয়েছিলো। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য সামরিক অভিযান পরিচালনা, চুক্তি সম্পাদন, হজ্জ পালন ইত্যাদি। প্রতিবারেই তিনি একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন করে গেছেন। মদিনার অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারকে পরিচালনা করাই ছিলো তাঁর প্রধান কাজ। কিন্তু সবসময় একই ব্যক্তিকে এ কাজে নিয়োগ করেননি। মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন মদিনা, কুরাইশ, কিনান এবং অন্যান্য গোত্রের লোকজন। এমনকি একবার একজন অন্ধ সাহাবিও এ দায়িত্ব পালন

মুহাজির সাহাবিগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুরাইশদের থেকে খলিফা নির্বাচিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হলে নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিধাবিভক্তির আশংকায় তখন হযরত আবু বকর (রা.) এগিয়ে গিয়ে বললেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্ এর মধ্যে থেকে যেন আনসার ও মুহাজিরগণ একজনকে পরবর্তী খলিফা তথা উত্তরাধিকারী বানিয়ে নেয়। কিন্তু তারা উভয়ে এ কথার সাথে একমত পোষণ করেন নি। তারা উভয়ে বললো, আপনি হাত বাড়িয়ে দেন, আমরাই প্রথমে বায়'আত করি। হযরত আবু বকর (রা.) হাত না বাড়ালে হযরত উমর (রা.) আবু বকর (রা.) হস্ত ধারণপূর্বক চুম্বন করলেন এবং তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ করলেন। তাঁর দেখাদেখি অগ্রে পশ্চাতে সেখানে উপস্থিত মুহাজির ও আনসারগণ কোনো প্রকার চাপ-প্রভাব ও প্রলোভন ব্যতীত নিজেরা সন্তুষ্টচিত্তে হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।[১৯] হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করার উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো–

ক. তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের এবং সিদ্দিক উপাধিপ্রাপ্ত।

খ. রাসূল (স.) তাঁর অসুস্থতার সময় আবু বকর (রা.)-কে নামাজের ইমামতি করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আর ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামাজ।[২০]

গ. ইমামতি করার এ নির্দেশ রাসূল (স.) এর অনুপস্থিতিতে আবু বকর (রা.)-কে খলিফা নির্বাচিত করার ইঙ্গিত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।[২১]

ঘ. হযরত আবু বকর (রা.) মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রিয়ভাজন ছিলেন এবং সর্বদা তাঁর পাশে ছায়ার মতোন থাকতেন। তার দীনি মর্যাদা উম্মাতের মধ্যে সর্বাধিক হওয়ায় রাসূল (স.) হিজরতের সময় সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন এবং ছওর গুহার নির্জনে তিনিই ছিলেন রাসূলে খোদার সাথী ।

ঙ. মুহাজির ও আনসারদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিও হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি সকলের আগে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়েছিলেন এবং নবি করিম (স.)-এর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। সকল বিষয়েই তিনিই সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন।

করেছিলেন। নবি করিম (স.)-এর ওফাতের মাত্র তিন মাস পূর্বে তিনি হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় যান, তখন অন্ধ সাহাবির ওপর মদিনার শাসনভার ন্যস্ত করেন। Dr. Muhammad Hamidullah, *Introduction to Islam,* Kitab Bhavan, New Delhi, 2003, pp. 135-136

[১৯] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit,* p. 86; Joseph Hell, *The Arab Civilization,* Tr. S. Khuda Bakhsh, Idarah-I Adabiyat-I Delli, Delhi, 1980, p. 34; A. H. Qasmi, *Islamic Governments,* Isha Books, Delhi, 2008, p. 88

[২০] Von Kremer, *The Orient Under the Caliphs,* Tr. S. Khuda Bukhsh, Idarah-I Adabiyat-I Delli, New Delhi, 1983, p. 3; G. E. Von Grunebaum, *Classical Islam A History 600-1258,* Tr. Katherine Watson, George Allen and Unwin Ltd., London, 1970, p. 50

[২১] S. M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1984, p. 21; Joseph Hell, *op.cit,* p. 34

হযরত আবু বকর (রা.) মুসলিম রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হলেন এবং সাকীফায় তাঁর এ নির্বাচনটা ছিলো হঠাৎ কোনো ধরনের পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া। হযরত ওমর (রা.) প্রথম হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে প্রথম বায়'আত গ্রহণ করলে পরবর্তীতে একে একে উপস্থিত লোকজন বায়'আত গ্রহণ করেন। এ বায়'আতকে ফুতজান হিসাবে অথবা বাইয়াত আল খাস হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।[২২] এভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উত্তমভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যে মীমাংসিত হয়ে গেলে নবি করিম (স.)-এর দেহ মোবারক জানাযা অন্তে দাফন করা হলো। হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রকোষ্ঠেই তাঁকে দাফন করা হলো।[২৩] পরবর্তী দিন মসজিদে নববিতে সাধারণ বায়'আত গ্রহণ করা হলো। তখন মদিনা মসজিদে উপস্থিত সমবেত সকল মুসল্লি এ বায়'আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সমবেত জনতা তাঁকে খলিফা বলে স্বীকার করে নিলো। এটা ছিল বায়'আতে আম।[২৪] যেহেতু মদিনার মসজিদে মদিনার সকল মুসলমানদের স্থান সংকুলান করা সম্ভবপর ছিল না ফলে সকল মুসলমান এ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেননি। তবে তারা এ নির্বাচনের সাথে একাত্মতা করেছিলেন। বায়'আত গ্রহণ সম্পন্ন হলে হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং জনতাকে উদ্দেশ্য করে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব, কর্তব্য ও নীতি-নির্ধারক মূলনীতি সমন্বিত একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করলেন।[২৫] তার এ ভাষণটিকে খিলাফতের খুতবা বা খিলাফতের ভাষণ বলে অভিহিত করা হয়। হামদ ও ছানার পর তিনি বললেন–

> হে লোকসকল, আমি আপনাদের শাসক নিযুক্ত হয়েছি। কিন্তু আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। আমি যদি কোনো শুভ কাজ করি তাহলে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন, আর কোনো ভুল করলে আপনারা আমাকে শুধরে দিবেন। দেখুন, সততাই আমানতদারি, আর মিথ্যাচার খিয়ানত। আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুর্বল, সে আমার নিকট শক্তিশালী যতক্ষণ আমি তাকে তার প্রাপ্য আদায় করে না দিই। আল্লাহ চাহেন তো আপনাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবল, সে আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ আমি তার নিকট থেকে অন্যদের প্রাপ্য আদায় করে না দিই। ইনশাআল্লাহ ! দেখুন, যে জনগোষ্ঠী আল্লাহর রাহে জেহাদ করা ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে অপদস্থ করেছেন এবং যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাপাচার বিস্তার লাভ করে, আল্লাহ তাদের মধ্যে বালা মুসিবত বিস্তৃত করে দেন। দেখুন, আমি যতদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করব, আপনারা আমার আনুগত্য করবেন এবং যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যচরণ করব, তখন আপনারাও আমার আনুগত্য মুক্ত হয়ে যাবেন।[২৬]

---

[২২] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড- ০৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০১-২০২

[২৩] Maulana Muhammad Ali, *op.cit*, p. 19

[২৪] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড, ০৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১০; Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, p. 87; A. H. Qasmi, *op.cit*, p. 88; Al-Haj Mahomed Ullah, *The Administration of Justice in Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1990, p. x

[২৫] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৮

[২৬] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, pp. 87-88; Sayed Athar Hussain, *The Glorius Caliphate*, Academy of Islamic Research and Publication, Lucknow, 1974, p. 19; কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯

এ খুতবা ছিল একটি বিধিবদ্ধ আইন। খুতবা শেষ করে হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা হিসেবে সর্বপ্রথম নামাজের ইমামতি করলেন। তিনি তাঁর খিলাফতকালে এ খুতবাটিকে সামনে রেখেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফতের পদে আসীন হওয়ার পরও নেতৃস্থানীয় কিছু সাহাবি[২৭] তাঁর নির্বাচনকে কিছুদিন মেনে নেননি। নেতৃস্থানীয় সাহাবিদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) ও তার পরিবারের কতিপয় সদস্য হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বায়'আত করতে কিছুটা বিলম্ব করেন। হযরত আলী (রা.) বায়'আত গ্রহণ করতে বিলম্ব করলে আবু সুফিয়ান তাঁকে বলেছিলেন, যদি হযরত আলী (রা.) খিলাফতের দাবি উত্থাপন করেন, তাহলে আবু সুফিয়ান সৈন্যদল দ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করবেন। হযরত আলী (রা.) এ প্রকার উসকানির যে জওয়াব দান করেছিলেন, তাহা শুনে আবু সুফিয়ান চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, তোমার এ কথা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা প্রমাণ করে।[২৮] আমি কখনো তা চাই না যে, তুমি কোনো পদাতিক বা অশ্বারোহী বাহিনী আনো। মুসলমানরা পরস্পর পরস্পরের কল্যাণকামী। আর এ খিলাফত পদের জন্য হযরত আবু বকর (রা.)-ই অধিক যোগ্য। তিনি যদি এ পদের যোগ্য না হতেন, তাহলে আমরা কখনো তাঁকে এ পদে নিয়োজিত হতে দিতাম না।[২৯] হযরত আলী (রা.) প্রায় ছয় মাস পর তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ করেন। হযরত আলী (রা.) আনুগত্যের শপথ করিলে বনু আব্দুল মান্নাফ গোত্রের তার সমর্থকরা বিশেষত আবু সুফিয়ান, খাযরায গোত্রের প্রধান সাদ বিন উবাইদা এবং তাদের আরও কিছু অনুসারী এ নির্বাচনকে মেনে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা এ সকল ঘটনাবলির বিভিন্ন পর্যায়ে কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এ গুলো হচ্ছে–

১. হযরত আবু বকর (রা.) নির্বাচনকে মদিনার অধিকাংশ মানুষই মেনে নিয়েছিলেন।

২. মসজিদে নববিতে মদিনার সকল মুসলমানের স্থান সংকুলান না হওয়ায় মদিনার সমস্ত মুসলিম জনসাধারণ হযরত আবু বকর (রা.)-এর বায়'আত গ্রহণের প্রাক্কালে উপস্থিত ছিল না বা এ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেনি।

৩. মাত্র একজন ব্যক্তিই হযরত আবু বকর (রা.)-কে খিলাফতে নির্বাচিত করেন। অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করেন এবং খলিফার আনুগত্য মেনে নেন।

---

[২৭] যে সকল নেতৃস্থানীয় সাহাবি হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্বাচনকে কিছুদিনের জন্য মেনে নেননি তাঁরা হলেন হযরত আলী (রা.) ও বনু আব্দুল মানাফ গোত্রের তার সমর্থকরা, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আবু সুফিয়ান, হযরত খালিদ বিন সা'দ, খাযরায গোত্রের প্রধান সা'দ বিন উবাইদা এবং তাদের আরও কিছু অনুসারী। Dr. Ghulam Nabi, *Khilafat In Theory and Practice*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, p. 49

[২৮] Rafi Ahmad Fidai, *Concise History of Muslim World*, Vol. I, Kitab Bhavan, New Delhi, 2004, p. 69

[২৯] আল্লামা আলাউদ্দিন আলী আল মুত্তাকী ইবনে হুসামউদ্দিন আল হিন্দী, (বিশ্লেষক, হাসসান আবদুল মান্নান), *কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল*, ৫ম খণ্ড, হাদিস নং-১৪১৪৪, ৫ম সংস্করন, মুওআসসাতুল রিসালাহ, বৈরূত, ১৯৮৫ পৃ. ৬৫৩-৬৫৪

৪. হযরত আবু বকর (রা.) মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হওয়ায় মুসলিম জাহানের শাসন ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপ লাভ করে। তথাপি তাহাতে স্বেচ্ছাচারিতা ছিল না। শাসনকার্য পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ গণকল্যাণকামী ছিল।

৫. কোনো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি এ নির্বাচনের সাথে প্রথমদিকে একমতো ছিলেন না। পরবর্তীকালে হযরত আলী (রা.) আনুগত্যের শপথ করায় খিলাফত প্রশ্নে জটিলতা দূরীভূত হয়।

৬. রাজধানীর বাইরের জনসাধারণের নীরব সমর্থন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (আহ্‌ল আল রাই) ছিল হযরত আবু বকরের খলিফা নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

হযরত উমর (রা.) এর খলিফা নির্বাচন (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)

হযরত আবু বকর (রা.) যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তিনি উম্মতকে ক্রমোন্নতির প্রাথমিক যুগে মত পার্থক্যের বিবাদ থেকে রক্ষার জন্য খিলাফতের বিষয়টিকে নিজ জীবনের শেষ মুহূর্তে মীমাংসা করে নেওয়া সমীচীন বলে মনে করেন। তিনি চিন্তা করলেন যে, খিলাফতের বিষয়টি সুরাহা হয়ে যাওয়াই ভালো। পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত না হলে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে তাদের শক্তি খর্ব হয়ে যাবে। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর খিলাফতকালীন যাবতীয় ঘটনা ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি কাজে হযরত উমর (রা.) কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পর খলিফা হওয়ার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি হযরত উমর (রা.) ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেহ নেই। অতঃপর তিনি নিজের এ প্রস্তাবটি প্রবীণ ও বিশ্বস্ত সাহাবিদের নিকট পেশ করলেন।[৩০] অধিকাংশ সাহাবিই তাঁর এ প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু কেউ কেউ বললেন, এমনিতে হযরত উমর উত্তম ব্যক্তি। তবে তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠোর প্রকৃতির।[৩১] আত তাবারী বলেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ এবং হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে আলাপ করেছিলেন। তারা উভয়েই হযরত উমর (রা.)-এর মনোনয়নকে স্বাগত জানিয়েছিল। হযরত উসমান (রা.) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, হযরত উমর ব্যতীত খলিফা হওয়ার অন্য কোনো যোগ্যতম ব্যক্তি নেই। অপরদিকে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ হযরত উমর (রা.)-এর চরিত্রের রুঢ় দিকসমূহের উল্লেখ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের দুজনকে এই ব্যাপারগুলো গোপন রাখার পরামর্শ দেন।[৩২] পরবর্তীকালে খলিফা আবু বকর বিষয়টি নিয়ে হযরত আলী বিন আবু তালিব এবং হযরত তালহা-এর সাথে আলাপ করলে তালহা হযরত আবদুর রহমান

[৩০] Von Kremer, *op.cit*, pp. 16-17
[৩১] Asghar Ali, *The Islamic State*, Vikas Publishing House pvt. Ltd., New Delhi, 1980, p. 43
[৩২] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড, ৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৮

বিন আউফের মতো হযরত উমরের চরিত্রের রুঢ়তার কথা উল্লেখ করেন। এর জবাবে আবু বকর বলেন যে, যখন তার উপর খিলাফতের বোঝা এসে পড়বে তখন এ কঠোরতা আপনাআপনি চলে যাবে। ঐতিহাসিক বিবরণী প্রমাণ করে যে, হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরাধিকার মনোনয়নের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন, যা তাঁকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদান করেছিল। সেগুলো হলো : হযরত উমরের প্রশাসনিক দক্ষতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অভূতপূর্ব প্রতিভা। শেষ পর্যন্ত সকল প্রবীণ সাহাবি হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রস্তাবে একমত হয়ে হযরত উমর (রা.) এর খলিফা হওয়াতে রাজি হয়ে গেলে কাতিব-এর দায়িত্ব পালনকারী হযরত উসমান (রা.)-কে তাঁর মনোনয়নপত্র বা উইল লিখতে বলেন।[৩৩] এর ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

> পরম করুণাময় মহান আল্লাহর নামে, এ শপথনামা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর খলিফা আবু বকর (রা.) এর পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি। অতঃপর (এ কথা বলার পর তিনি মূর্ছা গেলেন। এভাবে কিছুক্ষণ কাটলো।) হযরত উসমান (রা.) অতঃপর কথাটি লিখলেন। আবু বকর (রা.) জ্ঞান ফিরার পর আবার বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য উমরকে আমার স্থলাভিষিক্ত করলাম। তোমাদের জন্য সে সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর হবে বলে মনে করি। তারঃপর আবু বকর (রা.) আবার মূর্ছা গেলেন এবং জ্ঞান ফিরার পর তিনি বললেন, যা লিখেছ, তা পাঠ করে শুনাও। তাকে পাঠ করে শুনানো হলে তিনি তাকবির ধ্বনি দিলেন এবং তিনি হযরত উসমান (রা.) কে বললেন, আল্লাহ তোমাকে ইসলাম এবং মুসলিমদের ব্যাপারে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুক। এভাবে হযরত আবু বকর (রা.) উক্ত শপথনামাকে স্বীকৃতি প্রদান করলেন।[৩৪]

অতঃপর মসজিদে নববিতে সমবেত জনসাধারণের সামনে ঘোষণা করেন : "আমি যাকে আমার পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি, তোমরা কি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট? আল্লাহর কসম! নিজের বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিনি। আমি আমার কোনো পুত্র, ভাই বা আত্মীয়স্বজনকে এ পদে নিয়োগ করি নি বরং এ পদে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি উমর ইবনুল খাত্তাবকে, যার সাথে আমার কোনো ধরনের আত্মীয়তার বা আর্থিক সম্পর্ক নেই। সুতরাং আমার বিশ্বাস-তোমরা তাঁর আদেশ-নির্দেশ শুনবে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে।"[৩৫] তখন উপস্থিত সকলেই সমস্বরে বলে উঠলেন, "আমরা তাঁর আদেশ-নির্দেশ শুনবো এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবো।[৩৬] এরপর তিনি হযরত উমর (রা.) এর প্রতি ফিরলেন এবং তাঁকে অনেকক্ষণ যাবত উপদেশ দিতে

---

[৩৩] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড, ৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৯

[৩৪] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড, ৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৯

[৩৫] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড- ৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৮; আহমদ ইবনে আবি ইয়াকুব ইবনে জাফর, *তারীখুল ইয়াকুবী*, খণ্ড-২, মাতবাআতুল গারী, নাজফ, ১৩৫৮ হি., পৃ. ১১৫

[৩৬] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড, ৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৮; William Muir, *The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall*, Khayats, Beirut, 1963, p. 84

লাগলেন। হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালের সাফল্যের পিছনে এ সকল উপদেশের অনেক প্রভাব রয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পরদিন হযরত উমর (রা.) মসজিদে নববির মিম্বরে দাঁড়িয়ে খলিফা হিসেবে জনতার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করলেন। অতঃপর মুসলিম জনসাধারণ প্রথম খলিফার সুপারিশ ও নিজেদের নিরপেক্ষ ও অকুণ্ঠ রায়ের ভিত্তিতে হযরত উমর (রা.)-এর হাত ধরে বায়'আত (আনুগত্যের শপথ গ্রহণ) করলো। ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা এ সকল ঘটনাবলির বিভিন্ন পর্যায়ে কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এ গুলো হচ্ছে :

১. হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর নির্বাচনে স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল।

২. মুসলিম জনসাধারণ প্রথম খলিফার সুপারিশের ভিত্তিতে হযরত উমর (রা.)-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করিল। তবে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পুত্র বা তাঁর কোনো আত্মীয়কে খলিফা হিসেবে নিয়োগ দেননি।[৩৭]

৩. হযরত আবু বকর (রা.) বিশ্বস্ত কয়েকজন প্রবীণ সাহাবিদের সাথে খিলাফত বিষয়ক আলোচনা করলেও এটাকে নির্বাচন বলা যায় না।

৪. এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের (আহল আল রায়) কোনো সমর্থন নেওয়া হয়নি।

৫. হযরত আবু বকর (রা.) এর নির্বাচনের ন্যায় হযরত উমর (রা.) এর নির্বাচনে মদিনার বাইরের মুসলিম গোত্রসমূহের সাথে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনাই করা হয়নি।

হযরত উসমান (রা.) এর খলিফা নির্বাচন (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)

হযরত উসমান (রা.)-এর নির্বাচন তাঁর দুই পূর্বসূরীর নির্বাচনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। স্বাভাবিকভাবে হযরত উমর (রা.)-এর জীবনাবসান হলে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তা অনুমান করা কঠিন হলে এটা সুনিশ্চিত যে তিনি যুগোপযোগী ও কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা হযরত উমর ফারুক (রা.) ২৩ হিজরি সনে জীবনের শেষ হজ্জ পালন করার সময় মিনায় অবস্থানকালে এক ব্যক্তি বললো উমর (রা.) মারা গেলে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বায়'আত গ্রহণ করবো। কারণ, আবু বকর (রা.)-এর বায়'আতও তো হঠাৎই হয়েছিলো।[৩৮] হযরত উমর (রা.) এ ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে মদিনায় ফিরে জুম'আর খুৎবায় জনগণকে সচেতন ও সতর্ক করার জন্য ভাষণ প্রদান

---

[৩৭] Asghar Ali, *op.cit*, p. 43

[৩৮] তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে. সাকিফায়ে বনী সায়েদার মজলিসে হযরত উমর (রা.) হঠাৎ দাঁড়িয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেছেন এবং হাত বাড়িয়ে তখনই তাঁর হাতে বায়'আত করেছেন। তাঁকে খলিফা করার ব্যাপারে পূর্বাহ্নে কোন পরামর্শ করেন নি।

করলেন। জুম'আর খুৎবায় তাঁর মৃত্যুর পর খলিফা নির্বাচন সম্পর্কে ইতিপূর্বে শোনা কথার পুনরুক্তি করে নিম্নোক্ত এ ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি তখন সাকিফায়ে বনী সায়েদায় কেন হযরত আবু বকর (রা.) হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করলেন। খলিফা উমর (রা.) বলেন, তখন যদি হযরত আবু বকর (রা.) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ না করতাম তাহলে খিলাফত নির্বাচন নিয়ে মুহাজির ও আনসারদের মাঝে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়ে উভয় দল স্ব-স্ব দল থেকে নেতা নির্বাচিত করতো। অথবা এমন অবস্থার সৃষ্টি হতো যার সমাধান করা আমাদের জন্য কঠিন হতো। হযরত উমর (রা.) উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ রকম সিদ্ধান্ত নিলে ও পদক্ষেপটি সফল হলেও তা ভবিষ্যতের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় নয়। একে কখনোই উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। হযরত উমর (রা) বললেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতো উন্নতমানের নৈতিক চরিত্র এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব তোমাদের মধ্যে আর কে আছে? এখন কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কারো হাতে বায়'আত করে তাহলে সে এবং যার হাতে বায়'আত করা হবে উভয়েই নিজেকে মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করবে।[৩৯] ইবনু হাজার বলেন, এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে, খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করা যাবে না। কেননা আবু বকর (রা.)-এর মতো সর্বগুণাবলি সম্পন্ন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব পাওয়া সর্বযুগে সম্ভব নয়।[৪০] হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে হজ্জের সময় কোনো এক ব্যক্তির মন্তব্যের ব্যাপারে যে দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, তাতে এটি প্রমাণিত হয় যে, যদি স্বাভাবিকভাবে তাঁর জীবনাবসান হতো তাহলে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে এমন সুনিশ্চিত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন যাতে খিলাফত রাষ্ট্রে কোনো প্রকার বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ লক্ষ করা যেত না বরং ইসলামের বিস্তৃতির সহায়ক হতো। হযরত উমর (রা.)-কে যখন আবু লুলু[৪১] আহত করলো ও ডাক্তারগণ যখন তাঁর জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তখন তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত ও পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের প্রয়োজনীতা বোধ করেন। তখন কোনো কোনো

---

[৩৯] ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বুখারী শরীফ*, হাদিস নং- ৬৩৭০, ১০ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৭

[৪০] আল ইমামুল আল হাফেজ আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খণ্ড-১২, ৩য় সংস্করন, আল মাকতাবাতু তাওফিকিয়্যাহ, কায়রো, ২০১২, পৃ. ১৯৫

[৪১] আবু লুলু, জাফীনা ও হরমুজানের চক্রান্তের ফলে হযরত উমর (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। আবু লুলু ছিল নিহাওন্দের অধিবাসী পারসিক গোলাম আর জাফীনা হীরার অধিবাসী খিস্টান। পারস্য সেনাপতি হুরমুজান মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়ে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে গৌরবময় বিজয় এবং পারস্য ও খ্রিস্টান রাজ্যসমূহের দৃষ্টান্তমূলক ধ্বংসের কারণে তাদের অন্তরে হিংসা ও ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। পারসিকগণের অত্যাচারে মুসলমানগণ অতিষ্ঠ হয়ে ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে আল বুর্জ পর্বতের পাদদেশে নিহাওয়ান্দে মুসলিম শক্তির চেয়ে ৬ গুণ শক্তিসমৃদ্ধ পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করে। নিহাওন্দ বিজয়ের পর সেখানকার কয়েদীরা এসে পৌঁছল আবু লুলু এক একটি শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল আর কেঁদে কেঁদে বলছিল-'উমর আমার কলিজা খেয়ে ফেলেছে। মুসলিম বাহিনীর নিকট বারবার পরাজয় বরণ করে তারা হযরত উমর (রা.) কে হত্যার পরিকল্পনা করে। যে ভোরে হযরত উমর (রা.) শহীদ হন সে রাতে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) দেখলেন যে, আবূ লুলু, জাফীনা ও হুরমুজান পরস্পর কানাঘুষা করছে। তারা তাঁকে দেখে ঘাবড়ে গেল এবং পৃথক হয়ে গেল। তাদের ভীতির সময়ে তাদের মধ্যে কারো কাপড়ের মধ্যে থেকে খঞ্জর বের হয়ে পড়ে গেল। খঞ্জরটির দুই দিকে ধার ছিল। মাঝখানে একটি হাতল বসানো হয়েছিল। এর রকম খঞ্জর দিয়ে দু'দিকে একসাথে আক্রমণ করা যায়। উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) এ ঘটনা শুনে যে খঞ্জরের আঘাতে হযরত উমর (রা.) শহীদ হয়েছিলেন সেটি চেয়ে নিয়ে দেখলেন। খঞ্জরটি অবিকল তেমনই ছিল যেমনটি আবদুর রহমান বর্ণনা করেছিলেন। উবায়দুল্লাহ নিজের ক্রোধ আর প্রশমিত করতে পারলেন না। তিনি রাগের বশে উত্তেজিত অবস্থায় জাফীনা ও হুরমুজানকে হত্যা করে ফেললেন। বিস্তারিত দেখুন, Maulana Muhammad Ali, *op.cit*, pp. 156-57; William Muir, *op.cit*, pp. 198-201; কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৮

সাহাবা তাঁকে বললেন যে, আপনার অনুপস্থিতিতে কে আপনার উত্তরাধিকারী হবে ? আপনি যদি পরবর্তী উত্তরাধিকারীর নাম ঘোষণা করে যান, তাহলে উত্তম হয়। হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি দুটি কাজই করতে পারি। প্রথমতোঃ নাম ঘোষণা করতে পারি। দ্বিতীয়তঃ রাসূল (স.) এর নীতি অনুসরণ করতে পারি। প্রথমটি করলেও কোনো ক্ষতি নাই কেননা হযরত আবু বকর (রা.) পরবর্তী খলিফার নাম ঘোষণা করেছিলেন। আর আমি যদি দ্বিতীয়টি করি, তাহলেও কোনো ক্ষতি নেই। কেননা হযরত মুহাম্মদ (স.) কারো নাম তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেন নি। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা.)-এর নিকট শুনেছি আবু উবায়দা এ উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি। আজ আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ্ (রা.) জীবিত থাকলে আমি তাঁকে আমার উত্তরসূরী প্রস্তাব করতাম।[৪২] অথবা আবু হুযায়ফার গোলাম সালেম জীবিত থাকলে এ দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করতাম।[৪৩] কেননা আমি রাসূল (সা.)-এর বর্ণনা থেকে আমি শুনেছি– সালেম আল্লাহ প্রেমের পতঙ্গ।

কেউ কেউ হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা.)[৪৪] কে খলিফা হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করার নাম প্রস্তাব করলে তিনি জবাব দিলেন, খাত্তাব পরিবারের একজনই মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মতের দায়িত্বের হিসাব দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। সাহাবায়ে কেরামগণ তাঁর এ কথা শুনে নীরব হয়ে গেলেন। মারাত্মকভাবে আহত খলিফা জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মুসলিম জগতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে খলিফা নির্বাচনের এ দায়িত্ব কওমের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী, শ্রেষ্ঠ, গ্রহণযোগ্য, জনপ্রিয় ও জান্নাতী হবার সুসংবাদপ্রাপ্ত ছয় জন প্রথম শ্রেণির সাহাবির উপর ন্যস্ত করে যান।[৪৫] খিলাফত যাতে বংশানুক্রমিক পদাধিকারে পরিণত না হয়, সে জন্য তিনি খিলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে নিজের ছেলের নাম সুস্পষ্টভাবে বাদ দিয়ে দেন এবং আমার পরিবার থেকে খলিফা হওয়ার জন্য আর কোন ব্যক্তির প্রয়োজন নেই।[৪৬] খলিফা নির্বাচন করার জন্য যা ছিল আদতে একটি নির্বাচনি উপদেষ্টা পরিষদ যাকে আধুনিক পরিভাষায় নির্বাচন কমিশনার বলা হয়। এই পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছিলেন হযরত উসমান বিন আফফান, হযরত আলী বিন আবু তালিব হাশমী, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ তাইমী, হযরত যুবাইর বিন আওয়াম আসাদী, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ যুহরী এবং

---

[৪২] Maulana Muhammad Ali, *Ibid*, p. 203

[৪৩] A. H. Qasmi, *op.cit*, p. 89

[৪৪] আবদুল্লাহ বিন উমার, দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র, নবি (সা.)-এর সর্বাপেক্ষা সম্মানিত সাহাবিদের অন্যতম। হিজরতের কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকালে পিতার সাথে একই সময়ে ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি সমগ্র জীবন শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক কাজে অতিবাহিত করেন। তিনি ২৬৩০ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবন উমার ৭৩ হি. মোতাবেক ৬৯৩ খৃ. ৮৪ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। দেখুন, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৬-৫৭০

[৪৫] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড- ৪ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৭-২২৮; Amir Hasan Siddiqi, *Islamic State*, Karachi, 1961, p. 26; Justice Hamoodur Rahman, *Islamic Concept of State*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 2005, p. 14; Sir Thomas W. Arnold, *op.ci,t* p. 21

[৪৬] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড- ৪, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৮; ইবনুল আছির, খণ্ড- ৩য়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫

হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)।[৪৭] এ ছয় জনের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যে কেউ নির্বাচিত হলে তা সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণীয় হবে মনে করেই হযরত উমর (রা.) এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

অতঃপর তিনি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদকে ডেকে বললেন, আমার দাফন সম্পন্ন হলে এ ছয় ব্যক্তিকে একস্থানে একত্রিত করবে এবং বলবে যে, নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে যেন আমির নির্বাচন করে নেয়। খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে হযরত উমর ফারুক (রা.) কয়েকটি নিয়ম করে গিয়েছিলেন। যেমন-

ক. আমির নির্বাচন করার জন্য তিনদিন তিন রাতের মেয়াদ বেঁধে দিয়েছিলেন।[৪৮]

খ. যদি সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা নির্বাচিত না হয়, তাহলে যাঁর প্রতি অধিকাংশের রায় থাকবে, তিনি খলিফা বা আমির নির্বাচিত হবেন।

গ. স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহর খলিফা হওয়ার কোনো অধিকার নেই। তাঁকে উক্ত শূরার সাথে যুক্ত করেন শুধুমাত্র রায় দেওয়ার জন্য, খিলাফত গ্রহণের জন্য নয়। 'যদি তিন তিন সমভাগ হয়ে যায়, সে অবস্থায় আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর রায় চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।'[৪৯]

ঘ. তিনি খলিফা নির্বাচনের জন্য কুরাইশদের মধ্যে থেকে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। তিনি ছয় সদস্যের নির্বাচনি শূরার জন্য যে হেদায়েত দিয়ে যান, তাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়টিও ছিল : নির্বাচিত খলিফাগণ এ কথাটি মেনে চলবেন যে, তাঁরা আপন গোত্রের সাথে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ করবেন না।[৫০]

হযরত উমর (রা.) ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে তাঁর পরবর্তী খলিফা মনোনীত হওয়ার পথ সহজ করে গিয়েছিলেন বটে, তথাপিও উক্ত কার্যটি সহজে নিষ্পন্ন হয় নি। কারণ তাঁর মৃত্যুর পর পরামর্শ মোতাবেক মিকদাদ এ পরামর্শ দল কে মিসওয়ার ইবনে মাখরামার বাড়িতে একত্রিত করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম নির্বাচক-মণ্ডলী। নির্বাচক-মণ্ডলীর উপর নির্দেশ ছিল এই যে, তাঁরা যেন পরস্পর আলোচনা করে তাঁদের মধ্যে হ'তেই একজন খলিফা নিযুক্ত করে নেন। মনোনীত ছয়জন সাহাবি পরস্পর নিজেদের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। কতিপয় সাহাবার অনুরোধক্রমে

---

[৪৭] Von Kremer, *op.cit,* p. 19, S. Khuda Bakhsh, *op.cit,* p. 11

[৪৮] Justice Hamoodur Rahman, *op.cit,* p. 14; A. H. Qasmi, *op.cit,* p. 89; Dr. Mohammad Muslehuddin, *Islam and its Political System,* Kitab Bhavan, New Delhi, 1999, p. 67

[৪৯] আবদুর রহমান আবদুল খালেক, *আশ-শূরা ফী যিল্লি নিযা-মিল হুকমিল ইসলামী* (কুয়েতঃ দার সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮/১৯৮৮), পৃ. ১১৪; Von Kremer, *op.cit,* p. 19

[৫০] G. E. Von Grunebaum, *op.cit,* p. 58

তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী অপর তিনজনের পক্ষে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয়। তখন হযরত যুবাইর স্বীয় নেতৃত্বকে হযরত আলীর উপরে, হযরত তালহা হযরত উসমানের উপরে এবং হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস হযরত আবদুর রহমান বিন আউফের উপরে ন্যস্ত করলেন। এক্ষণে বিষয়টি হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) এই তিনজনের মধ্যে সীমিত হয়ে গেল। পরবর্তীতে হযরত আবদুর রহমানও তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন এবং পরিষদ তাঁর উপর একজন যোগ্য খলিফা নির্বাচনের ভার ন্যস্ত করেন।[৫১] হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ যুহরীকে এই কমিটির আহ্বায়ক এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরকে উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়।[৫২] হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ যুহরী নিজেকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে হযরত আলী ও হযরত উসমান (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্যে থেকে যিনি নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবেন, আমরা খিলাফতের দায়িত্ব তার উপরেই ন্যস্ত করবো। আল্লাহ তার উপরে সাক্ষী থাকবেন। এতে কেউ কোনো জবাব দিলেন না। দুজনেই খলিফা হতে ইচ্ছুক। তখন আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) বললেন, আপনারা কি নেতৃত্ব আমার উপর ন্যস্ত করতে চান ? অথচ খলিফা হওয়ার নির্বাচন থেকে আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। এখন আপনারা যদি নেতৃত্ব নির্বাচনের ভার আমার উপর অর্পণ করেন তাহলে আমি আপনাদের মধ্যে থেকে জনগণের মতামত নিয়ে উত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচন করবো। তখন তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ (এতে আমরা রাজি)।[৫৩] এর ফলে নেতৃত্ব দু'জনের মধ্যে সীমিত হয়ে গেল। খলিফা নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে আবদুর রহমান পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। তারপরেও হযরত উসমান (রা.)-এর মুসলমানদের কল্যাণার্থে অকাতরে দান, আর্থিক সচ্ছলতা, অমায়িক ব্যবহার, লজ্জা, দানশীলতা, আত্মশুদ্ধি, দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি গুণাবলির সমাবেশ, অন্যদিকে হযরত আলী (রা.)-এর অপরিসীম জ্ঞান, উন্নত মানবতাবোধ, অতুলনীয় শারীরিক বল, অফুরন্ত মনোবল, দূরদৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি, রণ-নিপুণতা, নবি করিম (স.)-এর গভীর সাহচর্যে অর্জিত অলৌলিক শক্তি ইত্যাদি মহাগুণের সমাবেশ। অতএব উভয়ের মধ্যে সকল দিক বিবেচনায় কে শ্রেষ্ঠতর, কে খলিফা হবার জন্য অধিক বেশি যোগ্য ও কোনো পদ্ধতিতে খলিফা নির্বাচন করা উচিত-ইহা স্থির করতে আবদুর রহমান (রা.) বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।[৫৪]

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ যুহরী (রা.) খলিফা নির্বাচনের জন্য অন্য সকল নির্বাচকের সাথে একান্তে এক এক করে কথা বলেন। এছাড়া সে সময় হজ্জ উপলক্ষে মদিনায় আগত গোত্র প্রধানদের সাথে নির্বাচন সম্পর্কিত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন। নির্ধারিত তিনদিন তিন রাতের মধ্যে জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে

---

[৫১] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড- ৭, ওয়াজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শূয়ূন আল-ইসলামিয়্যাহ, কাতার, ২০১৫, পৃ. ২৮০-২৮১

[৫২] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৪, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৯

[৫৩] ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ৬৭১৪, দশম খণ্ড, *পূর্বোক্ত* পৃ. ৪৭৪-৪৭৫

[৫৪] মুহম্মদ আহ্সানউল্লাহ, (অনু.মোহাম্মদ আব্দুল জাব্বার সিদ্দিকী), *খিলাফতের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৫৮

সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে সেনাধ্যক্ষ, নেতৃস্থানীয় সাহাবা, আঞ্চলিক শাসকবৃন্দ, মুকিম, মুসাফির, হজ্জে আগত লোকজন, দূরাগত ব্যবসায়ী, পর্যটকসহ সর্বস্তরের জনগণের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করেন যে, কে খলিফা হওয়ার জন্য যোগ্য। পর্দার অন্তরালের নারীদের মতামতও তিনি গ্রহণ করেন। হযরত আবদুর রহমান (রা.) রাতের আধারে চাদর মুড়ি দিয়ে একেক জনের নিকট যেতেন এবং তার স্বাধীন মতামত নিতেন। এভাবে তিনি যাকে পরামর্শের যোগ্য মনে করেন তার কাছে থেকেই পরামর্শ নেন। এ জনমত যাচাইয়ের ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অধিকাংশ লোকই হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষে।[৫৫] শুধুমাত্র বনু হাশিমের[৫৬] লোকগণ হযরত আলী (রা.) এবং বনু উমাইয়ার[৫৭] লোকগণ হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষাবলম্বী ছিলেন। এছাড়া অবশিষ্ট সকলের রায় ছিল এই যে, হযরত উসমান (রা.) কে খলিফা করা হোক। চূড়ান্তভাবে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ খলিফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রা.) কে ডাকেন এবং তাঁকে পূর্ববর্তী দুই খলিফা সম্পর্কে এবং কোরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হযরত আলী কোরআন এবং হাদিসের উপর অবিচল আস্থা প্রকাশ করেন এবং খলিফাদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। অপরদিকে হযরত উসমানকে জিজ্ঞাসিত করা হলে তিনি কোরআন, হাদিস এবং পূর্ববর্তী খলিফাদের উপর অবিচল আস্থা প্রকাশ করেন।[৫৮] তিনদিন পর ফজরের নামাজের সময় যখন আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) মসজিদে নববিতে এলেন খলিফার নাম ঘোষণা করার জন্য, তার পূর্বে তিনি দু'জনের নিকট থেকে আলাদাভাবে জানতে চান যে, এ পদ যদি আপনার হাসিল না হয়, তাহলে আপনারা এ পদের জন্য কাকে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত এবং যোগ্য বলে মনে করবেন ? হযরত আলী (রা.) বললেন, উসমান (রা.) কে। আর হযরত উসমান (রা.) হযরত আলী (রা.) নাম বললেন।[৫৯] তাছাড়া তিনি তাদের নিকট থেকে এ ওয়াদাও নেন যে, যার হাতেই বায়'আত করা হবে, তিনি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত-এর উপর আমল করবেন এবং

---

[৫৫] ইবনুল আছির, খণ্ড- ৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড. ০৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮১; Maulana Muhammad Ali, *op.cit*, p. 204

[৫৬] মক্কার কুরাইশ গোত্রের হাশিম ইবনে আবদ মানাফের নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয়েছে বনু হাশিম। হাশিম এর নাম ছিল আমর। আমর ইবনে আবদ মানাফ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে একবার শ্যামে ছিলেন। তখন তিনি শুনতে পান মক্কায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। দুর্ভিক্ষের সংবাদ শুনে প্রচুর খাদ্য ও রুটি নিয়ে উষ্ট্রসহযোগে মক্কায় এসে মক্কাবাসীদের মাঝে বিতরণ করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি 'হাশিম' নামে অভিহিত হন। হজ্জ মৌসুমে হাশিম হাজীদের পানাহার ও বসবাসের জন্য অনেক সম্পদ ব্যয় করতেন। তার বংশধরগণই হাশেমী নামে অভিহিত। এ বংশের বংশধররা সাইয়্যিদ, সৈয়দ, মীর, হাশমি ইত্যাদি উপাধি ধারণ করে। খলিফা উমর (রা.) পর্যন্ত মক্কার কুরাইশ গোত্রের দুটি গোত্র বুন উমাইয়া ও বনু হাশিমের মাঝে কোনো বিরোধিতা দেখা না গেলেও হযরত উসমান (রা.) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে বনু হাশিম গোত্রের লোকেরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে নি। এ দলটি হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনকালে বিভিন্ন গোলযোগের পেছনে ইন্ধন যোগাতে সমর্থন যুগিয়েছিল। *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫২৯-৩০

[৫৭] ইসলাম পূর্ব যুগে মক্কার কুরাইশ গোত্রের উমাইয়া ইবন আবদ শামসের বংশধর ছিল বনু উমাইয়া। আবদ শামসের বংশধরগণ উমাইয়া হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আবদুস শামস এর পুত্র উমাইয়া হাশিমের প্রভুত্ব নষ্ট করে সমস্ত কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট হলে বনু হাশিমের সাথে উমাইয়াদের সংঘর্ষ বাঁধে। এ সংঘর্ষ নির্মূল হয়নি। আবু সুফিয়ান, তাঁর পুত্র ও বেশিরভাগ উমাইয়া মুহাম্মদ (স.) এর জীবনের প্রথম দিকে ইসলাম প্রচারে বিরোধিতা করেন এবং শেষদিকে মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবি (স.) থেকে শুরু করে হযরত উমর ফারুক (রা.)এর খিলাফতকাল পর্যন্ত বন হাশিম ও বনু উমাইয়া গোত্রের মধ্যে সদ্ভাব বজায় থাকে। হযরত উসমান (রা.) উমাইয়া বংশের লোক হওয়ায় তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হলে গোষ্ঠীকলহ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পরবর্তীতে হযরত মুয়াবিয়া খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করলে তাদের আধিপত্য বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। বিস্তারিত দেখুন, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৬৪৫-৬৪৬

[৫৮] Dr. Ghulam Nabi, *op.cit*, pp. 51-52; S. Khuda Bukhsh, *A History of the Islamic Peoples*, Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 1983, p. 67

[৫৯] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮১; কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৩

তিনি যার হাতেই বায়'আত করবেন, অন্যজন তার আনুগত্য করবেন।[৬০] তখন হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ সকলের সামনে ঘোষণা করেন যে, অধিকাংশ মানুষই হযরত উসমান (রা.) কে খলিফা হিসেবে দেখতে চায় এবং তিনি নিজে তার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। এর সাথে কমিটির সকল সদস্য হযরত উসমানকে খলিফা হিসেবে মেনে নেয়।[৬১] এরপর উপস্থিত মদিনাবাসী, মুহাজির, আনছার, সেনাপতিবৃন্দ ও জনগণ দলে দলে বায়'আত করতে থাকেন। খলিফা হওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) আছরের জামায়াতে ইমামতি করেন। অতঃপর জনসমক্ষে প্রথম ভাষণ দেন।[৬২] বায়'আতের পর হযরত উসমান (রা.) প্রথম যে ভাষণ দান করেন, তা হলো ঃ

> আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল করিমে (স.) এর উপর দুরুদ পাঠ করার পর জনগণকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, শোন, নিশ্চয়ই তোমরা দুর্গের মাঝে বসবাস করছ এবং নিজেদের জীবনের বাকী অংশে বসবাস করছ। তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে আসছো। সাবধান! এ পৃথিবী ধোকা ও প্রতারনার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত করতে না পারে। ইতোপূর্বে যারা চলে গেছে, তাদের দেখে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। অতঃপর তোমরা তোমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখো, উদাসীন হয়ো না। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের সম্পর্কে অবগত আছেন। সেই লোকজনেরা কোথায়, যারা পৃথিবীকে আবাদ করেছিল। বহুকাল যাবত এ পৃথিবী থেকে উপকৃত হয়েছিল। পরিশেষে পৃথিবী কী তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য যা রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকো এবং আখেরাতকে অন্বেষণ করো।[৬৩]

ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করলে তৃতীয় খলিফার নির্বাচন কয়েকটি বিশেষ দিকের উন্মোচন করে এবং আমরা এ সকল ঘটনাবলির বিভিন্ন পর্যায়ে কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

ক. ক্ষমতাসীন ২য় খলিফা মৃত্যুর পূর্বে ৬ জন নেতৃস্থানীয় ও জান্নাতের সংবাদপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ সাহাবির সমন্বয়ে একটি নির্বাচনি বোর্ড গঠন করেন। এ নির্বাচনি বোর্ড তাঁর মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে নির্বাচনের কর্ম সম্পাদন করবে।

---

[৬০] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮১

[৬১] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮২, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) প্রথমে দীর্ঘক্ষণ দোআ করলেন। অতঃপর বললেন, হে লোকসকল, আমি খেলাফতের বিষয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং আমার উপর অর্পিত দায়িত্বের কারণে মানুষের সাথে সাক্ষাত করে তাদের মতামত জেনে নিয়েছি। আমি সুষ্ঠুরূপে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি এবং এ ব্যাপারে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী মুসলিম নাগরিকদের রায় সংগ্রহ করেছি। ইসলামি নাগরিকদের সর্বাধিক রায় এবং আলাপ-আলোচনা করে মুসলিম বিশ্বের খলিফা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি আশা করি যে, আমার সিদ্ধান্তের সাথে কারো দ্বিমত থাকবে না। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) কে ডেকে বললেন, অঙ্গীকার করুন যে, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত এবং পূর্ববর্তী দু'খলিফার আদর্শ অনুযায়ী কার্য করবেন। হযরত উসমান (রা.) বললেন, আমি নিজ জ্ঞান ও শক্তি অনুযায়ী এমনটিই করব। তারপর তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর হাত ধরে বায়'আত করলেন এবং তাঁকে খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। বিস্তারিত দেখুন, কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৩

[৬২] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৩

[৬৩] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৪, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৩; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৩-২৮৪

খ. যিনি খলিফা নির্বাচিত হবেন তাঁর হাতে সকলে বায়'আত গ্রহণ করবে। খলিফা ছয় সদস্যের নির্বাচনি বোর্ড গঠন করেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। নির্বাচনি বোর্ড গঠন করার সময় মদিনার বাইরের গোত্রসমূহের সাথে কোনো আলোচনা করার সুযোগ পাননি।

গ. খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ন্যায় হযরত উমর (রা.)ও নতুন খলিফা নির্বাচন করাকে তার দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করেছেন।

ঘ. নেতৃত্ব নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নেতৃত্ব যে কোনো ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। নেতৃত্ব নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্তারোপ করা হয়।

ঙ. খলিফা ইচ্ছা করলে নিজের ছেলেকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে একনায়কতন্ত্র চালু করতে পারতেন। কিন্তু নিজের ছেলে যোগ্য হওয়ার পরও তিনি নিজের ছেলেকে খিলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে বাদ দেন।

চ. নির্বাচনের জন্য আবশ্যক বোধে সকল পর্যায়ের ইসলামি নাগরিকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

ছ. নির্বাচকের রায়ই চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। প্রথমেই শূরার সদস্যদেরকে নেতৃত্বের প্রতি বায়'আত নিতে হবে এবং অন্য সবাইকে তা মেনে নিতে হবে।

হযরত আলী (রা.) এর খলিফা নির্বাচন (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার পর মুসলিম রাজনীতি এক সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রবেশ করে। তাঁর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। এ যুদ্ধ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের মাঝে ফাটলের সৃষ্টি হয়। মুসলিম বিশ্ব বানু হাশিম ও বানু উমাইয়া– এ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। J. Wellhausen- এর ভাষায় "The Janus-gate of civil war was opended and never again closed."[৬৮] Joseph Hell- এর বর্ণনাতেও এর সমর্থন মেলে। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলমানদের মাঝে অবিশ্বাস দানা বাঁধে এবং ইসলামি রাজনীতিতে কপটাচরণ প্রবেশ করে যার প্রত্যক্ষ নজির দেখা যায় সিফফিন ও কারবালার যুদ্ধে। সেইজন্য হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডকে ইসলামের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক, শোচনীয় ও যুগান্তকারী ঘটনা বলা হয়। সে সময় মদিনার পরিবেশ বিশৃঙ্খল ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মূলত মিসর, কুফা ও বসরার বিদ্রোহীগণের কারণেই মদিনায় অশান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক

[৬৮] J. Wellhausen, *The Arab Kingdom and its Fall*, Khayats, Beirut, 1927, pp. 50-51

তাবারী বলেন, তৃতীয় খলিফার হত্যাকাণ্ডের পর দুষ্কৃতিকারীরা সম্পূর্ণরূপে মদিনার দখল নিয়ে নেয়। প্রায় ৫ দিন পর্যন্ত মদিনায় কোনো খলিফাই ছিল না।[৬৫] এই অরাজকতার সময় রাসূল (স.)-এর বেশিরভাগ সাহাবি মদিনা ত্যাগ করেন। তবে স্বল্প সংখ্যক অবশ্যই মদিনায় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তারা ছিলেন সম্পূর্ণ অসহায়।[৬৬] কিন্তু বহিরাগতদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব তাঁদের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের সুযোগ রাখেনি। এ সময় দুষ্কৃতিকারীরা নিজেরাই একজন খলিফা নির্বাচন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.) উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের পর পাঁচ দিন পর্যন্ত গৃহ থেকে বের হননি এবং কারও সাথে সাক্ষাৎও করেননি। মিসরের অধিবাসীরা হযরত আলীর নিকট আসে এবং তাঁকে খলিফা হওয়ার অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বসরার কয়েকটি দল হযরত তালহার নিকট এবং কুফার কয়েকটি দল হযরত যুবাইর নিকট একই ধরনের প্রস্তাব নিয়ে গেলে তাঁরা উভয়ে এই বিশৃঙ্খলপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে আমিরুল মুমিনিন হইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। যখন উপরিউক্ত তিন ব্যক্তি খলিফা হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তখন দুষ্কৃতিকারীরা হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে খলিফা হওয়ার আমন্ত্রণ জানান, তিনিও তা প্রত্যাখান করেন। সর্বশেষ তারা হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের নিকট গমন করেছিলেন কিন্তু তিনিও খলিফা হতে অস্বীকৃতি জানান।[৬৭] বিশৃঙ্খলসৃষ্টিকারীরা বুঝতে পারে যে, খলিফাবিহীন অবস্থায় ব্যাপক হাঙ্গামার সৃষ্টি হতে পারে। অনন্যোপায় হয়ে এ রকম সংকটময় মূহুর্তে তারা হযরত আলী (রা.)-কে খলিফা করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ "খলিফা নির্বাচন করার ইখতিয়ার হলো শুরা সদস্য ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কর্তব্য। খলিফা নির্বাচন করার কোনো ক্ষমতা তোমাদের নেই। তারা যাকে খলিফা হিসেবে মনোনয়ন দান করবেন তিনিই খলিফা হবেন। আমরা বৈঠকে বসবো এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।"[৬৮] হযরত আলী (রা.) দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেও তিনি বিষয়টি নিয়ে কয়েকজন বন্ধু ও গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের সাথে আলাপ করেন। তাদের পরামর্শ ও বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের অনুরোধে খলিফার দায়িত্ব নিতে রাজি হন।[৬৯] হযরত উসমান (রা.) নিহত হওয়ার সপ্তম দিনে জুম'আ দিবসে হযরত আলীর সমর্থকসহ অনেকে তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করতে আসেন।[৭০] বিদ্রোহীগণের নেতা মালিক বিন আশতার সর্বপ্রথম বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। এরপর হযরত তালহা (রা.) ও হযরত জুবাইর (রা.) তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করিলেন। এমন লোক খুব অল্পই ছিল যারা বায়'আত গ্রহণ করেন নাই। আনসারদের মাঝে কতিপয় লোক এবং বনু উমাইয়া বংশের কতিপয় লোক বায়'আত গ্রহণ না করে শামের দিকে পালিয়ে গেল এবং বায়'আত এ ড়িয়ে গেল। একজন মদিনাবাসী অতি

[৬৫] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৪, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩২
[৬৬] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৪, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৩
[৬৭] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৪, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩২
[৬৮] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, p. 211
[৬৯] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৪, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৪ ; ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফত*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫৫০
[৭০] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড. ০৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০০

সন্তর্পণে খলিফা-পত্নী নায়নার কর্তিত অঙ্গুলী ও খলিফার রক্তরঞ্জিত জামা দামিস্কে নিয়ে মুয়াবিয়ার হাতে সমর্পণ করলে মুয়াবিয়া এ দুটো বস্তু দামেস্কে জামে মসজিদে সর্বসাধারণের সামনে প্রদর্শিত করলে ষাট হাজার উসমান (রা.) সমর্থকের দাড়ি অশ্রুতে ভিজে গেল এবং গোটা মসজিদ 'প্রতিশোধ' ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। এক সময় জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল, আপনার সময় মুসলমানরা কেন আন্দোলন ও সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বিরোধিতা করছে অথচ আবু বকর ও উমরের সময় এরূপ করে নি। জবাবে আলী (রা.) বললেন, এটা এজন্য যে, আবুবকর ও উমর আমার মতো লোকদের উপরে খলিফা ছিলেন। পক্ষান্তরে আমি খলিফা হয়েছি তোমার মতো লোকদের উপরে। ইবনু খালদুন বলেন, এর দ্বারা তিনি তাঁর সময়কার মানুষের মধ্যে দীনী দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেন।[৭১] এ রকম পরিস্থিতিতে নানা ঘাত সংঘাতে তিনি খিলাফতের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন এবং বায়'আতের পর (২৩ জুন, ৬৫৬ খ্রি.) হযরত আলী (রা.) এক সারগর্ভ খুতবা দান করলেন। এতে তিনি মুসলমানদের ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর খুতবার কতিপয় বাক্য নিম্নরূপ ঃ

> আল্লাহ তা'আলা হারামভূমিকে সম্মানিত করেছেন। মুসলমানদের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মুসলমান সেই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অপর মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে। শুধুমাত্র তখন ব্যতীত যখন কোনো শরিয়াত নির্ধারিত দণ্ড সাব্যস্ত হয়ে যায়। আল্লাহর বান্দাদের সাথে আচরণের বেলায় আল্লাহকে ভয় করবে। কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে মাটি ও পশুর সাথে আচরণের বিষয়েও প্রশ্ন করা হবে (মানুষের কথা তো উল্লেখ করা হয়েছেই)। আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর বিধানসমূহ থেকে মুখ ফিরাবে না, সৎকাজ করবে।[৭২]

হযরত হাসান (রা.) এর খলিফা নির্বাচন (৬৬১ খ্রি.)

আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর কুফার জনগণ জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত হাসান (রা.)-কে খলিফা নির্বাচন করে। ঐতিহাসিক বিবরণীতে পাওয়া যায়, হযরত আলী (রা.) যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা কি হযরত হাসানের পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করবো ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি না, নিষেধও করছি না। তোমরা নিজেরাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নাও।"[৭৩] এ ঐতিহাসিক বিবরণীতে এটা সুস্পষ্ট যে, হযরত আলী (রা.) তাঁর পুত্রকে খলিফা নির্বাচন করতে আদেশ ও নিষেধ করেননি। খলিফা হিসেবে পুত্রকে মনোনয়ন দেওয়া সাহাবাদের এখতিয়ার বহির্ভূত নয়। সাহাবারা মূলত যোগ্য লোককে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করবে। খলিফা নির্বাচন হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে, খলিফার পুত্র

---

[৭১] Ibn Khaldun, Tr. Franz Rosenthal, *The Muqaddimah,*Vol. I Routledge & Kegan Paul, London, 1967, p. 433

[৭২] কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬

[৭৩] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড. ০৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪০-৫৪৫; আবুল হাসান আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী আল মাসুদী, *মুরুয আয-যাহাব ওয়া মা'আদিন আল যাওয়াহিরহ্*, খণ্ড-২, আল মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ২০০৫, পৃ. ৩২১

হিসেবে নয়। যদি খলিফা হিসেবে নিজ পুত্রকে মনোনয়ন দেওয়া অবৈধ হতো, তাহলে হযরত আলী (রা.) তার অনুসারীদেকে তাঁর নিজ পুত্রকে মনোনীত করার ব্যাপারে বাঁধা প্রদান করতেন। জীবনের যখন আর আশা রইলো না, তখন তিনি পুত্রদের ডাকলেন এবং তাদেরকে নেক আমল, তাকওয়া ও দীনের খিদমতের ব্যাপারে অসিয়ত করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি আরয করলো, আমিরুল মু'মিনিন। আপনি আপনার উত্তরসূরী মনোনয়ন করছেন না কেন ? উত্তরে তিনি বলেন : "আমি মুসলমানদেরকে সে অবস্থায় রেখে যেতে চাই, যে অবস্থায় রাসূলে করিম (স.) রেখে গিয়েছিলেন।"[৭৪] মুয়াবিয়া হযরত আলীর জীবদ্দশায়ই সিরিয়া ও মিসরে আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাত ও হযরত হাসান (রা.)-এর বায়'আতের সংবাদ পেয়ে নিজের জন্য পুনরায় বায়'আত গ্রহণ করেন এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের খিলাফত দাবি করলেন এবং হাসানের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য ইরাকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। হযরত হাসান (রা.) যুদ্ধ না করে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি করেন এবং তাঁর নিকট বায়'আত করেন। অতঃপর অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ও ছোট বড় সকলে বায়'আত গ্রহণ করে।

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

উপরিউক্ত আলোচনা হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি আকিদা ও নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত এক ঐশী আদর্শিক বিশ্বরাষ্ট্র হলো ইসলামি খিলাফত। ইতিহাস দর্শনের দৃষ্টিতে খিলাফতে রাশেদার ত্রিশ বৎসরকালীন শাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনা করলে ইহার প্রতিষ্ঠাতা, অনুসৃত নীতি, মৌলিক আদর্শ, আইন প্রণয়নের ধরন, শাসনপদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য ইসলামি খিলাফতকে প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে একেক খলিফা একেক রীতি-নীতি ও প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এ সকল ঘটনার যথাযথ বিশ্লেষণপূর্বক নিম্নোক্ত ধারাগুলো উপস্থাপন করা যায়। যথা :

ক. খোলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন পদ্ধতি ছিল কতকটা প্রাক-ইসলামি যুগের গোত্রীয় শেখ নির্বাচনের অনুরূপ এবং কতকটা গণতান্ত্রিক। সে যুগে যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করা হতো। কারণ সে যুগে জাতীয় স্বার্থকে বড় করে দেখা হতো।

খ. হযরত আবু বকর (রা.) সাকিফা বানু সাঈদায় মাত্র একজন ব্যক্তি কর্তৃক নির্বাচিত হলে অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করেন এবং খলিফার আনুগত্য মেনে নেন। পরবর্তীতে মসজিদে নববিতে উপস্থিত মুসল্লিরা তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। মদিনার বাইরের মুসলিম গোত্রসমূহের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা না করা হলেও এ নির্বাচনকে মদিনার অধিকাংশ মানুষসহ মদিনার বাইরের মুসলমানগণও মেনে নিয়েছিলেন।

[৭৪] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪০-৫৪৫; আবুল হাসান আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী আল মাসুদী, খণ্ড-২, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২২

গ. হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর নির্বাচন কোনো প্রথাগত নির্বাচন ছিল না। এতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) বিশ্বস্ত কয়েকজন বয়োঃজ্যেষ্ঠ সাহাবিদের সাথে উমর (রা.)-এর খিলাফত বিষয়ক আলোচনা করলেও তা মূলত প্রথম খলিফার সুপারিশের ভিত্তিতেই হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-এর ন্যায় মদিনার বাইরের মুসলিম গোত্রসমূহের সাথে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

ঘ. হযরত উসমান (রা.)-এর নির্বাচন ক্ষমতাসীন খলিফা তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি প্যানেল অব ক্যান্ডিডেট ঠিক করে দেন, যাতে উল্লেখযোগ্য অনেক সাহাবা এবং সাধারণ জনগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সব সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। এ পদ্ধতিতে নির্বাচক এক বা একাধিক ব্যক্তি হতে পারলেও নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সকল পর্যায়ের ইসলামি নাগরিকের পরামর্শ নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। তৃতীয় খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী দু'জন খলিফার ন্যায় মদিনার বাইরের গোত্রসমূহের সাথে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

ঙ. হযরত আলী (রা.) বহিরাগত (মিসর, কুফা ও বসরার দুষ্কৃতিকারী) ও মদিনার একদল জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন যেখানে কোনো ভোট কিংবা অধিকাংশ জনগণের মতামত নেওয়া হয় নি। অবশ্য হযরত আলী (রা.) বিশৃঙ্খল পূর্ণ ইসলামি রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে ও শুরার সদস্য ও বদরী সাহাবিদের সম্মতিতে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

চ. খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে বিশাল সাম্রাজ্যজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে কোনো আলোচনা ব্যতিরেকে এ নির্বাচনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হতো। তবে কোনো পক্ষপাতমূলক নির্বাচন করা হতো না।

ছ. খিলাফতে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত কোনো খলিফার বংশ-গোত্র কিংবা পরিবার-ভিত্তিক অধিকার, উত্তরাধিকার বা প্রাধান্যের কোনোই অবকাশ ছিল না। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে সাহাবারা খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করতেন। হযরত আবু বকরের নির্বাচন প্রক্রিয়া হযরত উমরের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তেমনি হযরত উসমানের নির্বাচন প্রক্রিয়া হযরত আলী থেকে ভিন্ন ছিল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তৎকালীন সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বিবেচনায় আনা হতো। উদ্ভূত পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা হতো। ফলে সাহাবিদের এই অনুশীলন পরবর্তীকালে খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ না করে বরং উন্মুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল।

জ. ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রথম চার খলিফার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়েছিল সবগুলোই শরিয়া মোতাবেক বৈধ। ফলে বলা যায় যে, একটি ক্ষুদ্র দলের দ্বারা খলিফা নির্বাচন অথবা

মনোনয়ন, একদল নির্বাচক-মণ্ডলী[৭৫] যারা নিজেরাই খলিফা পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন তাদের দ্বারা কোনো মনোনয়ন অথবা জনসাধারণের একটি অংশ যারা ছিল বহিরাগত এবং রাজধানীর জনসাধারণের সম্মতি ছাড়াই তাদের কোনো মনোনয়ন এবং সে মনোনয়নের উপর ভিত্তি করে খলিফা নির্বাচন এ সবই ইসলামিকভাবে বৈধ এবং গণতান্ত্রিক।

ঝ. আল-মাওয়ার্দীর মতে প্রথম চার খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুই প্রকারে খলিফাগণ নির্বাচিত হতেন। যথা :

প্রথমত : জাতির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে একমত হয়ে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করতেন।[৭৬]

দ্বিতীয়ত : পূর্ববর্তী খলিফা দ্বারা মনোনীত হয়ে খলিফা নির্বাচিত হতেন।[৭৭]

উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে খোলাফায়ে রাশেদিনের বৈশিষ্ট্যগুলো কী ছিল তা আলোচনা করা না হলে খিলাফতের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অজানা থেকে যাবে। সেজন্য খোলাফায়ে রাশেদিনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

* খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে খলিফাগণ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এ যুগে যাঁরা খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যাঁরা নানা শাসনকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁদের সবাই হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রিয়পাত্র, বন্ধু, অনুগত, অনুরক্ত ও বিশিষ্ট সহকর্মী ছিলেন। তাঁদের কাজকর্ম ও চাল-চলনে রাসূল (স.)-এর দৃষ্টান্ত ও কুরআনের শিক্ষা সরাসরি প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাসূল (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্র খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে পূর্ণতা লাভ করে।

* খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে পবিত্র কোরআন, হাদিস এবং ইজমার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হতো। এ সময় খলিফারাও নিজেকে আইনের উর্ধ্বে মনে করতেন না। বরং আইনের দৃষ্টিতে নিজেকে এবং দেশের একজন সাধারণ নাগরিককে (সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম) সমান মনে করা হতো। তিনি আইন প্রণয়ন করতে পারতেন না। তিনি মাত্র আইন প্রয়োগকারী হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। কেবল শরিয়তি আইনকে প্রয়োগ করাই তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে শূরা বা উপদেষ্টাদের সাথে

[৭৫] যে নির্বাচক-মণ্ডলী খলিফা নির্বাচন করতেন তাঁদেরকে বলা হয় আহ্‌লুল্ ইমামাহ্ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, আহ্‌লুল্ ইখতিয়ার বা নির্বাচক এবং আহ্‌ল্ আল-হাল্‌ওয়া আল-আক্‌দ্ বা যারা বন্ধন শিথিল করতে পারেন ও বন্ধন আঁটতে পারেন। এঁরা ছিলেন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। এঁদের সিদ্ধান্ত কারো অস্বীকার করার উপায় ছিল না। বিস্তারিত দেখুন, Malcolm Kerr, *Islamic Reforms*, Barkeley, University of California, 1966, p. 166

[৭৬] আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল বাসরী আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকাম আল-সুলতানীয়া*, দারুল হাদিস, কায়রো, ২০০৬, পৃ. ১৭

[৭৭] আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল বাসরী আল-মাওয়ার্দী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

পরামর্শ করে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। খলিফা স্বয়ং প্রধান বিচারক ছিলেন। পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রদেশে ও জেলায় জেলায় কাযি নিযুক্ত করতেন।

* রাসূল (স.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে খলিফাগণ উত্তরাধিকার সূত্রে রাসূল (স.)-এর নিকট থেকে দ্বিবিধ ক্ষমতা লাভ করতেন। একটি আধ্যাত্মিক, অপরটি জাগতিক। তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মসজিদে সালাতের ইমামতি করতেন আবার রাষ্ট্রের যাবতীয় পার্থিব কাজকর্মে নেতৃত্ব দিতেন। খলিফাগণ মসজিদে বসেই রাজকার্য সম্পন্ন করতেন।

* সমালোচনা ও মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ছিল খিলাফতে রাশেদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। জনসাধারণ খলিফা হতে আরম্ভ করে সকল কর্মচারীর ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করতে পারতো।

উমাইয়া যুগ (৬৬১-৭৫০ খ্রি.)

উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) ৯০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। অনেক কারণেই এ সময়টা পূর্ববর্তী খোলাফায়ে রাশেদিনের ৩০ বছরের শাসন থেকে ভিন্ন ছিল। ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্তসমূহ প্রধানত উমাইয়াবিরোধী। কারণ এগুলো সংগৃহীত, সংরক্ষিত এবং বর্ণিত হয়েছে মূলতঃ আব্বাসীয় ঐতিহাসিকদের দ্বারা। ফলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সীমাহীন। এর ভেতর উল্লেখযোগ্য অভিযোগসমূহ হচ্ছে :

প্রথমত : হযরত আলী (রা.) এর মৃত্যু এবং তাঁর পুত্র ইমাম হাসানের খিলাফত ত্যাগের পর ক্ষমতার চাবিকাঠি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হস্তগত হয়। হযরত মুয়াবিয়া খিলাফতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রব্যবস্থা খিলাফত হতে রাজতন্ত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। হযরত মুয়াবিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের মতো অধিকতর যোগ্য ব্যক্তির হাতে না দিয়ে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদের হস্তে অর্পণ করায় খিলাফত ব্যবস্থায় উত্তরাধিকারী পন্থার প্রচলন শুরু হয়। ফলত মুসলিম রাজনীতিতে গণতন্ত্রের বিনাশ সাধন হয় বলে অভিযোগ আনয়ন করা হয়।

দ্বিতীয়ত : উমাইয়া যুগে রাষ্ট্রের সর্বক্ষমতা আরবগণের একচেটিয়া দখলে ছিল। রাজক্ষমতা যখনই নির্দিষ্ট কোনো গোত্রের উপর আরোপিত হয়, স্বাভাবিকভাবে তারা অত্যাচার ও নির্যাতন করে রাষ্ট্রের জনগণের উপর। আরবগণের হাতে রাজক্ষমতা একচেটিয়া দখলের কারণে তারা ছিল অত্যাচারী। তাছাড়া রাজতন্ত্রের সূচনালগ্ন থেকেই বাদশাবেশধারী খলিফাগণ কায়সার ও কিসরার অনুরূপ জীবনধারা গ্রহণ করে শাহী মহলে বসবাস করে এবং তাদের সুরক্ষার জন্য রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনী নিয়োগ করে যা খোলাফায়ে রাশেদিনদের জীবনধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থি ছিল বলে অভিযোগ করা হয়।

তৃতীয়ত : উমাইয়ারা পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনায় আক্রমণ করেছিল।

চতুর্থত : উমাইয়ারা বল প্রয়োগের মাধ্যমে শাসন করেছিল এবং সর্বপরি তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। রাজতন্ত্রে বায়তুল মালের এ নীতি পরিবর্তন হওয়ার ফলে প্রজারা বাদশার নিকট করদাতা হিসেবে গণ্য হয়। তাছাড়া সরকার জনগণের নিকট কোনো প্রকার জবাবদিহিতা করতে বাধ্য নয় বলে অভিযোগ প্রদান করা হয়। খলিফা মুয়াবিয়ার আমল হতে বায়তুল মাল উমাইয়া শাসকদের ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ। তিনি ছাড়া বাকি প্রায় সকল উমাইয়া খলিফাগণ বায়তুল মালকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো ব্যয় করতেন।

উপরিউক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে খোলাফায়ে রাশেদিন এবং উমাইয়া খিলাফতের মাঝে একটি বিভাজন রেখা টেনে অনেক পণ্ডিত উমাইয়া শাসনামলকে খিলাফত এবং শাসকদেরকে খলিফা বলতে অস্বীকৃতি জানান। তারা উমাইয়া শাসনামলকে 'মুলুক' এবং তাদের শাসনব্যবস্থাকে 'রাজতন্ত্র' বলে অভিহিত করেন। অভিযোগের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, খিলাফতে রাশেদার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং এর স্থলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য হযরত মুয়াবিয়াই সর্বপ্রথম রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেননি। হযরত মুয়াবিয়া তাঁর পূর্বে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন। পণ্ডিতরা জোর গলায় বলেন, একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। এ প্রসঙ্গে P K Hitti বলেন,

> The founder of the second Caliphate, Muawiyah the Umayyad, a man of the world, nominated his son Yazid as his successor and thus became the founder of a dynasty. The hereditary principle was thereby introduced into the caliphal succession never there after to be entirely abandoned. The Umayyad caliphate was the first dynasty (*mulk*) in the history of Islam.[78]

হযরত মুয়াবিয়া তাঁর পুত্রকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করায় খিলাফত ব্যবস্থা রহিত হয়ে যায়নি। আর খিলাফত ব্যবস্থা শুধুমাত্র খোলাফায়ে রাশেদিনদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তবে এটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে, হযরত মুয়াবিয়া কর্তৃক তার পুত্রকে উত্তরাধিকার নিয়োগের মাধ্যমে বংশানুক্রমিক খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

[৭৮] Philip K Hitti, *History of the Arabs,* Macmillan St Martin's Press, London, Tenth edition, Reprinted 1972, pp. 183-184

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্বাচন (৬৬১-৬৭৯ খ্রি.)

কুফাতে ৬৬০ খ্রিস্টাব্দে আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের পর মুসলিম উম্মাহ রাজনৈতিকভাবে দুটো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে কুফার জনসাধারণ জ্যেষ্ঠপুত্র হাসানকে পিতার স্থলে খলিফা নির্বাচিত করেছিল।[৭৯] অন্যদিকে মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.) জীবিত থাকাকালীন সময়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে সিরিয়া ও মিসরে আধিপত্য স্থাপন করেছিল। হযরত আলীর মৃত্যুতে তিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের খিলাফত দাবি করলেও কুফার জনসাধারণ হাসানকে খলিফা বলে দাবি করায় তিনি হাসানের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ইরাকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন।[৮০] এভাবে ইসলামের ইতিহাসে খিলাফত রাষ্ট্র মূলত দুই খলিফার দ্বারা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। খিলাফতের পশ্চিমাংশ ছিল সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মিসর যার অধিবাসীরা হযরত মুয়াবিয়ার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল অন্যদিকে পূর্বাংশের অধিবাসীরা হযরত হাসানের দিকে অনুগত ছিল। এই সমস্যার সমাধানের জন্য হযরত হাসান আমিরে মুয়াবিয়ার নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে আমির মুয়াবিয়া সানন্দে সন্ধি প্রস্তাবকে মহাবিজয় বলে গণ্য করে ইমাম হাসানের যাবতীয় প্রস্তাব মেনে নিলেন।[৮১] তখন ইমাম হাসান ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের দাবি ত্যাগ করে আমিরে মুয়াবিয়ার হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন।[৮২] এভাবে হযরত মুয়াবিয়া সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে আবির্ভূত হন।

ইয়াজিদের মনোনয়ন (৬৮০-৬৮৩ খ্রি.)

হযরত মুয়াবিয়ার পর তাঁর পুত্র ইয়াজিদ উত্তরাধিকারী হিসেবে রাজক্ষমতায় আসেন। হযরত মুয়াবিয়া জনগণের মাঝে একতা ধরে রাখার জন্য তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র ইয়াজিককে বেছে নিয়েছিলেন। তবে যে সকল কারণে মুয়াবিয়া ইয়াজিদকে মনোনয়ন প্রদান করেছিলেন তা হলো নিম্নরূপ :

ক. ইসলামি খিলাফতকে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা। ইয়াজিদকে মনোনয়ন প্রদান করলে ইসলামি সাম্রাজ্যের জনগণের মাঝে ঐক্য ধরে রাখা সম্ভব। ফলে তিনি ইয়াজিদকে মনোনয়ন প্রদান করেছিলেন।

খ. সে সময় উঁচু পদে আসীন উমাইয়া ব্যক্তিবর্গও ইয়াজিদের ব্যাপারে ঐকমত্যে ছিল। শুধুমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের হযরত মুয়াবিয়ার সিদ্ধান্তের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন নি।

---

[৭৯] Dr. Ghulam Nabi, *op.cit,* p. 67

[৮০] ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৫

[৮১] ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৫

[৮২] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১-১৬৫

গ. উমাইয়ারা কুরাইশদের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল এবং ইয়াজিদের চেয়ে অন্য কেউ অধিকতর পছন্দনীয় হলেও তারা (উমাইয়ারা) তাকে সমর্থন প্রদান করতো না।[৮৩]

অধিকন্তু খিলাফতের পদে ইয়াজিদকে স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিজের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের প্রস্তাব ছিল না। হযরত মুয়াবিয়া হযরত উমর-এর মতো তার উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জন্য নির্বাচনিক পরিষদ গঠন করতে চেয়েছিলেন, যাদের মধ্যে থেকে একজনকে লোকেরা খলিফা হিসেবে বেছে নিবে। কিন্তু তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। মূলত উমাইয়া পক্ষীয় আমির-উমরাদের কারণে তাঁর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রবীণ সাহাবিদের পক্ষ থেকে ইয়াজিদের ব্যাপারে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রবীণ সাহাবিদের পক্ষ থেকে বিখ্যাত কূটনীতিবিদ হযরত মুগীরা বিন-শূবা ইয়াজিদকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করলে মুয়াবিয়া তাকে খিলাফতের জন্য মনোনীত করেন।[৮৪] ইসলামের ইতিহাসে তিনিই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্বে জীবিত থাকা অবস্থায় নিজের ছেলের জন্য বায়'আত গ্রহণ করেছেন।[৮৫] পরবর্তীতে তাঁর এ নীতি উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে অনেক খলিফাই অনুসরণ করেছেন।

মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার মনোনয়ন (৬৮৩ খ্রি.)

ইয়াজিদের অকাল মৃত্যুতে মুয়াবিয়ার বংশধরগণ বেশিদিন খিলাফতের পদে টিকে থাকতে পারলো না। তাঁর মৃত্যুকালীন অসিয়ত অনুযায়ী দামেস্কবাসীরা তৎপুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার হাতে বায়'আত গ্রহণ করে এবং তাঁকে আমিরুল মুমিনিন বলে ঘোষণা করে। তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহের রাজনৈতিক কার্যাবলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন এবং তাদের জীবনাচরণ তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে নি। মূলত তিনি ছিলেন নম্র ও ভদ্র স্বভাবের লোক। বিশেষত নিষ্ঠুর, অধার্মিক ও মদ্যপায়ী ইয়াজিদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাদির ফলে উমাইয়াগণ এমনভাবে জনসমর্থন হারায় যে, ইয়াজিদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের সিরিয়ার কিয়দংশ ব্যতিরেকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।[৮৬] দ্বিতীয় মুয়াবিয়া জনগণকে এক জায়গায় জড়ো করে সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি নিজেকে খিলাফতের কাজ সম্পাদনের জন্য অযোগ্য মনে করছি। আমার পক্ষে খিলাফত পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আমি খিলাফত ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য হযরত উমরের মতো যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজছি কিন্তু পাইনি। আমি হযরত উমরের মতো একটি নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচন করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে রকম যোগ্য লোক খুঁজে পাচ্ছিনা। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তোমরা যোগ্য

---

[৮৩] Ibn Khaldun, Tr. Franz Rosenthal, Vol. I *op.cit*, pp. 421-423
[৮৪] Jurji Zayadan, *op.cit*, p. 61
[৮৫] Jalaluddin A's Suyuti, *Ibid*, p. 254; Sir Thomas W. Arnold, *op.cit*, p. 22
[৮৬] ইবনুল আছির, খণ্ড- ৪, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৯

ব্যক্তি খুঁজে বের করো। তোমাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তোমরাই সর্বোৎকৃষ্ট বিচারক। সুতরাং তোমরা তোমাদের মধ্যে থেকে যোগ্যতর কাউকে বেছে নাও। লোকজনের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর রাজকার্য পরিচালনা করেন নাই।[৮৭] অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি মাত্র ৪০ দিন রাজত্ব করে দামেস্কের সিংহাসন ত্যাগ করেন। সে সময়ে লোকজন তাঁর জীবদ্দশায় আর কাউকে খলিফা নির্বাচিত করেন নাই সত্য কিন্তু রাজকার্য হতে অবসর গ্রহণের অল্প কয়েক দিন পরই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে তাঁর মৃত্যু হয়।[৮৮]

মারওয়ানের নির্বাচন (৬৮৪ খ্রি.)

দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার খিলাফতের দাবি ফিরিয়ে দেওয়া এবং মৃত্যুর পর সিরিয়ার অধিবাসীগণ নতুন খলিফা নির্বাচিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু তারা নতুন খলিফা নির্বাচন করতে গিয়ে এক গভীর সমস্যায় আপতিত হয়। তারা ইয়াজিদের দুই পুত্র খালিদ এবং আবদুল্লাহের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিবেচনায় তাদের ব্যাপারেও আগ্রহী ছিল না। সিরিয়াবাসীগণ ইয়াজিদের চাচাতো ভাই উসমান ইবনে ওতবাকে খলিফা হবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বলেন, খলিফা হবার ক্ষেত্রে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে খলিফা হওয়ার পর আমি কারও সাথে যুদ্ধ করতে পারবো না এ শর্ত মেনে নিতে হবে। এ শর্ত মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বলে সিরিয়ার সর্দারগণ খলিফা নির্বাচন করার জন্য যোগ্য ব্যক্তি খুঁজতে লাগলো।[৮৯] খিলাফত নিয়ে এ রকম গোলযোগ এবং উমাইয়া বংশের দুর্বলতার সুযোগে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (৬৮৩-৯২ খ্রি.) মক্কা-মদিনাসহ সমগ্র হিজাজে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে (৬৮৩-৯২ খ্রি.) মক্কায় নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁর সাধুতা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য কেবল মক্কা ও মদিনার অধিবাসীগণই যে তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছিল তাই নয় বরং ইরাকের কুফা ও বসরা নগরীও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল এবং কুফা ও বসরায় তাঁর পক্ষ হইতে গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিল। মক্কার বাইরে অন্যান্য শহরে যেমন ইরাক, ইরান, ইয়েমেন এবং গোটা আরব উপদ্বীপ এলাকায় আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের শাসন কায়েম হলো। এমনকি সিরিয়াবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করতে শুরু করে।[৯০] এমতাবস্থায় উসমান ইবনে ওতবা দামেস্ক ত্যাগ করে মক্কায় এসে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের দলে যোগদান করলেন। এমনকি উমাইয়াদের রাজধানী দামেস্ক নগরেও জাহ্হাক নামক একজন সেনাপতি ইবনে যুবায়েরের পক্ষ অবলম্বন করে।[৯১] ফলে তিনি খলিফা পদের একজন যোগ্যতর দাবিদার হিসেবে আবির্ভূত হন। এ রকম গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সিরিয়ার অধিবাসীরা খলিফার মনোনয়ন নিয়ে নিজেদের মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তবে সিরিয়ার অধিবাসীদের কেউই

---

[৮৭] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩০-৫৩১; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৮, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩৫

[৮৮] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩১; আল-ইয়াকুবী, তারীখ, বৈরূত, ১৯৬৫, পৃ.২৫৪

[৮৯] মুহম্মদ আহ্সানউল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪

[৯০] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩০-৫৩৩, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৮, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬

[৯১] ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৬

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের পক্ষাবলম্বন করেনি। তাদের মাঝে একদল খলিফা হিসেবে ইয়াজিদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের পক্ষে ছিল অন্য এক দল উমাইয়াদের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং দক্ষ ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে দেখতে চেয়েছিল। দুইটি দলের মধ্যে একপক্ষ যারা বয়োজ্যেষ্ঠ ও দক্ষ ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে দেখতে চায় তাদের নেতৃত্বে ছিল মারওয়ান। অপরদিকে বাহদাল গোত্রপতি হাসান বিন-মালিক বাহ্দাল কাল্বী খালিদ বিন ইয়াজিদকে শিরোভাগে নিয়ে মুয়াবিয়া বংশের স্বার্থ রক্ষার্থে সসৈন্যে জাবিয়া নামক স্থানে স্বীয় অবস্থান গ্রহণ করেন।[৯২] প্রথমে আলোচনা শুরু হয় মারওয়ান ও হাসান বিন মালিক বিন-বাহদালের মধ্যে। হাসান ১৬ বছর বয়স্ক শাহজাদা খালিদ বিন ইয়াজিদের পক্ষ নিয়ে দাবি পেশ করেন এবং স্বীয় দাবির যৌক্তিকতা প্রবলভাবে ব্যাখ্যা করেন। মারওয়ান কোনো বয়স্ক ও বহুদর্শী লোকের হাতে শাসনভার অর্পণ না করলে উমাইয়া বংশের সমূহ অকল্যাণ হবে বলে অনমনীয় মনোভাব নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন। প্রায় দীর্ঘ ৪০ দিন বিফল আলোচনার পর উভয়পক্ষের মাঝে যখন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে, সেই মূহুর্তে দুই পক্ষের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আলোচনার মাধ্যমে তারা একটা মীমাংসায় উপনীত হয়। এই সিদ্ধান্তটি 'যাবিয়ার চুক্তি' নামে পরিচিত। নেতৃবৃন্দ শাহজাদা খালিদকে নাবালক সাব্যস্ত করে গোত্রের সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি মারওয়ানকে খলিফা পদে মনোনীত করেন এবং মারওয়ানের মৃত্যুর পর খালিদ ও পরে আমর সিংহাসনে আরোহণ করবেন।[৯৩]

আবদুল মালিক (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.)

মারওয়ান ক্ষমতায় আরোহণ করে মাত্র দশ মাস রাজত্ব করেছিলেন। তিনি সিংহাসনে বসে মুয়াবিয়া বংশকে ক্ষমতার উত্তরাধিকারীর পদ থেকে অপসারণের লক্ষ্যে বৃদ্ধ বয়সে ইয়াজিদের বিধবা বেগম ফকীতাহকে বিবাহ করেন।[৯৪] আবদুল মালিক খালিদের আত্মীয় ও প্রধান সমর্থক প্রবল প্রতাপান্বিত হাসানকে গোপনে ডেকে এনে অভিযোগ করেন যে, 'আমর বিন-সা'য়ীদ জাবিয়া চুক্তির বিরোধিতা করে সরাসরি তাঁর (মারওয়ানের) পর খিলাফতের দাবি করছে। তখন মারওয়ান হাসানকে নানারকম সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে খালিদের খিলাফত প্রাপ্তির দাবি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব দেন। মারওয়ান কর্তৃক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভের নিশ্চয়তায় হাসান উক্ত প্রস্তাবে রাজি হলে মারওয়ান প্রকাশ্যে ইয়াজিদের পুত্র খালিদের খিলাফতের উপর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে তদস্থলে স্বীয়পুত্র আবদুল মালিক ও আব্দুল আজিজকে পর্যায়ক্রমে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। অবশ্য সে সময় মুসলিম উম্মাহর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিকট থেকে ইয়াজিদের পুত্র খালিদের উত্তরাধিকার মনোনয়ন বাতিল এবং নিজ পুত্র আবদুল মালিক ও আবদুল আজিজের উত্তরাধিকার

[৯২] জাবিয়া দামেস্ক ও জর্দানের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ছিল। খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর সময় এ স্থানটি একটি সামরিক ঘাটি ছিল। এখান হতেই জর্দান ও জেরুজালেমে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

[৯৩] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩০-৫৩৫

[৯৪] আবুল হাসান আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী আল মাসুদী, খণ্ড-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮

মনোনয়নের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তার উত্তরাধিকার হিসেবে তার নির্বাচন শুধুমাত্র পুত্র হিসেবেই যে ছিল তা নয়, তিনি তার রাজনৈতিক দক্ষতা এবং প্রতিভার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।[৯৫] আবদুল মালিক হযরত উসমান (রা.)-এর আমল থেকে শুরু করে তার পিতা পর্যন্ত প্রশাসনিক বিভিন্ন পদে নিয়োজিত থেকে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। হযরত মুয়াবিয়ার আমলে মদিনার দিউয়ানের পদে আসীন ছিলেন। তিনি ফিলিস্তিনেরও গভর্নর ছিলেন। আবদুল মালিকের এ সকল পদে সাফল্যজনকভাবে আসীন থাকার ফলেই তাঁর ভাইদের মধ্যে তাঁর নির্বাচন যথার্থ ছিল।[৯৬]

প্রথম ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রি.)

খলিফা আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তাঁর চার পুত্র খলিফা হন। সেই জন্য তাঁকে রাজেন্দ্র বা 'Father of kings' বলা হয়।[৯৭] যদিও তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফতের উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর ভ্রাতা আবদুল আজিজ। খলিফা আবদুল মালিক নিজ পুত্র ওয়ালিদের পক্ষে তাঁর ভ্রাতাকে খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। কিন্তু আবদুল আজিজ ভ্রাতা কর্তৃক আরোপিত চাপে খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করেননি। আবদুল আজিজ ভ্রাতা আবদুল মালিকের পূর্বে মারা যাওয়ায় খলিফার উত্তরাধিকারী নির্বাচনে আর কোনো বাধা রইল না। খলিফা তখন নিজ পুত্রদের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করার সুযোগ লাভ করেন।[৯৮] আবদুল মালিক মৃত্যুকালে পিতার মনোনয়ন বাতিল করে নিজপুত্র আল ওয়ালিদ ও সুলাইমানকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে যান।[৯৯] সেই মনোনয়ন অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র প্রথম ওয়ালিদ বিনা বাধায় ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে (৮৬ হিজরী) দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলাইমান (৭১৫-৭১৭ খ্রি.)

খলিফা প্রথম ওয়ালিদ মৃত্যুর পূর্বে পিতার মনোনয়ন বাতিল করে ভ্রাতা সুলাইমানের পরিবর্তে নিজ পুত্রকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উমাইয়া বংশকে আসন্ন পতনের হাত থেকে রক্ষাকারী খলিফা ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় ভাইসরয় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ মতকে সমর্থন করেন। খলিফা অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দশ বৎসর কাল শাসন ও বিজয় অভিযানে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে খিলাফতের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা-দীক্ষা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

---

[৯৫] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১০; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৮, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৪
[৯৬] A.A. Dixon, *The Umayyad Caliphate*, London, 1971, pp. 17-18
[৯৭] J. Wellhausen, *op.cit* , p. 223
[৯৮] J. Wellhausen, *Ibid*, pp. 223-224
[৯৯] ইবনুল আছির, খণ্ড-৪, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১৩

ওয়ালিদের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই সুলায়মান ৯৬ হিজরি তথা ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১০০]

উমর বিন আবদুল আজিজ (৭১৭-৭২০ খ্রি.)

ন্যায়পরায়ণ খলিফা সুলায়মান জ্যেষ্ঠ পুত্র দাউদকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। কিন্তু সে পুত্র তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই মারা যাওয়ায় ক্ষমতার শেষ দিনগুলোতে উত্তরাধিকার মনোনয়ন নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর এক নাবালক পুত্রকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সভাসদবর্গের অনেকের সুপরামর্শ এবং তৎকালীন সময়ের একজন বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ও দরবেশ রাজা বিন হাওয়া কিন্দীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ধার্মিক, নিষ্ঠাবান, অনাড়ম্বর, শান্তিপ্রিয়, পূত-চরিত্র এবং প্রথম যুগের খলিফাগণের সম-শ্রেণির লোক চাচাতো ভাই উমর বিন আবদুল আজিজ ও তাঁর নিজ ভ্রাতা দ্বিতীয় ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনয়ন দান করেন।[১০১] স্বীয় ভাইদের পরিবর্তে উমর বিন আবদুল আজিজকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন সহজ হবে না ভেবে তিনি একখণ্ড কাগজের উপর উমরের নাম লিখে একটি খামে সিলগালা করে বন্দি করেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্য ও সমস্ত লোককে খামে নির্বাচিত ব্যক্তির প্রতি বায়'আত করতে আদেশ জারি করেন। সকল লোকজনই মনোনীত ব্যক্তির নাম না জেনে বিনা বাক্য ব্যয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিল। সুলায়মানের মৃত্যুর পর রাজা হাওয়া বিন কিন্দি সকল উমাইয়া সদস্যদেরকে জড়ো করেন এবং অপ্রকাশিত নামের প্রতি দ্বিতীয়বারের মতো আনুগত্যের শপথ করান। এরপর তিনি খলিফা হিসেবে উমর বিন আবদুল আজিজের নাম প্রকাশ করলে উপস্থিত সকলে নতুন খলিফার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ৯৯ হিজরির সফর মাসে (সেপ্টেম্বর, ৭১৭ খ্রি.) খলিফা সুলায়মানের মৃত্য হলে তদস্থলে উমর বিন আবদুল আজিজ খিলাফত লাভ করেন।[১০২]

দ্বিতীয় ইয়াজীদ (৭২০-৭২৪ খ্রি.)

উমর বিন আবদুল আজিজ পূর্ববর্তী খলিফা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী খলিফার ভাই (সুলায়মানের) ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিকের উত্তরাধিকার বহাল রাখেন। উল্লেখ্য যে, খলিফা সুলায়মান নিজ ভ্রাতা ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিককে উত্তরাধিকার হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজের খিলাফত সমাপ্তির পর। উমর বিন আবদুল আজিজ রাজক্ষমতা লাভ করে উত্তরাধিকারী নীতিতে কোনো ধরনের পরিবর্তন

[১০০] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit,* p. 294

[১০১] Anwar G. Chejne, *Succession to the Rule in Islam,* Lahore, 1960, pp. 32-33; Rafi Ahmad Fidai, Vol. II, *op.cit,* pp. 75-76 ; Maulana Muhammad Ali, *op.cit,* p. 91

[১০২] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৬, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫০-৫২; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৯, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৭-৩৮০; Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit,* pp. 296-97 ; মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৩৮

আনয়ন করেন নি।[১০৩] তিনি যখন আল কাশিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে দেখতেন, তখন তিনি বলতেন যদি মনোয়নের ব্যাপারে বংশানুক্রিক আদর্শের ব্যতিক্রম করে কাউকে খলিফা নির্বাচিত করতাম তাহলে তোমাকেই খলিফা নির্বাচিত করতাম। অবশ্য তিনি যদি বংশানুক্রমিক আদর্শের ব্যতিক্রম করে যোগ্য ব্যক্তিকে তার উত্তরাধিকার নির্বাচন করতেন, তবে তিনি তা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি প্রভাবশালী উমাইয়াদের ভয়ে ভীত ছিলেন।[১০৪] খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজের (দ্বিতীয় উমর) মৃত্যুর পর খলিফা আবদুল মালিকের তৃতীয় পুত্র দ্বিতীয় ইয়াজিদ ৭২০ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হিশাম (৭২৪-৭৪৩ খ্রি.)

ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিক বা দ্বিতীয় ইয়াজিদ উত্তরাধিকার মনোনয়নের ব্যাপারে বংশানুক্রমিক আদর্শ অনুসরণ করে নাবালক পুত্র দ্বিতীয় ওয়ালিদকে মনোনয়নদানের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এ মনোনয়নের চেষ্টা বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হতে থাকে। একজন বিখ্যাত জ্ঞানী আল যুহরীও দ্বিতীয় ওয়ালিদের মনোনয়নের বিরোধিতা করেছিলেন। পরে নিজ পুত্র দ্বিতীয় ওয়ালিদকে সরাসরি মনোনয়নদানে ব্যর্থ হয়ে প্রথম উত্তরাধিকারী হিসেবে ভ্রাতা হিশাম ও দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে এগার বৎসর বয়স্ক পুত্র দ্বিতীয় ওয়ালিদকে মনোনয়ন দান করেন।[১০৫] দ্বিতীয় ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হিশাম বিন আবদুল মালিক (আবদুল মালিকের চতুর্থ পুত্র) ৭২৪ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৭৪৪ খ্রি.)

উমাইয়া বংশের শেষ গৌরব হিশাম বিন মালিক ক্ষমতায় আরোহণ করে ৭২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বৎসর কাল যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে হিশাম নিজেও তাঁর পূর্বসূরী দ্বিতীয় ইয়াজিদের মনোনয়নে সন্তুষ্ট ছিলেন না বিধায় পূর্ববর্তী মনোনয়ন বাতিল করে নিজ পুত্র মাসলামাকে মনোনয়নদানের চেষ্টা করেন।[১০৬] উমাইয়াদের প্রবল বিরোধিতার মুখে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ফলে দ্বিতীয় ইয়াজিদের মনোনয়ন অনুযায়ী হিশাম বিন মালিকের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ওয়ালিদ ৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কের মসনদে আরোহণ করেন।

তৃতীয় ইয়াজিদ (৭৪৪ এপ্রিল-৭৪৪ সেপ্টেম্বর)

দ্বিতীয় ওয়ালিদের সময় উমাইয়া বংশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠলে তিনি প্রতিপক্ষের প্রায় সকল সদস্যকেই হত্যা করেন। তাঁর মদ্যপান, সঙ্গীত, ঘোড়দৌড়ে আসক্তি, অধার্মিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা,

---

[১০৩] William Muir, *op.cit,* p. 385
[১০৪] Ibn Khaldun, Tr. Franz Rosenthal, Vol. I, *op.cit,* p. 422
[১০৫] ইবনুল আছির, খণ্ড- ৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২; M.A. Shaban, *Islamic History AD 600-750,* Cambridge, 1971, p. 153
[১০৬] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৯

হেরেমপ্রিয়তা, শাসনকার্যে অযোগ্যতা, হীনচরিত্র ও নিষ্ঠুরতার তিনি দামেস্কের জনসাধারণের নিকট বিরাগভাজন হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর নাবালক দুই পুত্র আল-হাকাম ও উসমানকে মনোনয়ন দান করে আমির উমরাহদের সমর্থন হারালে খলিফা প্রথম ওয়ালিদের পুত্র তৃতীয় ইয়াজিদ জনগণের সমর্থন নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সসৈন্য দামেস্ক প্রবেশ করে দ্বিতীয় ওয়ালিদকে রাজধানীর উপকণ্ঠে এক দুর্গে অবরোধ করে এবং তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাঁর মস্তক দামেস্কে প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে জনসাধারণকে প্রদর্শনের জন্য উম্মুক্ত করা হয়।[১০৭] দ্বিতীয় ওয়ালিদ সৈন্যদের বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি করে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও তৃতীয় ইয়াজিদ সৈনিকদের বেতন-ভাতাদি হ্রাস করে 'আন-নাকিস' বা ব্যয় সংকোচনকারী উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ৬ মাস রাজত্ব করার পর অসুস্থ হয়ে ভ্রাতা ইবরাহিমকে মনোনয়ন দান করে পরলোকগমন করেন।

ইব্রাহিম (৭৪৪ সেপ্টেম্বর-৭৪৪ নভেম্বর)

তৃতীয় ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই ইব্রাহিম ক্ষমতায় আসেন কিন্তু সবাই তাকে আমিরুল মুমিনিন হিসেবে স্বীকার করে নেয়নি। কেউ তাকে খলিফা এবং কেউ তাকে আমির হিসেবে ডাকত।[১০৮] তিনি মাত্র দুই মাস রাজত্ব করার পর খলিফা প্রথম মারওয়ানের পৌত্র আরমেনিয়ার শাসনকর্তা দ্বিতীয় মারওয়ান সিংহাসনের দাবি নিয়ে সসৈন্যে রাজধানী অভিমুখে রওনা হলে খলিফা ইব্রাহিম ভীত হয়ে সরকারি ধনভাণ্ডার লুট করে দ্বিতীয় ওয়ালিদের মনোনীত দুই পুত্র আল-হাকাম ও উসমানকে হত্যা করে রাজধানী দামেস্ক হতে পলায়ন করেন।[১০৯]

দ্বিতীয় মারওয়ান (৭৪৪-৭৫০ খ্রি.)

মুদার হিমার দ্বন্দ্ব, উমাইয়াদের বিরুদ্ধে শিয়াদের উমাইয়াবিরোধী প্রচারণা, খারিজি বিদ্রোহ ও আব্বাসীয় আন্দোলন যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে ঠিক তখনিই আর্মেনিয়ার গভর্নর মারওয়ান বিন মুহাম্মদ দামেস্কের খিলাফতে ইব্রাহিমকে হটিয়ে ৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করে মাত্র ৫ বৎসর ১০ মাস ক্ষমতায় টিকে থাকতে পেরেছিলেন। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জাবের যুদ্ধে খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান আব্বাসীয়দের হাতে পরাজিত হয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

উমাইয়া খিলাফতের খলিফা নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- উমাইয়া খিলাফতের খলিফা নির্বাচনের প্রধান এবং প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল খলিফা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মনোনয়নদান প্রথা।

---

[১০৭] J. Wellhausen, *op.cit*, pp. 482-85
[১০৮] William Muir, *op.cit*, p. 418
[১০৯] William Muir, *Ibid*, p. 419

- মনোনয়নদান প্রথাটি সাসানী ও রোমান সম্রাটদের প্রায় অনুরূপ ছিল।
- উমাইয়ারা হাশেমী ও শিয়াদের রাজকার্য হতে বিতাড়িত করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়া সবসময় কর্তৃত্বধীন শাসক কর্তৃক মনোনীত হতো।
- খলিফা নির্বাচনে নিজ ভ্রাতা পরবর্তী উত্তরাধিকারী হলেও যিনি খলিফা থাকতেন তিনি তার ভাইকে বঞ্চিত করে নিজ পুত্রদেরকে/পুত্রকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচিত করতেন।
- ৭ম উমাইয়া খলিফা সুলায়মান ক্ষমতায় এসে বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ রাজা হাওয়া বিন কিন্দি-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পূববর্তী খলিফাদের মনোনয়নদান নীতি ত্যাগ করে নতুন পদ্ধতি চালু করেন। তিনি নিজের সন্তানকে মনোনয়ন না দিয়ে তিনি তার চাচাতো ভাই উমর বিন আবদুল আজিজকে প্রথম উত্তরাধিকার এবং তার ভাই ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিককে দ্বিতীয় উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।
- খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ খিলাফতে আরোহণ করে পূর্ব নির্ধারিত উত্তরাধিকারীর কোনো পরিবর্তন ঘটাননি এবং তিনি নিজেও কোনো দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেননি। তবে তিনি যখন আল কাশিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে দেখতেন, তখন তিনি বলতেন উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার সত্যিকার অর্থে ক্ষমতা যদি আমার হাতে থাকতো, তাহলে আমি তোমাকে খলিফা নির্বাচন করতাম। এতে এটা প্রমাণিত যে, তিনি বাকি উমাইয়াদের ভয়ে ভীত ছিলেন।
- উমাইয়া আমলে এমন খলিফাও দেখা যায়, যিনি পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে কাউকে নির্বাচিত করে যাননি অথবা যাওয়ার সুযোগও পাননি। সে সময় লক্ষ্য করা যায় যে, শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমেও ক্ষমতা দখলের যা খলিফা নির্বাচনের একটি স্বীকৃত পদ্ধতি।
- খলিফা সুলায়মানের পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফারা খলিফা নির্বাচন ও মনোনয়নের কোনো সুনির্দিষ্ট পন্থা ও পদ্ধতির অনুসরণ করতে না পারায় উমাইয়া শাসকদের মধ্যে মনোনয়ন নিয়ে দ্বিধাবিভক্তি এবং রাজনৈতিক দলীয়করণের সৃষ্টি করেছিল যা রাজবংশটির পতনের পথ ত্বরান্বিত করে।
- খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে যোগ্য, বিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে মজলিসে-শূরার সদস্য নির্বাচিত করা হতো। কিন্তু উমাইয়া শাসনামলে নিজ দল ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে হতে মজলিসে-শূরার সদস্য নির্বাচন করা হতো।
- বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের প্রভাবে অনেক উত্তরাধিকারীকে নিহত হতে হয়। সে ক্ষেত্রে অনেক সময় দুর্বল উত্তরাধিকারী ক্ষমতায় চলে আসে।
- শুধুমাত্র দুর্বল উত্তরাধিকার নির্বাচনের কারণেই উমাইয়া শাসন অবসানের একমাত্র কারণ ছিল না। উমাইয়াদের পতনের মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক।

আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)

উমাইয়াদের কাছ থেকে আব্বাসীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। উমাইয়া বংশের পতনের পর আব্বাসীয় বংশের শাসনক্ষমতায় আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে কেবল শাসক বংশেরই পরিবর্তন ঘটেনি, ইহার ফলে শাসন নীতিরও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আব্বাসীয়দের ক্ষমতায় আরোহণ এবং তাদের দ্বারা উমাইয়াদের উৎখাত কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সমন্বয়।[১১০] যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল উমাইয়া বিরোধী প্রচারণা যা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পরিবারকে প্রকৃত ক্ষমতার দাবিদার হিসেবে তুলে ধরতে শুরু করে। এই প্রচারণা প্রকৃতপক্ষে কোনো আন্দোলন ছিল না। সকল উমাইয়া বিরোধী উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।[১১১] আব্বাসী আন্দোলন ছিল অনেক বেশি সুসংহত। সুদক্ষ যোদ্ধা, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ এবং অভিজ্ঞ সংগঠক আবু মুসলিম[১১২] খোরাসান হতে প্রচারণা শুরু করেন উমাইয়াগণকে উৎখাত করে আহল-ই- রাসূল তথা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পরিজনকে ক্ষমতাসীন করতে হবে। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পরিজন বলতে হযরত আলী (রা.) এর বংশধরগণকে খিলাফতের প্রকৃত দাবিদার হিসেবে মনে করা হতো। সে সময় আবু মুসলিম স্বীয় বাহিনীর জন্য কালো রংয়ের পোশাক নির্ধারণ করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে লোকেরা ধারণা করেছিল যে, আলী বংশীয় মজলুম নিহত জায়েদ ও তৎপুত্র ইয়াহিয়ার প্রতি শোক জ্ঞাপন এবং তাদের হত্যার প্রতিশোধের জন্য এরকম পোশাক ধারণ করা হয়েছে। এরূপ ধারণার কারণে জনগণ আবু মুসলিমকে সাহায্য করে। আব্বাসীয় খিলাফত অনেকগুলো আন্দোলনের ফল। তবে আন্দোলনটি শুরু হয় খোরাসানে, আর জাব যুদ্ধে উমাইয়া বংশের পতনের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে।

---

১১০ Dr. Ghulam Nabi, *op.cit*, p. 78

১১১ Dr. Ghulam Nabi, *Ibid*, p. 78

১১২ আবু মুসলিম খোরাসানি আরব বংশোদ্ভূত একজন ইস্পাহানবাসী। চমৎকার বক্তৃতার মাধ্যমে শত্রুগণকেও মিত্রে পরিণত করতেন। তাঁর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে খারিজি, মাওয়ালীসহ বিভিন্ন দলের লোক মান-অভিমান ও সকল পার্থক্য ভুলে গিয়ে দলে দলে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়। আবু মুসলিম সুদক্ষ যোদ্ধা, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ও অভিজ্ঞ সংগঠক ছিলেন। ভাগ্য বিপর্যয়ে তিনি কখনও ঘাবড়ে যেতেন না এবং রাগান্বিত হলে তিনি রাগকে সবসময় দমন করতেন। রাগের বহি:প্রকাশ তার মধ্যে লক্ষ্য করা যেত না। সৈন্যদল গঠন ও শাসনকার্য পরিচালনায় তার অপরিসীম দক্ষতা ছিল। খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের শাসনকালে মুহম্মাদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইব্রাহিম আব্বাসীয়দের ইমাম নিযুক্ত হলে তিনি আবু মুসলিমকে খোরাসানে আব্বাসীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। খোরাসানে আবু মুসলিম আব্বাসীয়গণের কালো পতাকা ৭৪৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে উত্তোলন করেন এবং খোরাসান ও ফারগানা আবু মুসলিমের হস্তগত হয়। খোরাসানের পতনের পর খলিফা মারওয়ান আব্বাসীয় আন্দোলনের পর বিচলিত হয়ে গুপ্তচর মারফত জানতে পারেন ইবরাহিম আবু মুসলিমকে এরূপ কার্যে নিয়োগ প্রদান করেছেন। মারওয়ান এ কারণে ইবরাহিমকে বন্দি ও হত্যা করেন। আবু মুসলিমের সুযোগ্য নেতৃত্বে উমাইয়া বংশের পতন ঘটিয়ে আব্বাসীযগণকে সিংহাসনে স্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছিল। একথা অধিক প্রচলিত আছে যে, উমাইয়াগণকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে তাঁকে প্রায় ছয় লক্ষ উমাইয়ার প্রাণনাশ করতে হযেছিল। আবুল আব্বাস আস্-সাফ্ফাহ ক্ষমতায় আরোহণের পর আবু মুসলিমকে খোরাসানের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। আবুল আব্বাস আস্-সাফ্ফাহ মৃত্যুর পূর্বে আবু জাফরকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী করলে আবু জাফরের চাচা সিরিয়ার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ বিন আলী বিদ্রোহ ঘোষণা করলে আবু মুসলিম নাসিবিনের যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেন। পরবর্তীতে খলিফা আবু জাফর আল-মানসূর নিজের রাজত্বকালকে কণ্ঠকমুক্ত করার লক্ষ্যে আবু মুসলিমকে ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করান। বিস্তারিত দেখুন, Rafi Ahmad Fidai, Vol. II, *op.cit*, pp. 128-134

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর চাচা আল আব্বাসের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ আবুল আব্বাস ৭৪৯ সালের ২৫ নভেম্বর কুফার জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের প্রেক্ষিতে বিখ্যাত আব্বাসী বংশের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি ইমাম উপাধি গ্রহণ না করে কেবল আমিরুল মুমিনিন পদে অভিষিক্ত হন।[১১৩]

৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি আব্বাসীয়গণ জাবের যুদ্ধে উমাইয়া বংশের সর্বশেষ শাসক খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত ও নিহত করে খিলাফত দখল করেন যা ইতিহাসে আব্বাসীয় খিলাফত নামে পরিচিত। দ্বিতীয় মারওয়ান জাব নদীর পশ্চিম প্রান্তরে ১২০০০০ সৈন্য সমাবেশ করে তাঁর শেষ শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করে পরাজয় বরণ করায় উমাইয়া আধিপত্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়।[১১৪]

আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ আস্-সাফ্ফাহ (৭৫০-৭৫৪ খ্রি.)

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জাবের যুদ্ধে উমাইয়াদের পতনের পর আব্বাসীয় পরিবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের অনুসারী দ্বারা আবুল আব্বাস খলিফা নির্বাচিত হলে কুফার মসজিদে জনসাধারণ তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তিনি খিলাফতে আরোহণ করেই আস-সাফফাহ[১১৫] উপাধি গ্রহণ করেন। আর এই 'আস-সাফ্ফাই্'-ই ইসলাম ধর্মের আরবীয় বংশধরদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নিজের বংশের সুরক্ষার জন্য উমাইয়া বংশকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে স্ব স্ব প্রদেশের উমাইয়াদিগকে পাইকারি হারে হত্যার আদেশ দেন এবং নিজেও বহুসংখ্যক উমাইয়া অভিজাত আমিরগণকে নিধন করেন।[১১৬] তাঁর এই নৃশংস হত্যা ও রক্তপাত উমাইয়া বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উমাইয়া বংশের লোকজন ব্যতীত আর কেউ নৃশংস হত্যা ও রক্তপাতের মুখোমুখি হন নি। এরূপ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ফলে দামেস্ক, হিম্স্, কিন্নিসিরিন, ফিলিস্তিন এবং মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি প্রদেশে বিদ্রোহ শুরু হয়। খলিফা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ সকল বিদ্রোহ দমন করেন। খিলাফতের দায়িত্বভার কুফায় গ্রহণ করবার পরও আস্-সাফ্ফাহ আলীপন্থিদের প্রভাবিত কুফায় নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা করে এবং চঞ্চলমতি ইরাকবাসীদের মধ্যে কুফায় অবস্থান করা নিরাপদ হবে না ভেবে

---

[১১৩] M.AShaban, *op.cit*, p.7-8

[১১৪] Syed Ameer Ali, *op.cit*, pp. 180-181

[১১৫] আস্-সাফ্ফাহ শব্দের অর্থ "রক্ত পিপাসু"। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আবুল আব্বাস কুফার মসজিদে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করলে জনসাধারণ তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। খিলাফত প্রাপ্তির পর তিনি উমাইয়া নিধনে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালান। উমাইয়া পরিবারের সকল লোককে তিনি ধরাপৃষ্ঠ হতে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে প্যালেস্টাইনের আবু ফ্রুটস নামক স্থানে ৮০ জন উমাইয়াকে আমন্ত্রণ করে অত্যন্ত নির্দয়, নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে হত্যা করেন। তিনি শুধু জীবিত উমাইয়াদেকেই হত্যা করেননি বরং তাঁর নির্দেশে মৃত উমাইয়াদের কবর খনন করে তাঁদের দেহের ধ্বংসাবশেষ কবর থেকে উত্তোলন করে পুড়ানো হয়। শুধুমাত্র উমাইয়াগণই নন তাঁর শত্রুদের তিনি বেপরোয়াভাবে হত্যা করেন এবং এইজন্য 'আস্-সাফ্ফাহ' বা 'রক্তপিপাসু' উপাধি গ্রহণ করেন। আস্-সাফ্ফাই ইসলাম ধর্মের আরবীয় বংশধরদের সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বিস্তারিত দেখুন, Rafi Ahmad Fidai, Vol.3, *op.cit*, pp. 4-5; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১২-১৩; মুসা আনসারী, *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, চয়নিকা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ.৩৫-৩৬; শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১০০

[১১৬] শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১০০

তিনি ফুরাত নদীর তীরবর্তী আল-আনবার নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্তন করে সেখানে ‘আল-হাশেমিয়া’ নামে একটি রাজকীয় আবাসস্থল নির্মাণ করেন।[১১৭] তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। অত্যন্ত সাবধানতার সাথে তিনি তাঁর আত্মীয়দের এবং যে সকল লোক তাঁর জন্য নিবেদিতভাবে কাজ করেছিলেন তাদেরকে নিয়োগ প্রদান করতেন। খলিফা ভ্রাতা আবু জাফরকে মেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানেঃ পিতৃব্য দাউদ ইবনে আলীকে হিজাজ, ইয়েমেন এবং ইয়ামামারঃ আবদুল্লাহ বিন আলীকে সিরিয়ার, সুলাইমান বিন আলীকে বসরার, আবু মুসলিমকে খোরাসানের এবং আবু আয়ূনকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।[১১৮] এভাবে আস-সাফ্‌ফাহ সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেন। প্রথম আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ প্রায় চার বৎসর তিন মাস রাজত্ব করার পর ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে হীরার অনতিদূরে আনবারে হাশেমিয়া প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে পুত্র মুহাম্মদ ও কন্যা রাইতাকে রেখে ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ভ্রাতা আবু জাফরকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসা-বিন-মুসাকে তৎপরবর্তী ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দান করে যান।[১১৯] আব্বাসী আন্দোলনের প্রকৃত কর্ণধার এবং যাদের বাহুবলে উমাইয়া বংশ ধ্বংস হয়েছিল সেই দুই সেনাপতি বীরবর আবদুল্লাহ[১২০] নিজেই খলিফা পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন আর আবু মুসলিম খোরাসানি আবু জাফরের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এই মনোনয়নে আপত্তি করেন।

আবু জাফর আবদুল্লাহ আল মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)

৭৫৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে আবুল আব্বাস আস্-সাফ্‌ফাহর মৃত্যুকালে তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠভ্রাতা আবু জাফর হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় থাকায় তাঁর অনুপস্থিতিতে স্থলবর্তী হিসাবে ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসা-বিন-মুসার প্রতি জনসাধারণের নিকট হতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা হয়। সাফ্‌ফাহর মৃত্যু সংবাদ শুনামাত্র আবু জাফর দ্রুতগতিতে কুফায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং আনবার-এর হাশেমিয়া প্রাসাদে ‘আল-মানসূর’ (বিজয়ী) উপাধি

[১১৭] S. A. Q. Husaini, *Arab Administration*, M. Abdur Rahman, Madras, 1949, p. 206

[১১৮] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 211

[১১৯] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭০; Al-Haj Mahomed Ullah, *op.cit*, p. 37; Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Cambridge at the University Press, London, 1969, p. 282

[১২০] আবদুল্লাহ বিন আলী খলিফা আবুল আব্বাসের চাচা ছিলেন। আবুল আব্বাস কুফায় খলিফা ঘোষিত হবার পর জানতে পারেন যে, উমাইয়া খলিফা মারওয়ান তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। তখন তিনি স্বীয় চাচা আবদুল্লাহকে মারওয়ানের বিরুদ্ধে সৈন্যসহ প্রেরণ করলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারওয়ান মিসর অভিমুখে রওয়ানা হলেন। আবদুল্লাহ দামেস্ক নগরী দখল করেন। আবদুল্লাহ সেনাপতি আমেরকে মারওয়ানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলে যুদ্ধে মারওয়ান পরাজয় বরণ করেন এবং নিহত হলে আবুল আব্বাস আস্-সাফ্‌ফাহ নিজেকে মুসলিম জগতের আমিরুল মুমেনিন বলে ঘোষণা করেন। আবুল আব্বাস আস্-সাফ্‌ফাহ এর মৃত্যুর পর আবু জাফর আল-মানসূর খিলাফতে আসীন হলে আবদুল্লাহ বিন আলী বিদ্রোহ ঘোষণা করলে খলিফা আবু জাফর আবু মুসলিমকে তাঁর চাচা আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে প্রেরণ করলে আবু মুসলিম নাসিবিনের যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করলে তিনি তাঁর ভ্রাতা সুলায়মানের নিকট পলায়ন করেন। পরবর্তীতে খলিফা সুলায়মানের পদচ্যুতি পর্যন্ত তিনি তাঁর ভাইয়ের নিকট লুকায়িত ছিলেন। পরে খলিফা মানসুর হাশিমিয়ার অনতিদূরে একটি দুর্গে তাকে অবরুদ্ধ করেন। সেখানে প্রায় সাত বছর যাবত তিনি বন্দি অবস্থায় দিনাতিপাত করেন। খলিফা পরবর্তীতে তাঁর জন্য জলপরিবৃত ও লবণের ভিত্তির উপর একটি গৃহনির্মাণ করেন এবং মহাসমারোহে সেখানে নিয়ে যান। পরবর্তীতে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে লবণের ঘর ধ্বসে তাঁর মৃত্যু হয়। বিস্তারিত দেখুন, William Muir, *op.cit*, pp. 428-449

ধারণ করে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১২১] ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে 'আব্বাসীয় আন্দোলন' নামে পরিচিত একটি গণআন্দোলনের মাধ্যমে উমাইয়াদের পতন ঘটিয়ে আস্-সাফ্ফাহ আব্বাসী বংশের প্রথম খলিফা হলেও সময়ের অভাবে এ বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও আবু জাফর আল-মানসুর দীর্ঘ ২২ বছর রাজত্বকালে তাঁর অদম্য সাহস, রাজ্য সম্প্রসারণে বিশ্বজয়ের নীতি পরিত্যাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম, আচার-ব্যবহার ও জীবনযাপনে আদর্শস্থানীয়, দূরদর্শিতা ও কূটনীতির বলে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর সকল আক্রমণ হতে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে এই রাজবংশের প্রকৃত স্থপয়িতা হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক আমির আলীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,–

> Although Saffah is the first sovereign of the Banu Abbas, Abu Jafar must be regarded as the real founder of the dynasty. The permanence of the family, the power they wielded, and the influence they exercised, even after they had lost their temporal sovereignty, were due to his foresight.[122]

তাছাড়া তিনিই আব্বাসীয় শাসনতন্ত্রকে পরিপূর্ণ রূপ দান করেন। তাঁর দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার ফলে এ বংশের ৩৫ জন খলিফাই তাঁর বংশধর ছিলেন এবং পাঁচ শতাব্দী ধরে মুসলিম জগতের খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। ঐতিহাসিক পি.কে. হিট্টি বলেন–

> Austere in nature and stern in manner, he stands in marked contrast to the type represented by his successors. But his policies continued for many generations to guide those who came after him just as those of Muawiyah had guided the Umayyads.[123]

আল-মানসুর যখন কুফায় আমিরুল মুমিনিন বলে ঘোষিত হলেন, তখন তাঁর পিতৃব্য সিরিয়ার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে আলী বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। খলিফা আবদুল্লাহর বিদ্রোহ দমনের জন্য আবু মুসলিমকে প্রেরণ করেন। ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সতের হাজার সুশিক্ষিত বাহিনী নিয়ে নাসিবিন নামক স্থানে এক তুমুল যুদ্ধে আবু মুসলিম আবদুল্লাহকে পরাজিত করেন। আবদুল্লাহ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁর ভ্রাতা বসরার গভর্নর সুলাইমান ইবনে আলীর নিকট পরিবারবর্গসহ পলায়ন করেন। সেখানে তিনি তাঁর ভ্রাতার পদচ্যুতির সময় পর্যন্ত লুকায়িত ছিলেন। জাব নদীর যুদ্ধে উমাইয়াদের উপর বিজয়ী সেনাপতি আবদুল্লাহকে আল-মানসুর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়সহ হাশিমিয়ার[১২৪] অনতিদূরে একটি দূর্গে কারারুদ্ধ করেন। সাত বছর বন্দি

---

[১২১] William Muir, *Ibid*, p. 448
[১২২] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 212
[১২৩] Philip K Hitti, *op.cit*, p. 295

[১২৪] আবুল আব্বাস আস্-সাফ্ফাহ কুফার মসজিদে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা বলে ঘোষিত হলে জনসাধারণ তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু কুফার অধিবাসীগণ হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থক হওয়ায় খলিফা আলী বংশের সমর্থক ও চঞ্চলমতি ইরাকবাসীদের মধ্যে কুফায় অবস্থান করা

জীবনযাপনের পর তাঁকে মহাসমারোহে একটি জলপরিবৃত ও লবণের ভিত্তির উপর নির্মিত একটি গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীকালে একদা প্রবল বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে লবণের ঘর ধসে পড়ে এবং ধবংসস্তূপের নিচে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।[১২৫]

আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর খলিফা আল-মানসুর খোরাসানের শাসনকর্তা আবু মুসলিমের দিকে নজর দিলেন। খোরাসানে আবু মুসলিমের প্রতিপত্তি ছিল অসীম এবং একদল লোক তাঁকে নবির মর্যাদা দান করে। আবু মুসলিমের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা, রণকৌশল, দৃঢ়তা, জনপ্রিয়তা, দাম্ভিকতা ও প্রতিপত্তি দেখে আল-মানসুর তাঁকে ভবিষ্যতের বিপদ ভেবে দরবারে ডেকে তাঁকে প্রকাশ্য হত্যা করান।[১২৬] অথচ এ খোরাসানি নেতাই আবদুল্লাহর পর আব্বাসীয় খিলাফতের রক্ষাকর্তা হয়েছিলেন। আবু মুসলিমের জীবিত থাকাকালীন সময় পর্যন্ত আল-মানসূর নিজেকে সিংহাসনে নিরাপদ মনে করেন নাই। আবু মুসলিমের মৃত্যুর পর আল-মানসুর নিজেকে প্রকৃত খলিফা বলে মনে করলেন।

আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠার পথে বড় দুটি বাধা অপসারিত হওয়ার পর আল-মানসুর খিলাফতের সম্ভাব্য দাবিদার ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে আলী ও ফাতেমার বংশধরগণের ধ্বংস সাধন করতে বদ্ধপরিকর হন। অথচ আব্বাসী বংশের উত্থানের সময় আব্বাসী বংশের নেতৃত্বে উমাইয়া বিরোধী আন্দোলনে আলী ও ফাতেমার বংশধরগণ সক্রিয় সহযোগিতায় আন্দোলনটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ সময় আলী ও ফাতেমার বংশধরগণ যদি আব্বাসীয় আন্দোলনে যোগদান না করতেন তাহলে হয়তবা আব্বাসীয় আন্দোলন জনসমর্থন লাভ করতে পারতো না এবং উমাইয়াদের পতন ঘটাতে হয়তবা সম্ভবপর হতো না। এই প্রচারণার সময় আহলে বায়'আতের মধ্য হতে ইমাম/আমিরুল মোমেনিন হওয়ার সম্ভাব্যতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হলে শেষ পর্যন্ত আব্বাসী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাসীয়গণ ক্ষমতায় আরোহণ করলে আলী ও ফাতেমার বংশধরগণের প্রতি ষড়যন্ত্র শুরু করলে তারা রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করে। তারা অতি সাধারণ জীবনযাপন শুরু করে এবং সাহিত্য ও দর্শনের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময় মুহাম্মদ ও ইবরাহিম নামক আলী বংশের দুই ভ্রাতা জ্ঞান, ধর্মভীরুতা, মহান ও পবিত্র চরিত্র, উচ্চ পর্যায়ের গুণাবলির জন্য খুব সুনাম অর্জন করেন। আল হাসানের নাতির ছেলে মুহাম্মদের পদবি ছিল আল-নাফস আল-যাকিয়া (পবিত্র আত্মা)।[১২৭] আলীপন্থিদের কাছে আব্বাসীয় খলিফারা জবরদখলকারী এবং তারা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, আব্বাসীয়গণ নিজেদের বংশে

নিরাপদ হবে না মনে করে তিনি হীরার অনতিদূরে ফুরাত নদীর তীরবর্তী কুফা ও বাগদাদের মধ্যখানে একটি নগর নির্মাণ করে এর নাম দেন "আল-হাশেমিয়া"। এটি মূলত: একটি রাজকীয় আবাসস্থল। অবশ্য আল হাশেমিয়া বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট জনপদ বা স্থানকে বুঝায় না। আব্বাসীয়রা তাদের বসবাসের জন্য যেখানেই আবাস স্থাপন করতেন তাকেই আল হাশেমিয়া বলা হতো। বিস্তারিত দেখুন, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৩২-৫৩৩

[১২৫] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 214

[১২৬] M. A. Shaban, *op.cit*, p.7-8

[১২৭] শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১০১

খিলাফত স্থায়ী করে নিয়েছে আহলে বায়'আতের নামে প্রচারণা চালিয়ে, যা মেনে নেওয়া যায় না। তারা মনে করতেন, প্রকৃত খলিফা হচ্ছেন ইমাম। আর ইমাম হবেন আলী ও ফাতেমার বংশধরগণের মধ্যে থেকে। এ কারণে আব্বাসীয়রা আলী ও ফাতেমার বংশধরগণের বিদ্রোহ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য আলী বংশের গতিবিধির উপর নজরদারি শুরু করলেন। আলীর বংশধরদের প্রতি জনসাধারণের অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির জন্য খলিফা বিচলিত হয়ে মুহাম্মদ ও ইবরাহিম নামক আলী বংশীয়দের দুই ভ্রাতাকে আবু মুসলিম ও আবদুল্লাহর মতো মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করলে পবিত্রাত্মা মুহাম্মদ মদিনায় এবং ইবরাহিম আহ্ওয়াজ ও বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মুহাম্মদ ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে এবং ইবরাহিম ৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ করে নিহত হন।[১২৮] খলিফা আলীর বংশধরগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করে আলী বংশীয় আন্দোলনকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে সম্ভাব্য সকল বিদ্রোহীগণকে খলিফা নিষ্ঠুরভাবে নির্মূল করে আব্বাসীয় বংশের পরবর্তী উত্তরাধিকারের সকল পথ কণ্টকমুক্ত করেন।

আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস আস্-সাফ্ফাহ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পরবর্তীতে প্রথমে ভ্রাতা আবু জাফর এবং আবু জাফরের পরে ভ্রাতষ্পুত্র ঈসা-বিন-মুসাকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।[১২৯] আবু জাফর আল-মানসুর খিলাফত লাভ করার পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসাকে খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করার জন্য বল প্রয়োগ করেন। বল প্রয়োগের মাধ্যমে ঈসাকে তাঁর দাবি মূলতবি রাখতে বাধ্য করা হলো। তারপর আল-মানসুর তাঁর পুত্র মুহম্মদকে খিলাফতের একাদশ বর্ষে 'আল-মাহদী' উপাধি দান করে খলিফা হিসেবে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।[১৩০]

মুহাম্মদ আল্-মাহ্দী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.)

খলিফা আল-মানসুর ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত হলে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ আল্-মাহ্দী ৩২ বৎসর বয়সে নির্বিঘ্নে বাগদাদের সিংহাসনে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। এই মনোনয়ন জনগণের মনোপুত হওয়ায় তারা যথাযথভাবে তাঁর প্রতি বশ্যতার শপথ গ্রহণ করেন। মাতা উম্মে সালমার দিক থেকে তিনি ইয়েমেনের প্রাচীন হিমারীয় রাজবংশোদ্ভূত ছিলেন।[১৩১] আস্-সাফ্ফাহর কন্যা রাইতার সাথে তাঁর প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়। পরে তিনি বার্বার তরুণী খায়জুরানের রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পাণি গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ আল্-মাহ্দী সিংহাসন লাভ করলে মহিষী খায়জুরান দরবারে প্রধান মহিষী ও বিশেষ প্রতিপত্তির অধিকারিণী হন। মাহ্দীর রাজমহিষী খায়জুরান শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ানের বিধবাপত্নী মাজুনার স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপনের জন্য রাজপ্রাসাদে

---

[১২৮] শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১০১-১০২

[১২৯] William Muir, *op.cit,* p. 449

[১৩০] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৮, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮-১১০; Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit,* p. 342

[১৩১] Syed Ameer Ali, *op.cit,* p. 229; Carl Brockelmann, *History of the Islamic peoples,* Routledge & Kegan Paul Limited, London, 1949, p. 112

একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে দেন। রাজপরিবারের সবাই তাঁর প্রতি সম্মানসূচক ও সৌজন্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করতেন।[১৩২] খলিফার শাসনামলে তাঁর স্ত্রী খায়জুরান রাজনৈতিক ব্যাপারে এতে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, খলিফা কঠিন সমস্যাবলির মীমাংসা তাঁর মতামত ছাড়া গ্রহণ করতেন না। খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসা-বিন-মুসার স্থলে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ আল্-মাহ্দীকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী হিসেবে নিয়োগ করায় ঈসা-বিন-মুসা মাহ্দীর পর খিলাফতের দাবিদার হন। অসাধারণ বুদ্ধিমতী মহিলা খায়জুরান আপন পুত্রদের অনুকূলে ঈসা-বিন-মুসাকে খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করতে বিশেষ চাপ প্রয়োগ করেন।[১৩৩] খলিফা তাঁর স্ত্রীর পরামর্শক্রমে লোক লাগিয়ে ঈসা-বিন-মুসাকে খিলাফত হতে তাঁর দাবি প্রত্যাহার করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। ঈসা-বিন-মুসা কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিলেন না। নগদ দশ লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে ঈসা-বিন-মুসাকে খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করাতে সক্ষম হন। খিলাফতের দাবি যে প্রত্যাহার করা হয়েছে সেজন্য তিনি ৪৩০ জন সাক্ষী রাখেন। অতঃপর মাহ্দী খায়জুরানের গর্ভজাত তাঁর দুই পুত্র হাদী এবং হারুনকে খিলাফতের পর পর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁহাদের প্রতি আনুগত্যের শপথও গ্রহণ করা হয়। হারুন পিতা ও মাতার এতে প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, জীবনের শেষ দিকে মাহ্দী তাঁর প্রথম পুত্র হাদীর মনোনয়ন বাতিল করে হারুনকেই উত্তরাধিকার মনোনয়ন করার কথা মনস্থ করেছিলেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তে সম্রাজ্ঞী খায়জুরানেরও পূর্ণ সম্মতি ছিল। কিন্তু খলিফার মৃত্যুতে খিলাফতে হাদীর উত্তরাধিকার অপরিবর্তিত থেকে যায়।

মুসা আল-হাদী (৭৮৫-৭৮৬ খ্রি.)

প্রায় ১১ বৎসর রাজত্ব করার পর ৪৩ বৎসর বয়সে খলিফা মুহাম্মদ আল্-মাহ্দী ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৩রা আগস্ট জুরজানের মাসান্দান নামক স্থানে হরিণ শিকার করবার সময় হঠাৎ একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদের দ্বারে আঘাত পেয়ে পাঁজরা ভেঙ্গে ফেলেন এবং তীব্র ব্যথা-যন্ত্রণা সহ্য করে ঐ দিনই মৃত্যুবরণ করেন। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে মুসা আল-হাদী ২৪ বৎসর বয়সে ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব মনোনয়ন অনুসারে পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তাঁর প্রকৃত নাম মুসা এবং উপাধি ছিল আল্-হাদী (পথপ্রদর্শক)। আব্বাসীয় বংশের উত্তরাধিকার নীতি এবং মৃত খলিফার অনুজ্ঞা অনুসারে হারুন তাঁর ভ্রাতা মুসা আল্-হাদীকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন এবং স্বয়ং সর্বপ্রথম আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তিনি হাদীর নিকট রাজকীয় সিলমোহর এবং পয়গম্বরের যষ্ঠি ও জামা প্রেরণ করেন। লক্ষ্য করা যায় যে, সেই সময় আব্বাসীয় খিলাফতে সৈন্যবাহিনীও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতো। রাজকার্যে তারা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতো। হাদীর সিংহাসনে আরোহণের সময় সেনাবাহিনীর মাঝে বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায় এবং হাদীর সিংহাসন আরোহণকে

[১৩২] M.AShaban, *op.cit*, p.21
[১৩৩] Carl Brockelmann, *op.cit* , p. 114

কেন্দ্র করে পুরস্কারস্বরূপ তারা অর্থ দাবি করে। পরবর্তীতে মাতা খায়জুরান ও ভ্রাতা হারুনের চেষ্টার ফলে সেনাবাহিনীর গোলযোগ বন্ধ হয়।[১৩৪] হারুন ভ্রাতার আনুগত্য স্বীকার করলে হাদী তাঁর ভ্রাতার আনুগত্যের মর্যাদা দেননি বরং তাঁর স্বল্পকাল স্থায়ী রাজত্বের মধ্যে হারুনের উত্তরাধিকার পরিবর্তন করে পুত্র জাফরকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতে প্রয়াসী হলেন। এ উদ্দেশ্য হাদী হারুনের গৃহশিক্ষক ও প্রধান উপদেষ্টা ইয়াহিয়া-বিন-খালিদ বার্মেকী ও তাঁর ভ্রাতার অন্যান্য কর্মচারীকে কারারুদ্ধ করেন।[১৩৫] এ প্রসঙ্গ নিয়ে হাদী ও তাঁর মাতা খায়জুরানের মধ্যেও মনোমালিন্য হয়। কারণ খায়জুরান রাজনৈতিক বিষয়াদিতে হারুনকে সাহায্য করতেন। এছাড়াও তাঁর মাতা রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে তাঁর স্বামীর রাজত্বকালের সময় যেভাবে প্রভাব বিস্তার করতেন ঠিক সেভাবে তাঁর পুত্র হাদীর রাজত্বকালে প্রভাব বিস্তার করতে চাইলে হাদী সাম্রাজ্যের নীতি-নির্ধারণে মাতার এ সকল কার্যকলাপ পছন্দ করেননি বরং মাতার সকল প্রকার প্রভাব খর্ব করেন। ফলে রাজদরবারে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। একদল খলিফা মুসা আল্-হাদীর এবং অন্যদল হারুন ও রাজমাতার পক্ষ অবলম্বন করে। হারুন তাঁর ভ্রাতার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে স্বীয় নিরাপত্তার জন্য রাজদরবার ত্যাগ করেন।[১৩৬] ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ হতে একদিনের ভ্রমণপথ ঈসাবাদ নামক স্থানে ভ্রমণ করতে গিয়ে হাদী এক দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হন। অন্তিম সময় সন্নিকটে জেনে তিনি কৃত অপরাধের জন্য মায়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং পরবর্তী উত্তরাধিকারী হারুনই হবে এ নির্দেশনা দিয়ে যান।[১৩৭]

হারুন-অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)

দুই বৎসরেরও কম সময় মুসা আল্-হাদী শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। হঠাৎ পীড়িত হয়ে হাদী ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে রাজধানীর বাইরে আত্মগোপনে অবস্থান করা হাদীর ভ্রাতা হারুন মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দ্রুত দরবারে উপস্থিত হয়ে ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করে ২২ বৎসর বয়সে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। হাদীর অল্পবয়স্ক পুত্র জাফর খিলাফতের উত্তরাধিকারের সকল দাবি চাচা হারুনের পক্ষে পরিত্যাগ করেন। খিলাফতের প্রতি আমার কোনো প্রকার দাবি নেই।[১৩৮] খলিফা হারুন ইতিহাসে 'রশিদ' নামে পরিচিত।[১৩৯] এ রশিদ উপাধিটি তাঁর পিতা মাহ্দী প্রদান করেন এক বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। খলিফা আল্-মানসুরের শাসনামলে ৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রোমক সম্রাট চতুর্থ কনস্টানটাইন আল্-মানসুরের সেনাবাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করে বার্ষিক বশ্যতামূলক কর দানে বাধ্য হন। কিন্তু খলিফা আল্-মাহ্দীর শাসনামলে

---

[১৩৪] শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭
[১৩৫] ইবনুল আছির, খণ্ড-৬, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৯-১০০; Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 235
[১৩৬] Syed Ameer Ali, *Ibid*, p. 235
[১৩৭] ইবনুল আছির, খণ্ড-৬, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০০; আবুল হাসান আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী আল মাসুদী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৬; Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 236
[১৩৮] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 237 শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭
[১৩৯] Rafi Ahmad Fidai, Vol. 3, *op.cit*, p. 33

রোমানগণ উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করলে খলিফা তাঁর পুত্র হারুনকে রোমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হারুন রোমানদিগকে পরাজিত করে সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে বসফরাস উপকুলে স্কুটারি পর্যন্ত অগ্রসর হলে রোমান সম্রাজ্ঞী আইরিন বার্ষিক বিপুল পরিমাণ কর দেওয়ার শর্তে হারুনের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। রোমান সম্রাজ্ঞী আইরিনের সাথে জয়লাভের জন্য খলিফা মাহ্দী পুত্র হারুন কে 'রশিদ' উপাধি প্রদান করেন। রূপকথার রাজা, আরব্যোপন্যাসের বহু রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়ক, ধর্মীয় কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান, জীবনযাপনে মিতভাষী, সাধুতা ও দানশীলতায় অনাড়ম্বর, ইতিহাসের গৌরব খলিফা হারুন-অর-রশিদ সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর মাতা খায়জুরানকে সকল প্রকার রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। খায়জুরান তাঁর স্বামী আল্-মাহ্দীর শাসনামলে যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন যা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন তাঁর বড় ছেলে হাদী সে সকল সুযোগ-সুবিধা রশিদ সিংহাসনে আরোহণ করেই প্রত্যাপর্ণ করেন। তাছাড়া হারুনের গৃহশিক্ষক এবং প্রধান উপদেষ্টা ইয়াহিয়া-বিন-খালিদ বার্মেকী হাদীর পুত্র জাফরের উত্তরাধিকার মেনে না নেওয়াতে হাদী হারুনের স্থলে নিজ পুত্র জাফরকে মনোনয়ন দান করতে পারেন নি। ফলে হাদী হারুনের প্রধান উপাদেষ্টা ইয়াহিয়া-বিন-খালিদ বার্মেকীকে কারারুদ্ধ করলে হারুন খলিফা হয়ে তাঁর গৃহশিক্ষক ও প্রধান উপাদেষ্টা ইয়াহিয়া-বিন-খালিদ বার্মেকীকে মুক্ত করে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং সাম্রাজ্যের যাবতীয় সাধারণ প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করেন। রশিদের মাতা ৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমণ করলে প্রধানমন্ত্রী ইয়াহিয়া-বিন-খালিদ বার্মেকী একজন গুরুত্বপূর্ণ মিত্রকে হারান। কারণ খলিফার উপর প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে রানীমাতা তাঁকে জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ দিয়ে সর্বোতোভাবে সাহায্য করতেন। খায়জুরানের মৃত্যুর পর হারুন তাঁর নিকট হতে রাজকীয় সিলমোহর গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁর চার পুত্র ফজল, জাফর, মুসা ও মুহাম্মদ (৭৮৬-৮০৩ খ্রি.) পর্যন্ত আব্বাসী সাম্রাজ্যের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৪০] খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনামলে বার্মেকীদের উত্থান এবং পতন দুটিই আশ্চর্যজনকভাবে সংঘটিত হয়। খলিফা হারুন-অর-রশীদের কৃতকার্যতা, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, শাসন-গৌরবের মূলে রয়েছে বার্মেকী পরিবারের অক্লান্ত পরিশ্রম। পারসিক বার্মেকীগণ ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত আর পক্ষান্তরে আব্বাসীয়গণ ছিলেন সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে সুন্নিগণ স্বাভাবিকভাবেই বার্মেকী শিয়াদের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল। কিন্তু খলিফা হারুনের গৌরবের সব কৃতিত্ব বার্মেকীদের হওয়ায় হারুন সুন্নি মুসলমানদের কথা গুরুত্ব দেননি তাদের গৌরব ও খ্যাতির কথা চিন্তার করে। পরবর্তীতে লক্ষ্য করা যায় বার্মেকী পরিবার গোপনে আলী বংশীয় শিয়াদের সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা শুরু করে। আর শিয়াগণও এ সময় ক্ষমতালাভের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান উজির হবার আশায় ফজল-বিন-রাবি খলিফাকে জানান যে, বার্মেকীগণ হারুনকে পদচ্যুত করে আলী বংশীয়দিগকে খিলাফত প্রদান করার লক্ষ্যে অনিন্দ্যসুন্দর ও স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন জাফরী ভবনে গোপন আলোচনায়

[১৪০] Rafi Ahmad Fidai, Vol. 3, *Ibid*, pp. 37-38

বসেন। খলিফা এ সংবাদ জানতে পেরে জাফর বার্মেকীকে হত্যা করেন এবং অন্যান্য সকল বার্মেকীদের কারারুদ্ধ করে বার্মেকীদের ধ্বংস সাধন করেন। সুতরাং এটা প্রমাণিত যে, খলিফা হারুন-অর-রশিদ কখনোই বার্মেকীদের পতন ঘটাতেন না যদি না তারা ক্ষমতালাভের জন্য তৎপর হতেন।

বীরত্ব, সাহস, শক্তি, উদারতা, মহত্ত্ব ইত্যাদি সদগুণে বিভূষিত অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী সর্বগুণসম্পন্ন মহান সম্রাট খলিফা হারুন-অর-রশিদ ৭৯১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাজ্ঞী জুবাইদার অনুরোধে, তাঁর ভ্রাতা ঈসা ইবনে জাফরের চাপে এবং সমগ্র আব্বাসী গোষ্ঠীর সমর্থনে তাঁর ৫ বৎসরের বয়স্ক পুত্র মুহম্মদকে 'আল-আমিন' (বিশ্বাসী) উপাধি দিয়ে খিলাফতে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দান করেন এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে ফজল বার্মেকীকে নিযুক্ত করেন। সাত বৎসর পর হারুনের পারসিক পত্নী মুরাজির নামক উম্মে ওলাদের গর্ভজাত তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুল্লাহকে 'আল-মামুন' (বিশ্বস্ত) উপাধি দিয়ে আল-আমিনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন এই শর্তে যে, তিনি আমিনের পর ক্ষমতায় আসবেন।[১৪১] জাফর বার্মেকীকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ৮০২ খ্রিস্টাব্দে হারুন-অর-রশিদ আমিন ও মামুনকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় হজ্ব করতে যান এবং সাথে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও যান। কাবাগৃহকে সামনে রেখে দুই ভাইকে দিয়ে লিখিতভাবে পবিত্র চুক্তি করিয়ে নেন যে, তারা ভবিষ্যতে যেন কেউ কারো এলাকা হস্তক্ষেপ না করে এবং পিতার মনোনয়ন অনুসারে তারা যেন তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে। ৮০৪ খ্রিস্টাব্দে হারুন তাঁর তৃতীয় পুত্র কাসিমকে 'মুতামিন' (যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে) উপাধি দিয়ে মামুনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এভাবে খলিফা তাঁর তিন পুত্র আমিন, মামুন ও মুতামিনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন একের পর এক।[১৪২] হারুন-অর-রশিদ মামুনের সুবিচার ও বিশ্বস্ততার উপর এতে বেশি আস্থাশীল ছিলেন যে মামুন কর্তৃক কাসিম খলিফা পদের অযোগ্য বিবেচিত হলে তিনি তাঁহাকে উত্তরাধিকারী হতে অপসারিত করতে পারবেন। খলিফা তাঁর জীবদ্দশায় সাম্রাজ্যকে তিনটি ভাগ করে দেন যার শাসক ছিল পুত্ররা। তারা তাদের শাসিত অঞ্চলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত এবং খিলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতো। আমিনকে সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ বাগদাদ হতে শুরু করে দক্ষিণ ও পশ্চিমের ইরাক, সিরিয়া, হেজাজ, মিসর ও আফ্রিকার অন্যান্য অংশ। আমিনের রাজধানী স্থির করা হয় বাগদাদ। মামুনকে সাম্রাজ্যের পূবাঞ্চল দেওয়া হয়। অর্থাৎ ইরান, তুর্কিস্তান, উত্তর ও পূর্বাংশ। তাঁর রাজধানী স্থির হয় ইরানের অন্তর্গত মার্ভ নগর। কাসিমকে মেসোপটেমিয়া ও সীমান্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।[১৪৩]

[১৪১] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৯; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-১০, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৭
[১৪২] Von Kremer, *op.cit* , p. 267
[১৪৩] Syed Mahmudunnasir, *Islam its Concepts & History*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1981, p. 196

আল-আমিন (৮০৯-৮১৩ খ্রি.)

আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট এবং তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের মধ্যে অন্যতম নরপতি খলিফা হারুন-অর-রশিদ দীর্ঘ ২৩ বৎসর ৬ মাস গৌরবময় রাজত্ব করার পর ৮০৯ খ্রিস্টাব্দে বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে খোরাসানে বিদ্রোহ দমন অভিযানে রায়নগরে পৌঁছানোর পর অসুস্থ হয়ে যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আমিন ছিলেন রাজধানী বাগদাদে, মামুন ছিলেন খোরাসান প্রদেশের রাজধানী মার্ভে এবং কাসিম ছিলেন তাঁর কর্মস্থল কিন্নিসরীনে। খলিফার মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্র সালিহ মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত ছিলেন। খলিফার মৃত্যু সংবাদ ডাক বিভাগের প্রধান হামাওয়াইহ্ কর্তৃক বাগদাদে পৌঁছামাত্র আল-আমিন সাথে সাথেই কাসরুল খুল্‌দে (বেহেশতি প্রাসাদ) ত্যাগ করে কাসরুল খিলাফতে (খলিফার প্রাসাদে) বাসস্থান পরিবর্তন করলেন। যুবরাজ সালিহ যথাসময়ে রাজকীয় সিলমোহর, তরবারি এবং রাজপোশাক আমিনের নিকট প্রেরণ করেন। খলিফার মৃত্যু সংবাদ এবং রাজকীয় প্রতীকসমূহ হাতে পেয়ে আমিন সিংহাসনে আরোহণ করে আমির-উমরাহ, সেনাবাহিনী এবং বাগদাদের জনসাধারণের নিকট হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর প্রতি বশ্যতার শপথ গ্রহণ করেন। মামুন তাঁর নিকট বশ্যতা স্বীকার করে অভিনন্দন পত্র ও উপঢৌকানাদি প্রেরণ করেন।[১৪৪] খলিফা হারুন-অর-রশিদ খোরাসানের বিদ্রোহ দমনের জন্য যে সৈন্যদল ও কোষাগার নিয়ে এসেছিলেন পথিমধ্যে অসুস্থ হলে পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহের জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা অবলোকন করে শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য তাঁর সঙ্গের কোষাগার ও সৈন্যবাহিনী মামুনের নামে উইল করে যান। খলিফা হারুন-অর-রশিদ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য অনুধাবন করে এ উইল করে যান। আমিন তাঁর পিতার মৃত্যুর আশংকা করে খোরাসানের সৈন্যদিগকে নিজের আয়ত্তে বশীভূত করার জন্য সেখানে গুপ্তচর পাঠালেন। খোরাসান অভিযানে খলিফার মৃত্যুর সময় ফজল-বিন-রাবি তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। আমিনের চরিত্রগত দুর্বলতা সম্পর্কে ফজল-বিন-রাবি পূর্ব থেকে অবগত হওয়ায় রাজকার্যের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিজেই পরিচালনা করতে পারবেন বলে স্থির নিশ্চিত হলে তিনি সৈন্যবাহিনীকে অর্থলোভের প্ররোচনা দিয়ে বাগদাদে ফিরিয়ে আনেন। সৈন্যদল ও কোষাগার নিয়ে ফজল-বিন-রাবি রাজধানীতে পৌঁছলে আমিন সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনীকে দুই বছরের অগ্রিম বেতন প্রদান করেন এবং ফজল-বিন-রাবিকে উজির পদ প্রদান করেন।[১৪৫] আমিনের এ কার্যক্রম দুই ভ্রাতার মধ্যে সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়।

ফজল-বিন-রাবির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে অর্থসম্পদ ও সৈন্যদল হতে বঞ্চিত হয়ে মামুন মহাসংকটে পড়লে তাঁর পারসিক প্রধান পরামর্শদাতা ফজল-বিন-সাহল, প্রখ্যাত সেনাপতি হারসামা এবং উদীয়মান সৈনিক তাহির-বিন-হুসাইন আল-খুজায়ী তাঁকে সমর্থন করেন। সে সময় আঞ্চলিক শাসনকর্তাগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলে

---

[১৪৪] Syed Ameer Ali, *op.cit,* p. 254

[১৪৫] Syed Ameer Ali, *Ibid*, pp. 254-255

রাজকর হ্রাস ও উদার ব্যবহারের মাধ্যমে নেতৃস্থানীয় লোকদের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হন। রাজ্যের প্রজাসাধারণ বিভিন্ন প্রকার কর মওকুফের কারণে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। তাছাড়া তাঁর মাতা পারসিক হওয়ায় খোরাসানের লোকেরা 'ভগিনীর পুত্র'[১৪৬] হিসেবে তাঁর চারদিকে একত্র হওয়া শুরু করল।[১৪৭] খোরাসানে মামুনের জয়জয়কার অবস্থা দেখে খলিফা আমিনের উজির ফজল-বিন-রাবি ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ মামুনের মতো শক্তিশালী শাসক যদি খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহলে ফজল-বিন-রাবির বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি তাঁর প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছেন তা কখনো ক্ষমা হবে না ভেবে মামুনকে খিলাফতের উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করার জন্য আমিনকে প্ররোচিত করতে লাগলেন। কিন্তু খলিফা আল-আমিন এই প্ররোচনায় প্রথমে কর্ণপাত করলেন না। পরবর্তীতে আলী-বিন-ঈসা-বিন-মাহান ও অন্যান্য সভাসদগণের কুপরামর্শে খলিফা আমিন মামুনকে বাগদাদে আনয়ন করার জন্য দূত প্রেরণ করেন। মামুন খলিফা আমিনের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সন্দেহ করে তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। অবশ্য মামুনের উজির ফজল-বিন-সাহল মামুনকে মার্ভ পরিত্যাগ করত বাগদাদ গমন করতে নিষেধ করলে তিনি প্রদেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে বাগদাদ গমন করতে পারবেন না বলে খলিফাকে জানান। ফলে আমিন তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাচ্যের শাসনকর্তার পদ হতে বরখাস্ত করেন এবং খুৎবায় তাঁর নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ করে এক পরিপত্র জারি করলেন। অপর ভ্রাতা কাসিমকেও মেসোপটেমিয়া ও সীমান্ত অঞ্চলের শাসনকর্তার পদ হতে অপসারিত করেন।[১৪৮] ৮১১ খ্রিস্টাব্দে আমিন মামুনের স্থলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুসাকে 'নাতিক বিল হক' বা 'সত্য বিঘোষক' নামক জাঁকাল উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।[১৪৯] তিনি কিছুদিন পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে 'কায়িম-বিল-হক' বা 'সত্য নিষ্ঠাবান' উপাধি দান করে খিলাফতের জন্য মনোনয়ন দান করেন। খলিফা আমিনের পিতা পবিত্র কাবাগৃহে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত যে দুটি প্রতিজ্ঞাপত্র আমিন মামুনের উপস্থিতিতে ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলেন সেগুলো আমিন এনে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন।

---

[১৪৬] খলিফা হারুন-অর-রশিদের মৃত্যুর পর রাজ অনুজ্ঞা অনুসারে মুহম্মদ আল-আমিন বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করলে বাগদাদের জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুগত্য প্রকাশ করে। মামুন খোরাসানের মার্ভ থেকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে অভিনন্দন ও উপঢৌকন প্রেরণ করেন। আল-আমীন রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড আরব উজির ফজল-বিন-রাব্বির হাতে ছেড়ে দেন। তাঁর সভাসদদের কুপরামর্শে খোরাসানের শাসনকর্তা মামুনের উত্তাধিকার বাতিল করে তাঁকে রাজধানী বাগদাদে তলব করা হয়। আমিন তাঁর শিশুপুত্রকে মামুনের স্থলে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। মামুন বাগদাদ যেতে অসম্মতি জানালে মামুনকে খোরাসানের শাসনকর্তার পদ হতে পদচ্যুত করেন। এ রকম পরিস্থিতিতে খোরাসানের লোকেরা মামুনের পক্ষাবলম্বন করে। আমিন আরব মাতা জুবায়দার পুত্র হওয়ায় আরবের লোকেরা আমিনের পক্ষাবলম্বন করে আর মামুন পারসিক মাতা সারাজিলের পুত্র হওয়ায় খোরাসানবাসীগণ তাঁর পক্ষাবলম্বন করেন। আমিন ও মামুন কে কেন্দ্র করে আরব-অনারব বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । মূলত মামুনের মাতা পারসিক হওয়ায় খোরাসানের লোকজন মামুনকে 'ভগিনীর পুত্র' বলে তাঁর চারদিকে জড়ো হওয়ায় আব্বাসীয় সাম্রাজ্য আরব বনাম পারস্য- এ দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হয়। আল-মামুন তাঁর উদার ব্যবহারের জন্য পারসিকদের সমর্থন পেয়েছিলেন। 'ভগিনীর পুত্র' হিসেবে তিনি যে সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন তা মূলত 'ভগিনীর পুত্র' হিসেবে নয় বরং তিনি সহযোগিতা ও সমর্থন পেয়েছিলেন তাঁর উদার ব্যবহারের জন্য। বিস্তারিত দেখুন, মুসা আনসারী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩-৮২

[১৪৭] Jurji Zayadan, *History of Islamic Civilization Umayyads and Abbasids,* Tr. D.S. Margoliouth, Kitab Bhavan, New Delhi, 2006, p. 185

[১৪৮] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 257-258

[১৪৯] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, p. 394

তাছাড়া ফজল-বিন-রাবি বাগদাদে মামুনের ব্যক্তিগত সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।[১৫০] বাগদাদে নওফলের অভিভাবকত্বে মামুনের দুই পুত্র অবস্থান করতেছিল তাদেরকে আমিনের অধীনে এনে জামিনস্বরূপ রাখা এবং মামুন বশ্যতা স্বীকার না করলে তাদেরকে হত্যা করার জন্য খলিফাকে পরামর্শ দিলেন। খলিফা আমিন শুধু এ পরামর্শ বর্জনই করলেন না বরং যে সকল পরামর্শদাতাগণ এ রকম বিব্রতকর পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি তাদেরকে বন্দি করে শাস্তি প্রদান করেন। এ রকম পরিস্থিতিতে দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে।

খলিফা আল-আমিনের এরূপ আচরণের ফলে মামুন তাঁর শাসনাধীন এলাকার পশ্চিম সীমান্তে সেনা মোতায়েন করলেন। দেহ তল্লাশি ও বিনা অনুমতিতে যেন কেউ পশ্চিমাংশ হতে পূর্বাংশে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য তিনি কঠোরতা আরোপ করলেন। ফলে দুই ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো এবং পরোক্ষভাবে হারুনের সাম্রাজ্য দুই ভাইয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়লো। ফজল-বিন-রাবির চক্রান্তে আমিন আলী-ইবনে-ঈসার নেতৃত্বে ৫০০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মামুনের বিরুদ্ধে রাইয়ে প্রেরণ করলেন। মামুনের সেনাপতি তাহির-বিন-হুসাইনের হাতে আলী-বিন-ঈসা-বিন-মাহান ৮১১ খ্রিস্টাব্দে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হন।[১৫১] আমিন মামুনের বিরুদ্ধে বাগদাদ হতে আরো কয়েকটি সেনা অভিযান প্রেরণ করলে সৈন্যদল তাহির কর্তৃক প্রথম অভিযানের অনুরূপ পরাজয়বরণ করে। পুরো পার্বত্য অঞ্চল তাহির শত্রুমুক্ত করেন। আমিনের বিরুদ্ধে মামুন বাহিনীর এরূপ সাফল্যের ফলে মামুন আমিরুল মু'মিনিন উপাধি গ্রহণ করলেন এবং সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের খলিফা বলে স্বীকৃত হলেন। আর ইতোমধ্যে আহওয়াজ, ইয়েমেন, বাহরায়েন ও ওমান অধিকার করে ওয়াসিত দখল করেন মামুনের অন্যতম সেনাপতি হারসামা।[১৫২] এদিকে কুফা, বসরা ও মক্কা-মদিনার শাসনকর্তাগণ মামুনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তারপর মামুনের সেনাপতিত্রয়– তাহির, হারসামা ও জুহাইর একত্রে বাগদাদের দিকে সৈন্য পরিচালনা করে নগরী অবরোধ করলে বাগদাদ নগরীর অধিকাংশ লোকজন আমিনের পক্ষ ত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় বাগদাদ নগরীতে অবস্থান করা নিরাপদ হবে না ভেবে তিনি তাঁর মাতা জুবাইদা ও পরিবারবর্গসহ দজলার পশ্চিম তীরে মদিনাতুল 'মানসুর দুর্গে'[১৫৩] আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমিনের পারিষদবর্গ এ রকম করুণ অবস্থায়ও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করলে তিনি

---

[১৫০] Jalaluddin A's Suyuti, *Ibid*, p. 394

[১৫১] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 258

[১৫২] Syed Ameer Ali, *Ibid*, p. 259

[১৫৩] আব্বাসীয় বংশের শাসক খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর প্রথম শাসক আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ-এর মৃত্যুর পর রাজক্ষমতায় আরোহণ করে খিলাফতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে মক্কা, মদিনা, দামাস্কাস, কুফা, বসরা অথবা আনবার কোনোটাই তাঁর কাঙ্খিত রাজধানীর উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয় নি। নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার জন্য খলিফা মনসুর পারস্যের বিখ্যাত সম্রাট কিস্‌রা নওশিরওয়ানের গ্রীষ্মবাস বাগদাদকে উপযুক্ত স্থান বলে নির্ধারণ করেন। বাগদাদ নগরীটি দজলা (টাইগ্রিস) নদীর পশ্চিম তীরে এবং আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক ক্ষেত্রে এর গুরত্ব ছিল অপরিসীম। এরূপ আদর্শ স্থানে তিনি রাজধানী স্থাপন করে এর নতুন নামকরণ করেন 'দার-উস-সালাম' বা শান্তিনিবাস। খলিফার নামানুসারে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ সমৃদ্ধ এ নগরটি 'মানসুরিয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে। খলিফা আমিন ও তাঁর মাতাসহ পরিবারবর্গ এ নগরীতে আশ্রয় লাভ করেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, K. A. C Creswell, *A Short Account of Early Muslim Architecture*, Penguin books Ltd., U.S.A., 1958, pp. 164- 171; Syed Ameer Ali, *op.cit*, pp. 445-449

অবস্থা অনুকূলে না হওয়ায় আত্মসমপর্ণের সিদ্ধান্ত নিলেন। আমিন তাঁর ভ্রাতা মামুনের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আস্থাবান ছিলেন। তাহির-বিন-হুসাইন আমিনকে তার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বললে তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। কারণ তাহিরকে তিনি কোনো অবস্থাতেই বিশ্বাস করতেন না। ফলে তাহিরের আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় তিনি মনে মনে ক্ষুব্ধ হন। অবশেষে বহু আলাপ-আলোচনার পর এরূপ মীমাংসা হলো যে, আমিন পিতার পুরাতন ও বিশ্বস্ত সেনাপতি হারসামার নিকট আত্মসমর্পণ করবেন, কিন্তু রাজদণ্ড, সিলমোহর এবং রাজকীয় বেশভূষা তাহিরের নিকট প্রেরণ করবেন। অশ্রুবিগলিত নেত্রে আমিন সন্তানসন্ততিদের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করে হারসামার নৌকায় করে যাত্রা শুরু করলেন। কিন্তু সেনাপতি তাহিরের কতকগুলো নিষ্ঠুর ও পাশবিক সৈন্য নৌকা লক্ষ করে বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করে নৌকা তলিয়ে ফেললে সাঁতরিয়ে কূলে পৌঁছে একটি গৃহে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু গভীর রাত্রিতে কয়েক জন পারসিক দ্বার ভেঙ্গে তাঁকে হত্যা করে।[১৫৪] মামুন ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং হত্যাকারীদিগকে শাস্তি প্রদান করেন। রাজমাতা জুবাইদার তত্ত্বাবধানে আমিনের পুত্রদিগকে রেখে বড় করে নিজ কন্যাগণের সাথে বিবাহ প্রদান করে কিয়ৎপরিমাণে হলেও তাদের পিতার মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। তাছাড়া তাদের নিজস্ব জমিজমাও ভোগদখল করবার অনুমতি প্রদান করেন।

আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)

৮১৩ খ্রিস্টাব্দে অন্তর্বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধে আমিন পরাজিত ও নিহত হলে আল-মামুন অপ্রতিদ্বন্দ্বী খলিফারূপে সমাদৃত হয়ে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খলিফা হওয়ার পর তিনি স্বয়ং বাগদাদে না এসে সাম্রাজ্যের শাসনভার প্রধানমন্ত্রী ফজল-বিন-সাহলের উপর ন্যস্ত করে স্বয়ং খোরাসানের রাজধানী মার্ভে অবস্থান করে জ্ঞানী ও বিদ্বান সভাসদগণের সাথে দার্শনিক আলোচনায় কালযাপন করতে লাগলেন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে মামুন যদি সাম্রাজ্যের শাসনভার উচ্চাভিলাষী মন্ত্রী ফজল-বিন-সাহলের হাতে ন্যস্ত না করে বাগদাদ আগমন করতেন তাহলে পরবর্তী কয়েক বৎসরের শাসন বিশৃঙ্খলা হতে রক্ষা পেত।[১৫৫] তাঁর বিশ বৎসরের খিলাফতকালকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা ঃ (ক.) প্রথম ৬ বৎসর (৮১৩ -৮১৯ খ্রি.) পর্যন্ত খলিফা মামুন মার্ভে অবস্থান করে দার্শনিক আলোচনায় ব্যস্ত থাকায় প্রধানমন্ত্রী ফজল-বিন-সাহল বাগদাদে অবস্থান করে রাজকার্য পরিচালনা করেন। এ সময় মন্ত্রী ফজল-বিন-সাহল সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে নানা প্রকার অপকর্ম করলে সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইরাক, সিরিয়া ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা চলতেছিল এ সম্পর্কিত কোনো তথ্যই তিনি খলিফাকে জানাতেন না। (খ.)

---

[154] Carl Brockelmann, *op.cit*, p. 122; ড. মফীজুল্লাহ কবীর, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৮-২৩৯

[১৫৫] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 263

পরবর্তী ১৪ বৎসর (৮১৯-৮৩৩ খ্রি.) পর্যন্ত রাষ্ট্রপরিচালনার ভার খলিফা মামুন স্বহস্তে গ্রহণ করলে সাম্রাজ্য থেকে সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়। ঐতিহাসিক আমির আলী বলেন,

> Mamun's Caliphate Consitutes the most glorious epoch in Saracenic history, and has been justly called the Auguston Age of Islam. The twenty years of his reign have left enduring monuments of the intellectual development of the Moslems in all directions of thought.[156]

খলিফা মামুনের রাজত্বকালের প্রথম ৬ বৎসরের সময় মার্ভে থেকে দার্শনিক আলোচনায় ব্যস্ত থাকার সময় উজির ফজল-বিন-সাহল রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের বিশৃঙ্খলপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে কোনো সংবাদ বিশেষ করে ইরাক, সিরিয়া ও রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল সেগুলো সম্পর্কে কোনো কিছুই অবগত করানো হতো না। এ সময় উজির ফজল-বিন-সাহল খলিফার উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভাব বিস্তার করলেন। এ সময় ধর্মপ্রাণ খলিফা মামুন আলী (রা.) এর বংশধরদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন।[১৫৭] এ সহানুভূতির বশবর্তী হয়ে এবং রাসূল (সা.) এর বংশধরদের হাতে খিলাফত প্রত্যপর্ণে উদগ্রীব হয়ে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক মদিনা হতে মুসা আল কাজিমের পুত্র শিয়াদের অষ্টম ইমাম আলী আর রিজাকে ৮১৭ খ্রিস্টাব্দে মার্ভে ডেকে তাঁকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন।[১৫৮] এ সময় মামুন নির্দেশ প্রদান করলেন যে, আব্বাসীয় প্রতীক কৃষ্ণবর্ণ ত্যাগ করে ফাতেমীয়গণের সবুজ বর্ণের পতাকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। তার এই মনোনয়নে আব্বাসীয়সহ সর্বত্র নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। এমনকি সাধারণ মানুষ নতুন উত্তরাধিকারীর প্রতি আনুগত্যের শপথ করতে অস্বীকার করে।[১৫৯] খিলাফতের এই উত্তরাধিকারী মনোনয়নকে কেন্দ্র করে বাগদাদের সুন্নি আব্বাসীয়গণ ক্রোধে উত্তাল হয়ে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ শুরু করে । বাগদাদবাসী মামুনের এরূপ কার্যকলাপে ক্ষুন্ন ও রুষ্ট হন। খলিফার পক্ষপাত-নীতি ও অদূরদর্শিতায় আব্বাসীয়গণ বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রকাশ্যে দিবালোকে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি-অগ্নি সংযোগ করে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। ইবনে খালদুন বলেন, আব্বাসীয়রা আলী আল রিজার মনোনয়নকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। তারা আল মামুনের ঘোষণাকে অবৈধ বলে প্রচার করতে শুরু করে এবং মামুনের পরিবর্তে তারা তাঁর পিতৃব্য ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আল মাহদীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শণ করতে শুরু করে।[১৬০] ইরাক এবং হিজাজেও মামুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো যা ইব্রাহিম অথবা হাসান ইবন সহল কাহারও কোনো কর্তৃত্ব রইলো না। এই সংকটময় সময়ে ইমাম আলী-আর রিজা তাকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচিত করায় যে

---

[১৫৬] Ameer Ali, *op.cit,* p. 274
[১৫৭] মফীজুল্লাহ কবীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০
[১৫৮] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit,* p. 411; Rafi Ahmad Fidai, Vol. 3, *op.cit,* pp. 52-53; মফীজুল্লাহ কবীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০
[১৫৯] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৮, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫৪
[১৬০] Ibn Khaldun, Tr. Franz Rosenthal, Vol. I, *op.cit,* p. 433

রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অরাজকতার সূচনা হয় তা খলিফা মামুনকে জানানোর জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মামুনের কাছে মার্ভে গমন করে প্রকৃত অবস্থা অকপটে বর্ণনা করলেন। প্রধানমন্ত্রী ফজল-ইবনে-সহলের কুশাসন, ইব্রাহিমের নির্বাচন ও তাঁকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচিত করায় আব্বাসীয়গণের সমর্থন লাভের অভাব, যোগ্য সেনাপতি তাহিরকে কোণঠাসা এবং প্রভুভক্ত হারসামাকে অন্যায়ভাবে উজিরের চক্রান্তে হত্যার কথা শুনে খলিফার জ্ঞান-চক্ষু উম্মোচিত হলো।[১৬১] মামুন প্রকৃত অবস্থা অবগত হয়ে সসৈন্য ৮১৮ খ্রিস্টাব্দে আর-রাজিসহ রাজধানী বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। বাগদাদে পৌঁছাবার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রী ফজল-বিন-সহল জনৈক গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। যাত্রাপথে মামুন তুস নগরীতে কিছুকাল বিশ্রাম করবার জন্য থামলেন। এখানে দুর্ভাগ্যক্রমে খলিফা হারুন-অর-রশিদের সমাধি স্তম্ভের নিকট ইমাম আলী-আর-রিজা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করলে একটি সম্ভাব্য রাজনৈতিক গোলযোগ দূরীভূত হয়।[১৬২] পরিশেষে ৮১৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মামুন আব্বাসীয় নগরী বাগদাদে বিজয়ীবেশে বিনা বাধায় প্রবেশ করে শাসনভার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেন। তাঁর আগমনে ইব্রাহিম-বিন-মাহদী পলায়ন করেন এবং সমস্ত বিশৃঙ্খলা থেমে যায়। পরবর্তীকালে আল মামুন উপদেষ্টাদের পরামর্শ অনুযায়ী পুনরায় বংশগত উত্তরাধিকারী নীতি চালু করেন। খলিফা মামুন তাঁর অবস্থা সংকটজনক বুঝতে পেরে মৃত্যুর পূর্বে ভ্রাতা কাশিম এবং পুত্র আব্বাসকে খিলাফত হতে বঞ্চিত করে বীরত্ব ও প্রতিভার প্রতি লক্ষ্য করে যোগ্য ও কর্মঠ ভ্রাতা ইসহাক মুহম্মদকে 'মুতাসিম বিল্লাহ' উপাধি দান করে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

আবু ইসহাক মুহাম্মদ আল-মুতাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)

৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ আগস্ট ৪৮ বছর বয়সে খলিফা আল-মামুন তরসাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তাঁর মনোনয়ন অনুযায়ী ভ্রাতা আবু ইসহাক মুহাম্মদ আল-মুতাসিম বিল্লাহ[১৬৩] উপাধি ধারণ করে ১৯ শে রজব, ২১৮ হিজরি বা ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথমে সৈন্যবাহিনীর একাংশ আব্বাসের মনোনয়নের জন্য দাবি জানালে আবু ইসহাক আব্বাসকে টায়ানা হতে তরসাসে ডেকে আনেন। কিন্তু তিনি তাঁর পিতার অন্তিম ইচ্ছানুসারে পিতৃব্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে সেনাবাহিনী তাদের দাবি

---

[১৬১] ড. ওসমান গনী, *আব্বাসীয় খিলাফত*, বুকস ওয়ে, কলকাতা,২০১২, পৃ. ১০৫-'০৬; মফীজুল্লাহ কবীর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪১-২৪২

[১৬২] মফীজুল্লাহ কবীর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪২

[১৬৩] পরলোকগত খলিফা আল-মামুনের মনোনয়ন অনুযায়ী তাঁর ভ্রাতা আবু ইসহাক মুহম্মদ আল-মুতাসিম বিল্লাহ উপাধি ধারণ করে ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। খলিফা মামুন মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ঔরসজাত পুত্র আব্বাসকে উত্তরাধিকারী মনোনীত না করে ভ্রাতা আবু ইসহাক মুহম্মদকে মনোনয়ন দান করে ইতিহাসে একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ইহা অনুধাবন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য যে, মামুন সৈন্যবাহিনীর বিশ্বাসভাজন ও আরবদের প্রিয় তাঁর পুত্র আব্বাসকে কেন পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচিত করেন নি? সৈয়দ আমীর আলীর ভাষ্য অনুযায়ী মনে হয়, সম্ভবত তাঁর মনে হয়েছিল পুত্র আব্বাস তাঁর প্রণীত নীতিগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারবেন না। অন্যদিকে তাঁর ভ্রাতা আবু ইসহাক মুহম্মদ রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় নিয়মনীতিগুলি অনুসরণ করে চলতে পারবেন। তবে উল্লেখ্য যে, তাঁর ভ্রাতাও সেনাবাহিনীর মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। তবে মামুন যে এ মনোনয়ন যোগ্যতার বিচারে করেছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 281

প্রত্যাহার করে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলো।[১৬৪] সাহসী যোদ্ধা ও সুযোগ্য নরপতি মুতাসিম বিল্লাহের শাসনামলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য আরও প্রসারিত হয়। খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ্ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ৫ই জানুয়ারি ৮৪২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু জাফর হারুনকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

আবু জাফর হারুন আল-ওয়াসিক বিল্লাহ (৮৪২-৮৪৭ খ্রি.)

অষ্টম আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাসিমের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবু জাফর হারুন 'আল-ওয়াসিক বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে আব্বাসীয় খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উদার, মহানুভব, শিক্ষিত, শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক আল-ওয়াসিক বিল্লাহ ৫ বৎসর রাজত্ব করেন। শাসন কার্য পরিচালনায় তিনি পিতার মতো এতো দক্ষ না হলেও পিতার সকল নীতি অব্যাহত রাখেন।[১৬৫] তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহের ন্যায় তুর্কিভাবাপন্ন নীতি অনুসরণ করায় তাঁর সাম্রাজ্যে কেবল তুকিদের প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাদের প্রভাব এতে বেশি বৃদ্ধি পায় যে, পরবর্তীতে খলিফা নির্বাচনে এদের অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি সাম্রাজ্য পরিচালনায় সমৃদ্ধির স্বাক্ষর রেখেছিলেন, যার অন্যতম প্রমাণ হলো তাঁর শাসনামলে সাম্রাজ্যে কোনো ভিক্ষুক ছিল না। ৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে আল-ওয়াসিকের মৃত্যুর সাথে সাথে আব্বাসীয় খিলাফতে এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ঐতিহাসিক আমির আলী বলেন, "For the next two centuries their history presents a confused picture of sovereigns coming to the throne without power, and descending to the grave without regret."[166]

আল-মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)

খলিফা আল-ওয়াসিক তাঁর জীবদ্দশায় কোনো উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান নি। তাঁর স্বল্পকালীন রাজত্বকাল বিদ্রোহ ও বিপ্লবে ভরপুর ছিল বিধায় শাসন কার্যক্রমে এক ধরনের অনাগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ফলে তিনি উত্তরাধিকার মনোনয়নের কাজটি সম্পন্ন করেন নি। আধুনিক গবেষকরা এ মতের সাথে একাত্মতা পোষণ করেন না। তারা মনে করেন যে, খলিফা মামুন-মুতাসিমের পারস্যভাবাপন্ন ও তুর্কিভাবাপন্ন নীতির সফল প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম এমন উপযুক্ত সদস্য ওয়াসিকের পরিবারে ছিলেন না বলে তিনি উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন নি।[১৬৭] তাঁর মৃত্যুর পর কাজি উল কুজ্জাত আহম্মেদ বিন আর দুয়াদ, প্রভাবশালী উজির ইবনে জাইয়াত এবং অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ ওয়াসিকের নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে

---

[১৬৪] Syed Ameer Ali, *Ibid*, pp. 281-282; Rafi Ahmad Fidai, Vol. 3, *op.cit*, p. 69
[১৬৫] M. A. Shaban, *op.cit*, p. 69
[১৬৬] Ameer Ali, Syed, *op.cit*, p. 287
[১৬৭] M. A.Shaban, *op.cit.*, p. 71

উপবিষ্ট করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ; কিন্তু তুর্কি নেতা ওয়াসিফ ও ইতকাহ্‌র নেতৃত্বে তুর্কি প্রধানরা এই মর্মে বাধা প্রদান করলেন যে, রাজ্য, রাজত্ব, রাজমুকুট, রাজপোশাক এবং রাজদণ্ড পরিচালনা করতে নাবালক বালকের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। তখন তাঁরা ওয়াসিকের ভ্রাতা জাফরকে 'মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ' উপাধি দিয়ে খলিফা নির্বাচিত করেন।[১৬৮] তাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁকে 'আরবদের নীরো'[১৬৯] নামে আখ্যায়িত করেছেন। খলিফা হারুন-অর-রশিদের ন্যায় আল-মুতাওয়াক্কিল নিজের তিন পুত্রকে পর্যায়ক্রমে খিলাফতের জন্য উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তিনি তাঁর ইচ্ছাপত্রে বিস্তারিতভাবে কোন পুত্র কি উপাধি ধারণ করবে এবং কে কখন সিংহাসনে আরোহণ করবে তাঁর সব খুঁটিনাটি বিষয় সন্নিবেশিত করেন। সেই বণ্টন অনুসারে ১৩ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র আল-মুনতাসিরকে সিরিয়া ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল, তিন বৎসর বয়স্ক আল-মু'তাজকে খোরাসান, তাবারিস্থান, আজারবাইজান ও পারস্য এবং ছোট পুত্র কোলের শিশু আল-মু'য়াইয়াদকে হিম্‌স, দামাস্কাস, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের শাসনভার অর্পণ করা হয়। যেহেতু নবনিযুক্ত কর্মকর্তারা সকলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন সেহেতু সকলের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। তাঁর এ ব্যবস্থার কারণে সকল প্রদেশে তিনি সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারতেন।[১৭০] খলিফা নানাবিধ কারণে দ্বিতীয় পুত্র আল-মু'তাজকে অধিক স্নেহ করতেন ও তাঁর নামে মুদ্রাঙ্কন করেন। খলিফার এই পক্ষপাতিত্বপূর্ণ নীতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-মুনতাসিরকে অসন্তুষ্ট করে তোলে। এই অবস্থায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আল-মুনতাসিরের সমর্থনে তাঁর তুর্কি দেহরক্ষীগণ ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে হত্যা করেন।[১৭১]

আল-মুনতাসির বিল্লাহ (৮৬১-৬২খ্রি.)

সামাররা বাহিনী মুতাওয়াক্কিলকে হত্যা করার পর পরই তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-মুনতাসির বিল্লাহ খলিফা হন। তাঁর রাজত্বকালে তুর্কিগণ বিশেষ শক্তিশালী ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। তিনি ক্ষমতায় এসেই সামাররা বাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মুতাওয়াক্কিলের সামরিক বিন্যাস বাতিল করে সামাররা বাহিনীকে পুন:প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭২] তিনি খলিফা হওয়ার মাত্র ৪০ দিনের মধ্যে তাঁর মন্ত্রী আহমাদ বিন-খাসিব এবং বুগাও ওয়াসিফ

---

[১৬৮] Carl Brockelmann, *op.cit*, p. 132

[১৬৯] খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল ৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে একদিকে বিলাসী জীবনযাপন করেন আর অন্যদিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর আচরণ করেন। তিনি শিয়া ও মুতাজিলাপন্থি লোকদের উপর অত্যন্ত দুর্ব্যবহার ও নির্যাতন করেন। তিনি মুতাজিলাদের সরকারি কার্য হতে বহিস্কার, স্বাধীন মতাবলম্বী মুতাজিলা কাজী আবু দুয়াদ ও তাঁর পুত্রকে কারারুদ্ধ করে তাঁদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তিনি আলী ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বিদ্বেষবশত কারবালায় শহিদ হুসাইনের মাজার ধূলিসাৎ করে সেখানে ওরস উদযাপন নিষিদ্ধ করেন এবং উহার উপর দিয়ে জলস্রোত প্রবাহিত করেন। তিনি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রতিও অত্যন্ত কঠোর নীতি নীতি আরোপ করেন। তাঁর বিদ্বেষ যাদের উপর পড়েছিল তারা সকল ধরনের সরকারি চাকুরি হতে অপসারিত হলেন। খলিফার সাথে মতবিরোধের জন্য তাঁর দেহরক্ষী তুর্কি সেনাপতি ইতাকাহ্‌কে বন্দি করা হয়। তিনি পানির পিপাসায় মারা যান। ওয়াসিকের ওজির ইবন জাইয়াত মুতাওয়াক্কিলকে সিংহাসনে আরোহণের সময় যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করায় তাকে হত্যা করেন। এমনিভাবে তাঁর পনের বছরের শাসনামলে জনগণের উপর নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন করেন। তাঁর নিষ্ঠুরতা তাঁকে জনগণের কাছে অপ্রিয় করে তুলেছিল। ফলে ঐতিহাসিকগণ তাঁর নিষ্ঠুরতার জন্য তাঁকে 'আরবদের নীরো' বলে আখ্যা প্রদান করেছেন। বিস্তারিত দেখুন, Ameer Ali, Syed, *op.cit*, pp. 288-290 মফীজুল্লাহ কবীর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৩-২৫৪

[১৭০] M. A Shaban, Op.cit., p. 74, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২০শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৬

[১৭১] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, p. 471; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২০শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৬

[১৭২] M. A Shaban, *Op.cit.*, p. 80

মিলে মুনতাসিরকে তাঁর পিতার মনোনয়ন বাতিল করতে বাধ্য করেন। তিনি তাঁর দুই ভাই মুতায ও মুঈদকে উত্তরাধিকার বঞ্চিত করে স্বীয় পুত্রের মনোনয়ন দান করেন।[১৭৩] দু'ভ্রাতাকে ডেকে তিনি বলেন যে, মূলত তুর্কিদের চাপে পড়ে তিনি তাদের মনোনয়ন বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। ভ্রাতৃদ্বয় স্বেচ্ছায় তাদের দাবি প্রত্যাহার করেন।[১৭৪] মাত্র ছয় মাস রাজত্ব করার পর হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবুল আব্বাস আহমদ আল-মুস্তাইন বিল্লাহ (৮৬২-৬৬খ্রি.)

খলিফা আল-মুনতাসির বিল্লাহর মৃত্যুর পর পরই তুর্কি দলপতিগণ তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের মনোনয়ন নিয়ে এক পরামর্শ সভায় মিলিত হলেন। তাঁরা আল-মুনতাসিরের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের মনোনয়ন বাতিল করে মুতাসিমের ১৮ বছর বয়স্ক এক পৌত্র আবুল আব্বাস আহমদকে 'মুস্তাইন বিল্লাহ' উপাধি দিয়ে খলিফা মনোনীত করেন।[১৭৫] মুস্তাইন বিল্লাহর অভিষেক চলাকালীন সময় একদল আমির ও অমাত্যবর্গ নগরীর মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করে। তাঁরা মুতাযের পক্ষাবলম্বন করে নগরীর মধ্যে মিছিল করে এবং দাঙ্গা চালাতে থাকে। তিন দিন ধরে দাঙ্গা চলতে থাকে। মুস্তাইন বিল্লাহ দাঙ্গা বন্ধ করে মুতায ও মুয়াইদকে খিলাফতের দাবি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেন।[১৭৬] তিনি ৮৬২ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩ বৎসর ৯ মাস রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালীন সময়ে তুর্কি জেনারেলদের মধ্যে গোলযোগ দেখা দিলে তুর্কি সৈন্যদের মাঝে একতা বিনষ্ট হয়ে সামার্‌রা শান্তি নষ্ট হলে খলিফা আল-মুস্তাইন বিল্লাহ সামার্‌রা ছেড়ে বাগদাদে চলে যান। তুর্কিরা তাঁকে ফিরিয়ে আনতে না পেরে মুতাওয়াক্কিলের দ্বিতীয় পুত্র আল মু'তাযকে কারাগার থেকে বের করে খলিফা বলে ঘোষণা করেন এবং বাগদাদ অবরোধ করতে অগ্রসর হন। অবরুদ্ধ অবস্থায়ও খলিফা পদ থেকে ইস্তফা দিতে রাজি না হলে দুইজন তুর্কি সেনাপতি বুগা ও ওয়াসিফ তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আল-মু'তাযের পক্ষে খিলাফত ত্যাগে বাধ্য করেন।

আল-মু'তায বিল্লাহ (৮৬৬-৮৬৮ খ্রি.)

খলিফা আল-মুস্তাইন বিল্লাহ তুর্কি সেনাপতিদের প্রাণনাশের ভয়ে নিজে অবসর গ্রহণ করে আল মু'তাযের পক্ষে খিলাফত ত্যাগ করলে আল-মু'তায ৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজ ভ্রাতা মু'য়াইদকে বরখাস্ত করে হত্যা করেন এ সন্দেহে যে, সে যে কোনো সময় সিংহাসনের দাবি করতে পারে। অপর ভ্রাতা আবু আহম্মেদকে বন্দি করেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত আল-মুস্তাইন বিল্লাহকে সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাসের মধ্যে হত্যা করেন।[১৭৭] তিনি নিজের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করার কাজে যখন ব্যস্ত ঠিক তখন বকেয়া বেতনের দাবিতে সৈন্যবাহিনী গোলমাল শুরু করলে কোষাগার শূন্য থাকায় তাদের দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ

---

[১৭৩] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit,* p. 479

[১৭৪] শেখ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৬

[১৭৫] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit,* p. 481; S. M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims,* Vol. II, Najmahsons, Dacca, 1977, p. 175

[১৭৬] William Muir, *op.cit,* pp. 534-535; মুসা আনসারী, পূর্বোক্ত,পৃ. ১০৮

[১৭৭] শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৭

হন। ফলে সেনাপতি সালিহ ও অন্যান্য সেনাপতিগণ বলপূর্বক প্রাসাদে প্রবেশ করে তাঁকে বাইরে এনে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং বায়'আত থেকে সরে সিংহাসন ছাড়ার জন্য চাপ দেন। মু'তায খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে মুহতাদীর হাতে সর্বপ্রথম বায়'আত গ্রহণ করেন।[১৭৮]

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল মুহ্তাদী বিল্লাহ (৮৬৯-৮৭০ খ্রি.)

তুর্কি সেনাপতি ও সর্দারগণ এই সময় খিলাফতের প্রকৃত ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন। তারা মু'তাযকে সিংহাসনচ্যুতি করে পরলোকগত খলিফা ওয়াসিকের পুত্র আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদকে 'মুহতাদী বিল্লাহ' উপাধি দিয়ে খিলাফত প্রদান করেন। তিনি প্রথমদিকে বিভিন্ন প্রান্তিক সুবিধাদি দিয়ে সকলের আনুগত্য আদায় করেন। তিনি দৃঢ় চরিত্র, ধার্মিক, ন্যায়বান ও কর্তব্যপালনে উমাইয়া বংশের ধার্মিক খলিফা উমরের পদানুসরণকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ খলিফা হলেও রাজকোষ শূন্য থাকায় সৈন্যদের দাবি-দাওয়া পূরণ করতে অসমর্থ হন। ফলে মাত্র ১১ মাস রাজত্ব করার পর অনাচারী আমিরগণ তাঁকেও বলপূর্বক সিংহাসনচ্যুত করে কারাগারে বন্দি করেন।[১৭৯] তিনিও কোনো উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দিতে পারেন নি।

আবুল আব্বাস আহমদ মু'তামিদ আলাল্লাহ (৮৭০-৮৯২ খ্রি.)

তুর্কি সেনাপতি ও সর্দারগণ পরলোকগত খলিফা মুতাওয়াক্কিলের জীবিত পুত্রগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল আব্বাস আহ্মদকে 'মু'তামিদ আলাল্লাহ' উপাধি দান করে খলিফার পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজে আমোদপ্রিয় ও দুর্বল প্রকৃতির মানুষ হলেও তাঁর ভ্রাতা মুওয়াফ্ফিক উপাধিধারী আবু আহমদ সুদক্ষ ও সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।[১৮০] মু'তামিদ দীর্ঘ প্রায় ২২ বছরকাল খিলাফতে আসীন ছিলেন। তিনি ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে পুত্র জাফরকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দান করে মিসর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় গভর্নর পদে নিয়োগ দেন।[১৮১] এ রকম মনোনয়নের সে সময় কোনো মূল্য ছিলনা। কেননা সেই সময় খিলাফতের সর্বময় কর্তা ছিলেন তুর্কি বাহিনী।

আবুল আব্বাস আহমদ মুতাজিদ বিল্লাহ (৮৯২-৯০১ খ্রি.)

৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মু'তামিদের মৃত্যুর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও মুওয়াফ্ফাকের পুত্র আহমদ মুতাজিদ বিল্লাহ উপাধি ধারণ করে খলিফা হন। সাহসী যোদ্ধা ও কর্মঠ, তেজোদীপ্তপূর্ণ ও জ্ঞানী এই শাসক ৯ বৎসর ৯ মাস রাজত্ব করেন। বনু আব্বাসের খলিফাদের মধ্যে মুতাজিদ সুদর্শন, সাহসী, নির্ভীক, জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান ছিলেন।[১৮২] তিনিই আব্বাসীয় শাসনামলে একমাত্র খলিফা যিনি শূন্য রাজকোষ পেয়েও শাসনকার্য বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা

---

[১৭৮] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, p. 485

[১৭৯] শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৭

[১৮০] S. M. Imamuddin, Vol. II, *op.cit*, p. 184

[১৮১] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, 2010, p. 486

[১৮২] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 296; মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৫২

করেন। প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস আস্ সাফ্ফাহ্-এর নীতির সাথে তাঁর নীতির মিল খুঁজে পাওয়া যায় বলে তাঁকে 'দ্বিতীয় সাফ্ফাহ্'[১৮৩] বলা হয়।

আবু মুহাম্মদ আলী আল-মুক্তাফি বিল্লাহ (৯০২-৯০৭ খ্রি.)

খলিফা আল-মুতাজিদ বিল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র আবু মুহাম্মদ আলী মুকতাফি রাক্কায় ছিলেন। তখন সৎ ও যোগ্য উজির কাসিম ইবন উবায়দুল্লাহ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন আবু আহমদ মুহাম্মদ আলী মুকতাফি-এর পক্ষে। মুকতাফি দ্রুত বাগদাদে পৌঁছে আবু মুহাম্মদ আলী মুকতাফি বিল্লাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পিতার ভূগর্ভস্থ কারাগারগুলো ধ্বংস করে মসজিদে পরিণত করেন। তাঁর পিতা প্রাসাদ নির্মাণ করতে যে জমি ও বাগান দখল করেন, সেগুলো প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দিয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেন।[১৮৪] তিনি মাত্র ৬ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করার পর দুর্ভাগ্যক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবুল ফজল জাফর আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ (৯০৮-৯৩২ খ্রি.)

খলিফা আল-মুকতাফি বিল্লাহ অসুস্থ থাকায় তিনি আশংকা করেছিলেন যে, যে কোনো সময় তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারেন। তাঁর পরে কে বাগদাদের খলিফা হবেন এ বিষয়ে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন নি। তাঁর সন্তানেরা সবাই ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক। তবে তিনি মৌখিকভাবে একবার তাঁর ভাই জাফর উত্তরাধিকারী হতে পারেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।[১৮৫] আল-মুকতাফি মৃত্যমুখে পতিত হলে তাঁর ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতা আবুল ফজল জাফর আল-মুকতাদির বিল্লাহ উপাধি ধারণ করে আব্বাসীয় খিলাফতে আরোহণ করেন।[১৮৬] তিনি প্রায় দীর্ঘ ২৫ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে ১৫ জন মন্ত্রীর উত্থানপতন হয়। তবে তুর্কি সেনাপতিরা তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর থেকে জোর করে 'আমিরুল-উমারা' পদলাভ করেন। তবে সেই সময় তুর্কিগণ এতে বেশি প্রভাব বিস্তার করে যে, তুর্কি সেনাবাহিনীর উত্থানে আব্বাসীয় ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তুর্কি সমরনেতাদের মাঝে কোন্দল থাকায় সে সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। সমরনেতাদের বলপ্রয়োগের কারণে খলিফা দুইবার সিংহাসনচ্যুত ও তিনবার খিলাফত লাভ করেন।[১৮৭] তাঁর সময়ে ইসলামি বিশ্বে আমরা তিনজন খলিফা একসাথে দেখতে পাই। উত্তর আফ্রিকায়

---

[১৮৩] খলিফা মুতামিদ আলাল্লাহর ভ্রাতস্পুত্র আহমদ মুতাজিদ বিল্লাহ্ আব্বাসীয় খিলাফতের ষোলতম খলিফা। ৮৯২ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে দীর্ঘ ৯ বছর ৯ মাস রাজত্ব পরিচালনা করেন। বনু আব্বাসের খলিফাদের মধ্যে মুতাযিদ সুদর্শন, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। তিনি এতই নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন যে, তিনি একাই বাঘের সঙ্গে লড়াই করতেন। তিনি যখন ক্ষমতায় আরোহণ করেন, তখন বাগদাদের কোষাগার প্রায় শূন্য ছিল। এ রকম পরিস্থিতি আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে ইতোপূর্বে আর লক্ষ্য করা যায়নি। শূন্য কোষাগার পূরণ করার লক্ষ্যে তিনি বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ প্রথম সাফ্ফাহর মতোই রক্তলোলুপ ও নৃশংস ছিলেন। তিনি রেগে গেলে প্রজাদেরকে ক্ষমা করতেন না। অপরাধীদের জীবন্ত পুঁতে ফেলতেন বলে তাঁকে তার পূর্বপুরুষ প্রথম সাফফাহ্র সাথে তুলনা করা হলেও তিনি কখনও অবৈধ রক্তপাত করেন নি। তিনি কখনো অনুসন্ধান ছাড়া কখনো কাউকে হত্যা করতেন না। তিনি সুশাসন ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাজ থেকে বিভিন্ন কুসংস্কার ও অত্যাচার দূরীভুত করেন। প্রতিটি রণাঙ্গনে তিনি অব্যর্থ ও সফল হওয়ায় সাম্রাজ্যে ভয় ও ত্রাসের উদ্রেক হয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কবিত্ব প্রিয়, বিচক্ষণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ। তিনি দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করে বনু আব্বাসের খিলাফতের ইমারতকে রক্ষা করেন বলে তাঁকে 'দ্বিতীয় সাফ্ফাহ' বলা হয়। বিস্তারিত দেখুন, Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, pp. 497-507

[১৮৪] M. A.Shaban, op.cit. pp.125-26; Ameer Ali, Syed, *op.cit*, p. 299

[১৮৫] William Muir, *op.cit*, p. 568

[১৮৬] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, p. 511; William Muir, *op.cit*, p. 568

[১৮৭] শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮

ফাতেমীয় খলিফা উবায়দুল্লাহ, স্পেনে তৃতীয় আবদুর রহমান এবং বাগদাদে খলিফা আবুল ফজল জাফর আল-মুকতাদির বিল্লাহ। এই তিনজন খলিফার শক্তি এতে দুর্বল ছিল যে, একজন খলিফা অপরজনকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ হলো, এই তিনজন খলিফাই নামেমাত্র খলিফা ছিলেন। তাঁরা কেউ দেহরক্ষীদের অধীন, কেউবা মন্ত্রীর অধীন আর কেউবা আমলাদের অধীনে ছিলেন।[১৮৮] রাজ্যের এ রকম বিশৃঙ্খলপূর্ণ অবস্থায় রাজমাতা রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করেও কোনো প্রকার শৃঙ্খলা আনয়ন করতে পারেন নি। কারণ দেহরক্ষী মুনিসের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। মুনিস ৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মুকতাদিরকে হত্যা করে।

আবু মনসুর মুহাম্মদ আল-কাহির বিল্লাহ্ (৯৩২-৯৩৪ খ্রি.)

খলিফা আল-মুকতাদির বিল্লাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা আবু মনসুর মহাম্মদকে আল-কাহির বিল্লাহ্ উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসানো হয়। যাদের কারণে তিনি খিলাফতের পদে আসীন হয়েছিলেন, তাদের চক্রান্তের কারণেই তিনি ৯৩৪ সালে সিংহাসনচ্যুত হন এবং তারা তাঁর চোখে সীসা ঢেলে চিরদিনের জন্য অন্ধ করে দেন।[১৮৯]

আবুল আব্বাস মুহাম্মদ আর-রাজী বিল্লাহ্ (৯৩৪-৯৪০ খ্রি.)

তুর্কি সেনাপতি ও সর্দারগণ প্রয়াত খলিফা আল-মুকতাদিরের পুত্র আবুল আব্বাস মুহম্মদকে আর-রাজী বিল্লাহ উপাধি দিয়ে খলিফা মনোনীত করে ৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর শাসনামলে প্রদেশগুলো একের পর এক স্বাধীন হতে থাকলে কার্যত মদিনাতুস-সালাম শুধু খলিফার হাতে থাকলো। এ সময় আমিরুল উমরা নামক একটি উচ্চতাসম্পন্ন পদ সৃষ্টি করে সামরিক বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত করা হয়। আমিরুল উমরাহদের ক্ষমতা এ সময় এতেঠ বেশি বৃদ্ধি পায় যে, খলিফা রাযীর নামের সাথে আমিরুল-উমরার নামও খুতবায় পঠিত হতো এবং মুদ্রায় অঙ্কিত হতো।[১৯০] সে সময় সামরিক প্রধানদের ক্ষমতা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, খলিফা নামে মাত্র খলিফা হতেন, সাম্রাজ্যের বাকি সমস্ত কার্যকলাপ কেবলমাত্র তুর্কি সেনাপতি ও সর্দারগণের হাতে ন্যস্ত ছিল। ৯৪০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আর-রাযী মৃত্যুবরণ করেন।[১৯১]

আবু ইসহাক ইব্রাহিম আল-মুত্তাকী বিল্লাহ্ (৯৪০-৯৪৪ খ্রি.)

তুর্কি সেনাপতিগণ ৯৪০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আর-রাজী বিল্লাহ্র মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতা আবু ইসহাক ইব্রাহিম নামক মুকতাদির বিল্লাহ্র আর এক পুত্রকে আল-মুত্তাকী বিল্লাহ্ উপাধি দিয়ে খলিফা বলে ঘোষণা করে। খলিফা মানসুর কর্তৃক নির্মিত মদিনা শরিফের গম্বুজকে বাগদাদের মুকুট মনে করা হতো। আব্বাসীয় খলিফাদের নিকট এর আলাদা গুরুত্ব ছিল। এ গম্বুজটি আল-মুত্তাকী বিল্লাহ যে বছর শাসনক্ষমতায় আরোহণ

---

[১৮৮] ড. ওসমান গনী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩২
[১৮৯] Sir Thomas W. Arnold, *op.cit*, p. 58
[১৯০] শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮; মফীজুল্লাহ কবীর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৯-২৬০
[১৯১] মফীজুল্লাহ কবীর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬০

করেন ঠিক সে বছর ভারী বর্ষণ ও বজ্রপাতের আওয়াজে ভেঙ্গে যায়।[১৯২] তাঁর প্রায় ৪ বৎসরের রাজত্বকালে আমিরুল উমারা পদের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। তাঁর সময়ে তুর্কিগণকে দমন করার জন্য বুয়াইদগণের সাহায্য চাওয়া হলে বুয়াইয়াগণ ক্রমে ক্রমে আব্বাসী সাম্রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে।[১৯৩] ৯৪৪ সালে তাঁকে অন্ধ করে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

আবুল কাসেম আবদুল্লাহ আল-মুস্তাক্ফী বিল্লাহ্ (৯৪৪-৯৪৫ খ্রি.)

তুর্কি সেনাপতি তুজুন খলিফা আল মুত্তাকী বিল্লাহ্কে অন্ধ করে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং মুকতাদির বিল্লাহ্র পুত্র আবুল কাসেম আবদুল্লাহ্কে আল-মুস্তাক্ফী বিল্লাহ উপাধি প্রদান করে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। খলিফা মুস্তাক্ফী বিল্লাহ তুর্কিদের অক্টোপাশ হতে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য বুয়াইয়া দলপতি আহমাদের[১৯৪] সাহায্য প্রার্থনা করলে বুয়াইয়া দলপতি সসৈন্য বাগদাদ প্রবেশ করলে তুর্কিগণ বাগদাদ হতে পলায়ন করেন। কিন্তু বুয়াইয়াগণ বাগদাদে প্রবেশ করে তুর্কিদের চেয়ে তারা বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। খলিফা আহমদকে বাগদাদের ত্রাণকর্তারূপে অভিহিত করে আমিরুল উমারা নিযুক্ত করেন এবং মুইজ্জদ্দৌলাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। খলিফা তাঁর হাতের পুতুল হলেন। এ প্রসঙ্গে আমির আলী বলেন-

> His position was like that of Charles Martel under the Merovingian kings of France, for he was the virtual sovereign, whilst the Caliph was merely his dependent, receiving a daily allowance of 5,000 dinars from the public treasuary.[195]

তারা তুর্কিদের চেয়ে বেশি প্রভাব খাটাতে শুরু করলে খলিফা তাদের শক্তি খর্ব করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা খলিফার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বুঝতে পেরে খলিফাকে পদচ্যুত ও অন্ধ করেন।[১৯৬] ইনি মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেন।

আবুল কাসেম আল ফজল আল-মুতী বিল্লাহ্ (৯৪৬-৯৭৩ খ্রি.)

মুইজ্জউদ্দৌলাহ্ খলিফা মুস্তাক্ফী বিল্লাহ্রে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর খলিফাকে পদচ্যুত করে তদস্থলে একজন শিয়া রাজকুমারকে সিংহাসনে বসাতে চাইলে মুইজ্জদ্দৌলার পরামর্শদাতাগণ শিয়া রাজকুমারকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বিরোধিতা করেন। তারা মুইজ্জদ্দৌলাকে পরামর্শ দেন যে,

---

[১৯২] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit,* p. 534
[১৯৩] মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৫৩
[১৯৪] দাইলামী উপজাতির নেতা আবু সূজা বুয়াইয়াহ্ নিজেকে পারস্যের কোনো রাজবংশের লোক বলে দাবি করেন। কিন্তু তিনি কোন বংশের লোক ছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না । তাঁর তিন পুত্র ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী, দ্বিতীয় পুত্র হাসান এবং কনিষ্ঠ পুত্র আহমদ। ৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তারা ইস্পাহান, কিরমান, সিরাজ প্রভৃতি অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। সিরাজ ছিল তাদের রাজধানী। খলিফা মুস্তাক্ফী বিল্লাহ তুর্কিদের অক্টোপাস হতে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে মুক্ত করার জন্য বুয়াইয়াগণের সাহায্য প্রার্থনা করলে তুর্কিগণ বাগদাদ ত্যাগ করে পলায়ন করেন সত্য কিন্তু বুয়াইয়াগণ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হন। কনিষ্ঠ আহমাদকে মুইজ্জুদ্দৌলাহ উপাধি প্রদান করেন। তাছাড়া বাগদাদে আমির-উল-উমারা নিযুক্ত হয়ে তিনি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন। দেখুন, Sir Thomas W. Arnold, *op.cit*, pp. 60-62
[১৯৫] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 303
[১৯৬] শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০

যদি আমরা সুন্নি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত রাখি তাহলে খলিফাদের ইচ্ছামতো ক্ষমতায় বসানো ও উঠানো যাবে। মুইজ্জদ্দৌলাহ এ পরামর্শ গ্রহণ করে মুকতাদিরের আর এক পুত্র আবুল কাসিম আল-ফজলকে আল-মুতী বিল্লাহ্ উপাধি দান করে ৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি ২৯ বৎসর কয়েক মাস রাষ্ট্রপরিচালনা করেন।[১৯৭]

আবু বকর আবদুল করীম আত্-তায়ী বিল্লাহ্ (৯৭৩-৯৯১ খ্রি.)

খলিফা আল-মুতী বিল্লাহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লে বুওয়াইহী আমিরের আদেশক্রমে তাঁর পুত্র আবু বকর আবদুর করীমের অনুকূলে খিলাফত ত্যাগ করেন।[১৯৮] আবদুল করীম আত্-তায়ী বিল্লাহ্ উপাধি প্রাপ্ত হয়ে ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় ১৮ বৎসর রাজত্ব করেন। এ সময় বুওয়াইয়াগণ ইচ্ছা করলে খিলাফতের সিংহাসন অধিকার করতে পারতেন কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা করেননি।

আবুল আব্বাস আহমদ আল-কাদির বিল্লাহ্ (৯৯১-১০৩০ খ্রি.)

আমিরুল উমারা বাহাউদ্দৌলাহ খলিফা আত্-তায়ী বিল্লাহকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর ভ্রাতা আবুল আব্বাস আহমদকে আল-কাদির বিল্লাহ্ উপাধি দিয়ে ৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসান। তিনি একজন গুণবান, দয়ালু, তাহাজ্জুদ গুজার, কর্মঠ, সদকা-খয়রাতকারী, ঝানু রাজনীতিবিদ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আব্বাসীয় খলিফাদের মাঝে মহান খলিফার খ্যাতি লাভ করেন।[১৯৯] তাঁর সময়ে বুয়াইয়া শক্তি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে এবং আব্বাসী খলিফাগণের শক্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। তিনি বুয়াইদদের শক্তি খর্ব করে আব্বাসীয় বংশকে নবজীবন দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে ৮৭ বৎসর বয়সে ৪১ বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করার পর বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন।[২০০]

আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-কায়িম বি-আমরিল্লাহ (১০৩০-১০৭৪ খ্রি.)

বার্ধক্যজনিত কারণে আল-কাদির বিল্লাহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তাঁর পুত্র আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-কায়িম বি-আমরিল্লাহ উপাধি লাভ করে ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন।[২০১] তাঁর সময়ে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এ সময় আব্বাসী খিলাফতে শিয়া বুয়াইয়াদের প্রভাব সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং সুন্নি সেলজুকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় যা

---

[১৯৭] শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০
[১৯৮] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, p. 549
[১৯৯] ড. ওসমান গনী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩২
[২০০] মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৫৪
[২০১] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, p. 573

পক্ষান্তরে আব্বাসীয় খলিফাগণের শক্তি ও সম্মান বৃদ্ধি করে। খলিফা এ সময় সেলজুক তুর্ক বংশের সম্রাট তুগ্রল বেগের সহযোগিতায় শত্রুপক্ষকে পরাভূত করেন।[২০২]

আবুল কাসিম আবদুল্লাহ আল-মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ্ (১০৭৫-১০৯৪ খ্রি.)

খলিফা কায়িমের মৃত্যুর তিন বছর পর তাঁর পৌত্র আবুল কাসিম আবদুল্লাহ আল-মুকতাদী বি আমরিল্লাহ ১৯ বছর ৩ মাস বয়সে ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের পদে আরোহণ করেন। তাঁর খিলাফতকালে খিলাফতের সীমানা বৃদ্ধি পায়।[২০৩] আব্বাসীয় বংশের অন্যতম দানশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পুণ্যবান, ধার্মিক এ খলিফা প্রায় ২০ বছর রাজত্ব করেন।

আবুল আব্বাস আহমদ আল মুস্‌তাজহির বিল্লাহ্ (১০৯৪-১১১৮ খ্রি.)

খলিফা মুকতাদী বিল্লাহ ১০৯৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস আহমদ আল মুস্‌তাজহির বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করে ১৬ বছর বয়সে খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শাসনামলে ইউরোপীয় খ্রিস্টান শক্তি পশ্চিম এশিয়ায় ক্রুসেড চাপিয়ে দেয়। সে সময় ক্রুসেডাররা বাগদাদ দখলের বৃথা চেষ্টা করেছিল। এ সময় বাগদাদের খলিফা ইসলামের পবিত্রতম স্থান রক্ষায় কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ইনিও পিতার মতো ধর্মপরায়ণ শাসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি দানশীল, উদার ও ওলামা প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[২০৪]

আবু মনসুর আল্ ফজল আল-মুস্‌তারশিদ বিল্লাহ্ (১১১৮-১১৩৪ খ্রি.)

খলিফা মুস্‌তাজহির বিল্লাহের পরলোকগমনের পর তাঁর পুত্র আবু মনসুর আল্ ফজল 'আল-মুস্‌তারশিদ বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হলেন। ১১১৮ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর প্রায় ১৭ বছর রাজত্ব করেন।[২০৫] বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও সাহসী এ বীর খিলাফতের কাজ সূচারুরূপে সম্পাদন করতেন। খিলাফতকে সুসংহত ও সুদৃঢ়করণে তিনি ব্যাপক অবদান রাখেন। সুন্দর হস্তাক্ষরের ক্ষেত্রে বনু আব্বাসের সকল খলিফাদের মধ্যে তিনি অগ্রজ ছিলেন। পিতার খিলাফতকালে তাঁর বাবা তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তার নামে খোদিত পয়সা চালু করেন।[২০৬] খলিফা মুস্‌তারশিদ সেলজুক পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির তৎপরতা চালিয়ে গেলেও তিনি সফলতা লাভ করতে পারেন নি। কারণ মুস্‌তারশিদ বিল্লাহ ও

---

[202] মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৪
[২০৩] Syed Ameer Ali, *op.cit,* pp. 314-315
[২০৪] Jalaluddin A's Suyuti, *Ibid,* p. 579; Syed Ameer Ali, *op.cit,* pp. 320-321
[২০৫] মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৪
[২০৬] Jalaluddin A's Suyuti, *Ibid,* pp. 586-587

সেলজুক আমিরুল উমারা মাসউদ এর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে মুস্‌তারশিদ বন্দি হন এবং মাসউদের তাঁবুতে অবস্থানকালে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।[২০৭]

আবু জাফর মনসুর আর-রশিদ বিল্লাহ (১১৩৪-১১৩৫ খ্রি.)

খলিফা আল-মুসতারশিদ বিল্লাহের পরলোকগমনের পর তাঁর পুত্র আবু জাফর মনসুর 'রশিদ বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে খলিফার পদে ১১৩৪ খ্রিস্টাব্দে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু রশিদ বিল্লাহ মাত্র কয়েক মাস খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খিলাফতে আরোহণ লাভ করে পিতার নীতি অনুসরণ করায় তাঁর ও সুলতান মাসউদের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় বাগদাদ ছেড়ে মসুল যেতে বাধ্য হলেন। তখন সুলতান মাসউদ রশিদের বিশ্বাসঘাতকার কথা প্রচার করে খিলাফতের আসন থেকে পদচ্যুত করেন।[২০৮]

আবু আবদুল্লাহ আল-মুক্‌তাফী বি আমরিল্লাহ্ (১১৩৫-১১৬০ খ্রি.)

খলিফা আবু জাফর মনসুর আর-রশিদ বিল্লাহের সিংহাসনচ্যুতির পর মুসতাজহিরের পুত্র আবু আবদুল্লাহ 'আল-মুক্‌তাফী বি আমরিল্লাহ্' উপাধি গ্রহণ করে ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর রাজ্য শাসন করে ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শাসনামলে 'আমিরুল উমারা' মাস্'উদ ও মান্‌যারের মধ্যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হলে খলিফা সুযোগমতো তাদের ক্ষমতা কমিয়ে দেন এবং নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন।[২০৯] ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ এই খলিফা স্বীয় চরিত্রবলে আব্বাসী বংশের গৌরব ফিরিয়ে এনেছিলেন। শেষের দিকে দুর্বল আব্বাসীয় খলিফাগণের মাঝে তিনি সেলজুকদেরকে বাগদাদ হতে বিতাড়িত করে তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তাকে আব্বাসীয় খলিফাদের মাঝে শেষ গৌরব বলা হয়।

আবুল মুজাফ্‌ফর ইউসুফ আল-মুস্তানজিদ বিল্লাহ (১১৬০-১১৭০ খ্রি.)

খলিফা মুক্‌তাফীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবুল মুজাফ্‌ফর ইউসুফ 'আল-মুস্তানজিদ বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে খিলাফতের সিংহাসনে সমাসীন হন। তিনি তাঁর পিতার ন্যায় দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে প্রায় ১১ বছর রাজত্ব করেন। শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর তিনি অনেক শুল্ক মাফ করে দেন। বখাটে ও সন্ত্রাসী লোকদের সাথে কঠোর আচরণ করলেও তিনি ইনসাফ, সুবিচার ও নমনীয় স্বভাবের লোক ছিলেন।[২১০] এ সময় আব্বাসীয় শাসন বাগদাদ ও এর কাছাকাছি কিছু এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ছিল।

---

[২০৭] S.M Imamuddin, Vol. II, *op.cit*, p. 229
[২০৮] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 337
[২০৯] মুসা আনসারী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬০
[২১০] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, pp. 602-603

আবু মুহাম্মদ হাসান আল-মুসতাদী বি-আমরিল্লাহ্ (১১৭০-১১৭৯ খ্রি.)

১১৭০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-মস্তানজিদ বিল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র আবু মুহাম্মদ হাসান ‘আল-মুসতাদী বি-আমরিল্লাহ’ উপাধি গ্রহণ করে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ে বাগদাদে ধর্মীয় আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় খলিফারা আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। তাঁর ১০ বৎসরের রাজত্বকালে তিনি ধার্মিক ও দানশীল খলিফা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[২১১] রাষ্ট্র থেকে অত্যাচার ও অনাচার বন্ধের জন্য তিনি সরকার প্রধান হওয়ার পর সকল শুল্ক মওকুফ করে দেন। তাঁর নিকট অর্থের কোনো মূল্য না থাকায় সর্বদা দান-সদ্কা করতেন। তাঁর খিলাফতকালে উমাইয়া বংশীয় শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।[২১২]

আহ্মদ আবুল আব্বাস আন্-নাসির লি দীনিল্লাহ্ (১১৭৯-১২২৫ খ্রি.)

খলিফা আল-মুসতাদী ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র আহ্মদ আবুল আব্বাস ‘আন্-নাসির লি দীনিল্লাহ’ উপাধি গ্রহণ করে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার সাথে সাথেই তিনি উমাইয়া খলিফা আল-হিশামের মতো খিলাফতের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর হলেন। খিলাফতের হৃত গৌরবকে পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর রাজত্বকালের ৪৬ বৎসর অক্লান্ত সাধনা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। বনু আব্বাসের খলিফাদের মধ্যে তিনি যত দীর্ঘ সময় ধরে খিলাফতের কাজ পরিচালনা করেছেন তা আর কোনো খলিফা পরিচালনা করতে পারেন নি।[২১৩] কঠোর পরিশ্রম করার পরও অর্থবল ও সামরিক শক্তি সীমিত থাকায় মূলত তিনি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হননি। ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে সত্তর বছর বয়সে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত থেকে মৃত্যুবরণ করেন।[২১৪]

আবু নসর মুহাম্মদ আজ্-জাহির বি আমরিল্লাহ্ (১২২৫-১২২৬ খ্রি.)

খলিফা আন্-নাসির লি দীনিল্লাহ ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র আবু নসর মুহাম্মদ ‘আজ্-জাহির বি আমরিল্লাহ’ উপাধি গ্রহণ করে খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় নয় মাসের মতো রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনকাল প্রকৃত অর্থে বিচার-বিশ্লেষণ করলে উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজের রাজত্বকালের কথা মনে করিয়ে দেয়। অল্প সময় রাজত্বকালের মধ্যেই তিনি ন্যায়বান, অমায়িক ও মহানুভব খলিফা হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ও পিতামহ যে সকল সম্পদ কুক্ষিগত করেছিলেন তিনি সেগুলো প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যের সকল কর মওকুফ করে দেন।[২১৫]

---

[২১১] মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৫
[২১২] Jalaluddin A’s Suyuti, *op.cit,* pp. 606-607
[২১৩] Jalaluddin A’s Suyuti, *Ibid*, p. 611; ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৫
[২১৪] ড. ওসমান গনী , *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৫
[২১৫] Jalaluddin A’s Suyuti, *op.cit,* p. 627; Syed Ameer Ali, *op.cit,* pp. 382-383

আবু জাফর মনসূর আল্-মুস্তানসির বিল্লাহ্ (১২২৬-১২৪২ খ্রি.)

খলিফা আজ্-জাহির বি আমরিল্লাহ ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র আবু জাফর মনসুর 'আল্-মুস্তানসির বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। ধার্মিক, দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ ও বিদ্যোৎসাহী এ নরপতি ১৬ বছর দক্ষতার সাথে রাজত্ব করে খিলাফতের ক্ষমতা ও গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।[২১৬] একজন প্রজারঞ্জক ও ন্যায়বিচারক শাসক হিসেবে তৎকালীন সময়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা ও হাসপাতাল নির্মাণ করেন।[২১৭] তিনি ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আবু আহমদ আবদুল্লাহ আল্-মুসতাসিম বিল্লাহ্ (১২৪২-১২৫৮ খ্রি.)

খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহ ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র ও সর্বশেষ আব্বাসীয় খলিফা আবু আহমদ আবদুল্লাহ 'আল্-মুসতাসিম বিল্লাহ্' উপাধি নিয়ে আব্বাসীয় বংশের সর্বাপেক্ষা সংকটময় মুহূর্তে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় বাগদাদের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এ সময় হানাফী ও হাম্বলী সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব, শিয়া সুন্নি সম্প্রদায়ের দাঙ্গা বাগদাদের নগর জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। খলিফা নিজে সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন। এ সময় শিয়াদের উপর ব্যাপক অত্যাচার নির্যাতন করা হয়। তাছাড়া খলিফা নিজে সুন্নি মতাবলম্বী হওয়ায় সুন্নিদের পক্ষ সমর্থন করছিলেন।[২১৮] খলিফা মনে হয় এ সময় ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি শুধু সুন্নি জনগণের খলিফা নন, তিনি সকল শিয়া-সুন্নিসহ সকল দল, মত, আদর্শ ও সম্প্রদায়ের খলিফা। শিয়াদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা মাত্রাতিরিক্ত হলে শিয়া সম্প্রদায়ের নেতারা তখন মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। হালাকু খান বিপুল বাহিনী নিয়ে মঙ্গোলিয়া ত্যাগ করে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য খলিফার সাহায্যও প্রার্থনা করেন। কিন্তু খলিফার পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দে আলামুত দুর্গসহ গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে[২১৯] নির্মূল করে

---

[২১৬] মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৫-১৫৬

[২১৭] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, p. 629

[২১৮] Syed Ameer Ali, *op.cit*, pp. 395-396

[২১৯] সেলজুক সুলতান মালিক শাহের রাজত্বকালে তাঁর মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলকের বন্ধু হাসান বিন-সাবাহ্ সেলজুক দরবারে উচ্চ রাজপদ না পেয়ে বন্ধুর উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে ফাতেমীয় আন্দোলনে যোগদান করে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। হাসান বিন সাবাহ্‌র পুরো নাম ছিল আল-হাসান-'বিন আলী বিন মুহম্মদ বিন-জাফর আল-হুসায়ন বিন-সাবাহ্ আল হিমায়রী। ইতিহাসে তিনি 'পর্বতের বৃদ্ধ লোক' (Shaikh-ul-Jabal : Old Man of the Mountain) হিসেবে পরিচিত। তরুণ বয়সে তিনি রায় নগরে শিয়া গুহ্য তত্ত্বে 'বাতেনী' মতে দীক্ষা লাভ করেন এবং কিছুকাল ফাতেমীয় মিসরে বসবাস করেন। কিছুদিন পরে ইরানে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ইসমাঈলী শিয়া মতাদর্শের প্রচার কাজে লিপ্ত হন। গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য ইতিহাস শুরু হয় ১০৯০ খ্রিস্টাব্দে । এ সময় তাঁর অনুসারীরা মাজেন্দ্রান আল বুরুজ পর্বত শ্রেণির গিরি সংকটে শক্তিশালী দুর্ভেদ্য দুর্গ আলামুত পর্বতে ঘাঁটি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন । দুর্গটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১০২০০ ফুট উচুতে ছিল। পর্বতের চূড়ায় বসবাসের কারণে তার আবাসস্থলকে 'ঈগলের বাসা' বলা হতো। ১০৯২ খ্রিস্টাব্দে হাসানের জনৈক গুপ্তচর মালিক শাহের মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলককে প্রথম হত্যা করেন। এরপর সেলজুক বংশের অনেককে তারা বিষ প্রয়োগে বা তরবারির আঘাতে হত্যা করেন। মালিক শাহ্ দু'বার আলামুত দুর্গে অভিযান পরিচালনা করে ব্যর্থ হন। এ সম্প্রদায়ের প্রধান কাজ ছিল রাজদরবারকে বিপর্যস্ত করে রাজ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করা এবং লোকদেরকে জোরপূর্বক শিয়া মতবাদে দীক্ষিত করা। এ সম্প্রদায়ের রাজ্যসীমা মাজেন্দ্রান (উত্তর পারস্য), ফারস, কুজিস্তান ও খুজিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে এদের কার্যকলাপ সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। এভাবে আলামত দুর্গ হতে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের তৎপরতার জাল বিস্তার করতে থাকে। আব্বাসীয় খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং প্রাচ্যের অধিবাসীদের উপর ধ্বংসাত্মক ও নৈরাজ্যবাদী কার্যক্রম পরিচালনা করে সর্বত্র ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এ রকম নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিতে হালাকু খান ১২৫৬ সালে আলামত দুর্গে অভিযান পরিচালনা করে এ দুর্গের পতন ঘটান। বিস্তারিত দেখুন, Rafi Ahmad Fidai, Vol. 3, *op.cit*, pp. 136-166; মুসা আনসারী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৫-৫৭

তাব্রিজের পথে বাগদাদের দিকে রওনা হন। খলিফাকে আত্মসমর্পণ করতে বললে খলিফা তা করতে অস্বীকৃতি জানালে হালাকু খান ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ অবরোধ করেন। তখন খলিফা হালাকু খানের নিকট আত্মসমর্পণ করতে চাইলে হালাকু খান তাতে অস্বীকৃতি জানান এবং ছয় সপ্তাহ যাবত বাগদাদে ভয়াবহ লুণ্ঠন, নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা, মসজিদ, প্রাসাদ, শিক্ষায়তন, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল ও সমাধিসৌধগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করা হয়। হালাকু খান নির্মমভাবে খলিফা, রাজপরিবারের সকল সদস্য ও তাঁর তিনশ অনুচরসহ ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে সকলকে হত্যা করে আব্বাসীয় খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটান।[২২০] হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংস ও পতনের পর সেখানে প্রায় দুই বছর খলিফা শূন্য থাকে।

আব্বাসীয় খিলাফতের খলিফা নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- আব্বাসীয় খলিফারা তাদের পূর্বসূরী উমাইয়াদের মতোই উত্তরাধিকার মনোনয়নের ধারা অনুসরণ করে।[২২১] আব্বাসীয় খলিফাদের প্রথম ১০ জন খলিফা উত্তরাধিকার মনোনয়নের ক্ষেত্রে একে অপরকে অনুসরণ করতো।
- উত্তরাধিকার নীতির প্রবর্তনের ক্ষেত্রে খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর যে নীতি প্রবর্তন করেন তা তাঁর বংশের গৃহীত নিয়মে পরিণত হয়।
- উমাইয়াদের মতো আব্বাসীয়রাও খিলাফতের ধারাকে তারা নিজেদের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে খলিফা মামুন ৮১৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তরাধিকার মনোনয়নের এই ধারা থেকে বের হয়ে শিয়া মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসা আল কাজিমের পুত্র আলী আল রিজাকে উত্তরাধিকার মনোনয়ন দেন। কিন্তু তার এ মনোনয়নে আব্বাসীয়সহ সর্বত্র নিন্দার ঝড় উঠলে পরবর্তীতে আল মামুন পুনরায় বংশগত উত্তরাধিকারনীতি চালু করেন।
- উত্তরাধিকার মনোনয়নের ক্ষেত্রে আব্বাসীয় খলিফাগণ নিজ পুত্র কিংবা ভ্রাতাকে মনোনয়ন দান করেন।
- উত্তরাধিকার মনোনয়নের ক্ষেত্রে কখনও কখনও আব্বাসীয় খলিফাগণের কেউ কেউ তাদের পুত্রদের মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের নীতি অনুসরণ না করে ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণ সৃষ্টি করেন। মনোনয়নের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ছেলেকে প্রথমত মনোনয়ন না দিয়ে কনিষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনীত করেন এবং তাঁর ঠিক সাত বছর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মনোনয়ন দেন এই শর্তে যে কনিষ্ঠ পুত্রের পর তুমি সিংহাসনে আরোহণ করবে। পরবর্তীতে তৃতীয় পুত্র মুহম্মদকে তৃতীয় উত্তরাধিকারী নিয়োগ দেন। ব্যতিক্রমধর্মী এ উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন খলিফা হারুন-অর-রশিদ। অবশ্য খলিফা হারুন-অর-রশিদ এ সম্পর্কে একটি চুক্তিপত্র তৈরি করে সেখানে উত্তরাধিকারীদের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

---

[২২০] Sir Thomas Arnold, Alfred Guillaume, *The Legacy of Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2009, p. 302; Al-Haj Mahomed Ullah, *op.cit*, p. 37, Joseph Hell, *op.cit*, p. 97; Robert Durie Osborn, *Islam Under the Khalifs of Baghdad*, Longman, London,1878, p. 401; Sir Thomas W. Arnold, *op.cit*, p. 81

[২২১] S. M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*, op.cit , p. 47

- খলিফা হারুন-অর-রশিদের পুত্র আল-আমিন সিংহাসনে আরোহণ করে পিতার মনোনয়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন। আল-আমিনের উজির ফজল-বিন-রাবি এবং পরবর্তীতে আলী-বিন-ঈসা-বিন-মাহান নামক সভাসদের মন্ত্রণার প্রভাবে পড়ে আমিন মনোনয়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে নিজের দুই ভ্রাতাকে বঞ্চিত করে দুই পুত্রকে মনোনয়ন দিয়ে পিতার মনোনয়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন।
- আব্বাসীয় খিলাফতে লক্ষ করা যায় যে, অধিকাংশ খলিফাই তাঁর পুত্রদের মনোনয়ন দান করে যেতেন। কিন্তু ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। নিজ পুত্র যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যোগ্য ভ্রাতাকে খিলাফতের জন্য মনোনয়ন দান করে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনয়ন দানের নজিরও লক্ষ্য করা যায়। যেমন- খলিফা মামুন তাঁর পুত্র আব্বাসকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত না করে ভ্রাতা আবু ইসহাক মুহম্মদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দান করে ফরমান জারি করেছিলেন। সৈন্যবাহিনী আব্বাসার মনোনয়নের জন্য প্রবল দাবি জানালেও তিনি পিতার অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে পিতৃব্যের নিকট আনুগত্যের শপথ করেন।
- আব্বাসীয় বংশের খলিফাগণ 'আহল-ই-রাসূল' তথা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পরিবারকে ক্ষমতার প্রকৃত দাবিদার হিসেবে উল্লেখ করেন। তারা খিলাফত দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সঙ্গে তাদের 'আত্মীয়তার নৈকট্যের' ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।
- খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উমাইয়ারা তাদের শাসন আমলে খলিফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো গোলযোগ বা বিভাজন মেনে নেয়নি। কিন্তু তাদের পরবর্তীতে আব্বাসীয়রা খিলাফতের এই ধারাকে ধরে রাখতে পারেনি।
- এক বা একাধিক উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে আব্বাসীয় খলিফারা বিভেদ বা জটিলতার সৃষ্টি করে। একাধিক খলিফা মনোনয়ন দেওয়ার কারণে উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আমিন ও মামুনের গৃহযুদ্ধ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উমাইয়া খলিফাগণ ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করলেও আব্বাসীয় শাসন ছিল পুরোপুরি ধর্মভিত্তিক শাসন। উমাইয়াদের ধর্মীয় উদাসীনতার ফলে জনগণ যে তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুদ্ধ হয়ে পড়েছিল সে সম্পর্কে আব্বাসীয়রা পরিপূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। ফলে খলিফা নির্বাচনের আব্বাসীয়রা নিজেদের স্বার্থেই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।
- খলিফা আবু জাফর হারুন আল-ওয়াসিক বিল্লাহর পর থেকে খলিফা নির্বাচনে তুর্কিদের অসীম প্রভাব লক্ষ করা যায়।
- খলিফা আবুল কাসেম আবদুল্লাহ আল-মুস্তাক্ফী বিল্লাহ্ তুর্কিদের হাত থেকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য বুয়াইয়াদের ডাকলে বুয়াইয়াগণ আহমদ এর নেতৃত্বে বাগদাদ থেকে তুর্কিদের বের করে দেন। আব্বাসীয় খিলাফত তুর্কিদের থেকে মুক্ত হলেও তাদের উপর নতুন বিপদ এসে আপতিত হয়। আর তা হলো বুয়াইয়াগণ তুর্কিদের চেয়েও বেশি প্রভাব আব্বাসীয় খলিফাদের উপর বিস্তার করে। এক বিপদ থেকে বাঁচার জন্য তারা আরও বড় বিপদ নিয়ে আসলো।
- খলিফা আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-কায়িম বি-আমরিল্লাহ এর শাসনামলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আর তা হলো এ সময় আব্বাসীয় খিলাফতে বুয়াইয়াদের প্রভাব সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে সুন্নি সেলজুকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

- আব্বাসীয় শাসনামলে খলিফা নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে এটা স্পষ্টত: লক্ষ করা যায় প্রায় ৫০০ বৎসরের অধিককাল আব্বাসীয়গণ শাসনক্ষমতা পরিচালনা করলেও প্রথম ১০০ বৎসর এই সাম্রাজ্যের খলিফাগণ তাদের নিজেদের মেধা, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং তাদের পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবেন তা নির্ধারণ করেন। কিন্তু প্রথম ১০০ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আব্বাসীয় খলিফাগণ তুর্কি, বুয়াইয়া ও সেলজুকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে কখনও পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন আবার কখনও তুর্কি, বুয়াইয়া ও সেলজুকগণ পরবর্তী খলিফা কে হবেন নির্ধারণ করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খলিফা পদটি নির্ভর করতো শাসক খলিফার উপর এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের বায়'আত গ্রহণের উপর। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে আসার পর সেখানকার যুদ্ধরত গোত্র ও গোষ্ঠীগুলোকে একই ভাবধারার প্রভাবে একটি মহান জাতিতে পরিণত করেন। রাসূল করিম (স.) মদিনায় যে রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সেই রাষ্ট্রের উপরই খোলাফায়ে রাশেদিনগণ (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) পর্যন্ত শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনকাল ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। এ সময় যারা খিলাফতের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন, তারা সবাই হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করে রাজ্যবিস্তারের পাশাপাশি একটি উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থাও প্রবর্তন করেন। এ সময় সর্বপ্রথম মুসলিম সাম্রাজ্যের কাঠামো সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। তবে হযরত মুহাম্মদ (স.) উত্তরাধিকার নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট নীতিমালা রেখে যাননি এবং এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা প্রদান না করায় উত্তরাধিকার নির্বাচনের ব্যাপারে সাহাবিগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলেও অধিকাংশ সাহাবিই সাধারণ নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন। রাষ্ট্রের সর্বময়কর্তা হিসেবে খলিফা জনসাধারণের সমর্থনক্রমে নির্বাচিত হয়ে তাদের নিকট যাবতীয় কার্যকলাপের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতেন। রাষ্ট্রের যে কোনো নাগরিক খোলাফায় রাশেদিনের ৩০ বৎসর শাসনামলে সরাসরিভাবে খলিফার কাছে তার অভিযোগ উত্থাপন করতে পারতো কিংবা খলিফার কাজের সমালোচনা করতে পারতো। সে সময় খলিফা ছিলেন ধর্মীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক শাসনকর্তা। ৬৩২ খ্রি. থেকে ৬৬১ খ্রি. পর্যন্ত যে খিলাফতের অস্তিত্ব ছিল সে সময়কালকে ইসলামের ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশেদুনের যুগ বলা হয়। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়াগণ রাজক্ষমতায় আরোহণ করলে খলিফা ও খিলাফত উভয় ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। কালের বিবর্তনে তা উপাধিতে পরিণত হয়ে পারিবারিক শাসন বা রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। বায়তুল মালের ব্যবহার খলিফার ইচ্ছার উপর নির্ভর করতো এবং এ সম্পদ খলিফার ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয়গণ উমাইয়া বংশের শেষ শাসক ২য় মারওয়ানকে জাবের যুদ্ধে পরাজিত করে রাজক্ষমতায় আসেন। আব্বাসীয়গণ ক্ষমতায় আরোহণ করে উমাইয়াগণের ন্যায় উত্তরাধিকারী নীতি অনুসরণ করায় ক্ষমতা ও আদর্শ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে খিলাফতে রক্তাক্ত ইতিহাসও সমান্তরালভাবে যাত্রা শুরু

করে। খিলাফতের রাজতান্ত্রিক যাত্রাপথে বিভিন্ন বিষয় এর সাথে অঙ্গীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। বহু বাধা ও প্রতিকূলতা পার হয়ে একটানা ৫০৮ বছর শাসন করে মোঙ্গল নেতা হালাকু খান কর্তৃক শেষ আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ ও পরিবারবর্গকে হত্যার মাধ্যমে আব্বাসীয় খিলাফতের পতন হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

মৌলিক মানবাধিকার

মানুষ এ পৃথিবীতে কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ অধিকারগুলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত নয়, বরং জন্মসূত্রেই স্বাভাবিকভাবে পাওয়ার ফলে দেশ-কাল, বর্ণ-ভাষা ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একই আদমের বংশধর প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে সে অধিকারগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য। এ অধিকারগুলো মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে আলাদা সত্তা ও স্বকীয়তা দান করে বিশিষ্টতা দেয়। এ অধিকারগুলোকেই একত্রে মানবাধিকার বলা হয়। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের মানদণ্ড হলো মানবাধিকার। মানবাধিকারের মধ্যে এমন কিছু অধিকার আছে যা ছাড়া সভ্য সমাজে স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ কল্পনা করা যায় না। আর এ অধিকারগুলোই হলো মৌলিক অধিকার। মানুষের মধ্যে মৌলিক মানবতার দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য করা চলবে না যতই মানুষের মধ্যে বংশ, রক্ত, বর্ণ, স্থান ও ভাষার দিক দিয়ে পার্থক্য থাক-না কেন। মানুষের এই মৌলিক অভিন্নতাই মানুষে-মানুষে সব বৈষম্যের ও ভেদাভেদের প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। এই পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্ব যত প্রাচীন, ইসলামে মৌলিক অধিকারের ধারণা তত প্রাচীন হলেও মানব ইতিহাসের শুরু থেকে ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত সময়ে মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রামের কোনো ইতিহাস আমরা জানি না। সে সময় অঞ্চলভিত্তিক শাসন হওয়ায় শাসকদের খেয়াল-খুশিমতো মুখোচ্চারিত বাণীই ছিল রাষ্ট্রের আইন। অধুনা পশ্চিমা তাত্ত্বিকগণ বলেন, মানবাধিকার সম্পর্কিত জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ ইউরোপ ও আমেরিকার দার্শনিক ও বিপ্লবীগণের চিন্তাধারার ফসল কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে তাদের এ সম্পর্কিত চিন্তাধারার ভিত্তিতে সাম্প্রতিককালে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অনেক পূর্বে আজ থেকে পূর্ণ চৌদ্দশত বছরের পূর্বে সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামে স্বীকৃত মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব কোরআন মজিদ ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এক ফলপ্রসূ দিক-নির্দেশনা উপস্থাপন করেছে। মূলত মানবাধিকারের ইসলাম চিহ্নিত বিষয়গুলো কোনো মানুষের পরিকল্পিত নয়। মানুষকে এই দুনিয়ায় পাঠানো এবং খেলাফতের পদে সমাসীন করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাকে অধিকার ও কর্তব্যের চেতনাশক্তি দান করে মানুষ হিসেবে তার অস্তিত্বের প্রশ্নে চাওয়া-পাওয়া, সহজাত মর্যাদার সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু জীবনযাপন ও বিকাশের স্বার্থসম্পর্কিত বিষয়গুলো শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ইসলামি আইনে সংযোজিত মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের নীতিসমূহই বর্তমানের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে পরিলক্ষিত হয়েছে। ইসলামি আইনে বর্ণিত মানবাধিকারসমূহ যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিকল্পিত, নির্ধারিত এবং ঘোষিত, সেহেতু কোনো প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এইগুলো স্থগিত রাখার কোনো বিধান

নেই। এতে কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা যাবে না এবং এই অধিকারগুলো পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী, পুরুষ সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

মানবাধিকার পরিচিতি ও বিভিন্ন ধারণা

আধুনিক গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের যুগে মানবাধিকার একটি বহুল আলোচিত বিষয় ও জনপ্রিয় ধারণায় পরিণত হয়েছে। মানুষ যে মানবীয় সত্ত্বায় অতুলনীয় এ কথা উচ্চারিত হয়েছে যেমন বেদ পুরাণে, তেমনি মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে; উচ্চারিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে, কবি কণ্ঠে ও বাউলের গানে। সুতরাং মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সবার উপরে।[১] তারপরেও বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে মানুষের অধিকার নানাভাবে খর্বিত হওয়ায় পৃথিবীর সর্বত্র সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, নাটক, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলাম থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে বিশ্বে যে বিষয়টি নিয়ে বেশির ভাগ মানুষ আলোচনায় মত্ত, বেশিরভাগ মানুষ যে কারণে উদ্বিগ্ন সেটি হচ্ছে মানবাধিকার।[২] অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি মানুষের মৌলিক অধিকার।[৩] মানবাধিকার হলো মানব ইতিহাস সংশ্লিষ্ট ধারণা, যা সমাজ এবং সামাজিক ভূমিকার বিষয়বস্তুকে পরিবর্তন করে। মানবাধিকার একটি গতিশীল ধারণা, যা সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য নিজেই সচেষ্ট। দেশ-কাল, বর্ণ-ভাষা ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষই জন্মগতভাবে কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় মানুষের অধিকারের বিষয়টি বিভিন্নভাবে লক্ষ করা যায়। কাজেই মানবাধিকারের অর্থ, পরিচয় ও এ সম্পর্কিত সমাজতান্ত্রিক, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও ইসলামি ধারণার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

মানবাধিকারের আভিধানিক অর্থ

আক্ষরিক অর্থে মানবাধিকার হলো মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা। তা সত্ত্বেও মানবাধিকারের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। মানবাধিকার শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো “Human rights”. Oxford Advanced Learners Dictionary তে ‘human rights’ এর পরিচয়ে বলা হয়েছে “One of the basic rights that every one has to be treated fairly and not in crual way, especially by their government.”[4]

মানবাধিকার শব্দটির বিশ্লেষণের ফলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো মানবের অধিকার বা মানুষের অধিকার। অতএব, মানুষ এবং অধিকার শব্দদ্বয় হচ্ছে মানবাধিকারের অন্তর্নিহিত বিষয়। শব্দ দু’টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে আইনগত অধিকার (Legal Rights) অথবা ইতিবাচক অধিকার

---

[১] গাজী শামসুর রহমান, *মানবাধিকারের ভাষ্য*, ১ম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৯-১০

[২] মোস্তফা জামান ভুট্টো, ‘*মানবাধিকার নিয়ে ভাবনা*’ Amity- A voice of Humanity Vol-1, No.-1,May 2002, P-1.

[৩] মো: মাহবুব উল হক জোয়াদ্দার, *আন্তজার্তিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১

[৪] A. S Hornby, *Oxford Advanced Learners Dictionary*, Oxford University Press, Sixty ed., London, 2002, p. 635.

(Positive Rights), মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights), মৌলিক মানবাধিকার (Basic Human Rights), এবং মানুষের জন্মগত অধিকার (Birth Rights of Man) এগুলো সবই মানবাধিকারের অর্থের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। মূলত মানব বা মানুষের পরিচিতি সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষের সাথে যে অধিকার শব্দটি আছে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। কেননা মানবাধিকার ধারণা ব্যাখ্যার পটভূমি হিসেবে অধিকার ধারণাটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। অধিকার (Rights) ব্যাপক এবং বিচিত্র অর্থবোধক ধারণা। অধিকারের আক্ষরিক অর্থ হলো দাবি। সাধারণ অর্থে অধিকার বলতে কোনো স্বত্ব বা দাবিকেই বুঝায়। কিন্তু এই দাবি স্বীকৃত বা সংরক্ষিত না হলে অধিকারের সৃষ্টি হয় না। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাকে অধিকার বলা হয়। মূলত অধিকার একটি বহুমুখী সামাজিক ধারণা (Multi-dimensions social concept)। অধিকারের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি বলেন, "Rights are those conditions of social life without which one man can seek in general to be himself at his best."[5]

এক কথায় বলা যায়, অধিকার হলো সমাজের সদস্য হিসেবে মানব ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ-সুবিধা। মানুষ বংশগতির মাধ্যমে যে অন্তর্নিহিত মানবীয় সুপ্ত প্রতিভা ও ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেগুলো বিকাশের অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধা হলো অধিকার।

মানবাধিকারের পারিভাষিক অর্থ

মানবাধিকার ধারণাটি সহজ কিন্তু সংজ্ঞায়িত করা কঠিন হলেও মানবাধিকারকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সাধারণ অর্থে মানবাধিকার বলতে সেসব মৌলিক এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকারকে বোঝায়, যেগুলো সামাজিক মানুষ হিসেবে বসবাসের জন্য অপরিহার্য। মানবীয় মর্যাদা ও স্বাধীনতা সহকারে জীবনযাপনের উপায় হলো মানবাধিকার। The New Encyclopedia Britannica -তে মানবাধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"Rights thought to belong to the individual under natural law as a consequence of his being human."[6]

Gealirth Alan মানবাধিকারের সংজ্ঞায় বলেন, "Human rights are aspecies of moral rights in which all persons are equal simply because they are human. Such rights can be arguable or justificable through a universal set of valid moral principles."[7]

---

৫ Harold J. Laski, *Grammar of Politics*, Unwin Hyman, 5th edition, New South Wales, 1967, p. 91
৬ *The New Encyclopedia Britannica*, Founded-1968, 15th edition, Printed in USA, Vol-5, p. 200
৭ Alan, Gealirth, *Human Rights : Eassys on Justification and Applications*, Chicago University Press, 1982, p. 1

Muhammad Zamir এর মতে, "Human rights have gradually evolved over the years and are based on mankind's measureing demand for a life in which the inherent dignity and worth of each human being will receive respect and protection."[8]

Robert L. Barker মানবাধিকারের সংজ্ঞায় বলেন, "Human rights are the opportunity to be accorded the same prerogatives and obligations as to race, sex, language or religion."[9]

গাজী সামছুর রহমান বলেন, "মানবাধিকার বলতে সেই অধিকারকে বোঝায় যা নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যা তাকে বিশিষ্টতা দেয় এবং যা হরণ করলে সে আর মানুষ থাকে না।"[১০]

মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, "এ দুনিয়ায় মানুষ কতাগুলো স্বতঃসিদ্ধ অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। দেশ-কাল, বর্ণ-ভাষা ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের বেলায়ই সে অধিকারগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য। এ কালের ভাষায় সে অধিকারগুলোকেই একত্রে বলা হয় মৌল মানবাধিকার, সংক্ষেপে মানবাধিকার (Human Rights)। এই মানবাধিকার এমনই একটি অলঙ্ঘনীয় বিষয় যে, একে হরণ কিংবা দলন করার অধিকার নেই দুনিয়াার কোনো শক্তির।"[১১]

মানবাধিকারের পরিধি

মানবাধিকারের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মানবাধিকার ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে; যদিও মানবাধিকার সর্বজনীন বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া বিশ্বের অন্যসব প্রাণীর অধিকার প্রকৃতিগতভাবেই নির্ধারিত আছে এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা তা লাভ করেছে, অথচ মজার বিষয় হলো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষই এমন এক জীব, যার মৌলিক অধিকার নিয়ে সকল কালের মানবীয় মেধা চিন্তা-ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকার পরও মানুষের নিকট সেই মানুষেরই অধিকার ধূল্যাবলুণ্ঠিত, পদদলিত, অপমানিত। মানবাধিকার বলতে মানুষের সেই অধিকারকে বুঝায় যা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে, যা তাকে মর্যাদা দান করে এবং যা হরণ করলে সে আর মানুষ থাকে না। অর্থাৎ মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে যেসব অধিকার থাকা আবশ্যক সেসব অধিকারের নাম মানবাধিকার।[১২] কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের পরিবর্তে বিশ্বমানব গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে মানবপ্রকৃতির জন্য মানুষ যেসব অধিকারগুলো লাভ করে, সেগুলো মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। মানুষ সামাজিক জীব হওয়ার কারণে তার পক্ষে একাকী জীবনযাপন সম্ভব নয়।

---

[৮] Muhammad Zamir, *Human Rights : Issues and International Law*, University Press Limited, Dhaka, 1990, p. 1

[৯] Robert L. Barker (edt.), *The Social Work Dictionary*, NASW, New York, 1995, p. 173

[১০] গাজী শামসুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১

[১১] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামে মানবাধিকার*, ২য় সংস্করণ, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১

[১২] রেবা মণ্ডল ও সাহজাহান মণ্ডল, *মানবাধিকার আইন*, সংবিধান, ইসলাম ও এনজিও,চট্টগ্রাম: প্রাইভেট লিঃ, ১৯৯৯,পৃ. ১

তাই সামাজিক জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির বলিষ্ঠতার জন্য এবং পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য সমাজের এক সদস্যের প্রতি অন্য সদস্যের অনেকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। এই দায়িত্বই হচ্ছে মূলত অধিকার। এ অধিকারগুলো মানুষকে বিশিষ্টতা দেয়, অন্যান্য জীব থেকে তাকে আলাদা সত্তা ও স্বকীয়তা দান করে, ফলে এ অধিকারগুলো হরণ করা হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। মানুষ জন্মসূত্রে চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং কথা বলার যোগ্যতা নিয়ে জন্মায়। এ ক্ষমতা কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের প্রদত্ত নয়। মানুষের জীবনটাও কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দান নয়। সুতরাং এগুলো কেড়ে নেওয়ার অধিকারও কারো থাকার কথা নয়। ইসলাম এই পৃথিবীতে সকলের অধিকারকেই সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়েছে। সে মানবাধিকারের পোশাকে মানুষকে শেডিয়ুল কাস্ট, শেডিয়ুল ট্রাইব, কামার-কুমার, আদি জাতি-উপজাতি, বাগদি-মুচি, জেলে, ডোম, বেদে, নাপিত, বাউল, সাঁওতাল, সুঁড়ি, মাঝি, মাল প্রভৃতি নানা নীচু বর্ণে বন্দি করে রাখে নি। তুলে নিয়েছে আপন পাশে। ইসলাম মানবাধিকারকে মানবীয় মর্যাদার সাথে উন্নীত করেছে। এসব অধিকার বর্ণ, ধর্ম, অঞ্চল, ভাষা, লিঙ্গ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে শুধু মানব প্রকৃতির জন্য সর্বজনীনভাবে মানুষ লাভ করে। আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা মানুষ। মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে প্রমাণ করার অন্যতম বাহন হলো মানবাধিকার। মানবাধিকারের মাধ্যমে মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে নিজেকে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত করে। মানবাধিকার ছাড়া মানুষের পূর্ণতা আসে না, মানুষ পরিপূর্ণরূপে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। নিচে মানবাধিকারের পরিধি তুলে ধরা হলো :

- মানবাধিকার কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণিবিশেষের অধিকার নয় বরং সকল ব্যক্তির, শ্রেণির এবং দেশের অধিকার। মানবাধিকার যেমন সকলের অধিকার, তেমনি এই অধিকার সকলের সমানভাবে প্রাপ্য। রাজা-প্রজা, ইমাম-মুয়াজ্জিন, শিল্পপ্রতি-শ্রমিক, চাকুরিজীবী-বেকার, গুরু-পুরোহিত, মজুর ও দরিদ্র সকলের জন্য সমান অধিকার। বিশেষ মর্যাদার কারণে মানবাধিকার ইতর বিশেষ পার্থক্য করে না। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিরই একই সাধারণ জৈবিক পদ্ধতিতে পৃথিবীতে আগমন ঘটে সুতরাং প্রত্যেকেই কোনো সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে একই ধরনের অধিকার একইভাবে সংক্ষণের অধিকারী। জীবনের বৃহৎ এলাকায় সকল মানুষ অভিন্ন, এক। মানুষ কর্তৃক সৃষ্টি বৈষম্য যেমন–ধর্ম, জাত, বর্ণ, গোষ্ঠী, সমাজ, জন্মস্থান, নারী, পুরুষ সেগুলোর কারণে মানুষের অধিকারে কোনো পার্থক্য হওয়া উচিত নয়। মুসলমান-হিন্দু, আশরাফ-আতরফ, ব্রাহ্মণ, শুদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, রাজা-প্রজা, শিল্পপতি-শ্রমিক, ধনী-দরিদ্র এসব বিভাজনের কারণে মানুষের অধিকারে তারতম্য বা হেরফের করা মানবাধিকার পরিপন্থি।[১৩]

[১৩] গাজী শামসুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, জীবিকা অর্জন, সম্পত্তির মালিকানালাভ সংরক্ষণ, জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের অবাধ অধিকার, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার, অবসরের অধিকার, ধনীদের সম্পদে গরিব অনাথ মানুষের অধিকার প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকার অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থনীতি মানবজীবনের যেসব দিক ও বিভাগ নিয়ে আলোচনা করে সেগুলোর সাথে অর্থের সম্পর্ক রয়েছে। তেমনি ব্যক্তির যেসব অধিকারের সাথে অর্থের যোগ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক অধিকার।[১৪] অন্যভাবে বলা যায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের সুবিধা ও সুযোগকে অর্থনৈতিক অধিকার বলা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুধা হতে মুক্তি, চাকুরি গ্রহণের সুযোগ, কর্মসংস্থান প্রভৃতিকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রয়োগের ফলে যেরূপ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা যায়, তেমনি অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ফলেই অর্থনৈতিক অধিকার উপভোগ করা সম্ভবপর হয়।[১৫]
- জাতি, ধর্ম-বর্ণ, গোত্র-লিঙ্গ নির্বিশেষে সম মানবাধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, জান-মালের নিরাপত্তা, বেঁচে থাকার অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, চলাফেরার অধিকার, বিনোদনের অধিকার, খেলাধুলায় অংশগ্রহণের অধিকার, সৃজনশীল কর্মের স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার, অক্ষমতা ও বার্ধক্যে সহায়তা, চুক্তির অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পরিবার গঠন, ভোটাধিকার, নির্বাচিত করার এবং নির্বাচিত হবার অধিকার, রাজনৈতিক তথা নাগরিক অধিকার, সভা-সমিতি, সংগঠন ও জনমত গঠনের অধিকার, ধর্মকর্ম পালনের অবাধ স্বাধীনতা, সরকারি চাকুরিলাভের অধিকার, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার লাভের অধিকার এবং বিবাহ-তালাক ইত্যাদি সামাজিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।
- পিতা-মাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহমমতা প্রদর্শন, সমাজের দরিদ্র অসহায়, বিধবা, ইয়াতিম, অধিকারবঞ্চিত মজলুম মানুষের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ, মেহমান-মুসাফিরদের আপ্যায়ন করা, মালিকানার অধিকার, মজুরি প্রাপ্তির অধিকার, মোহর প্রাপ্তির অধিকার, প্রতিশোধ ও প্রতিদানের অধিকার, সৎকর্মের আহবান, অসৎ কর্মের প্রতিরোধ, শ্লীলতার প্রসার ও অশ্লীলতা প্রতিরোধ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা, সর্বশ্রেণির মানুষের প্রতি ভদ্রতা-সৌজন্য প্রদর্শন করা ইত্যাদি নৈতিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

---

[১৪] ঐ, পৃ. ৪৫৭

[১৫] ড. এমাজউদ্দিন আহমেদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৪০৫

মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য

মানবাধিকারের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো দুইটি।[১৬] আর তা হলো সার্বজনীন সহজাততা এবং অহস্তান্তরযোগ্য। এ দুইটি বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানবাধিকার অন্যান্য অধিকার থেকে আলাদা এবং অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।[১৭] নিম্নে মানবাধিকারের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। যথা:

ক. সার্বজনীন সহজাততা

মানুষ জন্মগতভাবে কিছু সহজাত মানবাধিকার নিয়ে জন্মলাভ করে যা সমাজের সদস্য হিসাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের ক্ষেত্রে সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিধায় তার জন্মস্থানে বসবাস, অবস্থান এবং সম্পর্ক গড়ে তোলা তার জন্মগত অধিকার। এটা প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights) হিসাবে স্বীকৃত হয়; যা প্রতিটি মানুষ স্থান-কাল-পাত্রভেদে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বেড়ে ওঠে এবং পরিচিতি লাভ করে। সভ্যতার বিকাশ হবে, চলতে থাকবে মানবজীবন, সময়ের চাকা ঘুরতে থাকবে, সমাজ পরিবর্তন হবে, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মানুষের জীবন-জীবিকার পার্থক্য হবে কিন্তু পরিবর্তন হবে না মানবাধিকার। মানবাধিকার হচ্ছে এমন কতকগুলো অধিকার যেগুলো সকল সময়ের, সকল স্থানে, সকল মানুষের জন্য। আর সে জন্যই এই অধিকারগুলোকেই বলা হয় সর্বজনীন। এই অধিকারগুলো শাশ্বত এবং চিরন্তন।

খ. অহস্তান্তরযোগ্য

মানবাধিকারগুলো অহস্তান্তরযোগ্য। কারণ বিবেকসম্পন্ন মানবগোষ্ঠী অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট এমন কি নিজ ইচ্ছাশক্তির নিকটও মানবাধিকারগুলো সমর্পণ করতে পারে না। মানবাধিকার লংঘন করলে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ পশুর পর্যায়ে নেমে যায়। ফলে মানবাধিকার অলঙ্ঘনীয়। মর্যাদা ও সম্মানজনকভাবে মানবজীবন পরিচালনার জন্য মানবাধিকারের প্রয়োজন অপরিহার্য। মানবাধিকারের অস্বীকৃতি সমাজ ও জাতির মধ্যে বৈষম্য, রেষারেষি, অত্যাচার-অবিচার ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে, মানব পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য সহজাত, সর্বজনীন ও অহস্তান্তরযোগ্য কিছু অধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার।[১৮] মানবাধিকার এমন একটি সর্বজনীন বিষয়, যা আদর্শিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক সীমানার আওতায় সীমাবদ্ধ করা যায় না। মানবাধিকার কোনোভাবে সমর্পণযোগ্য নয় বা আত্মসমর্পণের মাধ্যমে হস্তান্তর অথবা বিচ্ছিন্নভাবে উপভোগ করা যায় না।

---

[১৬] Karel Vask, *The international Dimaension of Human Rights*, Vol, 1, p. 43

[১৭] Paul Sieghart, *The international law of Human Rights*, Vol, 1, p. 1983

[১৮] মহাম্মদ শফিক আহমেদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *ইসলামে মানবাধিকার নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা ৪৭, ৪৮, ৪৯, অক্টোবর ১৯৯৩, পৃ. ১৫৩

মানবাধিকারের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

মানবাধিকারের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

১. মানুষের অধিকার

যে অধিকার একান্তভাবে মানুষের অধিকার, তাকেই মানবাধিকার বলা হয়। পশু-পাখি ও মানুষ উভয়ের মাঝে প্রাণ আছে বিধায় উভয়ে প্রাণী কিন্তু এই দুই শ্রেণির প্রাণীর মধ্যে নিশ্চয়ই তফাৎ আছে। মানুষ যা পারে পশু-পাখি তা পারে না বলেই মানুষের এই বিশেষ ক্ষমতাই তার বিশেষ অধিকার। মানুষ অনর্গল কথা বলতে পারে, চিন্তা ও উদ্ভাবন করতে পারে এবং চলাফেরা করতে পারে কিন্তু পশু-পাখির এই ক্ষমতা বা শক্তি নেই বিধায় মানুষকে পশু-পাখি থেকে পৃথক করেছে। মানুষের এসব অধিকারের ক্ষেত্রে তাকে বাধাহীন হতে হবে। এসব ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা থাকতে হবে। চিন্তা, ভাবপ্রকাশ, চলাফেরা, কথা বলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা থাকাই মানবাধিকার। অকারণে এসব ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা মানবাধিকার পরিপন্থি।[১৯] মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করতে গিয়ে বিচারপতি জ্যাকশন বলেন, "কোনো ব্যক্তির জীবন, মালিকানার স্বাধীনতা, বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনির স্বাধীনতা, ইবাদত-বন্দেগি ও সমাবেশের স্বাধীনতা এবং অনুরূপ অন্যান্য অধিকার জনমত যাচাইয়ের জন্য দেওয়া যায় না। তার নির্ভরযোগ্যতা নির্বাচনসমূহের ফলাফলের উপর কখনও ভিত্তিশীল নয়।"[২০]

২. সকল মানুষের অধিকার

মানবাধিকার হচ্ছে সকল মানুষের অধিকার। এ অধিকার কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণি বা দেশের অধিকার নয়। স্থান-কাল-পাত্রভেদে মানবাধিকারের কোনো তারতম্য ঘটে না। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকার পার্থক্য হবে কিন্তু মানবাধিকারে কোনো পরিবর্তন হবে না। জীবনের বৃহৎ এলাকায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। এই অভিন্ন এলাকায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জমিদার, প্রজা, শিল্পপতি, শ্রমিক, ধনী, দরিদ্র এসব বিভাজনের কারণে মানুষের অধিকারের তারতম্য করা বা যে কোনো ধরনের বৈষম্য মানবাধিকারের পরিপন্থি।[২১] মৌল মানবিক চাহিদাগুলো সামাজিক জীব হিসাবে বসবাসের জন্য সর্বজনীনভাবে সব সমাজের, সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

---

[১৯] গাজী শামসুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩

[২০] A. K. Brohoi, *Quotation in United Nations and Human Rights*, Karachi, 1968, p. 313

[২১] গাজী শামসুর রহমান, *পূর্বোক্ত*,পৃ. ১৩

৩. মানবাধিকারগুলো পরস্পর নির্ভরশীল

মানবাধিকারগুলো পরস্পর নির্ভরশীল। একটার সাথে অন্যটা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্য জরুরি, তেমনি সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত না হলে খাদ্যের নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। খাদ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণ করা কঠিন। উক্ত উদাহরণের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানবাধিকারগুলো পরস্পর নির্ভরশীল। মানবিক মর্যাদা নিয়ে বসবাসের জন্য প্রত্যেকটি মানবাধিকার সমান গুরুত্ব বহন করছে।

৪. মানবাধিকার ক্রমপরিবর্তনশীল একটি চিন্তা

সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে মানবিক চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা হতে মানবাধিকার ধারণার উদ্ভব। মানবিক চাহিদা ধারণাটি পূর্ণাঙ্গ না হলেও, মানুষের সহজাত গুণাবলি বিকাশের জন্য মৌল মানবিক চাহিদার ধারণা পরিপূর্ণ ধারণা হিসেবে বিবেচিত। মৌল মানবিক চাহিদাগুলো সামাজিক জীব হিসেবে বসবাসের জন্য সর্বজনীনভাবে সব সমাজের, সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মৌল মানবিক চাহিদাগুলো সকল মানুষের জন্য পূরণ করা অত্যাবশক হলেও তা কখনো পরিপূর্ণভাবে সম্ভব হয় নি। মানবসৃষ্টির পর মানব ইতিহাসে মানবাধিকারের চিন্তা সবকালে এক ধরনের ছিল না; বরং যুগে যুগে এতে নানা রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। মানবাধিকারগুলো ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একটা অধিকার অর্জনের ভিত্তিতে পরবর্তী অধিকারগুলো পর্যায়ক্রমে নিশ্চিত হয়। কোনোকালে একটা অধিকারকে মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয় বলে মনে হলে অন্যকালে এসে এ অধিকারটিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এক অঞ্চলে একটি অধিকারকে মানবাধিকার বলে স্বীকৃতি দিলে অন্য অঞ্চলে ওই অধিকারটি মানবাধিকার বলে স্বীকৃতি পায়নি।[২২] বরং এটা ক্রমপরিবর্তনশীল একটি চিন্তা। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে মানুষ সরকার গঠন করে যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। আর এ ধরনের প্রচেষ্টা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানবাধিকার ক্রমবিকাশের ধারা। মানবাধিকার বিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে মানবাধিকার ধারণার প্রসার এবং প্রকাশে আইন অত্যাবশ্যকীয় ভিত রচনা করলেও মানবাধিকারের সঠিক বুনিয়াদ ও ভিত্তি রচিত হয়নি যার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল প্রান্তে মানবাধিকারকে নির্ণয় করা যায় এবং তা সংরক্ষণের দাবি করা যায়। হযরত মুহাম্মদ (স.) পৃথিবীতে আগমন করে তৎকালীন পৃথিবীতে মানবাধিকারের সঠিক বুনিয়াদ ও ভিত্তিস্থাপন করে দিয়েছেন। তিনি মানব জাতির উদ্দেশে এমন কিছু মৌল চিন্তা ও বুনিয়াদি বিষয় উপস্থাপন করেছেন যেগুলোর ভিত্তিতে কোনটি মানুষের মৌলিক অধিকার ও সংরক্ষণযোগ্য বিষয় আর কোনটি নয় তা সহজেই চিহ্নিত করা যায়।[২৩]

[২২] মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, অনু. মুফতী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, আশরাফিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৮
[২৩] ঐ, পৃ. ১০

মানবাধিকারের প্রকারভেদ

মানবাধিকার একটা ব্যাপক এবং পরিবর্তনশীল ধারণা। মানবাধিকার এবং মানবিক চাহিদার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মানবাধিকারগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা গেলেও মানবাধিকার প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা:

ক. **মৌলিক মানবাধিকার (Fundamental Rights)**

মৌলিক মানবাধিকার হলো মানুষ কোনো রাষ্ট্রের পরিবর্তে বিশ্বমানব গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে মানবপ্রকৃতির জন্য যেসব অধিকার লাভ করে। যেসব অধিকারে মানুষ তার আপন সত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য এবং তার স্বকীয় আদর্শ বাস্তবায়নের পথে অবাধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে এবং এই সহজাত ও অর্জিত ক্ষমতার পূর্ণ ও অবাধ ব্যবহার করতে পারে।[২৪] মানুষের কতকগুলো স্বাভাবিক ও সহজাত মৌলিক অধিকার রয়েছে। কোনো প্রকার আইন বা সংবিধান এই অধিকারসমূহকে খর্ব করতে পারে না। এই অধিকার প্রাকৃতিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত।[২৫] এসব অধিকার বর্ণ, ধর্ম, অঞ্চল, লিঙ্গ, ভাষা ইত্যাদির ঊর্ধ্বে শুধু মানবপ্রকৃতির জন্য সর্বজনীনভাবে মানুষ লাভ করে। R.C. Agarwal মৌলিক অধিকারের ধারণা ব্যাখ্যায় বলেন:

> By fundamental rights, we mean those rights which from the essential conditions of good life and which constitute the essential of human progress. In the absence of these rights the growth and development of human personality is not possible.[26]

খ. নাগরিক অধিকার (Citizen Rights)

কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ বা নাগরিক হবার কারণে এবং রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা সমর্থিত, সংরক্ষিত ও অনুমোদিত অধিকারগুলোকে নাগরিক অধিকার বলা হয়। মানবপ্রকৃতির জন্য নয়; বরং রাষ্ট্রের নাগরিক হবার কারণে মানুষ আইন দ্বারা সংরক্ষিত ও অনুমোদিত অধিকারগুলোকে নাগরিক অধিকার বলা হয়। মানবাধিকার যখন ক্রমবিকাশের মাধ্যমে আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হয়, তখন সেগুলো মানবাধিকারে রূপান্তরিত হয়। নাগরিক অধিকারকে আইনগত অধিকারও বলা হয়। নাগরিক অধিকারগুলো বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী কয়েক ধরনের হয়। যথা:

ক. সামাজিক অধিকার (Social rights)

খ. অর্থনৈতিক অধিকার (Economic rights)

গ. রাজনৈতিক অধিকার (Political rights)

ঘ. কল্যাণমূলক অধিকার (Welfare rights)

---

২৪ গাজী শামসুর রহমান, *পূর্বোক্ত*,পৃ. ১৮৪

২৫ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিভাষা, *বাংলা একাডেমী*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১১৬

26 R.C. Agarwal, *Political Theory*, S. Chand & Co. Ltd., New Delhi, 2002, pp.182-183

আবার প্রকৃতিগত দিক থেকে মানবাধিকারকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা:

ক. নেতিবাচক অধিকার : এর আওতায় আছে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার।

খ. ইতিবাচক অধিকার : অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার।

গ. মৌল অধিকার : এটি হলো সর্বজনীন ঘোষণার অধিকার ও স্বাধীনতা যাতে পূর্ণতরভাবে অনুধাবন হতে পারে সে জন্য সামাজিক ও আন্তজার্তিক নিয়ম ব্যবস্থায় প্রত্যেকের অধিকার নিশ্চিতকরণ।[২৭]

স্বীকৃতির দিক হতে মানবাধিকার শ্রেণিকরণ : স্বীকৃতির দিক হতে মানবাধিকারগুলো নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা:

ক. আইনগত বা স্বীকৃত মানবাধিকার (Legal or Recognised Human Rights)

খ. নৈতিক বা স্বীকৃতিহীন মানবাধিকার (Moral or Unrecognised Human Rights)

গ. প্রত্যক্ষ আইনগত মানবাধিকার (Direct Legal Human Rights)

ঘ. পরোক্ষ আইনগত মানবাধিকার (Indirect Legal Human Rights)

ঙ. পরিপূর্ণ মানবাধিকার (Perfect Human Rights)

চ. অসম্পূর্ণ মানবাধিকার (Imperfect Human Rights)

মানবাধিকারের বিকাশ

মুসলিম হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা আমাদের কাছে নতুন নয়। এই পৃথিবীতে মানব জাতির অস্তিত্ব যখন থেকে শুরু ঠিক তখন থেকেই ইসলামে মৌলিক অধিকারের আবির্ভাব। আল্লাহ্‌র এ সৃষ্টি-জগত যেমন সুন্দর, নিখুঁত ও সুনিয়ন্ত্রিত, মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র জীবনবিধানও তেমনি নির্ভুল, নিখুঁত ও সুনিয়ন্ত্রিত। ফলে মানবাধিকার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বিধানও তেমনি নির্ভুল ও ন্যায়সঙ্গত। মানবজাতি এক আদম থেকে সৃষ্টি বিধায় সকল মানুষ একই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং মানুষ হিসেবে তাদের সকলের মর্যাদা ও অধিকার সমান হলেও বিশ্বাসের কারণে মানুষের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বিশ্বাসের কারণে কেউ মুসলিম ও কেউ অমুসলিম হয়। মুসলিম-অমুসলিম এ বিভক্তির কারণে মানবাধিকারের বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি ধারা লক্ষ করা গেলেও নীতিগতভাবে মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই- সকল মানুষ সমান। মানুষের মাঝে এ বিভক্তির কারণে মানবাধিকারের বিকাশকে দুটি ভাগে আলোচনা করা হলো: (১) মানবাধিকারের ক্রমবিকাশে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদসহ অমুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি ও (২) মানবাধিকারের ক্রমবিকাশে ইসলাম।

---

[২৭] IFSW & IASSW, *Teaching and larning about Human Rights : A Manual for Schools for Social Work Profession*, UN Centre for Human Rights, Geneva, 1992, p.4

১. মানবাধিকারের ক্রমবিকাশে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদসহ অমুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি

আমরা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের নিকট আদি, মধ্য ও আধুনিক পৃথিবীতে মানবাধিকার ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস পাই, যাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কীভাবে মানবাধিকারের বিকাশ হয়েছে। মানবাধিকারের এ বিকাশকে দুটো ধারায় বিভক্ত করা যায়। যথা:

ক. প্রাচীন যুগে মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ ও খ. আধুনিক যুগে মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ

ক. প্রাচীন যুগে মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ

মানবাধিকার বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানবাধিকার ধারণার বিকাশ কেবল কয়েক দশক ধরে নয় বরং পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর হয়ে আসছে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ মৌলিক মানবাধিকারের ধারণার বিবর্তনশীল ইতিহাসের সূচনা কখন থেকে হয় তা যথাযথভাবে না জানলেও এটা সত্য যে, যে দিন থেকে এই দুনিয়ায় মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন সূচিত হয়েছে, সেদিন থেকে মানবাধিকার সমস্যাটি প্রচণ্ডভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে। তা সত্ত্বেও মানবতার প্রাচীন ইতিহাসে মানবাধিকার স্বীকৃতির উল্লেখ খুব বেশি পাওয়া যায় না। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন লিপিবদ্ধ Code of Justice প্রণয়ন করেন ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবি (King Hammurabi)। খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ সালে রাজা হাম্মুরাবি প্রণীত Babylonia Code থেকে জানা যায় যে, বিপদকালে নাগরিকগণ পরস্পরকে সাহায্য করার তিনি ২৮২টি বিধি প্রণয়ন করেন। মানুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বলিত রাজা হাম্মুরাবি প্রণীত Code of Justice লিখিত বিধান হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।[২৮] পরবর্তীতে মানুষের অধিকার সংরক্ষণে প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথার কার্যকারিতা লোপ পায় এবং তদস্থলে লিপিবদ্ধ বিধান তথা আইন অধিক কার্যকর বলে বিবেচিত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে গ্রিকে দানশীলতাকে 'Acts of love for humanity' হিসেবে গ্রিক নগররাষ্ট্রে (Greek City States) প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের মাধ্যমে মানবাধিকারকে সমুন্নত করার চেষ্টা করা হয়।[২৯] তবে সে সময় প্রাচীন ভারতের অনুরূপ জাতিভেদ প্রথা প্রাচীন গ্রিসেও লক্ষণীয়। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) তাঁর *The Republic* গ্রন্থে শাসনক্ষমতা শুধু সমাজের এলিট বা দার্শনিক শ্রেণির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত করার অভিমত ব্যক্ত করেন এবং সমাজের অবশিষ্ট লোকদের তিনি সৈনিক, কৃষক ও দাস ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। প্লেটোর ন্যায়বিচারের ধারণা হলো: গণতন্ত্র বিভেদের জন্মদানকারী এমন একটি সরকারব্যবস্থা

---

[২৮] Stanley A. Cook, *The Laws of Moses and the Code of Hammurabi*, Cosmo Classics, New York, 2010, pp. 8-10

[২৯] Ian Morris, *Burial and Ancient Society: The Rise of the Greek City State*, Cambridge University Press, 1987, pp. 1-14

যা বিশৃঙ্খলা ও বাড়াবাড়িতে পূর্ণ এবং অসমপ্রকৃতির লোকদের মধ্যে সমতাবিধানের প্রয়াসী।[৩০] গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রশ্নে এই ছিল জগৎ-বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর ধারণা। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য বিশ্বখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টোটলের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) ধারণাও প্লেটোর অনুরূপ। প্লেটো ও এরিষ্টোটল যে গ্রিক 'নগররাষ্ট্র' বা 'সিটি স্টেটের' প্রবক্তা ছিলেন সেখানে সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী নাগরিকদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আইনগত অধিকার নির্ধারণ করা হলেও সেখানে সাধারণ জনগণের মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদা যথাযথভাবে স্বীকৃত ছিল না। তারপরও নাগরিকদের জনকল্যাণে ব্যয় করার জন্য অর্থদানকে উৎসাহিত করা হয় এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তৎপরতা লক্ষ করা যায়। জনস্বার্থে পার্ক তৈরি এবং খাদ্য, বস্ত্রসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি মজুত করে প্রয়োজনমতো জনগণের মধ্যে বিলি করা হতো।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্ম বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ[৩১] অহিংস নীতির মাধ্যমে জীব জগতের সকল প্রাণীর সর্বজনীন কল্যাণ ঘোষণা করেন। অহিংসা, মানুষের সমানাধিকার, সার্বিক কল্যাণ এবং সেবার মহান নীতির ওপর বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত। ফলে অহিংস, সাম্য, মৈত্রী আর শান্তির বাণী প্রচারই ছিল বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি।[৩২] গৌতম বুদ্ধ সব মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির প্রতি সমান গুরুত্বারোপ করেন। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক[৩৩] অমানবিক ও কুখ্যাত কলিঙ্গ যুদ্ধের[৩৪] ভয়াবহ মানবতাবিরোধী অভিজ্ঞতার পর বৌদ্ধধর্মের মহান অহিংস নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়েই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মানবাধিকার সংরক্ষণে কল্যাণমূলক

---

[৩০] Morris Stockhammer, *Plato Dictionary*, Philosophical Library, New York, 1903, p. 56

[৩১] বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নেপালের সীমান্তবর্তী রাজ্য কপিলাবস্তুতে ক্ষত্রিয় রাজবংশে খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকে বুদ্ধ মানুষের রোগ, জরা ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সমাধানের পথ খোঁজে ফিরতেন। হিংসা, দ্বেষ ও বর্ণ-বৈষম্য দূর, সকলের সমান সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, জীবনে দুঃখের কারণ এবং তা ধেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধানের জন্য মাত্র ২৯ বছর বয়সে রাজকীয় মহিমা ও সুখভোগ পরিত্যাগ করে কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ৩৫ বছর বয়সে গয়ার নিরঞ্জনা নদীর তীরে একটি বৃক্ষের নিচে বসে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির শেষ রাতে তিনি চরম জ্ঞান বা বোধি লাভ করেন। তাঁর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত এবং ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। এ ধর্মের মূল ব্রত হলো সেবা ও জীবপ্রেম। তাঁর প্রচারিত ধর্ম ঈশ্বরবিহীন। এ ধর্মমতে সবকিছুই অবিরাম চলমান, সব কিছুই পরিবর্তনশীল এবং ধ্বংসযোগ্য। অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী আর শান্তির বাণী প্রচারই ছিল এ ধর্মের মূলনীতি। বিস্তারিত দেখুন, Muhammad Munir, *Islam in History*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2005, pp.149-150; আবু তাহের, *ইসলামে ধর্ম দর্শন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি*, কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩০-৩৩

[৩২] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Ruhini Chowdhury, *Gautam Buddha: Lord of Wisedom*, Penguine Books, New Delhi, 2011, pp. 11-20; V.S Bhaskar, *Faith & Philosophy of Buddhism*, Kalpaz Publications, Delhi, 2009, pp. 33-55; প্রেম রঞ্জন দে, *বুদ্ধ ও মানবতাবাদ*, ১০ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮, মুক্তকণ্ঠ, পৃ. ৭

[৩৩]. খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তার পুত্র অশোক মৌর্য ক্ষমতায় আরোহণ করে প্রজাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি বিধান করেন। পৃথিবীর রাজতন্ত্রের ইতিহাসে রাজ কর্তব্যে পালনের ক্ষেত্রে অশোকের শাসনামল ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। জোর যার মুল্লুক তার এ নীতির যুগে অশোক সাম্রাজ্যে আইনের চোখে সকলে সমান এ নীতি কার্যকর করেন। সমঅপরাধের জন্য সমপরিমাণ শাস্তির নীতি তিনি কার্যকর করেন। নিজে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে তিনি মানবধর্মকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেন। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারক পাঠিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Shiv Kumar Sharma, *Life Profile and Biography of Bhuddu*, Diamond Pocket Books, New Delhi, 2002, p. 118; Sailendra Nath Sen, *Ancient Indian History and Civilization*, (2nd ed.), New Age International (Pvt.) Ltd., Calcutta, 1999, pp. 130-166

[৩৪] খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করে পিতা বিন্দুসার ও পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্য বিস্তারের আদর্শ অনুসরণ করে তিনি নিজেও রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন এবং রাজত্বকালের অষ্টম বছরে কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে জয়লাভের জন্য তিনি ব্যাপক পরিমাণ হত্যা কার্যক্রম পরিচালনা করলেও যুদ্ধে জয় লাভ করার পর তাঁর ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যাপক রূপান্তর ঘটে। এ যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি যুদ্ধনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন এবং নিজে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। এ যুদ্ধের পরই তিনি শাসনব্যবস্থাকে মানবধর্মী ও জনকল্যাণকামী করে গড়ে তোলেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Sailendra Nath Sen, *Ibid*, p. 151; V. A. Smith, *Asoka: The Buddhist Emperor of India*, Asian Educational Services, New Delhi, 1997, p. 27

পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন[৩৫] মানবাধিকার রক্ষায় এবং মানবকল্যাণে যে অবদান রেখে গিয়েছেন, তার প্রেরণা যুগিয়েছে বৌদ্ধধর্মের মহান আদর্শ। গৌতম বুদ্ধ মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা বাস্তব সত্য ও মৌলিক বিষয় আবিষ্কার ও প্রচার করেন যার মধ্যে সর্বজনীন মানবাধিকারের বীজ নিহিত। বাস্তব সত্যগুলো হলো দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায়। এর সবগুলোই আধুনিক মানবাধিকার ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরিশেষে বলা যায়, হিংসা, দ্বেষ ও বর্ণবৈষম্য দূর, সকলের সমান সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সবশ্রেণির মানুষের সর্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠাই বৌদ্ধধর্মের সর্বজনীন নীতি। যা সুসংগঠিত ব্যবস্থা হিসেবে মানবাধিকার দর্শনের এবং বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৌদ্ধধর্মের মানবীয় মর্যাদার স্বীকৃতি প্রসঙ্গে বলা হয়-

> Buddhu is a humanist, as a great advocate of the dignity of man, made considerable help in the realization of this much needed ideal at a crisis when science and politics virtually failed, man and traditional religion has losts its appeal.[36]

যীশুখ্রিস্টের জন্মের ৩০ বছর পর খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক মহান যীশু এ শিক্ষা প্রচার করেন যে, 'স্রষ্টার রাজ্যে সবাই সমান' এছাড়াও তিনি 'স্রষ্টার পিতৃত্বে বিশ্বের সকল মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব' (Brotherhood of Man under the Fatherhood of God) প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। খ্রিস্টান ধর্মানুযায়ী সবাই এক ম-লীর মধ্যে; বংশ ও জাতি, সামাজিক অবস্থা বা নারী পুরুষ বৈষম্য নেই কেননা তোমাদের মধ্যে এখন ইহুদিও নেই, অনিহুদিও নেই; ক্রীতদাস নেই, পরাধীন মানুষও নেই, পুরুষও নেই, নারীও নেই। কারণ যীশুখ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমরা সবাই এক হয়ে আছ।[৩৭] খ্রিস্টধর্মের মূল বক্তব্য ছিল মূলত বৈষম্যহীন ও ন্যায়বিচারভিত্তিক বিশ্ব গড়ে তোলা।

৪০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে দরিদ্র ও অক্ষম আশ্রয়হীনদের আশ্রয়দানের জন্য বিশেষ ধরনের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৫৪২ খ্রিস্টাব্দের দিকে চীন, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে ভারতের অনুকরণে এ ধরনের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়, ফ্রান্সে যার নাম দেওয়া হয় 'House of God' (The Hotel Dieu)।[৩৮]

---

[৩৫] হর্ষবর্ধন ৫৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বড় ভাই রাজ্যবর্ধন রাজা শশাঙ্কের হাতে মৃত্যুবরণ করলে হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বীয় মেধা, যোগ্যতা, সমরকুশলতার মাধ্যমে যে ক'জন সম্রাট উত্তর ভারতের রাজনীতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের মধ্যে সম্রাট হর্ষবর্ধন অন্যতম ছিলেন। প্রজাদের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ঘুরে বেড়াতেন এবং নিজে রাজকার্য তদারকি করতেন। তিনি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বটে তবে তিনি নিজে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর ব্যাপক অনুরাগ ছিল। বানভট্ট তাঁর রাজসভায় সভাপতি ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। দেখুন, Sailendra Nath Sen, *Ibid*, pp. 152-161

[৩৬] G.C. Deb. "*Buddha*" The Humanist, Dhaka, 1969

[৩৭] সিলভানো গারোল্লা, *খ্রিস্ট ধর্মীয় শব্দার্থ*, জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ১৯৯৬, পৃ. ২৪৮

[৩৮] *Social Work Dictionary*, NASW, New York, 1995, p. 415

খ. আধুনিক যুগে মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ

মানবাধিকার সম্পর্কিত জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ ইউরোপ ও আমেরিকার দার্শনিক ও বিপ্লবীগণের চিন্তাধারার ফসল। মানবসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত অধিকারগুলো কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী সমাজচিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। মধ্যযুগের ইতিহাস ও দর্শনের 'Natural Law এবং Natural rights' এর সঙ্গে আধুনিক যুগের মানবাধিকার ধারণার সম্পর্ক রয়েছে। আধুনিক যুগে মানবাধিকার চেতনার বিকাশ মূলত একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে মৌলিক অধিকার আন্দোলনের সূচনা থেকে। ইউরোপে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হলো ম্যাগনাকার্টা। বর্তমান যুগে মানবাধিকার চেতনার বিকাশ কিভাবে হলো এ সম্পর্কিত ইতিহাস নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- মানবাধিকার ধারণার বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং মাইলফলক হিসেবে যে দলিলটিকে সর্বপ্রথম চিহ্নিত করা হয়, তা হচ্ছে ১২১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন ইংল্যান্ডের রাজা জন (King John) কর্তৃক ঘোষিত ম্যাগনাকার্টা। "Magna Carta"[39] কে বলা হয় থাকে মানবাধিকারের প্রথম চার্টার।[৪০] সন্দেহ নেই যে, ইংল্যান্ডে ম্যাগনাকার্টা ছিল মৌলিক অধিকারসমূহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী দলিল। প্রকৃতপক্ষে উৎসগতভাবে এটি কেবলমাত্র ব্রিটেনের রাজা জন ও সম্পদশালী ও ধনী ভূমির অধিকারী তথা জমিদার শ্রেণি বা ব্যারনদের (Baron হচ্ছে ব্রিটেনের ভূমি-মালিকদের সর্বনিম্ন খেতাব) মধ্যকার একটি সম্পাদিত চুক্তি ছিল যার অধীনে রাজা ব্যারনদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[৪১] এ চুক্তির মাধ্যমে রাজন্যবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়েছিল, জনগণের অধিকারের সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। হেনরি মারশ বলেন, "বিরাট বিরাট ভূস্বামীদের একটি ঘোষণাপত্র ছাড়া তার আর কোনো মর্যাদা ছিল না।"[৪২] তবে এটা সত্য যে, এ সনদের মাধ্যমে মধ্যযুগের চরম রাজশক্তির ক্ষমতা সীমিত হয় এবং সামন্তশ্রেণি এবং যাজকদের স্বার্থরক্ষার উপযোগী কতকগুলো অধিকার এতে স্বীকৃত হয়েছে। এজন্য একে জনগণের অধিকারের মহাসনদ বলা হয়। দীর্ঘ সময়ের পর একে মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়। ব্রিটেনের পার্লামেন্ট ১৩৫৫ সালে একে অনুমোদন দেয় এবং একটি আইন পাস করে যার আওতায় কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন, স্বাধীনতা এবং ভূমি থেকে আইনগত কারণ ব্যতীত বঞ্চিত না করার অধিকার স্বীকৃত হয়। ৬৩টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত ম্যাগনাকার্টাই ইংলিশ আইনে সর্বপ্রথম ব্যক্তিস্বাধীনতা বা Personal liberty প্রবর্তন করেছে এবং তাই এই সনদকে "Keystone of English Liberty"

---

[৩৯] ম্যাগনাকার্টা দলিলের কমপক্ষে ১৩ টি মূলকপি হাতে লিখে রাজকীয় প্রজ্ঞাপন আকারে তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। যার মধ্যে দুইটি বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে Cotton Ms. Augustus II.106 এবং Cotton Charter XIII.31A নামে সংরক্ষিত আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Breay Claire, *Megna Carta: Manuscripts and Myths*, British Library, London, 2010. p. 34

[৪০] Douglas Richardson, *Megna Carta Ancestry: A Study in Colonial Medieval Families*, Vol-I, 2nd ed., North Soltlake City, 2011, pp. V-XI; Albert Bebbe White, *Notes on the Name Megna Carta,* The English Historical Review, Vol-XXXII, London, 1917, p. 554

[৪১] Abdur Razzaq, *Human Rights in Islam-Historical perspective*, Paper Presented at International Seminar on Human Rights in Islam, 5th October, 1994, Sonargaon Panpacific Hotel, Dhaka, p. 18

[৪২] Henry Marsh, *Documents of Liberty,* David & Charls, New Town Abbot, England, 1971, p. 51

বলে অভিহিত করা হয়। প্রথমে এ সনদ "Charter of liberties"[43] পরিচিত হলেও পরবর্তীতে তা Magna Carta হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে এটি মানবাধিকার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

- ম্যাগনাকার্টার পরে ব্রিটিশ জনগণের মানবাধিকারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে দলিলটির কথা বলা যায়, তা হচ্ছে ১৬২৮ সালের Petition of Rights যা পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত সর্বপ্রথম সাংবিধানিক দলিল। এই বিলটি এতই সংক্ষিপ্ত যে, উহাতে কেবলমাত্র ৪টি ধারা সন্নিবেশ করা হয়। এগুলো হলো:

  ১. কোনো ব্যক্তির উপর কর আরোপ করতে হলে পার্লামেন্টের অনুমোদন লাগবে।

  ২. কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিকে বন্দি করে জেলে আটক রাখা যাবে না।

  ৩. সেনাবাহিনীর কোনো দল গৃহকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত কারও গৃহে অবস্থান করতে পারবে না; এবং

  ৪. রাজা বা রানী কর্তৃক সামরিক আইনে প্রসিডিং-এর জন্য কমিশন জারি করা যাবে না।[৪৪]

- ম্যাগনাকার্টা ও পিটিশন অব রাইটস-এর পরে মানবাধিকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দলিল হচ্ছে Bill of Rights যা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৬৮৯ সালে পাস করে। এই বিলকে বৃটেনে ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের সমাপ্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ এর সাহায্যে মৌলিক অধিকারসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। পিটিশন অব রাইটস, বিল অব রাইটস ও ম্যাগনাকার্টা-এ তিনটি ঐতিহাসিক দলিলকে একত্রে বলা হয় "ইংলিশ সংবিধানের বাইবেল" (The Bible of the English Constitutions)। আর এ সনদগুলো শুধু ইংল্যান্ডেই নয়, বরং সারা বিশ্বের মানবাধিকার বিকাশের মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করে।

- ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা মানবজাতির স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা, ১৭৭৬ সালে The Virginia Declaration of Rights এবং ১৭৯১ সালের American Bill of Rights মানবাধিকার ধারণা বিকাশের ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত। আমেরিকা ছিল ব্রিটিশ কলোনি। কলোনিগুলোতে চলতো ব্রিটিশ রাজের শাসন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকাবাসী ব্রিটিশদের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৭৭৬ সালের ১২ জুন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ভার্জিনিয়া থেকে জর্জ ম্যানশন রচিত অধিকার সনদপত্র ঘোষিত হয়, যার মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আদালতের শরণাপন্ন হওয়ায় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। ১৭৭৬ সালের ১২ জুলাই আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। এর খসরা তৈরি করেছিলেন টমাস জেফেরশন এবং এর অনেক মূলনীতি ইংরেজ চিন্তাবিদগণ বিশেষত জন লক- এর মতবাদের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এতে সকল ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমানাধিকারের ঘোষণা দেওয়া হয়।[৪৫]

---

[৪৩] Danny Danzeger & John Gillingham, *1215, The Year of Megna Carta*, Touchton, New York, 2004, p. XI

[৪৪] ড. এ বি এম মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী ও মোঃ আখতারুজ্জামান, *মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তা দানের মূলনীতি*, হিউম্যানিষ্ট এবং ইথিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, এপ্রিল, ২০০১, পৃ. ৭-৮

[৪৫] Pauline Maier, *Americal Scripture: Making the Declaration of Indepenence*, Knopf Doubleday Publishing, New York, 2012, pp. 42-43

- দার্শনিক হেগেল 'ইতিহাসের দর্শন'[৪৬] নামে একখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। তাতে মানুষের অধিকার পর্যায়ে অনেক তত্ত্বকথা আলোচিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র ইউরোপীয় সমাজে মানুষের অধিকার সম্পর্কে আওয়াজ তোলা। বিশ্বমানবতা তাতে অনুল্লিখিত থাকলেও মানবাধিকার সম্পর্কে দিক নির্দেশনা ছিল তাতে।
- ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাবলির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে "মানবাধিকার ঘোষণা" Declaration of the rights of man যা ১৭৮৯ সালে প্রকাশ পায় এবং এই ঘোষণা ১৭৯১ সালে ফরাসি সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়। এটা অষ্টাদশ শতকের সমাজদর্শন এবং বিশেষ করে রুশোর "সামাজিক আচরণ তত্ত্বের" (Social contact theory) ফল। এতে জাতির শাসন কর্তৃত্ব, স্বাধীনতা, সাম্য এবং মালিকানার প্রকৃতিগত অধিকারসমূহ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এতে ভোটের অধিকার, আইন প্রণয়ন এবং কর আরোপের এখতিয়ারের উপর জনমতের নিয়ন্ত্রণ, বিচারকদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের সামনে মামলার শুনানি ইত্যাদি অধিকারসমূহও স্বীকৃত হয়। ফরাসি ঘোষণায় বর্ণিত অধিকারগুলো হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষের একান্ত অধিকার। ফ্রান্সের এই রাষ্ট্রীয় ঘোষণায় কার্যত জনগণের সকল মৌলিক অধিকারগুলোকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই ঘোষণা গাইড লাইন হিসাবে পরবর্তীকালে মানবাধিকারের বিকাশে ভূমিকা রাখে।
- ১৭৯২ সালে টম পেনের (Paine Thomas) বিখ্যাত পুস্তিকা *The Rights of Man* প্রকাশ করেন, যা পাশ্চাত্যবাসীদের চিন্তাধারায় ব্যপক বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করে এবং মানবাধিকার সংরক্ষণের আন্দোলনকে আরও সামনে এগিয়ে নেয়। এই ব্যক্তি আসমানি কোনো ধর্মের সমর্থক ছিল না, আর তার যুগটাও ছিলো আসমানি ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যুগ। এজন্য পাশ্চাত্য জনগণও মনে করলো আসমানি ধর্মগুলোতে মানবাধিকার সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই।
- এভাবে ১৯ শ ও ২০ শ শতকে বিভিন্ন দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহের সংযোজন একটি সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়। ১৮৬৮ সালে আমেরিকার সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী অনুমোদন করা হয়। সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, আমেরিকার কোনো অঙ্গরাজ্যই আইনগত নীতিমালার অনুসরণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন, স্বাধীনতা ও মালিকানা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। ১৯২০ সালে ১৯তম সংশোধনীর মাধ্যমে আমেরিকায় মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। এভাবে সময়ের সাথে সাথে মানবাধিকার ধারণা দেশে দেশে বিকাশ লাভ করে। অর্থাৎ ইংল্যান্ড শুরু হওয়া মানবাধিকারের বিকাশ ফ্রান্সে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়নি বরং দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাকালে ঘোষিত হলো যে, এ প্রতিষ্ঠানটি "মৌল মানবিক অধিকার, মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং ছোট-বড় জাতি, ধর্ম-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারের প্রতি এই সংস্থা পুনরায় আস্থা রাখার অঙ্গীকার করেছে।"[৪৭] জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সাথে স্থান লাভ করে। ফ্রান্স তার ১৯৪৬ সালের সংবিধানে ১৭৮৯ সালের ঘোষণাপত্র The Rights of Man and of the Citizen অন্তর্ভুক্ত করে। একই বছর জাপান মৌলিক অধিকারকে সংবিধানের অংশে পরিণত করে আইন পাস করে। ১৯৪৭ সালে ইটালি তার সংবিধানে

[৪৬] G. W. F Hegel, *Introduction to the Philosophy of History*, Hackett Publishing Company, Cambridge, 1988
[৪৭] উদ্ধৃত, আবু সাঈদ চৌধুরী, *মানবাধিকার*, বাংলা একাডেমী, ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা, ২য় প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১২

মানবাধিকারের বিধান সন্নিবদ্ধ করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশসমূহে মানবাধিকার সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকারের পক্ষে পরিচালিত চেষ্টা সাধনার ফলে ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) অধীনে গঠন করা জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন (Commission on Human Rights) Universal Declaration of Human Rights- এর খসড়া প্রস্তুত করে, যা ১৯৪৮ সালের ১০ এপ্রিল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণা বা সার্বজনীন 'মানবাধিকার সনদ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সাধারণ পরিষদের ৪৮টি দেশ এই ঘোষণার পক্ষে ভোট দেয় এবং রাশিয়াসহ আটটি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। এর মধ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত অধিকারসমূহ অথবা মানুষের চিন্তায় উত্থিত হতে পারে এমন অধিকারসমূহ শামিল করা হয়। এই সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় সকল জাতি (মানুষ) ও সকল দেশের সকল মানুষের জন্য কতকগুলো অভিন্ন অধিকার চিহ্নিত করা হয়। নিম্নে এ মহাসনদ-এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

মানবাধিকার সনদ

মানবাধিকার সনদ একটি ঘোষণা। ১৯৪৮ সালের সালের ১০ ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এই ঘোষণা প্রদান করা হয়। ৩০ ধারা সম্বলিত এ ঘোষণায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং এই মহাসনদ প্রত্যেক মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ঘোষিত হয়।[৪৮]

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

মুখবন্ধ

যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও সম অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহের স্বীকৃতি বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ভিত্তি;

যেহেতু মানবিক অধিকারসমূহের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা মানবজাতির বিবেকের পক্ষে অপমানজনক বর্বোরচিত কার্যকলাপে পরিণতি লাভ করেছে এবং সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আশা-আকজ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে এমন একটি পৃথিবীর সূচনা ঘোষিত হয়েছে যেখানে মানুষ বাক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ভয় ও অভাব থেকে নিষ্কৃতি ভোগ করবে;

[৪৮] জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, সনদের বাংলা অনুবাদ, ঢাকা, ১৯৯১

যেহেতু চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে মানুষকে অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে বাধ্য করা না হলে মানবিক অধিকারসমূহ অবশ্যই আইনের শাসনের দ্বারা সংরক্ষিত করা উচিত;

যেহেতু জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়নে সহায়তা করা আবশ্যক;

যেহেতু জাতিসংঘভুক্ত জনগণ সনদের মাধ্যমে মৌল মানবিক অধিকারসমূহ, মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং নারী ও পুরুষের সম-অধিকারের প্রতি আস্থা পুর্নব্যক্ত করেছে এবং সামাজিক অগ্রগতি ও ব্যাপকতর স্বাধীনতায় উন্নততর জীবনমান প্রতিষ্ঠাকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ;

যেহেতু সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সহযোগিতায় মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধিকারসমূহের প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও মান্যতা বৃদ্ধি অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ;

যেহেতু সকল অধিকার ও স্বাধিকারের ব্যাপারে একটি সাধারণ সমঝোতা উক্ত অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে আদায় করার জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ;

তাই সাধারণ পরিষদ সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির একটি সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে জারি করেছে এই মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র।

ঐ লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ মানবিক অধিকারসমূহের এই সার্বজনীন ঘোষণাপত্রটিকে সর্বদা স্মরণ রেখে শিক্ষাদান ও জ্ঞান প্রসারের মাধ্যমে এ সকল অধিকার ও স্বাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রগতিশীল ব্যবস্থাদির দ্বারা সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জনগণ ও তাদের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের অধিবাসীবৃন্দ উভয়ের মধ্যে ঐগুলির সার্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি ও মান্যতা অর্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

ধারা-১
বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সম-মর্যাদা ও অধিকারাদি নিয়ে সকল মানুষই জন্মগ্রহণ করে। বুদ্ধি ও বিবেক তাদের অর্পণ করা হয়েছে এবং ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে তাদের একে অন্যের প্রতি আচরণ করা উচিত।

ধারা-২
যে কোনো প্রকার পার্থক্য যথা জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল প্রকার অধিকার ও স্বাধিকারে স্বত্ববান।

অধিকন্তু, কোনো ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী, তা স্বাধীন, অধিভুক্ত এলাকা, অস্বায়ত্তশাসিত অথবা যে কোনো প্রকার সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, তার রাজনৈতিক, সীমানাগত ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোনো পার্থক্য করা চলবে না।

ধারা-৩
প্রত্যেকেরই জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

ধারা-৪
কাউকে দাস হিসেবে বা দাসত্বে রাখা চলবে না; সকল প্রকার দাসপ্রথা ও দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।

ধারা -৫
কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তি ভোগে বাধ্য করা চলবে না।

ধারা-৬
আইনের সমক্ষে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতিলাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা-৭
আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোনোরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণাপত্র লঙ্ঘনকারী কোনোরূপ বৈষম্য বা এই ধরনের কোন উস্কানির বিরুদ্ধে সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার সকলেরই আছে।

ধারা-৮
যে কার্যাদির ফলে শাসনতন্ত্র বা আইনকর্তৃক প্রদত্ত মৌল অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হয় সে সবের জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকারলাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা-৯
কাউকে খেয়াল খুশিমতো গ্রেফতার, আটক অথবা নির্বাসন করা যাবে না।

ধারা-১০
প্রত্যেকেরই তার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত যে কোনো ফৌজদারি অভিযোগ নিরূপণের জন্য পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানিলাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা-১১
ক. যে কেউ কোনো দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এমন গণ-আদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই কোনো কাজ বা ত্রুটির জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না যদি সংঘটনকালে তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ গণ্য না হয়ে থাকে। আবার দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনকালে যতটুকু শাস্তি প্রযোজ্য ছিল তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ চলবে না।

ধারা-১২
কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল খুশিমতো হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান ও সুনামের উপর আক্রমণ করা চলবে না।

ধারা-১৩
ক. প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই নিজ দেশসহ যে কোনো দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

ধারা-১৪
ক. নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা ও ভোগ করার অধিকার রয়েছে।

খ. অরাজনৈতিক অপরাধসমূহ অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতিবিরোধী কার্যকলাপ থেকে সত্যিকারভাবে উদ্ভূত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রার্থনা করা নাও যেতে পারে।

ধারা-১৫
ক. প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা অথবা তাকে তার জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

ধারা-১৬
ক. পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও নারীদের জাতিগত, জাতীয়তা অথবা ধর্মের কারণে কোনো সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে বিবাহ করা ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে তাদের সম-অধিকার রয়েছে।

খ. কেবল বিবাহ ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীর অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির দ্বারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে।

গ. পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক গোষ্ঠী; সমাজ ও রাষ্ট্রকর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার এর রয়েছে।

ধারা-১৭

ক. প্রত্যেকেরই একাকী এবং অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল খুশিমতো বঞ্চিত করা চলবে না।

ধারা-১৮

প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতা এবং একাই অথবা অপরের সাথে যোগসাজশে ও প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান, প্রচার, উপাসনা ও পালনের মাধ্যমে প্রকাশ করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-১৯

প্রত্যেকেরই মতামতের ও মতামত প্রকাশের স্বাধিকার রয়েছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে কোনো উপায়াদির মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-২০

ক. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই কোনো সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা-২১

ক. প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারি চাকুরিতে সমান সুযোগলাভের অধিকার রয়েছে।

গ. জনগণের ইচ্ছাই সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি হবে; এই ইচ্ছা সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নৈমিত্তিকভাবে এবং প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে; গোপন ব্যালট অথবা অনুরূপ অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা-২২

সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে; প্রত্যেকেই জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদ অনুসারে তার মর্যাদা ও অবাধে ব্যক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায় করার জন্য স্বত্ববান।

ধারা-২৩
ক. প্রত্যেকেরই কাজ করার, অবাধে চাকুরি নির্বাচনের, কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থালাভের এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই কোনো বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

গ. প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রামিক ও প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাদি সংযোজিতলাভের অধিকার রয়েছে।

ঘ. প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৪
প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার রয়েছে। কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-২৫
ক. নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কার্যাদির সুযোগ এবং বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবনযাপনে অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

খ. মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেক বিশেষ যত্ন ও সহায়তালাভের অধিকারী। বৈবাহিক বন্ধনের ফলে বা বৈবাহিক বন্ধনের বাইরের জন্ম হোক না কেন, সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

ধারা-২৬
ক. প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধারভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

খ. ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্ব উন্নয়ন এবং শান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবে।

গ. যে প্রকার শিক্ষা তাদের সন্তানদের দেওয়া হবে তা পূর্ব থেকে বেছে নেওয়ার অধিকার পিতামাতার রয়েছে।

ধারা-২৭
ক. প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ, শিল্পকলা চর্চা করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলসমূহের অংশীদার হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা শিল্পকলাভিত্তিক সৃজনশীল কাজ থেকে উদ্ভূত নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থসমূহ রক্ষণের অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৮
প্রত্যেকেই এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য স্বত্ববান যেখানে এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ পূর্ণভাবে আদায় করা যেতে পারে।

ধারা-২৯
ক. প্রত্যেকেরই সমাজের প্রতি কর্তব্যাদি রয়েছে কেবল যার অন্তর্গত হয়েই তার ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

খ. স্বীয় অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ প্রয়োগকালে প্রত্যেকেরই শুধু ঐ ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকবে যা কেবল অপরের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের যথার্থ স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সাধারণ কল্যাণের ন্যায্য প্রয়োজনসমূহ মিটানোর উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা নিরূপিত হয়।

গ. এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগকালে কোনো ক্ষেত্রেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লঙ্ঘন করা চলবে না।

ধারা-৩০
এই ঘোষণায় উল্লিখিত কোনো বিষয়কে এরূপভাবে ব্যাখ্যা করা চলবে না যাতে মনে হয় যে, এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত কোনো অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোনো রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তিবিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার রয়েছে।

মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই মূলত মানবাধিকারের উদ্ভব। তবে বর্তমানে মানবাধিকারের এই প্রতিষ্ঠিত রূপ রাজা হাম্মুরাবি থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ধীরে ধীরে অর্জিত হয়েছে। পৃথিবীর বহু মনীষীর সমন্বিত চিন্তা-চেতনা ও চেষ্টার প্রতিফল হলো এ মানবাধিকার সনদ। আর এ মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হলো উপরিউক্ত 'মানবাধিকার সনদ'। আর জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা হলো

বিশ্বের সকল জাতির এবং সকল মানুষের অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের অভিন্ন সাধারণ মানদণ্ড। মূলত ১৯৪৮ সালের 'Universal Declaration of Human Rights' এর মাধ্যমেই মানবাধিকার ধারণাটি সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করে।

মানবাধিকারের ক্রমবিকাশে ইসলাম

সমকালীন বিশ্বে মানবাধিকার একটি বহুল আলোচিত বিষয় হলেও মুসলিম হিসেবে মানুষের মৌলিক অধিকারের ধারণা আমাদের কাছে নতুন নয়। কারণ এই পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্ব যখন থেকে শুরু হয়েছে, মূলত তখন থেকেই ইসলামে মৌলিক অধিকারের যাত্রা। সকল মানুষ একই আদম ও হাওয়া থেকে সৃষ্টি। হযরত আদম (আ.) থেকে মানব জাতির পথপ্রদর্শনের যে ধারা শুরু হয়েছিল তা কোনোরূপ বিচ্ছিন্নতা ব্যতিরেকে একের পর এক নবিগণের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত স্থায়িভাবে অব্যাহত থাকে। সৃষ্টির আদি থেকে সমস্ত মানুষের চাওয়া পাওয়ার আবেদন একইভাবে মূল্যায়িত হয়েছে।[৪৯] আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করার পূর্বেই পৃথিবীতে বিচরণের জন্য তাকে অধিকার ও কর্তব্যের চেতনাশক্তি দান করেছিলেন এবং জীবন পরিচালনার রীতি-নীতি, সৌজন্যবোধ ও আচরণবিধিও শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এই পৃথিবীতে পদার্পণকারী হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহ্, আল্লাহ্র বান্দাহ এবং আল্লাহ্র অন্যান্য সৃষ্টি সম্পর্কে অধিকার ও কর্তব্য সম্বলিত যে বিধান দেওয়া হয়েছিল তা মানবজীবনের ক্রমোন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে সময়ের দাবি ও চাহিদা অনুযায়ী বিস্তারিত ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় আইনকানুনসহ হযরত আদম (আ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত আবির্ভূত নবিগণের মাধ্যমে মানবজাতি তার সঠিক পথলাভের জন্য অব্যাহতভাবে পেতে থাকে। মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি নবি রাসূলদের মাধ্যমে মানুষকে মানবাধিকার সম্পর্কে অবগত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা মানুষের অধিকারসমূহ নির্ণয় করতে পারেন। তাই তিনি বিস্তারিতভাবে মানবাধিকারসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মুসলিম ভিন্ন অন্য লোকদের দৃষ্টিতে মৌলিক মানবাধিকারের ইতিহাস ইংল্যান্ডের ম্যাগনাকার্টা কিংবা জাতিসংঘ সনদ থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ইসলামে মৌলিক অধিকারের ধারণা সর্বপ্রথম মানুষের সৃষ্টির দিন থেকেই বিদ্যমান। তাছাড়া ইসলামে মৌলিক অধিকারের ধারণা সৃষ্টির দিন থেকে হিসাব না করে শুধু মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনা সনদের মাধ্যমে মানবাধিকারের যে ঘোষণাপত্র দিয়েছেন তাও পশ্চিমা জগতের মানবাধিকার ধারণাসংক্রান্ত ঘোষণার অনেক পূর্বে। মানবাধিকার যে ইসলাম সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছে Robert Traer-এর বক্তব্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় : "Islam was first to recognize basic human rights 14 centuries ago-it set up guarantees and

[৪৯] মোঃ সিরাজুল ইসলাম, *মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩০

safeguards, that have only recently been incorporated in universal declarations of human rights.”[50]

মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে মদিনা সনদ

প্রথম হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল/ ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে সেপ্টেম্বর মহানবি (স.) নবুয়তপ্রাপ্তির ১২ বৎসর পর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন।[৫১] মদিনায় এসে তিনি দেখেন যে, মদিনার অধিবাসীদের মধ্যে নানা গোত্র, উপগোত্র, ধর্মমত ও বিশ্বাসের মানুষ রয়েছে। এরা পাঁচ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। যথা: মদিনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়, ইহুদি সম্প্রদায়, খ্রিস্টান সম্প্রদায়, নবদীক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় (আনসার) এবং মক্কা থেকে আগত মুসলিম সম্প্রদায় (মুহাজির)। মদিনার এ বিভিন্ন সম্প্রদায় তখন নানা প্রকার কুসংস্কারে বিশ্বাস করতো, তাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না এবং তারা বিধর্মী কাজে লিপ্ত ছিলো। ধর্মীয় অধঃপতন, সামাজিক কুসংস্কার এবং রাজনৈতিক অরাজকতার কারণে তাদের মধ্যে কোনো আদর্শিক মিল ছিল না।[৫২] দ্বিধাবিভক্ত ও আত্মকলহে লিপ্ত মদিনাবাসীদের মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাব স্থাপনের জন্যে রাসূল (স.) শ্রেণি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে সপ্তম শতাব্দীতে এমন এক অভূতপূর্ব ধারণা দিলেন, যা বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখার লক্ষ্যে মহানবি (স.) ৬২৪ খ্রি. সকল গোত্র ও সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করে এক বৈঠকে বসেন এবং তাদেরকে আন্তসাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির আবশ্যকতা বুঝিয়ে সকলের সর্বসম্মতিক্রমে একটি সনদ বা আর্ন্তজাতিক সন্ধিপত্র প্রস্তুত করেন যাকে ’মদিনা সনদ’, ’চার্টার অব মদিনা’ বলে পৃথিবীবাসী আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।[৫৩] মহানবি (স.) মদিনায় হিজরতের অব্যবহিত পরই মদিনার সনদ[৫৪] জারি করা হয়। পণ্ডিতগণ মদিনা সনদ জারির বিভিন্ন তারিখ নির্ধারণ উল্লেখ করলেও তা বদর যুদ্ধের পূর্বে হয়েছে এটা সুনিশ্চিত।[৫৫] এটি মানবতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান। মদিনা সনদের মাধ্যমেই মদিনার ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, মহানবি (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত এ ’মদিনা সনদ’ বিশ্বের প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র (First written constitution of the world)। এ সনদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মদিনা

---

[৫০] Robert Trar, *Human Rights in Islam*, Journal of Islamic Research Institute, vol. 28, No. 1-4, Islamic University, Islamabad, Pakistan, 1989, p. 117

[৫১] W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, Oxford at the Clarendon Press, London, 1956, p. 1; Muhammad Munir, *op.cit*, p. 22; সফিউর রহমান মুবারকপুরি, *আররাহীকুল মাখতুম*, সৌদি আরব, ১৯৯৩, পৃ. ১৮৪

[৫২] Akram Diya al Umri, Tr. Huda Kattab, *Medinan Society at the Time of the Prophet*, vol-I, The International Institute of Islamic Thought, Herndon, USA, 1991. pp. 7-19

[৫৩] আল্লামা শিবলী নুমানী, *সিরাতুন্নবী (সা.)*, অনু. মাওলানা মহিউদ্দিন খান, ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৪১৩ হি., পৃ. ৫৫; ফজলুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফত*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৬৩; সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬

[৫৪] ইবন ইসহাক, *সীরাতু রাসূলুল্লাহ*, ইংরেজি অনুবাদ, এ গুইলেউম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, ১৯৫৫, পৃ. ২৩১-২৩৩

[৫৫] ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর সরকার কাঠামো*, অনু. মুহাম্মদ ইবরাহীম ভূঁইয়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ ২০

রাষ্ট্রটি ছিল একটি Multi Religious State. ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার ধর্ম নয়। ইসলাম উদার,[৫৬] অন্য ধর্ম মতের সংগে এর বিরোধিতা নেই বরং আছে পরিপূর্ণ সদ্ভাব এবং পরমতসহিষ্ণুতা-এর ধর্মীয় নীতি। ইসলামের উদার ও সহনশীলতার মহান আদর্শ সকল যুগের সকল জাতির আদর্শকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ সনদের মাধ্যমে তিনি হিজরত উত্তর পরিবর্তিত মদিনার নতুন সদস্যের মাঝে ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ সনদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি তিনি ইহুদিদেরকেও তাদের ধর্মপালনের স্বাধীনতা প্রদান করেন। নতুন রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শর্তে তিনি তাদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা এবং সাহায্যের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ হন এ সনদের মাধ্যমেই। মদিনা সনদে অমুসলিমদেরকে যতটা অধিকার দেওয়া হয়েছে, দুনিয়ার কোনো জাতি তার সংখ্যালঘুকে তা দেয়নি।[৫৭] W. Montgomery Watt মদিনা সনদের ধারা ৪৭ টি উল্লেখ করেছেন।[৫৮] তবে আরবি ভাষায় লিখিত এ সনদে তাসমিয়াহ (বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম) ও ভূমিকা ছাড়া মোট ৫৩টি ধারা বিদ্যমান ছিল। মহানবি (সা.) এর পক্ষ হতে এটি ঘোষণা করা হয়েছিল।[৫৯] যার অনেকগুলো ধারাই ছিল মানবাধিকার বিষয়ক। এভাবে মদিনা সনদের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও গোত্রের মানুষের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমান অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং সকলের প্রতি সহমর্মিতা প্রদানের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই প্রথম। সমাজের সকল শ্রেণির নাগরিকের সম্পদ, সম্ভ্রম ও ধর্মীয় অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং পরমতসহিষ্ণুতা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্প্রীতির ওপর ভিত্তি করে রচিত মদিনা সনদ বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান মানবসভ্যতার ইতিহাসে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনতান্ত্রিক সরকারের মর্যাদা লাভ করে।[৬০]

ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার

ইসলামের সার্বজনীন মূল্যবোধগুলো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম মানবাধিকারকে মানবীয় মর্যাদার সাথে উন্নীত করেছে। পৃথিবীর সকল মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে শান্তি, সকল প্রকার অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিকার করে সকল মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ইসলামের মূল লক্ষ্য। ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো আল্লাহ প্রদত্ত বিধায় এতে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সুযোগ নাই। নিম্নে ইসলামের মৌলিক মানবাধিকারগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

---

[৫৬] এ প্রসঙ্গে এম, এন, রায় বলেন, “The basic doctrine of Islam there is but one God,..... the whole world is admitted asthe creation of the self same God” *The Historical Role of Islam*, Bombay, 1942, p. 21

[৫৭] শাহ আবদুল হান্নান,ওয়াল্ড মুসলিম কালচারাল সোসাইটি আয়োজিত মদিনা দিবস উপলক্ষে ২৪.৯.৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ, উদ্ধৃত, দৈনিক সংগ্রাম, ২৫.৯.৯৯, পৃ. ৭

[৫৮] W. Montgomery Watt, *op. cit*, pp. 221-225

[৫৯] আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন হিশাম আল হুমায়রী, *আসসীরাতুন নববিয়্যা*, ১ম খণ্ড (মিসর; মাতবা'আ মুস্তফা, ১৯৯৫), পৃ. ৫০২-৫০৩; ড. আ. ক. ম আব্দুল কাদের, *মদিনা সনদ : একটি পর্যালোচনা*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব ল, ১৯৯৯, খ. ৪, পৃ. ২৬৪

[৬০] Dr. Muhammad Hamidullah, *The first written constitution the world*, Lahore : Shah Muhammad Ashraf, 1981, p. 4

জীবন ও প্রাণের নিরাপত্তালাভের অধিকার

ইসলাম মানবজীবনকে অত্যন্ত সম্মানের বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জীবনের নিরাপত্তা তথা স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র এ অধিকারটি প্রাপ্তির পরই মানুষ অন্যান্য অধিকার ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। মানুষের জীবনের অধিকারের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার জন্য ইসলামে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ :

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের নিরাপত্তালাভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে আইনের চূড়ান্ত রায় ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। কোরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুসারে মানুষ হত্যা মহাপাপ এবং হত্যাকারীকে হুদুদ পর্যায়ের শাস্তি ‘কিসাস’ বা মৃত্যুদণ্ডে (অবস্থাভেদে অন্য দণ্ডে) দণ্ডিত করা হয়েছে।[৬১] মহান আল্লাহর বাণী :

يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى- الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى- فمن عفى له من اخيه شئى فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان- ذلك تخفيف من ربكم ورحمة- فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم- ولكم فى القصاص حيوة ياولى الالباب لعلكم تتقون-

“হে মু’মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী, কিন্তু তাহার ভাইয়ের পক্ষ হইতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হইলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সঙ্গে তাহার দেয় আদায় বিধেয়। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। ইহার পরও যে সীমালঙ্ঘন করে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে, যাহাতে তোমরা সাবধান হইতে পার।”[৬২]

সূরা বণী ইসরাঈলে ইরশাদ হচ্ছে :

ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق - ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل - انه كان منصورا-

“আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিও না। কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে তো আমি উহা প্রতিকারের অধিকার দিয়াছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছেই।”[৬৩]

[৬১] গাজী শামসুর রহমান, *কোরআন ও সুন্নাহের আলোকে ফৌজদারি আইনের সংশোধন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ১৯৯২, পৃ. ৩০৫-৩১০

[৬২] *আল-কুর'আন*, ০২:১৭৮-১৭৯ (বি. দ্র. এ অভিসন্দর্ভে পবিত্র আল্-কুরআনুল করিমের অনুবাদের ক্ষেত্রে সকল উদ্ধৃতি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সম্পাদনা পরিষদ, ৫৮তম মুদ্রণ, জুন ২০১৮ এর রীতি-নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য সূত্র উল্লেখ করার ক্ষেত্রে প্রথমে সূরা নম্বর এবং পরে আয়াত নং ব্যবহার করা হয়েছে।)

[৬৩] *আল-কুর'আন*, ১৭:৩৩

সূরা ফুরকানে ইরশাদ হচ্ছে :

والذين لايدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون- ومن يفعل ذلك يلق اثاما-

"এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো ইলাহ্‌কে ডাকে না। আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করিবে।"[৬৪]

সূরা মায়েদায় ইরশাদ হচ্ছে :

من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا - ومن احيها فكانما احيها الناس جميعا - ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات- ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك فى الارض لمسرفون-

"নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা হেতু ব্যতীত কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করিল ; আর কেহ কাহারও প্রাণ রক্ষা করিলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল। তাহাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ আনিয়াছিল, কিন্তু ইহার পরও তাহাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালঙ্ঘকারীই রহিয়া গেল।"[৬৫]

ইসলামি আইন "قتل بالحق " (সংগত কারণে হত্যা) ছয়টি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে :

১. অকারণ হত্যাকারীকে কিসাসের দণ্ড হিসেবে হত্যা করা;

২. দীন-ইসলামের পথে বাধা সৃষ্টিকারীদের সাথে যুদ্ধ করা ও সে যুদ্ধে নরহত্যা;

৩. ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পতনের চেষ্টায় লিপ্তদের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা;

৪. বিবাহিত পুরুষ-নারী যিনা[৬৬] করলে দণ্ড স্বরূপ হত্যা;

৫. মুরতাদ-ইসলাম ত্যাগকারীকে দণ্ড স্বরূপ হত্যা; এবং

৬. ডাকাত অর্থাৎ রাজপথে রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা।

[৬৪] *আল-কুর'আন*, ২৫:৬৮

[৬৫] *আল-কুর'আন*, ০৫:৩২

[৬৬] যিনা আরবি শব্দ। অর্থ হলো ব্যভিচার। ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোনো প্রকারের যৌন ক্রিয়াকলাপ যা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ব্যতীত সম্পাদিত হয়, তা হলো যিনা। এ যিনা অবিবাহিত দুইজন মানুষের মধ্যে বা একজন বিবাহিত ও একজন অবিবাহিত মানুষের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে। সকল আসমানি কিতাব ও ইসলামি শরিয়াতের সকল দল-উপদলের মতে, যিনা এক বাক্যে হারাম। পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, সমকামিতা, পায়ুমৈথুন, পশুকামিতা যিনার অন্তর্ভুক্ত। যিনা তথা ব্যভিচার থেকে বাচার একমাত্র উপায় হলো বিবাহ করা। যিনা সর্বাধিক জঘন্য কবিরা গুনাহ। যিনাকারীর গুনাহ তওবা করা ছাড়া মাফ হয় না। কেননা যিনা ইসলামে বড় গুনাহ হিসেবে গণ্য যাকে কবীরা গুনাহ বলা হয়। যিনার শাস্তি পুরষ ও নারী উভয়ের জন্য সমান। পুরুষ ও মহিলা দু'জন অবিবাহিত হলে তাদেরকে একশত দোররা এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন আর দু'জন বিবাহিত হলে তাদেরকে ১০০ দোররা এবং মৃত্যু অবধি পাথর নিক্ষেপ। যিনাকারী ব্যক্তিরা যদি নিজেদের দোষ স্বীকার না করে তাহলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। তবে চারজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ যদি যিনাকারীদেরকে সঙ্গমরত অবস্থায় (লিঙ্গ প্রবেশকৃত) দেখে তাহলে যিনার শাস্তি কার্যকরী হবে। *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২১শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৯৮-৬০২

ইসলাম কেবলমাত্র এই ছয়টি অবস্থায় আইনের চূড়ান্ত বিচারে মানুষ হত্যা করার বিধান দিয়েছেন হত্যা কার্যে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন ব্যতীত। মহান আল্লাহ 'হত্যা' কে এমন গুরুতর ও জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করেছেন যে, এই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহকালে কিসাসের[৬৭] শাস্তি ভোগ করা সত্বেও আখেরাতে জাহান্নামি হবে। উপরন্তু সে মহান আল্লাহর গযব ও চরম অভিসম্পাতের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন :

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه ولعنة واعدله عذابا عظيما-

"কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং আল্লাহ্ তাহার প্রতি রুষ্ট হইবেন, তাহাকে লা'নত করিবেন এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখিবেন।"[৬৮]

বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছেন, " হে মানবজাতি ! নিশ্চয়ই তোমাদের জীবন, সম্পদ এবং সম্ভ্রম তোমাদের প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত (অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে) পবিত্র।"[৬৯]

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বের সকল মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই, সকলের মর্যাদা সমান, সবাই একই উৎস থেকে আগত এবং একই দেহের অংশ। ব্যক্তি, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান আচরণ, যাবতীয় অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার আর তোষণনীতির পরিবর্তে ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্যতা ও প্রযোজ্যতার নির্দেশনা দিয়ে ইসলাম যে বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছেন মানবসমাজের কল্যাণার্থে তা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বীকৃতি থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি নিঃশর্ত স্বীকৃতিদান এবং প্রকারান্তরে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বাণী ও শিক্ষা অমোঘ নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. আর্নল্ড টয়েনবি (১৮৮৯-১৯৭৫) বলেছিলেনঃ

> Equality and fraternity were the practice of Islam at least a thousand years before they became sologans of the French Revolution. The word 'Islam' means 'submission' (to God, not to man) and a common submission to God, as Muslims conceive of Him, makes all muslim feel like brothers.[70]

---

[৬৭] কিসাস আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো কর্তন করা। সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান রয়েছে ইসলামী পরিভাষায় তাকে কিসাস বলা হয়। সাধারণত কিসাস অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা কার্যকর করার দায়িত্ব বর্তায় সরকারের উপর। তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক নিজ হাতে হত্যার প্রতিশোধ যথাযথভাবে কার্যকরী করতে সক্ষম হলে আর সরকার বা তাঁর প্রতিনিধি তাকে এ কাজের জন্য যথোপযুক্ত মনে করলে সরকার বা তাঁর প্রতিনিধি নিজ হাতেই হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনুমতি দিতে পারে। সরকার বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে। এটা এই জন্যই যে, নতুবা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও তার লোকেরা বাড়াবাড়ি করতে পারে। নিহত ব্যক্তির অভিভাবক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় সরকার বা তাঁর প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকলে কোনো ভাবেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারবে না। ফলে মৃত্যুদণ্ড করার সময় সরকার পক্ষীয় প্রতিনিধির উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। কিসাস ফিন নাফস (হত্যার জন্য কিসাস)-এর ক্ষেত্রে সকল ফিকহবিদগণই নারী পুরুষের মর্যাদা একই পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন। অপরাধ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হলে কিসাস কার্যকরী হবে না। সুতরাং কিসাসের হুকুম বাস্তবায়নের জন্য অপরাধ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে হবে। বিস্তারিত দেখুন, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৮ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৪৬-২৫০; মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খণ্ড ৮, বৈরূত, দারু ইহ্য়া'ইত্ তুরাছিল আরবী, তা.বি., পৃ. ২৪৩-৪৪

[৬৮] *আল-কুর'আন*, ০৪:৯৩

[৬৯] মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহাব, *মুখতাসার সীরাত আর রাসূল*, ২য় সংস্করন, ১০৪৬ হিজরী, সৌদিয়া ইসলামী বিশ্ব, সৌদি আরব, পৃ. ১৮৪

[৭০] Dr. Arnold Toyenbee, *Islam Answers Most Powerful Demand of this Age.* The Islamic Review, Woking Mosque, London, September, 1961, p. 7

আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক মহান আল্লাহ্ তা'আলা। আর তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন মানুষ যেন এগুলো থেকে শক্তি সঞ্চারের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। মানুষের লক্ষ্যে পৌঁছা কিংবা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব নয় যদি তার প্রবৃদ্ধির সকল উপাদান পর্যাপ্ত না হয় এবং নিজের অধিকার পরিপূর্ণভাবে অর্জন করতে না পারে। জীবনধারণের অধিকারই হলো তার শীর্ষ অধিকার। এ অত্যাবশ্যকীয় অধিকারের বলেই মানুষ নিজের বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা এবং কর্মক্ষেত্র ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ইসলামই প্রথম ঘোষণা দিয়েছে যে, আদি উত্থানের দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। সুতরাং সকল মানুষ একটি মূল তথা একই উৎস হতে সৃষ্ট। তারা সকলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আর আল্লাহ তাদের আদি উত্থানকাল হতে তাদের মাঝে জীবনীশক্তি দিয়েছেন।[৭১] ফলে কেবল মুসলমানের জীবনই সম্মানিত নয়, আল্লাহ্র প্রত্যেক বান্দার জীবনই সম্মানিত। কোনো মুসলমানের হাতে অন্যায়ভাবে কোনো যিম্মি নিহত হলে সেই মুসলমানের জন্য জান্নাত হারাম। রাসূল (স.) বলেন,

من امن رجلا فقتله وجبت له النار-وان كان المقتول كافرا-

"যে ব্যক্তি কোনো লোককে নিরাপত্তা দান করার পর হত্যা করল, জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত হয়ে গেল, যদিও নিহত ব্যক্তি অমুসলিম হয়।"[৭২] অন্য হাদিসে তিনি রক্তের পবিত্রতা নষ্টকারীদের কঠোর ভাষায় সতর্ক করে বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত কাউকে হত্যা করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত শুঁকতে পারবে না। অথচ তার সুগন্ধী চল্লিশ বছর দূরত্ব থেকে অনুভূত হবে।"[৭৩] সুতরাং সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত জীবনের এ প্রাকৃতিক মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন কোনো পরিস্থিতিতেই অনুমোদনযোগ্য নয়। তবে ইসলাম ধর্মে কেবল বিচারকের রায়ের মাধ্যমেই কারো জীবন নিধন স্বীকৃত যা ইসলামি আইন ছয়টি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। বিচার কার্যক্রমে এ ন্যায়নীতি অনুসরণের ব্যাপারে কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ :

واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل-

"তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করিবে।"[৭৪]

গোপনে বিচারানুষ্ঠানের বিধান ইসলাম সমর্থন করে না। সব ধরনের বিচারকার্যই প্রকাশ্যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থন করার পূর্ণ সুযোগদানের মাধ্যমে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হতে হবে। বস্তুত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের এই সব মহামূল্য বাণী মানুষকে অকারণ হত্যা বা আঘাত করা থেকে বিরত

[৭১] মুহাম্মদ আলী আল-সাবূনী : *সাফাওয়াত আল-তাফসীর*, দার আল-কালাম, জিদ্দাহ, ১৯৮৬, খ.১, পৃ.২৪৩

[৭২] আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ আত তাবরানী, (বিশ্লেষক, হামাদি আব্দুল মাজিদ ইবনে ইসমাঈল) *আল মু'জামুল কবীর*, খণ্ড-২০, হাদিস নং-৬৪, ২য় সংস্করন, মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া, কায়রো, ১৯৮৩, পৃ. ৪১-৪২

[৭৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বুখারী শরীফ*, হাদিস নং- ৬৪৪৬, দশম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৯৭

[৭৪] *আল-কুর'আন*, ০৪:৫৮

রাখার উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হয়েছে। আর এভাবেই ইসলাম ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করেছে।

খ. আত্মহত্যা নিষিদ্ধ :

আল্লাহ তা'আলা কেবল অপরকে হত্যা করাই নিষিদ্ধ করেননি, বরং তিনি মানুষকে নিজের জীবন ধ্বংস না করারও নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আত্মহত্যাকারীরা নিজেরাই নিজেদেরকে জীবনের মূল্যবান অধিকার থেকে বঞ্চিত করে থাকে। কোরআনে আত্মহত্যাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলা হয়েছে :

ولا تقتلوا انفسكم- ان الله كان بكم رحيما-

"তোমরা নিজেদের হত্যা হত্যা করিও না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"[৭৫] নবি করিম (স.) বলেন,

الذى يخنق نفسه يخنقها فى النار والذى يطعنها فى النار-

"যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) নিজেকে ফাঁস লাগাতে থাকবে আর যে ব্যক্তি বর্শার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নাম (অনুরূপভাবে) বর্শা বিঁধতে থাকবে।"[৭৬]

সুতরাং আত্মহত্যা করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আত্মহত্যা না করে বরং নিজের অসহনীয় অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করার জন্য পবিত্র কোরআনুল কারিমের মাধ্যমে মানুষকে অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

গ. নবজাতক হত্যা নিষিদ্ধ :

প্রাক-ইসলামি যুগে নবজাতক হত্যা বিশেষত মেয়ে শিশুদেরকে জন্মলাভের পরপরই দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা বা জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। তাছাড়া মেয়ে সন্তান জন্মলাভ করলে সে সময় তাদের আত্মসম্মানে লাগত। ইসলামে শিশু হত্যাসহ সকল ধরনের হত্যা নিষিদ্ধ করে শিশুদের জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে।[৭৭] কোরআন মজিদে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানদের হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

ولا تقتلوا اولادكم من املاق- نحن نرزقكم و اياهم-

---

[৭৫] *আল-কুর'আন*, ০৪:২৯
[৭৬] ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ১২৮১, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১৭
[৭৭] গাজী শামছুর রহমান, *শরীয়া আইনে আত্মহত্যার দণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

“দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করিবে না, আমিই তোমাদের ও তাহাদের রিযিক দিয়া থাকি।”[৭৮]

দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق- نحن نرزقكم و اياكم- ان قتلهم كان خطا كبيرا-

“তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদেরকেও আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই উহাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।”[৭৯]

নিজেদের সন্তানদের হত্যা করলে যে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন,

قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله- قد ضلوا وما كانوا مهتدين

“যাহারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তাহারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা অবশ্যই বিপথগামী হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।”[৮০]

জাহিলী যুগে আরবদেশে কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়ার অমানুষিক প্রথা প্রচলিত ছিল। এই জঘন্য অপকর্মের জন্য পরকালের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে :

واذا المؤدة سئلت- باى ذنب قتلت-

“যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা ইহবে, কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল?”[৮১]

উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা’আলা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে নির্দেশনা দিয়েছেন যেন নিরপরাধ শিশু সন্তানকে (বিশেষত শিশু কন্যাদের) কোনো অবস্থায়ই হত্যা করা না হয়।

ঘ. গর্ভপাত নিষিদ্ধ :

ইসলামে গর্ভপাত নিষিদ্ধ। ইসলামি আইনে গর্ভপাত ফৌজদারি আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধ।[৮২] তবে জীবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে- কখন থেকে এর প্রয়োগ হবে? পৃথিবীর প্রচলিত আইনে

---

[৭৮] *আল-কুর’আন*, ০৬:১৫১
[৭৯] *আল-কুর’আন*, ১৭:৩১
[৮০] *আল-কুর’আন*, ০৬:১৪০
[৮১] *আল-কুর’আন*, ৮১:০৮
[৮২] Marion Holmes Katz, The Problem of Abortion in Classical Sunni Fiqh, *Islamic Ethics of life: Abortion, War and Euthansia*, Jonathan E. Brockopp (ed.), University of South Carolina Press, 2003, pp. 25-27

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার কার্যকর হয়। কিন্তু আল্লাহর আইনে কেবলমাত্র শিশু নয় বরং মাতৃগর্ভে আগত এবং আমাদের এই পৃথিবীতে অনাগত একটি ভ্রূণ শিশুর বাঁচার অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রাসূল (স.) বলেন : "ইয্দ সম্প্রদায়ের গামিদ গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট এসো বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তার কথা শুনে তিনি বললেন, তোমার অমঙ্গল হোক! ফিরে যাও, আল্লাহর কাছে মাফ চাও এবং তার নিকট তাওবাহ্ করো। তখন মহিলাটি বলে উঠলো, মায়েয ইবনে মালিককে আপনি যেভাবে হটিয়ে দিয়েছেন, আমিতো দেখেছি আপনি অনুরূপভাবে আমাকেও হটিয়ে দিতে চাচ্ছেন! এবার তিনি বলেন, আচ্ছা বলতো, তোমার কি হয়েছে? উত্তরে মহিলাটি বললো, তার নিজের গর্ভটি হচ্ছে যিনার দ্বারা অপগর্ভ! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই ব্যভিচারিণী? সে বললো, হাঁ আমিই। অতঃপর তিনি বললেন, যে পর্যন্ত তোমার পেটের ভেতর যা আছে তা খালাস না হয় সে পর্যন্ত তোমার ওপর পবিত্রতার বিধান প্রয়োগ করা হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আনসারী এক ব্যক্তি বললো, মহিলাটির গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত সে মহিলাটিকে নিজের দায়িত্বে রাখবে। বর্ণনাকারী বলেন, পরে একদিন উক্ত লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, গামেদীয়া গোত্রের মহিলাটির প্রসব হয়ে গেছে। এবার তিনি বললেন, এখনও আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করতে পারবো না, আর আমরা তার দুগ্ধপোষ্য ছোট্ট শিশুটিকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেবো না যে, তাকে দুগ্ধপান করাবার কেউই থাকবে না। তখন জনৈক আনসারী ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, হে আল্লাহ্র নবী! ঐ শিশুটিকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেবো না যে, তাকে দুগ্ধপান করাবার কেউই থাকবে না। তখন জনৈক আনসারী ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, হে আল্লাহ্র নবী! ঐ শিশুটিকে দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর উক্ত মহিলাটিকে রজম করা হলো।"[৮৩]

ইসলামি আইন বিশারদগণের মতে- তিন থেকে চার মাস পর মাতৃগর্ভে ভ্রূণ এর মধ্যে প্রাণসঞ্চার হয়ে থাকে। তাই তখন গর্ভপাত করানোটা ভীষণ বিপদজ্জনক এবং এতে জন্মদানকারী মায়ের মৃত্যুর আশংকা থাকে। তাই ইসলামি আইন বিশারদগণ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সন্তান গর্ভধারণের ১২০ দিনের মাথায় মাতৃগর্ভে ভ্রূণ এর মধ্যে প্রাণসঞ্চার হয়ে মানুষের আকৃতি ধারণ করে বিধায় ১২০ দিন তথা চার মাসের সময় প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার ধার্য করেছেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ফকিহগণের এই অভিমত শত-সহস্র বছর পর স্বীকার করে নিয়েছে। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট রো বনাম ওয়েড-এর বিখ্যাত মামলায় আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যের বরাতে রায় দিয়েছে যে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণ-এর মধ্যে গর্ভধারণের তিনমাস পর

[৮৩] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), অনু. মাওলানা আফলাতুন কায়সার, *সহীহ মুসলিম*, ষষ্ঠ খণ্ড, হাদিস নং-৪২৮৩, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১২৮-১২৯

'মানব অস্তিত্ব' কে আইনত স্বীকার করে নিতে হবে।[৮৪] ইসলাম ধরণীর সমস্ত মানুষের বাঁচার অধিকারকে নিরঙ্কুশভাবে বলবৎ করতে, বিনা অপরাধে একজনের হত্যাকে জগৎ হত্যার পাপে পরিণত করেছে। আবার একজনের রক্ষাকে জগৎ রক্ষার সম্মান দিয়েছে। মার্তৃগর্ভে একজন ভ্রূণশিশুর বাঁচার অধিকারকে রক্ষা করতে গিয়ে তার মায়ের প্রাণদণ্ডকেও তার প্রসবকাল পর্যন্ত রুখে দিয়েছে। তাই ইসলামে মানুষের বাঁচার অধিকার তাঁর জন্মগত শাশ্বত অধিকার।

স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও সম্পত্তির মালিকানার অধিকার

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সকল সম্পদের প্রকৃত মালিকানা নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌র মালিকানা সম্পদ মানুষকে দেওয়া হয়েছে তার নিরংকুশ মালিক বানিয়ে নয় বরং প্রকৃত মালিকের প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে। মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত (Trustee) হিসেবে এর অর্জন, ভোগ ও বণ্টনের অধিকার লাভ করে। ইরশাদ হয়েছে:

وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه-

"আল্লাহ তোমাদেরকে যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর।"[৮৫]

আল্লাহ্‌ তার বান্দার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল ও দয়াপরবশ। পৃথিবীতে সকল মানুষ সমান সম্পদের অধিকারী না। সকল মানুষ যদি একই রকমের সম্পদের অধিকারী হতো তাহলে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেত। পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে ধনী-গরিবের সৃষ্টি করে ব্যবধান গড়ে তুলেছেন এবং ধনীর সম্পদে গরিবের হক নির্ধারিত করে রেখেছেন। সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাহাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে। মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى- لهم اجرهم عند ربهم- ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون-

"যাহারা আল্লাহ্‌র পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে অতঃপর যাহা ব্যয় করে তাহার কথা বলিয়া বেড়ায় না এবং ক্লেশও দেয় না, তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।"[৮৬]

[৮৪] আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন, অক্টোবর ১৯৭২ খ্রি., নিউইয়র্ক ১৯৭৪ খ্রি., পৃ. ১৪৭
[৮৫] *আল-কুর'আন*, ৫৭:০৭
[৮৬] *আল-কুর'আন*, ০২:২৬১

সূরা বাকারার অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض- ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه- واعلموا ان الله غنى حميد-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা উপার্জন কর এবং আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ব্যয় কর; এবং উহার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করিও না; অথচ তোমরা উহা গ্রহণ করিবার নও, যদি তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাক এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, সর্বজ্ঞ।"[৮৭]

মানুষ ধনসম্পদ যেসব পদ্ধতিতে লাভ করতে পারে, নিজস্ব শ্রম তার মধ্যে প্রধান। তাই ধনসম্পদ উপার্জন করার অধিকার প্রত্যেকটি মানুষেরই রয়েছে। উপার্জনকারী নারী-পুরুষ যে-ই হোক না কেন তার সংরক্ষক প্রধানত সে-ই হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض- للرجال نصيب مما اكتسبوا- وللنساء نصيب مما اكتسبن- وسئلوا الله من فضله- ان الله كان بكل شئ عليما-

"যদ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তোমরা তাহার লালসা করিও না। পুরুষ যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ্র নিকট তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[৮৮]

ধন-সম্পদের এই উপার্জন ও উপার্জিত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ মানবাধিকার বিশেষ। এর কোনোটিতে বাধা দেওয়া হলে মানবাধিকার হরণেরই অপরাধ হবে। সুতরাং এটা প্রমাণিত যে, ইসলামি শরিয়ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত মালিকানা রাখার অধিকার দিয়েছে। অতএব ইসলামি রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ কেউ চালালে তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করতেই হবে। অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে সরকার কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর ও অতীব প্রয়োজন মনে করলে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করে মালিকের সম্মতিতে তা গ্রহণ করতে পারবে।

ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত এবং মালিক তার মালিকানা ভোগ ব্যবহার করার অবাধ অধিকারই লাভ করে থাকে, তবে তা শর্তহীন ও নিরংকুশ নয়। সেজন্য এক্ষেত্রে শরিয়ত নির্ধারিত সমস্ত অধিকার ও কর্তব্য যেমন যাকাত, দান-খয়রাত, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র পরিজন, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের লালন-

[৮৭] *আল-কুর'আন*, ০২:২৬৭
[৮৮] *আল-কুর'আন*, ০৪:৩২

পালন ও যত্নের ব্যয়ভার ও দায়িত্ব বহন করতে হবে। ধনসম্পদ ব্যয় করতে হবে প্রধানত কাদের জন্য তা এ আয়াতটির মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে-

قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتمى والمسكين وابن السبيل- وما تفعلوا من خير فان الله به عليم-

"যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় করিবে তাহা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম, মিস্‌কিন এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যাহা কিছু তোমরা কর না কেন আল্লাহ্ তো সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।"[৮৯]

অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রজনের সাহায্য দান করার কাজটি অপরিহার্য হবে তখন, যদি যাকাত ফান্ড ও সরকারি ব্যবস্থাপনা তাদের অভাব মেটাতে অক্ষম হয়।[৯০] ব্যক্তির সম্পদের মালিকানা সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখার জন্য রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা, প্রশাসন ব্যবস্থা, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, জরুরি অবস্থা, যেমন যুদ্ধ-বিগ্রহ, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, ভূমিকম্প, ইত্যাদি খাতের ব্যয়ভার বহনের জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক ধার্যকৃত সব ধরনের কর পরিশোধ বাধ্যতামূলক।

সাধারণ প্রচলিত কাজ ও শ্রমের পরিণামে অর্জিত সম্পদ, মিরাসসূত্রে প্রাপ্ত, পারস্পরিক লেনদেন ও চুক্তি, ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত ধনসম্পদে ব্যক্তিগত মালিকানা ইসলামি শরিয়তে বৈধ মালিকানারূপে স্বীকৃত। সম্পদের অধিকার রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেন,

من قتل دون ماله فهو شهيد-

"যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহিদ।"[৯১]

কিন্তু তাতে যদি চুরি, লুটতরাজ, জুয়া, মাত্রাতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ, ঘুষ ও সুদ ইত্যাদি ধরনের কোনো আয় জড়িত হয়, তবে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিমের স্পষ্ট নির্দেশ:

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعملون-

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধনসম্পত্তির কিয়দংশ জানিয়া-শুনিয়া অন্যায়ভাবে গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উহা বিচারকগণের নিকট পেশ করিও না।"[৯২]

অতএব শরিয়তের দৃষ্টিতে কারোর মালিকানা বৈধ প্রমাণিত হলে তার ব্যয় ও ব্যবহারের অধিকারও নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হবে। প্রতারণা, চৌর্যবৃত্তি, ডাকাতি ইত্যাদির সম্পদ হস্তগতকরণ, বাজারে কৃত্রিমভাবে মূল্যবৃদ্ধির জন্য

---

[৮৯] *আল-কুর'আন*, ০২:২১৫
[৯০] ড. আবদুল করিম যায়দান, *ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা*, অনু, মাওলানা মুহাম্মাদ আবুদর রহীম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬৭
[৯১] ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ২৩১৮, চতুর্থ খণ্ড,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৫
[৯২] *আল-কুর'আন*, ০২:১৮৮

পণ্যদ্রব্য মজুদকরণ, সুদের ভিত্তিতে ঋণ দান করে লভ্যাংশ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ ও সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। তা কেউ করলে সরকার এ সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে দিবেন।[৯৩] ধন-মালের সঞ্চয় ও ব্যয়ের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা প্রয়োজনীয় আইন-বিধান দিয়েছেন।

মান-সম্মানের নিরাপত্তার অধিকার

মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম হাতিয়ার হলো তার মান-সম্মান। বিদ্যা-বুদ্ধি, ধনদৌলত, বল-বিক্রম, সন্তান-সন্ততি, যশ-খ্যাতির কোনো মূল্য নেই, যখন একটি মানুষ তার মান-সম্মান হারিয়ে বসে। অথচ ইসলামে মানুষের মর্যাদা রক্ষার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তাই, মানহানিকর আচরণের সকল কর্মকাণ্ড যেমন– মিথ্যা অপবাদ, নাম ও উপাধি বিকৃতকরণ, নিন্দা, উপহাস প্রভৃতি কর্মকাণ্ড ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ان يكن خيرا منهن - ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالا لقاب- بئس الاسم الفسوق بعد الايمان- ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون-

"হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যাহারা তওবা না করে তাহারাই জালিম।"[৯৪]

আল্লাহ তা'আলা বহুবিধ অনুমান ও অপরের পশ্চাতে নিন্দা না করার মমার্থে ইরশাদ করেন :

يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن- ان بعض الظن اثم ولا تجسوا ولا يغتب بعضكم بعضا- ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكر هتموه- واتقوا الله- ان الله تواب رحيم-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশ্ত খাইতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণার্হ মনে কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ; আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।"[৯৫]

---

[৯৩] ড. আবদুল করিম যায়দান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭
[৯৪] *আল-কুর'আন*, ৪৯:১১
[৯৫] *আল-কুর'আন*, ৪৯:১২

পারস্পরিক বাক্য বিনিময়ে অশ্লীলভাষী হতে কঠোরভাবে নিষেধ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم- وكان الله سميعا عليما-

"মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না ; তবে যাহার উপর জুলুম করা হইয়াছে সে ব্যতীত। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৯৬]

নারী জাতির সম্ভ্রমের প্রতি অপবাদ আরোপ ইসলামি শরিয়া আইনে একটি জঘন্য কর্ম হিসেবে বিবেচিত। কোরআনে এরূপ অপবাদ আরোপকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

ان الذين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنت لعنوا فى الدنيا والاخرة- ولهم عذاب عظيم-

"যাহারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাহাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।"[৯৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم- ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون-

"মু'মিনদেরকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম। উহারা যাহা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।"[৯৮]

আল্লাহ আরও বলেন,

وقل للمؤمنين يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن-

"আর মু'মিন নারীদেরকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।"[৯৯]

কোরআনের উপরিউক্ত আয়াতসমূহে মানহানিকর বিভিন্ন আচরণকে নিষিদ্ধ করে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং মানুষের মান-সম্মান ও মর্যাদার মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানকে সমস্ত মাখলুকাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

ولقد كرمنا بنى ادم وحملنهم فى البر والبحر ورزقنهم من الطيبت و فضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا-

---

[৯৬] *আল-কুর'আন*, ০৪:১৪৮
[৯৭] *আল-কুর'আন*, ২৪:২৩
[৯৮] *আল-কুর'আন*, ২৪:৩০
[৯৯] *আল-কুর'আন*, ২৪:৩১

“আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি; স্থলে ও সমুদ্রে উহাদের চলাচলের বাহন দিয়াছি; উহাদেরকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের অনেকের উপর উহাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।”[১০০]

মান ইজ্জতের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন । রাসূল করিম (স.) বলেন,

من كانت له مظلمة لاحد من عرضه او شيئ فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه-

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রম হানী বা অন্য কোন বিষয়ে জুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাপ করায়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোন দিনার বা দিরহাম থাকবে না। সে দিন তার কোন সৎকর্ম থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।”[১০১]

মান মর্যাদার ব্যাপারে ইসলামি নীতিমালা হচ্ছে সমাজের প্রত্যেক সদস্য সম্মানিত। ইসলামে কোনো ব্যক্তির পদ, স্থান ও বিত্তবৈভব দিয়ে মান মর্যাদা রক্ষা হয় না। হযরত উমর ফারুক (রা.) লোকদের সামনে ভাষণ দিয়ে ঘোষণা করতেন, “হে জনতা! আমি আমার শাসকবর্গকে তোমাদের ওপর নিয়োগ করেছি এজন্যে নয় যে, তারা তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জতের ওপর হস্তক্ষেপ করবে বরং তাদের নিয়োগ করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, তারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করবে, সরকারি ভাণ্ডার থেকে জাতীয় সম্পদ প্রয়োজনমতো তোমাদের মাঝে বণ্টন করবে। এদের কেউ যদি এর বিপরীত কিছু করে থাকে, তাহলে এ জনসমাবেশে তার বিরুদ্ধে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ফরিয়াদ করো।”[১০২]

মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা বড়ো জিনিস হলো তার আত্মসম্মান। আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য মানুষ ধনসম্পদ বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। অনেক সময় মানুষ আত্মহত্যা করে আত্মসম্মানে আঘাত পেলে। আবার অনেক সময় আত্মসম্মানের আঘাতহেতু মানুষ জ্ঞানহারা হয়ে যায়। তাই ইসলাম মানুষের মান-সম্মানকে অনেক গুরত্ব দিয়েছে যাতে ওখানে কোনোরূপ আঘাত না পড়ে।

দাসত্ব থেকে স্বাধীনতার অধিকার

পৃথিবীতে সকল মানুষ স্বাধীন হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু দাসপ্রথার কারণে মানুষ মানুষের অধীনে দাস। মানবসমাজের একটি শ্রেণী দাসপ্রথার কারণে স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান এবং পৃথিবীর সকল মানুষ একই সম্প্রদায়ভুক্ত। আল কোরআনের ভাষায় :

---

[১০০] *আল-কুর’আন*, ১৭:৭০
[১০১] ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ২২৮৭, চতুর্থ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*,পৃ. ২৪৭
[১০২] মুহাম্মদ ইবনে সায়াদ ইবনে মুনী, *কিতাবুত তবাকাত আল-কাবীর*, খণ্ড-৩, মাকতাবাতুল খামজী, কায়রো, ২০০১, পৃ. ২৭৪

كان الناس امة واحدة-

"সমস্ত মানব ছিল একই উম্মত।"[১০৩]

কিন্তু দার্শনিক প্লেটো ও এ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে পরবর্তীতে আঠারো শতকের অধিকাংশ দার্শনিক মানুষের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে দাসপ্রথাকে সমর্থন করেছেন। দাসপ্রথা সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মতামত উল্লেখ করে- Abdullah Kannoun বলেছেন- "In his opinion, mankind consisted of two catagories-the free and the slaves and to him some people were slaves by their very nature."[১০৪]

সে সময় বিশ্ব সভ্যতায় দাসদের নাগরিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। আমেরিকায় দাস-দাসীদের প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে গিয়ে Abdullah Kannoun *'The Civilization of the Arabs'* গ্রন্থ প্রণেতা *French Soholar Gustave Le Bon* এর লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছেন-

> In the mind of the European reader of the American stories of the thirty years ago, the term slavery evoked pictures of miserable human beings, driven in shackless under the point of the whip, badly fed and living in dark cells.[১০৫]

দাসপ্রথা বিলুপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সপ্তম শতাব্দীতে মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (স.) করেছেন। ইসলাম সমস্ত বিশ্বের মানুষকে এক আদমের বংশজাত ও এক অভিন্ন পরিবারের লোক বলার সাথে সাথে এই ঘোষণাও দিয়েছে যে, সব মানুষ জন্মগতভাবে সমান, স্বাধীন ও মুক্ত। মানুষ প্রভু বা দাস নয়, হতে পারে না।[১০৬]

মহানবি (স.) বলেছেন,

قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعط اجره-

"আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। আরেক ব্যক্তি, যে কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিয়োগ করে তার থেকে পুরা কাজ আদায় করে এবং তার

---

১০৩ *আল-কুর'আন*, ০২:২১৩

১০৪ Quoted in Abdullah Kannoun, *Islam as The First Anti-Slavery Religious System of the World,* The Islam Review Journal, 1966, UK, p.37

১০৫ *Ibid*, p.37

১০৬ Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam,* Cosmo Classics, New York, 2010, pp. 266-67

পারিশ্রমিক দেয় না।"[১০৭] ইসলামে দাস-দাসী রাখার কোনো বিধান নেই শুধুমাত্র যুদ্ধবন্দি ব্যতীত। তবে তাও শর্তসাপেক্ষে ছিল যে, (১) অনুগ্রহ ও দয়া করে মুক্তকরণ (২) মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তকরণ (৩) বন্দি বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তকরণ ; যখন এ তিনটি পদ্ধতির কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের মুক্ত করা সম্ভব না হয় তাহলে যুদ্ধবন্দিদেরকে দাস-দাসী হিসেবে রাখা যাবে। কোরআনে বলা হয়েছে,

فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب- حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق-

"অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে কষিয়া বাঁধিবে।"[১০৮]

ইসলামে গৃহীত কয়েকটি অভূতপূর্ব ব্যবস্থা সকল ধরনের দাস-দাসীর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পথ খুলে দিয়েছিল। ইসলাম কর্তৃক এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দাসপ্রথা প্রকৃত অর্থে বিলুপ্ত হয় যার সূতিকাগার ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)।

শ্রমিকের অধিকার

ইসলাম শ্রমজীবী মানুষের নিরাপত্তালাভের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) উৎপাদিত পণ্যে কিংবা তার মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারিত্বের কথা বলেছেন। পুঁজি ও শ্রমের সমন্বয়ের ফলেই ফসল ও ফল-ফলাদি উৎপাদন হয়। মহানবি (স.) বহুদিন পর্যন্ত মুদারাবাতের ভিত্তিতে নিজের শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে অংশীদার হিসাবে হযরত খাদিজার (রা.) ব্যবসায় শ্রম দিয়েছেন। আল কোরআনের ঘোষণা :

وفى اموالهم حق للسائل والمحروم-

"এবং তাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।"[১০৯]

বিশ্ব-মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনার নগর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা ইসলামি সমাজে নারী, পুরুষ, শ্রমিক, সাধারণ জনতা নির্বিশেষে সকল মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আদর্শ মানবসমাজ গঠন করে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। রাসূল (স.) মদিনা রাষ্ট্রে যখন শ্রম ও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন তখন দুনিয়ার কোথাও শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে মানুষের কোনোই সচতেনতা ছিল না। আধুনিক মানবাধিকারের ধারণা পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে ১৯৪৫ সালে প্রণীত জাতিসংঘ চার্টারে। ইসলামের নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজেই শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন।

[১০৭] ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ২০৮৬, চতুর্থ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬
[১০৮] *আল-কুর'আন*, ৪৭:০৪
[১০৯] *আল-কুর'আন*, ৫১:১৯

ইসলামি সমাজে শ্রমিক, চাষী এবং অন্যান্য শ্রমজীবীকে কেউ মজুরি ছাড়া খাটাতে পারবে না। ফলে ইসলামে শ্রমিকদের অধিকার, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, ন্যায্য মজুরি ইত্যাদি অত্যন্ত গুরত্ব পেয়েছে। মানুষের জীবিকার প্রধান উপায় শ্রম। কোরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে :

وان ليس للانسان الا ما سعى- وان سعيه سوف يرى- ثم يجزه الجزاء الاوفى-

"আর এই যে, মানুষ তাহাই পায় যাহা সে করে, আর এই যে, তাহার কর্ম অচিরেই দেখান হইবে– অতঃপর তাহাকে দেওয়া হইবে পূর্ণ প্রতিদান।"[১১০]

আমাদের শ্রম আইনে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক হচ্ছে প্রভু-ভৃত্যের সমতুল্য। কিন্তু মহানবির (স.) আদর্শে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তারা সকলেই আল্লাহর বান্দা ও পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে রাসূল করিম (স.) বলেছেন :

هم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتوهم فاعينوهم-

"ওরা তোমাদের ভাই, তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পাদনকারী। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন, কাজেই কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে, তবে সে যা খায়, তা থেকে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে যা পরিধান করে, তা থেকে যেন তাকে পরিধান করায়। এবং তাদেরকে সাধ্যাতীত কোন কাজে বাধ্য করা না। তোমরা যদি তাদের শক্তির উর্ধ্বে কোন কাজ তাদের দাও, তবে তাদের সহযোগিতা কর।[১১১] একজন সৎকর্মশীল শ্রমিক সম্পর্কে কোরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে :

ان خير من استأجرت القوى الامين-

"কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।"[১১২] মালিক শ্রমিক উভয়ের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ :

واوفوا بالعهد- ان العهد كان مسئولا-

"প্রতিশ্রুতি পালন করিও; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।"[১১৩]

এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, শ্রমের উপার্জন কাজ ইসলামে খুবই পছন্দীয় ও সমর্থিত। শ্রম করার অধিকার এবং যে কোনো বৈধ পথে শ্রম করে উপার্জন করার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার পর্যায়ে গণ্য।

---

[১১০] *আল-কুর'আন*, ৫৩:৩৯-৪১
[১১১] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ২৩৭৭, চতুর্থ খণ্ড,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৪-৩০৫
[১১২] *আল-কুর'আন*, ২৮:২৬
[১১৩] *আল-কুর'আন*, ১৭:৩৪

শ্রম করার এই অধিকার পুরুষ ও নারীর জন্যে সর্বোতোভাবে সমান। নিজের পছন্দমতো বৈধ ও আইনসম্মত যে কোনো পন্থায় শ্রম করাও প্রতিটি শ্রমিকের পূর্ণ স্বাধীনতাসম্পন্ন অধিকার।

ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা যেখানে শ্রমিক-কর্মচারীর ন্যায়সঙ্গত মজুরি নিশ্চিত করেছে। ইসলাম কাউকে জোর করে পরিশ্রমে বাধ্য করা, সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, কম মজুরিতে শ্রম নেওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছে। শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে শ্রম অনুযায়ী মজুরি যথাসময়ে দেওয়ার জন্য ইসলাম তাগিদ দিয়েছে। কেউ অতিরিক্ত কাজ করলে তার মজুরি বা সেজন্যে ঘোষিত পুরস্কার পাওয়ার অধিকারও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।[১১৪] আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فمن يعمل مشقال ذرة خيرا يره- ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره-

"কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে।"[১১৫]

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক কাজ করা মাত্রই পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে। কোনো শ্রমিকের মাধ্যমে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে তাকে কম মজুরি দেওয়া হলে ইসলামের বিধান মোতাবেক শাস্তি পেতে হবে। শ্রমিকের শ্রম অনুযায়ী মজুরি প্রদান করতে হবে। কেউ অতিরিক্ত শ্রম দিলে অবশ্যই অতিরিক্ত মজুরি দিতে হবে। এক কথায়, প্রত্যেক কাজের যা মূল্য, তাতে শ্রমিকের পারিশ্রমিক বা মজুরি পূর্ণ মাত্রায় দিতে হবে এবং যাতে কোনোরূপ জুলুম, শোষণ বা বঞ্চনার অবকাশ থাকতে পারে না। তাই কোরআনে বলা হয়েছে :

ولكل درجت مما عملوا- وليوفيهم اعم لهم وهم لا يظلمون-

"প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী, ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না।"[১১৬]

শ্রমের চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক শ্রমিককে যথাসময়ে পূর্ণ মজুরি পরিশোধ করতে হবে। ইসলামে শ্রমিকদের সাথে মানবিক আচরণ করা এবং দ্রুত পারিশ্রমিক প্রদানের জন্য তাগিদ দিয়েছে। মহানবি (স.) বলেন,

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه-

"শ্রমিককে তার মজুরী দিয়ে দাও, তার ঘাম শুকাবার আগে।"[১১৭]

---

[১১৪] Khalil Ur Rehman, *The Concept of Labor in Islam*, Xlibris Corporation, New York, 2010, p. 17

[১১৫] *আল-কুর'আন*, ৯৯:৭-৮

[১১৬] *আল-কুর'আন*, ৪৬:১৯

মজুরির পরিমাণ দেশ ও যুগের অবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। তবে উপার্জনকারী যেন তার উপার্জন দ্বারা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করতে পারে। শ্রমিককে মজুরি না দেওয়া বা কাজ অনুপাতে না দেওয়া ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শ্রমিককে একাধারে বিশ্রামহীন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না। কেননা একটানা কাজ দেহকে অবসন্ন করে, মনকে ভরে দেয় অবসাদে। ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরকে পুনরায় কর্মক্ষম করে তুলতে প্রয়োজন যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম যা মৌলিক মানবাধিকার পর্যায়ে গণ্য।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিরাপত্তার অধিকার

ইসলামে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার হলো মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিরাপত্তার অধিকার। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন হওয়ার কারণে স্বাধীনতা আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। ইসলাম পরিষ্কার ঘোষণা করেছে, ইসলামি রাষ্ট্রে কোনো মানুষকেই বিচারের পূর্বে আটক করা যায় না। আইনের সুস্পষ্ট বিধান ছাড়া শুধুমাত্র সন্দেহ, সংশয় ও অনুমান বশত কাউকে গ্রেফতার, আটক বা বলপ্রয়োগ ইসলাম সমর্থন করে না। কোনো উপযুক্ত আদালতে আইনানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে কোনোরূপ শাস্তি দেওয়া যাবে না।[১১৮] কোরআনুল কারিমের সুস্পষ্ট ঘোষণা, আল্লাহ তার বান্দাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, কোনো সাধারণ শাসক তো দূরের কথা খোদ আল্লাহর নবিও তা খর্ব করতে পারেন না। ইরশাদ হচ্ছে,

ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون-

"কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিক্মত ও নবুওয়াত দান করিবার পর সে মানুষকে বলিবে, 'আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হইয়া যাও', ইহা তাহার জন্য সঙ্গত নহে; বরং সে বলিবে, তোমরা রব্বানী হইয়া যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।"[১১৯]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

افغير الله ابتغى حكما وهو الذى انزل اليكم الكتاب مفصلا- والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين-

[১১৭] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, অনু, ডঃ আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম, *সুনানু ইবনু মাজাহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, হাদিস নং-২৪৪৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪০১

[১১৮] Mohammad Hashim Kamali, *The Right to life, Security, Privacy and Ownership in Islam*, Islamic Tex Society, Kualalampur, 2008, pp. 6-22

[১১৯] *আল-কুর'আন*, ০৩:৭৯

"বল 'তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সালিস মানিব– যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন!' আমি যাহাদেরকে কিতাব দিয়াছি তাহারা জানে যে, উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।"[১২০]

ইসলাম সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে গ্রেফতার বা দোষী সাব্যস্ত করাকে অন্যায় মনে করে। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরও দাবি হলো, অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া ছাড়া ইনসাফ হতে পারে না। আবু দাউদ শরিফে উল্লিখিত একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: একবার নবি করিম (স.) মসজিদে নববিতে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণ চলাকালে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রতিবেশীকে দেনার কারণে আটক রাখা হয়েছে, তিনি দুবার এরূপ উচ্চারন করেন। এর পর তিনি বলেন, কিছু জিনিসের জন্য। তখন নবী (স.) তাকে বলেন ঃ তুমি তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দাও।"[১২১]

রাসূল করিম (স.) তাঁর এই প্রশ্নের প্রথম ও দ্বিতীয়ভার কোনো জবাবই দিলেন না। কারণ শহরের মুহতাসিব[১২২] গ্রেফতারির কোনো সংগত কারণ থাকলে সে জবাব দিবে, এই আশায় তিনি নিরুত্তর রইলেন। গ্রেফতারকৃত লোকটির কোনো অপরাধ থাকলে তিনি তা দাঁড়িয়ে বর্ণনা করবেন। কিন্তু তৃতীয়বারও যখন সেই সাহাবি পুনরাবৃত্তি করলেন এবং মুহতাসিবও তখন পর্যন্ত নীরব রইলেন, তখন রাসূল (স.) বুঝতে পারলেন যে, লোকটাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে, তখন রাসূল (স.) স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিলেন যে, এই লোকটির প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও। এই ঘটনা হতে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোনো সুনির্দিষ্ট অপরাধে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে আটক করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইসলামি নীতিতে অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে বন্দি বা গ্রেফতার করা যাবে না যা হযরত উমর (রা.) একটি মোকাদ্দমার ফায়সালা করতে গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন। ইসলামি রাষ্ট্রে ব্যক্তিকে ততটুকুই শাস্তি দেওয়া হবে, যতটুকু শরিয়তি আইনের প্রকাশ্যে বিচারে তার অপরাধ প্রমাণিত হবে । একজনের অপরাধের জন্য কখনোও অন্যজনকে শাস্তি ভোগ করতে হয় না। অপরাধী ব্যক্তিকে তার নিজের কৃতকর্ম অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে। কোরআন মজিদে বলা হয়েছে :

---

[১২০] *আল-কুর'আন*, ০৬:১১৪

[১২১] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস্‌সিজিস্তানী (র), অনু. ডঃ আফ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক, *আবূ দাউদ শরীফ*, হাদিস নং- ৩৫৯২, চতুর্থ খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৬৭

[১২২] অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে অসাধুতা রোধ, বাজার ও অন্যান্য স্থানের তদারকি, ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর তৎপরতা প্রতিরোধক এবং ধর্মীয় ও নৈতিক বিধান তদারকিসহ সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মুহতাসিব বলা হয়। মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মুহতাসিবের দায়িত্ব মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। বাজার পরিদর্শন ও তদারকি, ওজনে ব্যবসায়ীদের কারচুপি রোধ, দ্রব্যসামগ্রীতে ভেজাল প্রদানে নিষেধাজ্ঞা ও মজুতদারি যেন কেউ করতে না পারে তার জন্য মহানবি (স.) সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেলে হযরত উমর ফারুক (রা.) কে মদিনায় ও সাঈদ বিন আল আসকে মক্কার মুহতাসিব নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে এর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হলে নগরকেন্দ্রিক মুহতাসিব নিয়োগ দেওয়া হয় । উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে এ পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*, আহসান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৬০৬-৯

ولا تزر وازرة وزر اخرى-

"কেহ অন্য কাহারও ভার বহর করিবে না।"[১২৩]

ইসলাম অবতীর্ণ হয়েছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে। ফলে ন্যায়পরায়ণতার মানদণ্ডে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষিত হবে। মহান আল্লাহ পাক মহানবি (স.) কে ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন :

وامرت لاعدل بينكم - الله ربنا وربكم - لنا أعمالنا ولكم أعمالكم - لا حجة بيننا وبينكم - الله يجمع بيننا - واليه المصير-

"আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিতে। আল্লাহ্ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। আল্লাহ্ই আমাদেরকে একত্র করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।"[১২৪]

ন্যায়ভিত্তিক বিচার কার্য পরিচালনার জন্য আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেন :

واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل- ان الله نعما يعظكم به- ان الله كان سميعا بصيرا-

"তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করিবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[১২৫]

ইসলাম শাস্তি পরিহার এবং মুক্তির অনুসন্ধানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। রাসূলে করিম (স.) এর ভাষ্য হচ্ছে:

ادرء والحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإنّ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطي في العقوبة-

"তোমরা যথাসম্ভব মুসলিমদের থেকে হদ প্রতিহত করতে চেষ্টা করবে। সম্ভব হলে, কোন উপায় থাকলে তাকে তার পথে ছেড়ে দিও। কারণ, ইমাম বা কর্তৃপক্ষের শাস্তি প্রদান করে ভুল করা অপেক্ষা ক্ষমা করা শ্রেয়।"[১২৬]

রাসূলে (স.) জীবনে কোনোদিনই কারো ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন না। এমনকি তাঁর স্ত্রী ও দাস-দাসীদেরও অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল। ইসলাম কখনোই স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দেয় না বরং উৎসাহ প্রদান করে।

[১২৩] *আল-কুর'আন*, ১৭:১৫
[১২৪] *আল-কুর'আন*, ৪২:১৫
[১২৫] *আল-কুর'আন*, ০৪:৫৮
[১২৬] ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী (র), অনু. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*, চতুর্থ খণ্ড, হাদিস নং- ১৪২৯, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৭০

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার এবং বাসস্থানের স্বাধীনতা

ইসলামের দেওয়া মৌলিক অধিকার অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে নিরাপদ রাখার অধিকার রাখে। ইসলামি রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি নাগরিক তার বসবাসের স্থানে গোপনীয়তা রক্ষা ও বাসস্থানের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। বিনা অনুমতিতে কোনো ব্যক্তি ঘরের মালিকের অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। আর ঘরের চার দেয়ালকে একটি সুরক্ষিত দুর্গের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ঘরের ভেতর অন্য কারো হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই। কেননা বসবাসের স্থান হলো প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব গোপন এলাকা। এখানে তার সাথে তার স্ত্রী ও পরিবারবর্গ বাস করে। গৃহের অভ্যন্তরে নারী-পুরুষ অসতর্কাবস্থায় থাকে বিধায় বিনানুমতিতে প্রবেশের কারণে গৃহবাসীর বিরক্তি উৎপাদনের সমূহসম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া আবাসস্থলে মানুষ ক্লান্তি শেষে বিশ্রাম গ্রহণ করার সময় বিনা অনুমতিতে অযাচিতভাবে বাসস্থানে প্রবেশ মানুষের স্বাধীনতা ও শান্তিকে বিঘ্নিত করে। কোরআনে মানুষের এ অধিকার হস্তক্ষেপ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলা হয়েছে,

يايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها- ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون- فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم- وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم- والله بما تعملون عليم-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না লইয়া এবং তাহাদেরকে সালাম না করিয়া প্রবেশ করিও না। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। যদি তোমরা গৃহে কাহাকেও না পাও তাহা হইলে উহাতে প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরিয়া যাও', তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।"[১২৭]

আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ নিজেদের ইচ্ছেমতে হুটহাট করে কোনো প্রকারের অনুমতি ছাড়া একে অপরের বাড়িতে ঢুকে পড়ত। এতে পারিবারিক শালীনতা ক্ষুন্ন হতো এবং গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী অনেক সময় অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকতেন। মুসলমানদেরকে অপর কারো ঘরে বা বসবাসের স্থানে বিনানুমতিতে প্রবেশ না করার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন অন্যের অন্দর মহলে অনুমতি ব্যতীত ঘন ঘন প্রবেশ না করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে :

يايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوت النبى الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه - ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولامستأنسين لحديث-

---

[১২৭] *আল-কুর'আন*, ২৪:২৭-২৮

“হে মু’মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভোজনের জন্য নবিগৃহে প্রবেশ করিও না। তবে তোমাদেরকে আহবান করিলে তোমরা প্রবেশ করিও এবং ভোজন শেষে চলিয়া যাইও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হইয়া পড়িও না।”[১২৮]

কারো বাড়িতে প্রবেশ করে কোনো জিনিসপত্র আনতে হলে তা দরজায় দাঁড়িয়ে গ্রহণ করতে হবে। ঘরের ভিতর উঁকি না দিয়ে পর্দার আড়াল থেকে জিনিস গ্রহণ করে চলে আসতে হবে। কোরআনে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধানের সকল ধরন ও পন্থাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারো ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য উদঘাটন করা উচিত নয়। মানুষ গোপন বিষয়ের অন্বেষণ দ্বারা অন্যের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করে আনন্দ পায় এবং অন্যের কাছে বলাবলি করে। এ রকম না করার জন্য পবিত্র কোরআনে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কারো ব্যক্তিগত গুপ্ত বিষয় অবগত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, টেলিফোনের কথাবার্তা আড়িপেতে শোনা বা গোপনে রেকর্ড করা, টেপরেকর্ডার বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা, ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদি সকল কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। একইভাবে ডাকে আসা কারো জিনিসপত্র এবং চিঠিপত্রও দেখা যাবে না। কারো চিঠি-পত্র পড়াতো দূরের কথা উপর থেকে দৃষ্টি দিয়ে দেখার অধিকারও কারো নেই।

ইসলামের বাসগৃহে প্রবেশ সম্পর্কিত নীতিমালা শুধুমাত্র অপরের গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বরং নিজ গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। নিজ গৃহে যেখানে তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা বা মুহরিমা[১২৯] নারীগণের বসবাসের ব্যবস্থা থাকে বিধায় গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে ইসলামি নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য-

أن رجلا سأل رسول الله صـ فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم، فقال الرجل: إني معها في البيت. فقال رسول الله صـ استأذن عليها، فقال الرجل: إني خادمها فقال رسول الله صـ: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: استأذن عليها-

“এক ব্যক্তি রাসূল (স.) কে প্রশ্ন করল, আমি কি আমার মায়ের গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি প্রার্থনা করব? রাসূল (স.) বলেন, হ্যাঁ, লোকটি বলল, আমি তো তার গৃহেই থাকি। রাসূল (স.) বললেন, তবুও তোমাকে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। লোকটি পুনরায় বলল, আমি তো তার খাদেম। রাসূল (স.) বললেন,

---

১২৮ *আল-কুর’আন*, ৩৩:৫৩

১২৯ ইসলামি নীতি অনুসারে একজন ব্যক্তি সকল নারীকে বিয়ে করতে পারবে না। বিয়ে করার জন্য ‘গায়রে মাহারম’ নারী হতে হবে। মাহারম নারীদের বিয়ে করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ নিষিদ্ধতা আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষ্য হলো, “তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুস্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভাগিনী, শাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাহার সঙ্গে সংগত হইয়াছ তাহার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা, যাহারা তোমাদের অভিভাকত্বে আছে, তবে যদি তাহাদের সঙ্গে সংগত না হইয়া থাক, তাহাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নাই এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নীকে একত্র করা, পূর্বে যাহা করা হইয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীলম পরম দয়ালু।” *আল-কুর’আন*, ০৪:২৩

তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর। লোকটি বলল না। তখন রাসূল (স.) বললেন তাহলে অনুমতি প্রার্থনা কর।"[১৩০]

শাসকবর্গকে গুপ্তচরবৃত্তি থেকে বিরত থাকার জন্য মহানবি (স.) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামি রাষ্ট্রে শাসকের হস্তক্ষেপ করার সীমারেখা কি এবং এই হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তালাভের ক্ষেত্রে একজন নাগরিকের অধিকার কতটুকু তা হযরত উমর ফারুক (রা.) এর জীবনের একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। হযরত উমর ফারুক (রা.) নাগরিকদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রাত্রিবেলা মাঝে-মধ্যে বের হতেন। একদিন তিনি এক ব্যক্তির ঘরে গানের শব্দ শুনতে পান। তাঁর সন্দেহে হলে তিনি দেওয়ালের উপর আরোহণ করে দেখতে পান যে, ওখানে সূরা মজুত আছে এবং তার সাথে একজন নারীও আছে। তিনি সজোরে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুই কি ভেবেছিস যে, তুই নাফরমানি করতে থাকবি; আর আল্লাহ তা ফাঁস করে দেবেন না? লোকটি উত্তর দিল, হে আমিরুল মুমিনিন! ব্যস্ত হবেন না, আমি যদি একটি অপরাধ করে থাকি তবে আপনি করেছেন তিনটি অপরাধ। আল্লাহ গোপনীয় বিষয়াদি অন্বেষণ করতে নিষেধ করেছেন। আর আপনি সেই কাজটিই করেছেন। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে আর আপনি প্রবেশ করেছেন দেওয়াল টপকে। আল্লাহ আদেশ করেছেন, নিজের বাড়ি ব্যতীত অন্যের বাড়িতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করতে, আর আপনি অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করেছেন। একথা শুনে হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁর ভুল স্বীকার করলেন এবং গৃহকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অবশ্য তার নিকট থেকে সৎপথ অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন।[১৩১]

উল্লিখিত ঘটনাটির মাধ্যমে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, রাষ্ট্রের নাগরিকগণের একান্ত ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা স্থান ইত্যাদির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার সরকার বা রাষ্ট্রের নেই। তবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সূত্রে যদি জানা যায় যে, ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে তা হলে রাষ্ট্র অনুসন্ধান চালানোর জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

সমতায় মানবাধিকার

মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে। মানুষ স্বাধীন বিচার, বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী এবং মানুষের কর্তব্য ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আচরণ করা। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সকল মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই। একই পিতা-মাতা আদম হাওয়ার বংশধর হিসেবে তারা

---

[১৩০] মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতিব আল-তাবরিযী, (বিশ্লেষক, নাসির উদ্দিন আলবানী), *মিশকাতুল মাসাবিহ*, হাদিস নং-৪৬৭৪, ২য় সংস্করন, আল মাকতাবাতুল ইসলামী, বইরূত, ১৯৭৯, পৃ. ১৩২৪-১৩২৫

[১৩১] মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন, *ইসলামে মানবাধিকার*, অনু. মুহাম্মদ আবুত তাওয়াম, মুহাম্মদ আবূ নুসরত হেলালী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৩৫-২৩৬

জাত, বংশ ও রক্তের দিক দিয়ে একই বন্ধনে আবদ্ধ। ফলে ইসলামে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বংশ, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

ان هذه امتكم امة واحدة- وانا ربكم فاعبدون-

"এই যে তোমাদের জাতি– ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত কর।"[১৩২]

সূরা মুমিনুনে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون-

"এবং তোমাদের এই যে জাতি ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমাকে ভয় কর।"[১৩৩]

সব মানুষ মৌলিকভাবে সমান বলে ইসলাম ঘোষণা করলেও ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে পার্থক্য হতে পারে কেবল নেক আমল ও কল্যাণকর কার্যক্রমের ভিত্তিতে। আল্লাহ তা'আলা এ কথাই ঘোষণা করেছেন কোরআন মজিদের নিম্নোক্ত আয়াতে :

ياايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا-ان اكرمكم عند الله اتقكم-

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি।"[১৩৪]

উল্লিখিত কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, মানুষ মৌলিকভাবেই এক, অভিন্ন ও সর্বোতভাবে সমান। ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাসকারী মানুষ হিসেবে তাদের মাঝে আইনের চোখে কোনো পার্থক্য নেই।[১৩৫] আর মানুষকে যে বিভিন্ন জাত ও গোষ্ঠী সম্ভূত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য মানুষকে নানাভাবে বিভক্ত এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক করে দেওয়া নয়। ভাষা ও বর্ণের ক্ষেত্রে দুনিয়ার মানুষের মাঝে পার্থক্য থাকলেও এই পার্থক্য মানুষে মানুষে কোনো মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে না। কোরআনে এই পার্থক্যকে আল্লাহর কুদরত এবং তাঁর অস্তিত্বের বাস্তব নিদর্শন হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

---

[১৩২] *আল-কুর'আন*, ২১:৯২
[১৩৩] *আল-কুর'আন*, ২৩:৫২
[১৩৪] *আল-কুর'আন*, ৪৯:১৩
[১৩৫] Farid Younos, *Principles of Islamic Sociology,* Author House, Bloomington, 2011, p. 15

ومن اٰيته خلق السموت والارض واختلاف السنتكم والوانكم- ان فى ذلك لايت للعلمين-

"আর তাঁহার নিদর্শনাবলির মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে।"[১৩৬]

উপরিউক্ত আয়াতটির মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সমস্ত মানুষের বাক-শক্তি একই রকম। মগজের মাত্রা ও গঠনের প্রকৃতি একই রকম। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের ভাষার মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। একই দেশে একই ভাষার এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের ভাষা অনেক সময় বুঝতে পারে না আর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা বিভিন্ন রকম হওয়ায় তা বুঝা সম্ভব নয়। উপরন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির কথা বলার ভঙ্গি, উচ্চারণ ও বাকরীতি পরস্পর থেকে ভিন্ন ভিন্ন। তা সত্ত্বেও মানুষের মৌলিক একত্বে কোনো পার্থক্য নেই। বস্তুত ইসলামের মহান আদর্শই মানবসমাজ থেকে হিংসা, বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের মূলকেই উৎপাটিত করে দিয়েছে, শেষ করে দিয়েছে সব বংশীয় ও বর্ণীয় গৌরব অহংকার। হিন্দুগ্রন্থ ঋগবেদে উল্লেখ আছে, "No one is superior or inferior. All are brothers, all could strive for the interest of all and should progress collectively."[137]

রাসূল (স.) এর যুগ, খোলাফায়ে রাশেদিনের আমল এবং পরবর্তী আমলে আমরা এমন অনেক উদাহরণ পাই, যেখানে শাসক-শাসিত, আমির-ফকির, মনিব-গোলাম, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে ইনসাফের বেলায় একই রকম সাম্যনীতি অনুসরণ করা হয়েছে।[১৩৮] ইসলামের আইন সকল মানুষের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য। আইন প্রয়োগে মানুষে মানুষে আকিদা, বিশ্বাস, আত্মীয়তা, নৈকট্য, বন্ধুত্ব, বংশ, বর্ণ, ভাষা ও সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতে কোনোরূপ ভেদাভেদ করার নীতি ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়। অধিকার ও পারস্পরিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে রাসূল করিম (স.) সবসময় নিজেকে অপরের সমতুল্য মনে করতেন। ইসলামি আইনে সমতার বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় রাসূলুল্লাহর শাসনামলে মদিনা প্রজাতন্ত্রে সংঘটিত এক ঘটনায়। একবার মদিনায় অভিজাত পরিবারের একজন মহিলার বিরুদ্ধে চুরির অপরাধ সম্পর্কিত একটি মোকাদ্দমা রাসূলুল্লাহর বিচারালয়ে উত্থাপিত হয়। বিচারে মহিলার অপরাধ প্রমাণিত হয়। নবীপত্নী হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে এক মহিলা চুরি করেছিলো এবং তা কুরাইশদেরকে অত্যন্ত অস্থির করে ফেলেছিলো। তারা বললো, কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে সুপারিশ করবে? তারা আবারও বললো, উসামা ইবনে যায়েদ ব্যতীত আর কে এ নির্ভীকতা প্রদর্শন করবে? কেননা সে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[১৩৬] *আল-কুর'আন*, ৩০:২২

[১৩৭] R. N. Sharma, *Fundamental Rights, Liberty and Social Order*, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1996, p. 917

[১৩৮] Farid Younos, *op.cit,* p. 1

আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয়। অতঃপর উসামা ইবনে যায়েদ উক্ত মহিলাটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো এবং এ ব্যাপারে আলোচনা করলো। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেলো। আর তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, তুমি কি আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহ থেকে এক দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? তখন উসামা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার জন্যে আল্লাহর কাছে মাফ চান। অতঃপর বিকেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন এবং পরে বললেন, জেনে নাও। তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে এ জন্যই ধ্বংস করা হয়েছে যে, যখন তাদের কোনো ভদ্র-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো, আর যখন তাদের মধ্যে কোনো নিরীহ-দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করতো। আর আমার অবস্থা হলো এই, সেই সত্তার কসম যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! যদি (আমি) মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করে, তাহলে নিশ্চয়ই তার হাত কেটে দেবো।”[১৩৯] রাসূলুল্লাহর অনুসৃত আইনগত সমতার উপর্যুক্ত নীতি তাঁর খলিফাগণ কর্তৃকও কড়াকড়িভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায় ।

ইসলাম কোনো সমাজের মানুষকে আশরাফ ও আতরাফ বা শাসক ও শাসিত হিসেবে বিভক্ত করার পক্ষপাতী নয়। ফলে মানুষের মাঝে ধনী-গরিব, মালিক-শ্রমিক ও নীচ ও অভিজাত নামক কোনো শ্রেণিগত পার্থক্য থাকতে পারে না। মানুষের মধ্যে বংশ, রক্ত, বর্ণ, স্থান ও ভাষার দিক দিয়ে যত পার্থক্যই থাক-না কেন তার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে মৌলিক মানবতার দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য করা চলবে না। মানুষের এই মৌলিক অভিন্নতাই মানুষে-মানুষে সব বৈষম্যের ও ভেদাভেদের প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়ায় সকল মানুষ পরস্পর সমান।

ন্যায়বিচার লাভের অধিকার

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হলো ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচার ছাড়া মানবাধিকার প্রহসনে রূপান্তরিত হয়। ফলে ন্যায়বিচার হলো যে কোনো সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। ইসলাম যে কয়েকটি জিনিসের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছে, সুবিচার তাদের অন্যতম। ইসলামে দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, নির্ধন, আশরাফ-আতরাফ, জ্ঞানী, মূর্খ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক একটি নিরপেক্ষ, অবাধ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার অধীনে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার লাভ করে থাকে। সর্বদিক দিয়ে নিরংকুশ সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার পর্যায়ে স্বীকৃত ও গুরুত্বপ্রাপ্ত। ইসলামি আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা :

[১৩৯] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), ষষ্ঠ খণ্ড, হাদিস নং-৪২৬৪, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫-১১৬

ان الحكم الا لله-

"বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহ্রই।"[১৪০] আর মহান আল্লাহ তা'আলার এ বিধান কার্যকর করার জন্য আল্লাহ তাঁর নবিকে নির্দেশ দিচ্ছেন এ কথা ঘোষণা করতে :

وامرت لاعدل بينكم- الله ربنا وربكم- لنا اعمالنا ولكم اعمالكم- لا حجة بيننا و بينكم- الله يجمع بيننا- واليه المصير-

"আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিতে। আল্লাহ্ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। আল্লাহ্ই আমাদেরকে একত্র করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।"[১৪১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قل أمر ربى بالقسط- وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين-

"বল, 'আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন ন্যায়বিচারের।' প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং তাঁহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে ডাকিবে।"[১৪২]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামি জীবন বিধানের মূল উদ্দেশ্য। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব ও নিকটাত্মীয় হলে ইসলামে পক্ষপাতিত্বের কোনো স্থান নেই। ইরশাদ হয়েছে,

يايها الذين امنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين - ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما- فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا- وان تلوا اوتعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহ্র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীন হউক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো তাহার সম্যক খবর রাখেন।"[১৪৩]

উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য সত্য সাক্ষ্য প্রদান করবে। মামলায় কে হারলো, কে জয়লাভ করলো এটা মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় হলো সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা। উল্লেখ্য যে, সত্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে সুবিচার নিশ্চিত হয়। সত্য সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে যদি নিজেদের নিজের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হয়, তাহলেও সাক্ষ্য প্রদান করবে

[১৪০] *আল-কুর'আন*, ১২:৪০
[১৪১] *আল-কুর'আন*, ৪২:১৫
[১৪২] *আল-কুর'আন*, ০৭:২৯
[১৪৩] *আল-কুর'আন*, ০৪:১৩৫

আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্টিলাভের জন্য। কোনো পক্ষকে বাঁচানোর জন্য বা শায়েস্তা করার জন্য উল্টো সাক্ষ্য দিবে না। সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইনসাফের কথা মনে রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, সত্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে সুবিচার নিশ্চিত হয়। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা ইনসাফপূর্ণ আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل-

"তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করিবে।"[১৪৪]

واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى-

"যখন তোমরা কথা বলিবে তখন ন্যায্য বলিবে– স্বজনের সম্পর্কে হইলেও।"[১৪৫]

সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতাসম্পন্ন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খালেস সত্য ভাষক সাক্ষ্যের প্রয়োজন। সাক্ষ্য নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতশূন্য না হলে ন্যায়বিচার হওয়া কখনই সম্ভবপর নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط - ولايجر منكم شنان قوم على الا تعدلوا - اعدلوا - هو اقرب للتقوى- واتقوا الله- ان الله خبير بما تعملون-

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকিবে ; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহার সম্যক খবর রাখেন।"[১৪৬]

ইসলামে বিচারকের জন্য রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ব্যক্তিগত বা দলগত প্রভাব কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সুবিধামতো আইনের ব্যাখ্যাদান ও রায় প্রদানের ন্যূনতম সুযোগ নেই। ইসলামের নীতিমালা অনুযায়ী যে ব্যক্তি যতটুকু অপরাধ করবে, তার জন্য শাস্তিও ঠিক ততটুকু। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس- والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن- والجروح قصاص- فمن تصدق به فهو كفارة له- ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون-

"আমি তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা

[১৪৪] *আল-কুর'আন*, ০৪:৫৮
[১৪৫] *আল-কুর'আন*, ০৬:১৫২
[১৪৬] *আল-কুর'আন*, ০৫:০৮

করিলে উহাতে তাহারই পাপ মোচন হইবে। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয় না, তাহারাই জালিম।”[১৪৭]

এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وجزاء سيئة سيئة مثلها- فمن عفا وأصلح فأجره على الله- انه لايحب الظالمين- ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل- انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الارض بغير الحق- اولئك لهم عذاب اليم- ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور-

“মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোস-নিস্পত্তি করে তাহার পুরুস্কার আল্লাহ্র নিকট আছে। আল্লাহ্ জালিমদেরকে পসন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিবিধান করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না; কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহচরণ করিয়া বেড়ায়, উহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি। অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয়, উহা তো হইবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।”[১৪৮]

বস্তুত ন্যায়বিচার ইসলামি সমাজের একটা মৌলিক ও ভিত্তিগত ব্যাপার। রাসূল করিম (স.) নিজের বর্ম নগদ অর্থ বা শস্যের বিনিময়ে এক ইহুদির নিকট বন্ধক রেখেছিলেন। ইহুদি ব্যক্তি একদা রাসূল করিম (স.) নিকট এসে কর্কশ ভাষায় বলে যে, তোমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা ঋণ ফেরত দিতে বিলম্ব কর। পাশে উপবিষ্ট হযরত উমর ফারুক (রা.) এ রকম বদমেজাজি আচরণ পছন্দ করলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ রেগে গেলে রাসূল (স.) বললেন, হে উমর, এ রকম লেনদেন ঠিক হয়নি। তুমি আমাকে তার প্রাপ্য ফেরত দিতে বল এবং তাকে বল ভদ্রভাবে তার পাওনার জন্য তাগাদা দিতে। পাওনাদার তার পাওনার দাবি ভদ্রভাবে করা উচিত, কোনোভাবেই রুঢ়ভাবে নয়।[১৪৯]

ইসলামের বিচার নীতিতে আইন সবার জন্য সমান। এ ক্ষেত্রে কে বাদী আর কে বিবাদী তা দেখার বিষয় নয়। ন্যায়বিচার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামে ধনী-গরিব, উঁচু-নীচু, পরাক্রমশালী ও প্রভাবহীন সকলকে আদালতের সামনে সমান মর্যাদা দান করে। ফলত: ইসলামি সমাজে প্রত্যেকের সুবিচার নিশ্চিত অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার।

---

[১৪৭] *আল-কুর'আন*, ০৫:৪৫
[১৪৮] *আল-কুর'আন*, ৪২:৪০-৪৩
[১৪৯] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮

স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার

জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। স্বাধীন শুধু কর্মে নয়, স্বাধীন ভাব প্রকাশেও। ইসলামি রাষ্ট্রে ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। ইসলাম মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে। এ অধিকার হরণ করে জনগণকে বঞ্চিত করার অধিকার কারোর নেই। বস্তুত ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও মানসিক প্রতিভার বিকাশের জন্যে ব্যক্তির স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার (Freedom of expressian) স্বাধীনতা থাকা একান্তই অপরিহার্য। কোনো রাষ্ট্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার সুযোগ না থাকলে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রে মদিনার জনসাধারণকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ভিন্নমত পোষণ করার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। আর ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ রাষ্ট্রের শাসকের অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করবে এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাবলি সম্পর্কে শাসন কর্তৃপক্ষকে অবগত করবে। আর এসব কাজ সম্ভব হতে পারে ঠিক তখন যদি ব্যক্তির মত পোষণ ও প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।[১৫০] সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে পবিত্র কোরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে,

كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر-

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব ইহয়াছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর।"[১৫১]

সমাজের সামগ্রিক পরিবেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাক-স্বাধীনতার চর্চা সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ গর্হিত কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগ) পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (বাক্য) দ্বারা এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে, তবে এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।"[১৫২] উপর্যুক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহানবি (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রে ব্যক্তিজীবন হতে শুরু করে পারিবারিক ও সমাজজীবনে বাক-স্বাধীনতা ছিল। মদিনার বাইরে 'ওহুদ যুদ্ধ' বাক-স্বাধীনতারই ফল। উহুদের যুদ্ধের[১৫৩] ব্যাপারে তাঁর এবং

---

[১৫০] ড. আবদুল করিম যায়দান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮-৬৯

[১৫১] *আল-কুর'আন*, ০৩:১১০

[১৫২] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), ১ম খণ্ড, হাদিস নং-৮৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০

[১৫৩] বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়ের পর তারা তাদের যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়ে ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৭০০ বর্মধারী, ৩০০ উষ্ট্রারোহী ও ২০০ অশ্বারোহীসহ সর্বমোট ৩০০০ সৈন্যসহ মদিনার পাঁচ মাইল পশ্চিমে উহুদ উপত্যকায় সমবেত হয়। কুরাইশ বাহিনী মোকাবেলা করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.) ২ জন অশ্বারোহী, ১০০ জন বর্মধারী ও ৫০ জন তীরন্দাজসহ ১০০০ সৈন্যের বহরসহ সমভিব্যাহারে অগ্রসর হলেন। কিন্তু মাঝপথে বিশ্বাসঘাতক আবদুল্লাহ-বিন-উবাই তাঁর ৩০০ সৈন্যসহ মুসলিম বাহিনী হতে দলত্যাগ করলে হযরত মুহাম্মদ (স.) ৭০০ জন সৈন্যসহ যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। প্রথা অনুযায়ী মল্ল যুদ্ধ দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয় এবং মুসলিম মহাবীর হামযা প্রতিপক্ষ তালহাকে নিহত করলে দুই পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণে মক্কার কুরাইশগণ ছত্রভঙ্গ ও দিশেহারা হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। যুদ্ধে মুসলমানদের জয় লাভ নিশ্চিত জেনে গিরিপথ রক্ষার দায়িত্বে তীরন্দাজ বাহিনীর অনেকে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নির্দেশনা উপেক্ষা করে শত্রুশিবিরের পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠনে ব্যস্ত হয়ে উঠলে মহাবীর খালেদ কুরাইশ বাহিনীকে একত্রিত করে সুড়ঙ্গ পথ

প্রবীণ সাহাবিদের মত ছিল এই যে, মদিনার অভ্যন্তরভাগে থেকে শত্রুর অবস্থান ও গতিবিধি দেখে তাদের সাথে মোকাবিলা করা। কিন্তু হযরত হামযা (রা.) সহ যুবক সাহাবিদের অভিমত ছিল, মদিনার অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। এ যুদ্ধে আমরা পরাজয় বরণ করলে মদিনা নগরী তাদের দখলে চলে যাবে। ফলে আমাদের মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা উচিত। অধিকাংশ সাহাবির মতামত যখন রাসূল (স.) দেখলেন মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা, তখন তিনি হুজরায় চলে গেলেন যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য। এ সময়ে প্রবীণ সাহাবিগণ যুবক সাহাবিদের তিরস্কার করলেন এই বলে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) কে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছ। তখন নওজোয়ানরা রাসূল (স.) এর হুজরার সামনে একত্রিত হলেন ক্ষমা প্রার্থনার জন্য। মহানবি (স.) তখন বললেন তোমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক আছে। চল আমরা মদিনার বাইরে যাই। মদিনার বাইরে যুদ্ধ সংঘটিত হবে।[১৫৪] উপরিউক্ত ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল করিম (স.) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মতামত এবং অভিমত নিতেন যা বাক-স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ইসলামি রাষ্ট্রে কেউ ভিন্ন মত প্রকাশ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। কারণ স্বাধীন মত প্রকাশের উপর কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না। তবে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে যদি বিরোধী শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। তবে ইসলাম সর্বদা স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীন।

স্বাধীনভাবে চলাচল, বসবাস ও স্থানান্তরের অধিকার

ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ইচ্ছামাফিক যে কোনো স্থানে রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাস করার অধিকার দিয়েছে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের বাইরে যে কোনো অঞ্চলে যাতায়াত করার স্বাধীনতা রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يعبادى الذين امنوا ان ارضى واسعة فاياى فاعبدون-

"হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।"[১৫৫]

অনুরূপভাবে পররাষ্ট্রে বসবাসের অধিকারও ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় নাগরিকের ইচ্ছামাফিক চলাফেরা ও বসবাসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো বাধা দেবে না।[১৫৬] প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এক বিশ্ব

দিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিলে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হলেন। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য W. Montgomery Watt, *op.cit*, pp. 21-29; Dr. Mohammad Ali Al-Haj Salmin, *The Holy Prophet Mohammad*, Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 2002, pp. 147-160; Afzal Iqbal, *The Prophet's Diplomacy*, Idarah-i Adabiyat-i Delli,Delhi, 1984, pp. 20-21; Muhammad Munir, *op.cit*, pp. 29-33

[১৫৪] মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৯

[১৫৫] *আল-কুর'আন*, ২৯:৫৬

রাষ্টব্যবস্থার ধারণায় বিশ্বাসী। এ কারণে ইসলাম নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বাইরে চলাচল ও বসবাসের ক্ষেত্রে কোনো সীমা নির্ধারিত করে না। কোনো নাগরিককে তার ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করাকে ইসলাম চরম জুলুম মনে করে। বনী ইসরাঈলের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাদের অপকর্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে :

شم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم - تظاهرون عليهم بالاثم والعدون - وان تأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم - أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض - فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي فى الحياة الدنيا- ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب- وما الله بغافل عما تعملون-

"তোমরাই তাহারা যাহারা অতঃপর একে অন্যকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের এক দলকে স্বদেশ হইতে বহিস্কার করিতেছ, তোমরা নিজেরা তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছ এবং তাহারা যখন বন্দিরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ চাও ; অথচ তাহাদের বহিস্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।"[১৫৭]

ইসলামি রাষ্ট্র-দর্শন অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর রাজ্যস্বরূপ যা তিনি সকল মানুষের চলাচল ও বসবাসের জন্য কোনোরূপ বাধা-নিষেধ আরোপ করেননি বরং উম্মুক্তভাবে বিচরণের স্বাধীনতা দিয়েছেন। ইসলামি রাষ্ট্র-দর্শনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে পোপ দ্বিতীয় জন পল বলেন, "উন্নত জীবনের অন্বেষণে পরিবার হিসেবে অভিবাসিত হওয়ার অধিকার সকলের রয়েছে।"[১৫৮] সুতরাং মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকারবলে বিশ্বের যে কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের স্বাধীনতা লাভ করে। কোরআনে বলা হয়েছে,

والارض وضعها للانام-

"তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য।"[১৫৯]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

---

[১৫৬] Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Johns Hopkings University, Baltimore, 1984, p. 237
[১৫৭] *আল-কুর'আন*, ০২:৮৫
[১৫৮] সিলভানো গারোল্লা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৬
[১৫৯] *আল-কুর'আন*, ৫৫:১০

ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة- ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله- وكان الله غفورا رحيما-

"কেহ আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করিলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করিবে এবং কেহ আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ হইতে মুহাজির হইয়া বাহির হইলে এবং তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র উপর; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৬০]

ধর্ম, বর্ণ, মতাদর্শ, সামাজিক ও পেশাগত মর্যাদা নির্বিশেষে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে তার পছন্দমাফিক যে কোনো স্থানে বসবাস করার, রাষ্ট্রীয় সীমানার ভেতরে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের বাইরে যে কোনো অঞ্চলে যাতায়াত করার স্বাধীনতা প্রদান করলেও ইসলাম কেবল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও দেশদ্রোহীদের জন্য বসতি থেকে উচ্ছেদের শাস্তি নির্ধারণ করেছে যা কোনো অবস্থায়ই সাধারণ নাগরিকদের এই শাস্তি দেওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জন্য মৃত্যুদণ্ড, শূলীবিদ্ধ করা এবং হাত-পা কর্তনের শাস্তির সাথে নিম্নোক্ত শাস্তির কথাও কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض- ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم-

"যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করিয়া বেড়ায় ইহাই তাহাদের শাস্তি যে, তাহাদেরকে হত্যা করা হইবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদেরকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। দুনিয়ায় ইহাই তাহাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে।"[১৬১]

হযরত আলী (রা.) এর খিলাফতকালে খারিজি[১৬২] দলের অভ্যুত্থান হয়েছিল। বর্তমান যুগের নৈরাজ্যবাদী ও নিহিলীয় দলসমূহের সাথে এদের অনেকটা সামঞ্জস্য বিদ্যমান। তারা হযরত আলী (রা.)-এর যুগে রাষ্ট্রের

---

১৬০ *আল-কুর'আন*, ০৪:১০০

১৬১ *আল-কুর'আন*, ০৫:৩৩

১৬২ খারেজি একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ বের হওয়া, দল ত্যাগ করা, ভিন্ন মত পোষণ করা। অতএব খারেজি শব্দের অর্থ হলো দলত্যাগী। যেহেতু খারিজিগণ অন্য মুসলমানদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন সেহেতু তাদেরকে খারিজি বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে খারিজি সম্প্রদায় প্রথম ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল। ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা.)-এর সমর্থকগণ যখন সিফফিনের যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তখন মুয়াবিয়া দেখতে পেলেন যুদ্ধে জয়লাভ করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব তখন তিনি বর্ষার অগ্রভাগে কোরআন শরিফ বেঁধে যুদ্ধবিরতির আহবান জানালেন। তখন আলী (রা.) যুদ্ধবিরতি দিয়ে দুমাতুল জন্দাল নামক স্থানে আপোস মীমাংসার জন্য বসেন। ৬৫৭ খি. ২৮ শে জুলাই খিলাফতে বিশ্বাস ও ধর্মের যৌক্তিকতার প্রশ্ন তুলে বা দুমাতুল জান্দলের মীমাংসার প্রতিবাদে আবদুল্লাহ বিন-ওহাব আল-রাশিবীর নেতৃত্বে প্রায় বার হাজার সৈন্যের একটি দল 'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ' ধ্বনি দিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ ত্যাগ করে ইতিহাসে এরাই খারিজি নামে পরিচিত। এরা হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) উভয়ের বিরোধিতা শুরু করেন। হযরত আলী (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। ইসলাম সম্পর্কে খারিজিদের ধারণা খুবই সংকীর্ণ ও গোঁড়া। তারা হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) ব্যতীত খোলাফায়ে রাশেদিনদের আর কোনো খলিফার নেতৃত্ব

অস্তিত্বকেই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতো এবং শক্তি প্রয়োগ করে উহাকে নির্মূল করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। তাদের বিদ্রোহ ও অরাজকতা চরম আকার ধারণ করলেও তিনি তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং ইচ্ছামতো যেখানে সেখানে বসবাস করার অধিকার দিয়েছিলেন।[১৬৩]

রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে কোনো রকমের প্রয়োজন ছাড়া কোনো এলাকায় জনগণের অবাধ বিচরণের ক্ষেত্রে কোনো রকম বাধা প্রদান করতে পারে না। তবে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থে যদি কোনো এলাকাকে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে রষ্ট্রের যে কোনো পদক্ষেপকে জনগণ সাধুবাদ জানাবে। রাষ্ট্র কোনো রকম বাধাবিগ্রহ ছাড়াই প্রয়োজনীয় এলাকা সংরক্ষণ করবে। আর যে ব্যক্তি যে রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বসবাস করবে সে কেবল সে রাষ্ট্রেই নাগরিক বলে বিবেচিত হবে। সে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সে রাষ্ট্র তার নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করবে। স্থায়িভাবে বসবাস না করলে রাষ্ট্র এ দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য নয়।[১৬৪]

স্বাধীন বিবেক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের অধিকার

স্বাধীন বিবেক ও ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। ইসলামি রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন বিবেক ও ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ যাতে তার বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারে, ইসলাম তার নিশ্চয়তা বিধান করেছে। আল কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي-

"দীন গ্রহণে কোন জোর-জবরদস্তি নাই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে।"[১৬৫]

কোন মানুষকে তার বিবেকের বিরুদ্ধে কোনো চিন্তা অবলম্বনে বাধ্য করা যাবে না। দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী নয় এমন যে কোনো কাজ যে কোনো মানুষ আপন বিবেকের দাবি অনুসারে করতে পারবে। ইসলাম কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক কখনোও তার অধীনের লোকদেরকে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করে নি। জোরপূর্বক

স্বীকার করে না। তারা অমুসলিমদের ধ্বংস বা হত্যা করা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতো। উমাইয়া খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ ছাড়া আর কোনো খলিফাকে স্বীকার করত না। আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন ছাড়া তারা আর অন্য কোনো খলিফাকে স্বীকৃতি দেয়নি। খারিজিরা সময়ের পরিক্রমায় নিজেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হযে পড়ে। এদের মধ্যে আযারিকা ও ইবাদিয়া গুরত্বপূর্ণ দলগুলোর মাঝে অন্যতম ছিল। বিস্তারিত দেখুন, Afzal Iqbal, *The Culture of Islam*, Idarah-i Adabiyat-i Delli,Delhi, 1985, pp. 219-228; Syed Abdul Hai, *Muslim Philosophy*, Vol. I, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1982, pp. 58-59; অধ্যাপক হাসান আইয়ূব, অনু. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৯৪-৯৫ ড. আবদুল বাছির, *মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তার রূপরেখা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৮, পৃ; ৩৫-৩৯

[১৬৩] মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯১

[১৬৪] মোঃ ইব্রাহিম খলিল ও মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, *মানবাধিকার ও ইসলাম : পর্যালোচনা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭, পৃ. ১৩৭-১৩৮

[১৬৫] *আল-কুর'আন*, ০২:২৫৬

কাউকে ধর্মান্তরিত করা যাবে না। ইসলাম কখনো কোনো ব্যক্তির আগ্রহ ব্যতীত কারও উপর কোনো মতবাদ চাপিয়ে দেয় নি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে ব্যক্তির আগ্রহ ও ইচ্ছাকে ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করে। মানুষ আর্থিক দৈন্যতার জন্য অনেক সময় ধর্মান্তরিত হয়। আর্থিক প্রলোভন, অত্যাচার-নির্যাতন, শক্তি প্রয়োগ ও আর্থ-সামাজিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করার নীতি ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। ইসলামে প্রতিটি ব্যক্তির যে কোনো ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ার বা ধর্মহীন নাস্তিক থেকে যাওয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। তারা তাদের পূর্ব ধর্মে স্থায়ী থাকতে চাইলে তাদেরকে সেই পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম কবুল করতে বলা হয়নি। রাসূলে করিম (স.) কাফিরদের ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

ولو شاء ربك لا من من فى الارض كلهم جميعا- أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين-

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনিত; তবে কি তুমি মু'মিন হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে?"[১৬৬] অর্থাৎ কাউকে জোর করে মু'মিন বানানো তোমার কাজ নয়। লোকদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়াই হলো তোমার একান্ত দায়িত্ব। তবে তাদের কেউ ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলে তা ভিন্ন কথা। তবে কোনো অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কোনোরূপ চাপ সৃষ্টি করা বিধেয় নয়। হযরত উমর ফারুক (রা.) এর গোলাম ওসাক রুমীকে কখনো ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করেন নি। যদি দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) তাকে চাপ প্রয়োগ করতেন, তাহলে তিনি হযরত উমর (রা.) এর গোলাম হিসেবে কাজ করতে পারতেন না। আর কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করার পর যদি তা ত্যাগ করে এবং প্রমাণিত হয় যে, সে একান্ত চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তা হলে তার বেলায় মুরতাদের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে কোনোরূপ জোর জবরদস্তি নেই।

ইসলাম মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্ব-স্ব ধর্ম পালন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা প্রদান করে নি বরং সকল সময় স্বাধীনতা প্রদান করে। ইসলামি রাষ্ট্র অমুসলিমদেরকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ। হযরত আবু বকর (রা.)-এর আমলে হিরাবাসীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে এ কথাও লেখা হয়েছিল যে, "তাদের খানকাহ ও গির্জাগুলো ধ্বংস করা হবে না। প্রয়োজনের সময় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে সব ইমারতে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে সেগুলোও নষ্ট করা হবে না। নাকুশ ও ঘণ্টা বাজাতে নিষেধ করা হবে না। আর উৎসবের সময় ক্রুশ বের করার ওপরও কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা

[১৬৬] *আল-কুর'আন*, ১০:৯৯

হবে না।”[১৬৭] ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সময় জেরুজালেমের ঈলিয়াবাসীদের সাথে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তাতেও ধর্মীয় স্বাধীনতা, উপাসনা কেন্দ্রগুলোর মর্যাদা রক্ষার কথা স্পষ্ট উল্লেখ ছিল।

ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো মতবাদ, ধর্ম, জীবনাদর্শ বা দার্শনিক চিন্তাধারা মানুষের ধর্মীয় অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় এমন অনন্য সাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এরূপ লক্ষ করা যায় না। ধর্মীয় স্বাধীনতার নিরাপত্তা ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ধর্মে বিশ্বাস থাকুক আর না থাকুক ইসলাম সকলের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা হলো, তোমরা কারো উপর বলপ্রয়োগ করবে না, বরং কারো ধর্মানুভূতিকে আহত করে এমন কাজ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোরআনে অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করে এমন কোনো কাজ, বক্তৃতা, বিবৃতি, সাহিত্য বা নেতিবাচক সমালোচনা, তাদের মনে কষ্ট দেওয়া এবং তাদের উপাস্য দেবদেবীকে গালমন্দ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলা হয়েছে,

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم - كذلك زينا لكل أمة عملهم - ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون-

“ আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদেরকে তাহারা ডাকে, তাহাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তাহারা সীমালঙ্ঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌কেও গালি দিবে। এইভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাহাদের কার্যকলাপ সুশোভন করিয়াছি, অতঃপর তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তিনি তাহাদেরকে তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।”[১৬৮]

সংগঠন ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে নাগরিকগণ সংগঠন ও সভা-সমাবেশ করার অধিকার লাভ করে। প্রত্যেক মানুষ যেমন স্বতন্ত্র্য এবং একক, আবার প্রত্যেক মানুষই তার গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের অংশ। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সমাজবদ্ধ জীব হওয়ার কারণে কোনো মানুষই সমাজ থেকে বিমুখ বা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না বিধায় কোনো দল বা উম্মাহ্‌র[১৬৯] সাথে যুক্ত বা বিযুক্ত হওয়ার

[১৬৭] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *কিতাবুল খারাজ* (আরবি), দারুল মারেফা, লেবানন, বৈরুত, ১৯৭৯,পৃ. ১৪৩

[১৬৮] *আল-কুর’আন*, ০৬:১০৮

[১৬৯] ‘উম্মাহ’ শব্দটি সুমেরীয় ভাষা থেকে উদ্ভূত। শব্দটির অর্থ জাতি, সম্প্রদায়, জননী, গোষ্ঠী, দল বা শ্রেণি। উম্মাহ শব্দ দ্বারা সম্প্রদায় ও ধর্ম এ দুটি প্রধান ধারণাকে বুঝায়। কোরআনে উম্মাহ শব্দটি একবচন ও বহুবচন মিলে মোট ৬৫ বার এসেছে। পবিত্র কোরআনে উম্মাহ শব্দটি গোষ্ঠী ও জাতি অর্থে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়েছে। উম্মাহ সে দলকে বলা হয়, যারা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে একতাবদ্ধ হয়। মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৬২৪-২৬; মোঃ আবু তাহের, *ইসলামের সামাজিক ইতিহাস*, কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১১২-১৭

ব্যাপারে প্রতিটি ব্যক্তি প্রকৃতিপ্রদত্ত অধিকার অনুযায়ী স্বাধীন। এ স্বাধীনতা অনুসারে মানুষ একে অন্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, মহৎ উদ্দেশ্যে কোনো দল বা সংস্থার অধীন দলবদ্ধ হওয়া, পরস্পরের দেখা সাক্ষাত, নিজেদের মধ্যে মুক্তভাবে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় করা, সমাবেশ করা, নিজেদের কল্যাণে কর্মসূচি প্রণয়ন করা ইত্যাদি কার্যক্রমের অধিকার লাভ করে। মানুষ সভা-সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইসলামি রাষ্ট্র সভা-সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিরোধী না হলে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করে না।[১৭০] ফলে যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ মহৎ উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়ে যে কোনো সংগঠন করলে তাতে ইসলামের কোনোরূপ বাধা বা আপত্তি নেই। আপন আপন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমুন্নত করার জন্য ইসলাম সর্বদাই মানুষকে উৎসাহ প্রদান করেছে। মানুষের কল্যাণে, দেশের কল্যাণে মানুষ সংগঠিত হোক, সংগঠন করুক, এটা তো ইসলামের মৌলিক দাবি। মহানবি (স.) জাহিলি সমাজের কুসংস্কারগুলোর মূলোৎপাটন করার জন্য নবি হওয়ার পূর্বেই মক্কার মাটিতে হিলফুল ফজুল[১৭১] নামে একটি সংগঠন পরিচালনা করতেন যার মাধ্যমে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক অথবা আইন-শৃঙ্খলার পরিপন্থি কোনো কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য বা কোনো ষড়যন্ত্রমূলক অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠন ও সভা-সমাবেশ ইসলামে সমর্থিত নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) কে মানবজাতির দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। আর মানবজাতি শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ায় তারা সৎকাজে আদেশ দিবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। এ হচ্ছে উম্মাতের সামগ্রিক দায়িত্ব। কিন্তু সকল উম্মাত যদি সম্মিলিতভাবে এ দায়িত্বের প্রতি আগ্রহশীল না হয় তাহলে অন্তত তাদের মধ্যে এমন একটি দায়িত্বশীল দল বর্তমান থাকা উচিত যারা এ কাজের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেবে। ইরশাদ হচ্ছে:

ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون-

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করিবে; ইহারাই সফলকাম।"[১৭২]

---

[১৭০] Dr. Shaikh Shaukat Hussain, *Human Rights in Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2001, p. 61

[১৭১] ইসলামপূর্ব আরব সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান অঙ্গ উকায মেলায় জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড় ও কাব্য প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে মক্কার কুরাইশ ও কায়েস গোত্রের মধ্যে ৫৮৫ খ্রি. হতে ৫৯০ খ্রি. পর্যন্ত ৫ বছরব্যাপী স্থায়ী যুদ্ধ হয়েছিল। পবিত্র মাসে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে একে পবিত্র যুদ্ধও বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধকে 'হরব-আল-ফুজ্জার' বলা হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) পিতৃব্য আবু তালেবের সাথে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও এ যুদ্ধের বীভৎস নৃশংসতা তাঁকে অস্থির করে তুলে। আরবদের নিত্যদিনের সঙ্গী মদ, জুয়া ও নারীসহ বিভিন্ন প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, হত্যা ও লুটতরাজ দূরীভূত করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (স.) কয়েকজন শান্তিকামী উৎসাহী যুবকদের সমন্বয়ে ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ব ইতিহাসে সর্বপ্রথম কল্যাণী শান্তি সংগঠন 'হিলফুল ফুজুল' মানুষের কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করে প্রায় ৫০ বছর যাবত স্থায়ী হয়। বিস্তারিত দেখুন, Mohammad Ali Al-Haj Salmin, *op.cit*, pp. 40-41; Dr. Muhammad Hamidullah, *Introduction to Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2003, p. 7

[১৭২] *আল-কুর'আন*, ০৩:১০৪

উল্লিখিত আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে একটি প্রশ্ন জাগ্রত হয়, আর তা হলো ইসলামি রাষ্ট্রে কি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদের জন্য স্বাধীনভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার আছে? খারিজিদের আত্মপ্রকাশের ফলে এ প্রশ্নটি প্রথম আসে হযরত আলী (রা.)-এর সামনে। তিনি তাদের স্বাধীন সমাবেশের অধিকার স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, বস্তুত বিরোধী মতাবলম্বীরা যতোক্ষণ জনগণকে তাদের মত গ্রহণে তরবারির সাহায্যে জবরদস্তিমূলক মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা না চালাবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।[১৭৩] ইসলামে ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ-এ মৌলিক নীতি ও শর্তের অধীনে সংগঠন ও সভা সমিতির অধিকার তখনই কার্যকর হবে যখন তা মানবাধিকার লঙ্ঘন, সহিংসতা, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে এবং সত্য ও ন্যায়ের স্বপক্ষে পরিচালিত হবে।

গণতন্ত্র, সরকার ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার

মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের মধ্যে ইসলাম সমস্ত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, সরকার ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইসলাম কোনো সমাজের মানুষকে আশরাফ ও আতরাফ বা শাসক ও শাসিত হিসেবে বিভক্ত করার পক্ষপাতী নয়। মত প্রকাশের অধিকার, প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার, ন্যায়সঙ্গতভাবে সরকারের সমালোচনা করার অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। Dr, Shaikh Shaukat Hussain বলেন, "Islam gives the right of freedom of movement to every human being."[174] ইসলাম মানুষকে যে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছে তা কোনো সময়ই হরণ করা যায় না। এমনকি এ অধিকার হরণ করার অধিকার কোনো সরকার বা রাষ্ট্র প্রধানকেও দেওয়া হয় নি। ইসলামে গণতান্ত্রিক অধিকার যে কত মজবুত তা নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। হযরত উমরের খিলাফতকালে খলিফা মসজিদের মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে জু'মআর ভাষণ দিচ্ছিলেন। বললেন: হে জনতা, তোমরা শুন এবং পালন করো। তখন জনৈক সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন, আগে আপনি বলুন এতবড় লম্বা জামা আপনি কোথায় পেলেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পারবেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনার কথা শুনব না ও পালন করব না। হযরত উমর (রা.) খুতবা বন্ধ করে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে বললে আবদুল্লাহ বললেন, যেটুকু কাপড় পাওয়া গেছে তাতে জামার কাপড় না হওয়ায় আমি আমার অংশের কাপড় তাঁকে দিয়ে দিলে তিনি তা দিয়ে জামা তৈরি করেছেন। এই জবাব শুনে প্রশ্নকারী সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হ্যাঁ, এবার খুতবা শুরু করুন। আমরা আপনার কথা শুনব ও মানব। খলিফা বললেন, যদি আমি সন্তোষজনক জবাব না দিতে পারতাম তাহলে তুমি কী করতে? তখন প্রশ্নকর্তা বললেন, আমার এ তলোয়ার এর সমাধান

[১৭৩] আবদুল করিম যায়দান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১
[১৭৪] Dr. Shaikh Shaukat Hussain, *op. cit*, p. 62

দিতো। এ কথা শুনে খলিফা খুশি হলেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত এরূপ ঈমানদার বান্দা জীবিত থাকবে ততদিন ইসলাম ও মুসলমানদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।[১৭৫]

ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষের পরামর্শক্রমে সরকার গঠিত হবে। ইরশাদ হয়েছে,

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم- وليمكنن لهم دينهم الذى ارضى لهم وليبد لنهم من بعد خوفهم امنا- يعبدونى لا يشركون بى شيئا- فاولئك هم الفسقون-

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাদের দীনকে যাহা তিনি তাহাদের জন্য পসন্দ করিয়াছেন এবং তাহাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাহাদের অবশ্য নিরাপত্তা দান করিবেন। তাহারা আমার ইবাদত করিবে,আমার সাথে কোনো শরীক করিবে না, অতঃপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা তো সত্যত্যাগী।"[১৭৬]

সমগ্র মানবজাতি আল্লাহ্র খলিফা হওয়ার কারণে প্রত্যেকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সমান অংশীদার। সুতরাং ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা গোটা জাতির এবং সব লোকের পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচালনার নীতি স্থির করেছে। কোরআনের ঘোষণা হচ্ছে,

وامرهم شورى بينهم-

"মুসলমানদের যাবতীয় কার্যকলাপ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে চলবে।"[১৭৭] এ আয়াতাংশ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, মুসলমানদের সকল ব্যাপার বিশেষভাবে যাবতীয় গুরুতর সামাজিক ও জাতীয় ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন করতে হবে। কোরআনের এ ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার অধিকারকে উন্মুক্ত করা হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে মদিনা রাষ্ট্রে এ পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছিল। মদিনা রিপাবলিকের প্রথম রাষ্ট্রপতি হযরত মুহাম্মদ (স.) কে এ পদ্ধতিটি অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে কোরআনে বলা হয়েছে,

وشاورهم فى الامر-فاذا عزمت فتوكل على الله- ان الله يحب المتوكلين-

"আপনি তাহাদের (নাগরিকগণের) সঙ্গে যাবতীয় কাজকর্মের বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রণয়নে পরামর্শ গ্রহণ করুন। অতঃপর তুমি কোনো সংকল্প করিলে অর্থাৎ কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এর (সফলতার জন্য) আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিবে, যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাহাদের ভালোবাসেন।"[১৭৮]

---

[১৭৫] মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩-১২৪

[১৭৬] *আল-কুর'আন*, ২৪:৫৫

[১৭৭] *আল-কুর'আন*, ৪২:৩৮

[১৭৮] *আল-কুর'আন*, ০৩:১৫৯

রাসূলুল্লাহ (স.) সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছেন,"আমার পরে আর কোন নবী নেই। তবে অনেক খলীফাহ্ হবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের বায়'আতের হক আদায় করবে। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে যে সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল।"[১৭৯]

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খলিফা নির্বাচিত হয়ে সর্বপ্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আমি যদি সরকারকে যথাযথভাবে পরিচালনা করি তাহলে আপনাদের উচিত আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করা। আর আমি যদি বাঁকা পথে চলতে শুরু করি, তাহলে তোমরা আমাকে ভুল শোধরে দিবে এবং সঠিক পথে চলতে বাধ্য করবে।[১৮০]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করেন যে, পরামর্শ ছাড়া সরকার চলতে পারে না। এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক রাজনৈতিক কার্যাবলি জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে যা একটি গণতান্ত্রিক ও পরামর্শভিত্তিক সরকার গঠনের নীতিকে অনুমোদন করে।

সরকারি চাকরিলাভের ক্ষেত্রে সম-অধিকার

সরকারি চাকরিলাভের অধিকারও একটি মৌলিক অধিকার। দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মুর্খ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নিজ নিজ দেশের সরকারি কর্মে প্রবেশের সমান অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। ইসলামি সরকার সরকারি চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নিয়োগ করবে। যোগ্যতা নেই, অথচ সরকারি চাকরি পেতে তদবির করে সে সমস্ত লোককে সরকারি চাকরি দেওয়া উচিত নয়। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) বলেন :

"আমি ও আমার গোত্রের দু'ব্যক্তি মহানবী (স.) এর নিকট গমন করলাম। সে দু'জনের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমাকে কোন বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন। অপরজনও অনুরূপ কথা বলল। তখন তিনি বললেন : যারা নেতৃত্ব নিতে চায় এবং এর প্রতি লোভ পোষণ করে আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না।"[১৮১]

[১৭৯] ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ৩২০৯, ষষ্ঠ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৮

[১৮০] Jalaluddin A's Suyuti, *History of the Caliphs,* Tr. Major H.S. Jarrett, Kitab Bhavan, New Delhi, 2010, pp. 87-88; Sayed Athar Hussain, *The Glorius Caliphate*, Academy of Islamic Research and Publication, Lucknow, 1974, p. 19; কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, অনু. মাওলানা লিয়াকত আলী, *খেলাফতে রাশেদা*, মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৯

[১৮১] ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ৬৬৬৪, দশম খণ্ড,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৮-৪৩৯

এ হাদিস থেকে স্পষ্ট জানা গেল, সরকারি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগলাভের কোনো অধিকার জনগণের নেই। তাহলে সরকার জনগণকে এ পদে কী করে নিয়োজিত করবে? এখানেই সরকারের দায়িত্বের প্রশ্ন। সরকার প্রত্যেকটি কাজের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তিকে যাচাই-বাছাই করার একটা পন্থা উদ্ভাবন করতে পারে। এজন্যে প্রত্যেক পদেই একটি বিশেষ পরীক্ষা চালু করা যেতে পারে। সে পরীক্ষায় যারা অধিক যোগ্য বিবেচিত হবেন তারাই চাকরির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ইসলাম যোগ্য ও ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের ওপর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করার পাশাপাশি এ দায়িত্বের জন্য জবাবদিহিতার নীতিও অনুসরণ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক। আর প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৮২] রাসূলের এ ঘোষণা অনুসারে প্রতিটি সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী তার ওপর অর্পিত আমানতের (দায়িত্ব) জন্য রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের কাছে দায়ী থাকবেন।

শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে মানবাধিকার

মানুষের গুরুত্বপূর্ণ যে সকল মৌলিক অধিকার রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষার অধিকার অন্যতম। ইসলামের অন্যতম শিক্ষা হলো মানুষ যেন নিজেদেরকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে। ইসলামে জ্ঞান ও শিক্ষার এবং জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোকদের মর্যাদা সর্বোচ্চ। শিক্ষার অধিকারের স্বীকৃতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য বিধায় জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। এই অধিকার অস্বীকৃত হলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকারও অস্বীকৃত হয়। ব্যক্তি মানুষের মানসিক বিকাশ সাধনের জন্য শিক্ষার অধিকার অপরিহার্য। শিক্ষা হলো এক বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির যোগ্যতা ও দক্ষতা পূরণ বা আবিষ্কার।[১৮৩] ইসলাম মানুষকে জ্ঞান আহরণের জন্য তৎপর হতে, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে প্রচেষ্টা করতে ও সে জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছে। কোরআন মজিদে ইরশাদ করা হয়েছে :

وقل رب زدنى علما-

"তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা।"[১৮৪]

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে জ্ঞানার্জনকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নির্জন হেরা পর্বতের[১৮৫] গুহায় ধ্যানমগ্ন নবি করিম (সা.)-এর উপর আল্লাহর তরফ থেকে যে প্রথম ওহি নাযিল হয় তা হচ্ছে 'ইকরা'[১৮৬]

---

[১৮২] ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ২২৪৯, চতুর্থ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*,পৃ. ২১৪

[১৮৩] ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৯

[১৮৪] *আল-কুর'আন*, ২০:১১৪

[১৮৫] মক্কা হতে প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্বদিকে ছাবীর পর্বতের অপর দিকে হেরা পর্বত অবস্থিত। প্রতি বছর রমযান মাসে মুহাম্মদ (সা.) এই পর্বতের ওপরে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় কাটাতেন। রাসূল (স.) রিসালাত লাভের পূর্বে প্রায়ই এ গুহায় একাসী ধ্যান মগ্ন থাকতেন। এ পর্বতেই প্রথম রাসূল (স.) এর নিকট মাহগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়। রাসূল (স.) চল্লিশ বছর বয়সে রমজান মাসের ২৭ তারিখ আল্লাহর তরফ থেকে এ গুহায় প্রথম ওহী পান। এ পাহাড়কে বর্তমানে জাবালে নূর (আলোর পাহাড়) বলা হয়। বিস্তারিত দেখুন, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খণ্ড,

অর্থাৎ পাঠ করুন। এর আলোকে চার খলিফা মুসলিম সাম্রাজ্যে বিদ্যা শিক্ষা সম্প্রসারণের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেন। খলিফাদের নিকট মহানবি মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী ছিল আবেহায়াতস্বরূপ।[১৮৭] তাই তাঁদের আমলে শিক্ষাবিস্তারের পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষ গুরুত্ব পায় এবং এর পরিমণ্ডল আরও সম্প্রসারিত হয়।[১৮৮] শিক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য উপহার। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং সমাজের মানুষের কল্যাণে শিক্ষার আলো জ্বালাতে পারে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يرفع الله الذين امنوا منكم- والذين اوتوا العلم درجت- والله بما تعملون خبير-

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহাদেরকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে আল্লাহ্ তাহাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করিবেন; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।"[১৮৯]

মহানবি (সা.) বলেন,

بلغوا عنى ولو اية-

"আমার কথা (অন্যদের নিকট) পৌছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়।"[১৯০] এ হাদিসের মর্ম উপলব্ধি করে এবং উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা প্রচারকে আরও ব্যাপকতর করেন এবং ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বেলে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাদের আশংকা ছিল শিক্ষার প্রতি অবহেলার মাধ্যমে অন্যান্য কাওমের মত তাদের ওপর শাস্তি নেমে না আসে।[১৯১] রাসূলে করিম (সা.) ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে বদরের যুদ্ধে ধৃত ৭০ জন বন্দির মধ্যে বেশ কয়েকজনকে মুক্তিপণের বিনিময়ে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন। আর কয়েকজনকে এই শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা প্রত্যেকেই দশজন নিরক্ষর সাহাবিদিগকে আক্ষরিক জ্ঞান দান করবে।[১৯২] কেননা তখন মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। রাসূলে করিম (সা.) এইভাবেই তাঁর জীবনে শিক্ষাকে সকল মানুষের জন্য শীর্ষতম গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সকল মানুষের জন্য জ্ঞানের অন্বেষণ করা বাধ্যতামূলক। রাসূল করিম (স.) বলেন,

---

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৭১০; মাও. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, *বিশ্বনবীর জীবনী*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা : ১৯৮৮, পৃ. ৬৩

[১৮৬] ইকরা : মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সর্বপ্রথম ওহি :

اقرأ باسم ربك الذى خلق- خلق الانسان من علق- اقرأ وربك الاكرم- الذى علم بالقلم- علم الانسان مالم يعلم-

'পড়ুন (হে নবি) আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক থেকে, পড়ুন এবং আপনার রব বড়ই অনুগ্রহশীল, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানত না। দ্র. সূরা আলাক, আয়াত নং ১-৫

[১৮৭] মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল, *হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও খুলাফা-ই রাশেদীনের যুগের শিক্ষাব্যবস্থা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ. ৩২০

[১৮৮] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২০

[১৮৯] *আল-কুর'আন*, ৫৮:১১

[১৯০] ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ৩২১৫, ষষ্ঠ খণ্ড,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০-১৪১

[১৯১] ড. মোঃ আযহাব আলী, *শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৬, পৃ. ১৯৩

[১৯২] সাঈদ আহমদ, *আর রিক্ক ফিল ইসলাম*, দিল্লী, ১৯৬০, পৃ. ৫০-৫১, ১০৩, ১০৪; স্যার সাইয়েদ আহমদ, *মাকালাত*, লাহোর, ১৯৬২, ভল্যুম-৪, পৃ. ৪৪৮-৪৪৯

طلب العلم فريضة على كل مسلم-

"ইলম অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয।"[১৯৩]

অর্থনৈতিক নিরাপত্তালাভের অধিকার

ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের বিভিন্নতার জন্য ইসলাম কোনো ব্যক্তিকে তার মৌলিক অর্থনৈতিক চাহিদা যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে না। শুধুমাত্র ইসলামি রাষ্ট্র নয়, পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের নাগরিকই নিজের প্রয়োজন নিজেই পূরণ করবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে উপার্জন করবে। চাকুরি ও অন্যান্য পেশার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা থাকবে। আর প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপার্জিত অর্থ স্বাধীনভাবে ভোগ করার অধিকার থাকবে। ভিক্ষা করা ইসলাম পছন্দ করে না বিধায় ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। হাদিস শরিফে উদ্ধৃত হয়েছে :

"যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম! তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা, কোন লোকের কাছে এসে যাচনা করার চাইতে অনেক ভাল, চাই সে দিক বা না দিক।"[১৯৪]

উল্লিখিত হাদিসের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজে কাজ করে যদি স্বীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে উপার্জন করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে ভিক্ষা গ্রহণ করবে না। কারণ ভিক্ষাপ্রথাকে ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের বা সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিরা অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র লোকদের সাহায্য করবে তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য। এরপরও যদি কোনো ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত থেকে যায়, তাহলে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার জন্য হস্তপ্রসারিত করবে। নবি করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন :

من كان له فضل من زاد فليعد به على من لازادله-

"যার কাছে অতিরিক্ত সওয়ারী আছে সে যেন তাকে একটি দান করে, যার কাছে সওয়ারী নেই। আর যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাব আছে সে যেন তাকে কিছু দান করে, যার কাছে আসবাবপত্র নেই।"[১৯৫]

অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে,

طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعة وطعام الاربعة يكفي الثما نية-

[১৯৩] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-২২৪, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫
[১৯৪] ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ১৩৮৫, তৃতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫
[১৯৫] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), ষষ্ঠ খণ্ড, হাদিস নং-৪৩৬৮, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৮-১৭৯

"একজনের পরিমাণ খাদ্য দু'জনের জন্য যতেষ্ট, দু'জনের পরিমাণ খাদ্য তিনজনের জন্য যতেষ্ট এবং চারজনের পরিমাণ খাদ্য আটজনের জন্য যতেষ্ট।"[১৯৬]

রাসূলে করিম (সা.) হাদিসের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত যে, সচ্ছল লোকদের সম্পদে অভাবগ্রস্তদের অধিকার রয়েছে।

ইসলামি রাষ্ট্র দেশের সমস্ত অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র জনের অভাব মেটাবেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার তথা বায়তুল মাল থেকে। রাষ্ট্রপ্রধান এ দায়িত্ব পালন করবেন এবং যথাযথ সংবাদ নেবেন রাষ্ট্রে যেন কোনো অভাবগ্রস্ত লোক না খেয়ে থাকে।

ধন-মাল ব্যয় করতে হয় প্রধানত কাদের জন্যে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারাতে বলা হয়েছে :

قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتمى والمسكين وابن السبيل- وما تفعلوا من خير فان الله به عليم-

"বল 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করিবে তাহা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিস্‌কিন এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যাহা কিছু তোমরা করা না কেন আল্লাহ্ তো সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।"[১৯৭]

সূরা বাকারায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين- وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل - والسائلين وفي الرقاب - وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا - والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس - أولئك الذين صدقوا وألئك هم المتقون-

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবিগণে ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ্‌প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস-মুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে, সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ-সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকি।"[১৯৮]

সম্পদশালী ব্যক্তি তার নিকট রক্ষিত ধন-মাল ব্যয় বা দান করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এমনভাবে ধন-সম্পদ ব্যয় করা যাবে না যার ফলে সে দরিদ্র হয়ে পড়ে বা তার পরিবারবর্গ দরিদ্র

---

[১৯৬] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), সপ্তম খণ্ড, হাদিস নং-৫২০৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬
[১৯৭] *আল-কুর'আন*, ০২:২১৫
[১৯৮] *আল-কুর'আন*, ০২:১৭৭

হয়ে পড়ে। ইসলামের নির্দেশনা স্পষ্ট। আবার যাকে সম্পদ দিয়েছেন সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে সে যেন কোন কার্পণ্য না করে এ তাগিদও পবিত্র কোরআনে দেওয়া হয়েছে। সম্পদ ব্যয়ে কার্পণ্যও করা যাবে না আবার সবকিছু বিলিয়ে দেয়াও যাবে না। সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। এজন্যই ধন-মাল ব্যয়ের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা একটি সুস্পষ্ট মৌলনীতি ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا-

"তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করিয়া রাখিও না এবং উহা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করিও না, তাহা হইলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হইয়া পড়িবে।"[১৯৯]

এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

لينفق ذو سعة من سعته- ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله- لا يكلف الله نفسا الا ما اتها- سيجعل الله بعد عسر يسر-

"বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।"[২০০]

ধনসম্পদ ব্যয় (দান) করলে কমে না, বরং তা বাড়ে; এটা ক্ষতির নয় বরং সম্পূর্ণ লাভের পণ্য। আবার সম্পদ ব্যয় করলে ধন-সম্পদ ঘাটতি হওয়ার এবং দরিদ্র হয়ে যাওয়ার যে ভয় অন্তরে লেগে আছে তা থেকে মন-মগজকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ইরশাদ হচ্ছে :

ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء - وما تنفقوا من خير فلانفسكم- وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله- وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون-

"তাহাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব তোমার নহে ; বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করিয়া থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হইবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না।"[২০১]

ধন-সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ্র দেওয়া বিধি-বিধান ব্যাপক। ধন-সম্পদ পূঞ্জীভূত করে রাখলে দুনিয়া ও আখেরাত তথা উভয়স্থানে কীভাবে ধ্বংস ও বরবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এ সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত নিম্নে প্রদত্ত হলো :

---

[১৯৯] *আল-কুর'আন*, ১৭:২৯
[২০০] *আল-কুর'আন*, ৬৫:০৭
[২০১] *আল-কুর'আন*, ০২:২৭২

ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين- فان لم يصبها وابل فطل- والله بما تعملون بصير-

“আর যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভার্থে এবং নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে তাহাদের উপমা কোনো উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাহাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তাহার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।”[২০২]

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم - بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة - ولله ميراث السماوات والأرض- والله بما تعملون خبير-

“আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যাহা তাহাদের দিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে তাহাদের জন্য উহা মঙ্গল, ইহা যেন তাহারা কিছুতেই মনে না করে। না, ইহা তাহাদের জন্য অমঙ্গল। যাহাতে তাহারা কৃপণতা করিবে কিয়ামতের দিন উহাই তাহাদের গলায় বেড়ি হইবে। আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।”[২০৩]

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة - والله بضاعف لمن يشاء- والله واسع عليم-

“যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাহাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যাহা সাতটি শীষ উৎপাদক করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যদানা। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করিয়া দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।”[২০৪]

يا أيها الذين امنوا ان كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله - والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - فبشرهم بعذاب أليم- يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم- هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون-

“হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে। আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পূঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না উহাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে সেদিন বলা হইবে,

[২০২] *আল-কুর'আন*, ০২:২৬৫
[২০৩] *আল-কুর'আন*, ০৩:১৮০
[২০৪] *আল-কুর'আন*, ০২:২৬১

ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পূঞ্জীভূত করিতে। সুতরাং তোমরা যাহা পূঞ্জীভূত করিয়াছিলে তাহা আস্বাদন কর।”[২০৫]

এককথায় ধন-সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই মানবসমাজের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর। ধন-সম্পদ ব্যয়ে অধিক অপচয় ও অনর্থক খরচ করতে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন ঠিক তেমনি তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

দান-খয়রাত এর ব্যাপারে ইসলাম ধর্ম ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও একইরকম পদ্ধতি লক্ষ করা যায়। হিন্দু ধর্মের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাদাতা ও শাস্ত্রকার শ্রী অতুলচন্দ্র সেন লিখেছেন, যজ্ঞবান লোক (যজ্ঞ অর্থ সেবা) যে অন্ন পাক করেন, তা নিজের উদরপূর্তির জন্য নয়। দেবতা, অতিথি প্রভৃতিকে দান করে যা অবশিষ্ট থাকে তাই তিনি ভোগ করেন। অন্নদান করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা অমৃত। অমৃত ভোজন কর। যজ্ঞবান (দানশীল সেবাদানকারী) ব্যক্তি সকল পাপ হতে মুক্ত হও আর যজ্ঞহীন দুরাচারগণ নিজেদের ভোজনের নিমিত্তেই অন্ন পাক করে। এরা পাপান্ন ভোজন করে।[২০৬]

ধন-সম্পদের মাধ্যমে পারস্পরিক কোনো ব্যবসা পরিচালনা করতে হলে তা অবশ্যই লিখিত দলিলের ভিত্তিতে হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। লিখিত দলিলের মাধ্যমে কোনো কার্য সম্পন্ন হলে পরস্পরের মাঝে বিবাদের সম্ভাবনা থাকে না। অভাবীরা যদি ধনীদের নিকট ঋণ চাইতে আসে তাহলে তাদেরকে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা স্পষ্ট। পারস্পরিক ঋণ দান ও তা আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হলো :

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة- وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون-

“যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছাড়িয়া দাও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানিতে।”[২০৭]

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের গভর্নর হিসেবে পাঠানোর সময় মহানবি (স.) ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দায়িত্ব প্রসঙ্গে এই নীতিমালা বর্ণনা করেন: “সেখানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়! তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর

[২০৫] *আল-কুর'আন*, ০৯:৩৪-৩৫
[২০৬] অতুলচন্দ্র সেন, *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা*, পৃষ্ঠা. ১৮০
[২০৭] *আল-কুর'আন*, ০২:২৮০

সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে (যাকাত) উসূল করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হেব।”[২০৮]

রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকরা সমান অংশীদার। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একাকী কিংবা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অমুসলিম নাগরিকরা মুসলমান নাগরিকদের মতোই স্বাধীনভাবে যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে। ফিকাহবিশারদগণ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারিগরি, কৃষি, চাকুরি ও সব ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করেন নি। সংখ্যালঘু বলে তাদের উপর কোন পেশা বা কর্ম চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ যে পেশা বা কর্ম মুসলমানদের নিকট পছন্দনীয় নয়, সেটা অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কতোটা যৌক্তিক। তাদের মধ্যে কোনোরূপ বৈষম্য সৃষ্টি করা চলবে না। চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের যোগ্যতার মাপকাঠি হবে একটিই এবং লোকদেরকে ধর্মীয় পরিচয়ে নয়, একমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতেই নির্বাচন করা হবে।[২০৯] বস্তুত এ ব্যাপারে মুসলিম অমুসলিমে কোনোই পার্থক্য করা হয় না। অমুসলিম বেকার, অসামর্থ ও অভিভাবকহীন পরিবারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থ সাহায্য দেওয়ার বিধান ইসলামি আইনে রাখা হয়েছে।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (র.) তাঁর বসরার শাসনকর্তা আদী ইবনে আরতাতকে লিখে পাঠিয়েছিলেন,

انظر من قبلك من اهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته ولت عنه المكاسب فاجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه-

“তুমি নিজে লক্ষ করে দেখ, অমুসলিম নাগরিকদের মধ্য থেকে যেসব লোক বয়োবৃদ্ধ ও কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছে এবং যার উপার্জন-উপায় কিছুই নেই, তুমি তাদের প্রয়োজন মতো অর্থ রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল থেকে তাদের দাও।”[২১০]

---

[২০৮] ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ১৩১৩, তৃতীয় খণ্ড,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

[২০৯] স্বজনপ্রীতি কিংবা দলীয় বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ চিন্তাকে মাথায় এনে রাষ্ট্রের কোনো পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়া ইসলামে মহাপাপ। হযরত আবু বকর (রা) হযরত ইয়াজীদ ইবনু আবী সুফ্‌ইয়ান (রা) কে আমির নিয়োগ করে সিরিয়ায় প্রেরণের সময় ইরশাদ করেন,

يا يزيد ان لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالامارة وذلك اكبر ما أخاف عليك فان رسول الله ﷺ قال من ولى من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم-

“হে ইয়াযীদ, তোমার আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। আমি তোমার দিক থেকে এটা সর্বাধিক আশঙ্কা করছি যে, তুমি বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাপারে তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। অথচ রাসূল (স.) বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে যদি আত্মীয়তার কারণে কাউকে কোনো কাজে তাদের কর্তা নিয়োগ করে, তা হলে তার ওপর আল্লাহর লা’নত পতিত হবে এবং আল্লাহ তা’আলা তার কোনো ধরনের ফারয ও নাফল ‘ইবাদত (অথবা তার তাওবা বা বিনিময়) গ্রহণ করবেন না, যে যাবত না তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।” ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রথম খণ্ড, হাদিস নং-২১, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০২

[২১০] আবু উবায়দ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, আল মাকতাবাতু তিজারিয়্যাহ আল কুবরা, কায়রো, ১৩৫৩ হি., পৃ. ৪৫-৪৬

এককথায় বলা যায় যে, ইসলাম সমাজের সকল মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে যাকাতসহ সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করেছে।

অন্যায় অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার

ইসলামের দেওয়া মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, অন্যায় অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার। ইসলামে যে কোনো অন্যায় অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য মানবজাতিকে উৎসাহিত করেছে বলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মানুষের জন্মগত অধিকার। নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয়। অত্যাচারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। ফলে ইসলামের শিক্ষা হলো অত্যাচারীর সামনে মাথা নত না করে তার যথাযথ প্রতিবাদ করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لا تظلمون ولا تظلمون-

"তোমরা অত্যাচার করিবে না এবং অত্যাচারিতও হইবে না।"[২১১]

উৎপীড়নের উৎস সরকারই হোক বা অন্য রকম কোনো উৎসই হোক– এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকারের কথা পবিত্র কোরআন শরিফের সূরা নিসায় যথার্থভাবেই বলা হয়েছে, আর তা হচ্ছে :

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم- وكان الله سميعا عليما-

"মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না ; তবে যাহার উপর জুলুম করা হইয়াছে সে ব্যতীত। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[২১২]

উপরোল্লিখিত আয়াত দুটোর মাধ্যমে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, অশ্লীলতা ও মন্দ কথার প্রচারণা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বিধায় যতোক্ষণ না অবিচার করা হয়েছে ততোক্ষণ জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় মন্দ বলাকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। কিন্তু অন্যায় অত্যাচার যখন সীমা অতিক্রম করে, তখন ধৈর্য-সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙ্গে মুখ থেকে মন্দ ও অশ্লীল কথা বেরিয়ে পড়লেও আল্লাহর কাছে তা ক্ষমাযোগ্য যদিও ব্যক্তি উচ্চতর নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। তবে নির্যাতিত ব্যক্তি তার অভিযোগ পেশ করতে গিয়ে যদি আবেগের বশবর্তী হয়ে কথাবার্তায় সৌজন্য রক্ষা করতে অপারগ হলে সে অভিযুক্ত হবে না।

অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে সমাজে কলহ-বিবাদ লেগে থাকবে। সমাজে যেন কলহ-বিবাদ লেগে না থাকে সেজন্য ইসলাম সকল ধরনের অন্যায়-অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার অনুমতি দিয়েছে। পবিত্র হাদিস শরিফে মহানবি (স.) ফরমান, "তোমার ভাইকে

---

[২১১] *আল-কুর'আন*, ০২:২৭৯

[২১২] *আল-কুর'আন*, ০৪:১৪৮

সাহায্য করো, সে যালিম হোক অথবা মাযলুম। তিনি (আনাস) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাযলুমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম। কিন্তু যালিমকে কী করে সাহায্য করব? রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, তুমি তার হাত ধরে তাকে বিরত রাখবে (অর্থাৎ তাকে যুল্ম করতে দিবে না)।"[২১৩]

যখন কোনো রাষ্ট্রে অনাচার হয়, তখন যদি রাষ্ট্রের সৎ লোকেরা প্রতিরোধ গড়ে না তুলে তাহলে উক্ত অনাচারের ধাক্কা তাদেরকেও আঘাত করবে। এজন্য সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

রাষ্ট্রে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য শাসকের দায়িত্ব হচ্ছে অন্যায়-অত্যাচার ও নির্যাতনের অবসান ঘটানো এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু শাসক যদি রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে জালেম শাসকের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করার অধিকারও ইসলামে রয়েছে। আল্লাহ পাক মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছেন :

ولا تطيعوا أمر المسرفين-

"এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশ মান্য করিও না।"[২১৪]

ইসলামি রাষ্ট্রের যে সকল বিধানাবলি রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলি হলো নেতার আদেশ মান্য করা। ন্যায়সঙ্গত কাজে নেতৃত্বের আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক। অত্যাচারী শাসকের শরিয়তবিরোধী কাজকর্ম মেনে নেওয়া ও সমর্থন করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ বলে রাসূল (স.) নির্দেশনা দিয়েছেন। নবি করিম (স.) জনৈক আনসারির নেতৃত্বে মদিনা রাষ্ট্রের বাইরে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। দেশের বাইরে থাকাকালে সেনাধ্যক্ষ সেনাবাহিনীর লোকদের কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের কাষ্ঠ সংগ্রহ করে তা একত্রিত করে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তাতে ঝাঁপ দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা সেনাপ্রধানের এ নির্দেশ মান্য করেন নি। পরে এ ঘটনার কথা রাসূলে করিম (স.) এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন :

لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا انما الطاعة فى المعروف-

"লোকেরা যদি আগুনে ঝাঁপ দিত, তা হলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আর এ আগুন থেকে বের হতে পারতো না। কেননা আনুগত্য কেবল সৎকাজের।"[২১৫]

---

[২১৩] ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ২২৮২, চতুর্থ খণ্ড,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৪
[২১৪] *আল-কুর'আন*, ২৬:১৫১
[২১৫] ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ৪০০৪, সপ্তম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৩

পাপকাজ বর্জন করার অধিকার

ইসলামের নীতিমালার মধ্যে অন্যতম নীতি হলো, কোনো ব্যক্তিকে পাপের কাজ করতে উৎসাহিত করা বা নির্দেশ দেওয়া যাবে না। ইসলামের বিধান অনুযায়ী ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের আনুগত্য আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে পালন করা বাধ্যতামূলক। তবে রাষ্ট্র এমন কাজ করার আদেশ দিতে পারবে না যা পালন করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) এর নাফরমানি করা হয়। রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্রপ্রধানের সকল নির্দেশাবলি পালন করতে বাধ্য হলেও এমন আদেশ অমান্য করতে পারবে যা পালন করলে তাকে পাপাচারে লিপ্ত হতে হয়। রাষ্ট্র কাউকে এরূপ পাপকাজের নির্দেশ দিলে তা মেনে নেওয়া তার জন্য বা রাষ্ট্রের জনগণের জন্য বৈধ বা অপরিহার্য নয়। কেননা হারাম কাজে রাষ্ট্রের আনুগত্য করাও হারাম। আর পাপাচারের নির্দেশদাতার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে তার যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে। আর রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশ যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরোধী না হয়, তাহলে উক্ত আদেশ পালন করা বাধ্যতামূলক।
হাদিস শরিফে এসেছে বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন,

-لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

“সৃষ্টিকর্তার নাফরমানিতে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।”[২১৬]

মোদ্দাকথা, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসম্পন্ন লোকদের আনুগত্য করতে হবে সেসব কাজে যা করলে আল্লাহর আনুগত্য হবে। আল্লাহর নাফরমানির কাজে কোনো আনুগত্য করা চলে না। কেননা আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা যেতে পারে না।

প্রতিবেশীর জন্য মানবাধিকার

ইসলাম যে কয়েকটি জিনিসের ওপর সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, প্রতিবেশীর জন্য মানবাধিকার তাদের অন্যতম। প্রতিবেশী মুসলিম না অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এটা বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর প্রধানতম যে সকল অধিকারগুলো আছে, সে সকল অধিকারগুলো পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়া, বিপদ-আপদে পাশে থাকা, রোগাক্রান্ত হলে দেখতে যাওয়া, মৃত্যুর পর জানাযায় শরিক হওয়া, জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা প্রদান করা একজন প্রতিবেশীর প্রতি অন্য প্রতিবেশীর গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহের মাঝে অন্যতম। ইসলাম কোনো সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করে না। প্রতিবেশী মুসলিম কি অমুসলিম এটা বিবেচ্য বিষয় নয়, মূল বিষয়

[২১৬] আল্লামা আলাউদ্দিন আলী আল মুত্তাকী ইবনে হুসামউদ্দিন আল হিন্দী, (বিশ্লেষক, হাসসান আবদুল মান্নান), *কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদিস নং-১৪৮৭৫, ৫ম সংস্করন, মুওআসসাতুল রিসালাহ, বৈরূত, ১৯৮৫, পৃ. ৬৭

হলো প্রতিবেশীর অধিকার ও তাদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা।[২১৭] প্রতিবেশীকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেওয়াকে ঈমান পরিপন্থি কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

নিকটবর্তী লোক, ইয়াতিম, মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, পাশে বসবাসকারী প্রতিবেশী, সঙ্গী প্রতিবেশী, নিঃস্ব পথিক ও দাস-দাসীর প্রতি কর্তব্য পালনকে পিতামাতার সাথে শুভ আচরণ অবলম্বনের সমপর্যায়ের দায়িত্ব ও মানবাধিকারের ব্যাপার বলে মহানবি (স.) বলেন,

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذى-

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[২১৮]

প্রতিবেশীদের পারস্পরিক হক ও অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ প্রসঙ্গে রাসূলে করিম (স.) বলেন, "আমাকে জিবরাইল (আ) সবসময় প্রতিবেশি সম্পর্কে অসিয়ত করে থাকেন। এমনকি, আমার মনে হয়, তিনি প্রতিবেশিকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন।"[২১৯] অন্য হাদিসে নবি করিম (স.) বলেন, "সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে লোক মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে সে লোক? তিনি বললেন : যে লোকের প্রতিবেশি তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।"[২২০] ইসলাম যে মানবাধিকারের কথা বলে তার গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে আছে প্রতিবেশীর অধিকার। প্রতিবেশী ছাড়া কোনো মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে না এবং বসবাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতিবেশীকে হীন ও নগণ্য মনে না করে তার সাথে ভালো ব্যবহার করা প্রতিবেশীর কর্তব্য।

নারীর মানবাধিকার

ইসলাম মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে সুমহান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে এবং এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, সাদা-কালো, উঁচু-নীচু ও ছোট-বড়র মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। ইসলাম ভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মেও নারীর অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে উল্লেখ আছে- নর-নারীতে কোনো ভেদাভেদ নেই। নেই জাত-অজাতের বালাই।[২২১] জাহিলি যুগে নারীকে শুধুমাত্র ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং সে সময়ে সমাজে নারীর কোনো স্বীকৃত মর্যাদা ছিল না। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার হরণ, তাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন ও নিপীড়ন চালানো ও তাদেরকে অবজ্ঞা করার কারণে ইসলাম তাদেরকে প্রকৃত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। সে সময় কন্যা

---

[২১৭]. Dr. Towqueer Alam Falahi, *Studies in Muslim Theology*, Aligarh Muslim University Press, Aligarh, 1999, p.148

[২১৮] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), ১ম খণ্ড, হাদিস নং-৮২, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯

[২১৯] ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ৫৫৮৯, নবম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৬

[২২০] ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ৫৫৯১, নবম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৭

[২২১] জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৮০

সন্তান জন্ম হলে তাকে জীবন্ত কবর দিত। আর তখন ইসলামই সর্বপ্রথম অবহেলিত নারী সমাজকে সবধরনের সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়ে পূর্ণ মর্যাদাসহকারে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের চেয়ে অধিক সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দিয়েছে। যেমন, কোনো বিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিত নারীর মধ্যে যৌন সংসর্গ হলে সতীত্বের নীতি ভঙ্গের জন্য দায়ী হবে পুরুষ।[২২২] নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান, স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ দান, বিবাহে সম্মতি গ্রহণ, স্ত্রীর মোহরানা, সম্পত্তি ও মালিকানা স্বত্বলাভের অধিকার প্রদান করে ইসলাম নারীর সকল অধিকার সুরক্ষিত ও কার্যকর করেছে। হিন্দুধর্মসহ পৃথিবীর বহু ধর্মে নারীর উত্তরাধিকার স্বীকার করা না হলেও ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকার-কুরআন অংশীদারদের ৯ জনের মধ্যে ৬ জনই নারী।[২২৩] পর্দার মধ্যে থেকে নারী যা উপার্জন করবে তার মালিক সে নিজেই হবে। কোনো পুরুষের অধিকার নেই তার স্ত্রীর সম্পদ তার অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত ব্যবহার ও হস্তক্ষেপ করবে। ইসলাম নারীর উপার্জিত ধন-সম্পদে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। তাছাড়া নারী তার নিজ যোগ্যতায় দেশের সর্বোচ্চ পদ ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারবে।[২২৪]এভাবে ইসলাম সম্পত্তির মালিকানাসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع عمل عامل من ذكر او انثى- بعضكم من بعض-

“অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের ডাকে সাড়া দিয়া বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোন নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ।”[২২৫]

স্ত্রীর প্রতি আচরণ সম্পর্কে পুরুষের উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن-

“তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেইরূপ গৃহে বাস কর তাহাদেরকেও সেইরূপ গৃহে বাস করিতে দিবে ; তাহাদেরকে উত্যক্ত করিবে না সঙ্কটে ফেলিবার জন্য।”[২২৬]

মু’মিন নর-নারী যে একে অপরের বন্ধু এ সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা হলো-

---

[২২২] তমিজুল হক, *ইসলামে নাগরিক ও মানবাধিকার*, এ্যাবকো প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৩৬

[২২৩] পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে নারীদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যথাযথ অধিকার স্বীকার করা না হলেও ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে ধর্মে নারীদের অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআন শরিফে নারীদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোরআনের সূরা নিসার মোট তিনটি আয়াতে আয়াত নং ১১, ১২ ও ১৭৭ তে উত্তরাধিকার হিসেবে ৯ জন উত্তরাধিকারের আলোচনা এসেছে। এ ৯ জনের মধ্যে ৬ জনই হলো নারী। তারা হলো– (১) কন্যা, (২) মাতা, (৩) স্ত্রী, (৪) আপন বোন (৫) বিপিতা বোন ও (৬) বিমাতা বোন। বিস্তারিত দেখুন, এ, কে, এম সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে নারী ও মানবাধিকার*, মা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৯২

[২২৪] এ, কে, এম সিরাজুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭

[২২৫] *আল-কুর’আন*, ০৩:১৯৫

[২২৬] *আল-কুর’আন*, ০২:০৬

والمؤمنون والمؤمنت بعضهم اولياء بعض- يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله- اولئك سيرحمهم الله- ان الله عزيز حكيم-

"মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, ইহারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে; ইহাদেরকেই আল্লাহ্ কৃপা করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২২৭]

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত বলে নারীকে ইসলাম সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। আল্লাহ বলেন,

هن لباس لكم وانتم لباس لهن-

"তাহারা (রমনীগণ) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ।"[২২৮]

মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার

মানুষ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই অধিকার ভোগ করতে পারে। ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে মানুষ যখন স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে বা দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সচেতন থাকে, তখন সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। পিতা-মাতার সেবাযত্ন করা এবং তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করা সন্তানের কর্তব্য। কোরআন মজিদে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর-পরই পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

ووصينا الانسان بوالديه حسنا - وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما - الى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون-

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তাহার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তবে উহারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সঙ্গে এমন কিছু শরিক করিতে যাহার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদেরকে মানিও না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানাইয়া দিব তোমরা কী করিতেছিলে।"[২২৯]

অপর একটি আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে :

وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا - اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما- واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا-

[২২৭] *আল-কুর'আন*, ০৯:৭১
[২২৮] *আল-কুর'আন*, ০২:১৮৭
[২২৯] *আল-কুর'আন*, ২৯:০৮

“তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তাহাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহাদেরকে উফ বলিও না এবং তাহাদেরকে ধমক দিও না; তাহাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলিও। মমতাবশে তাহাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।”[২৩০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

ووصينا الانسان بوالديه- حملته أمة وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدين الي المصير- وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم - فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا - واتبع سبيل من أناب الي- ثم مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون-

“আমি তো মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাহাদের সঙ্গে বসবাস করিবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হইয়াছে তাহার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করিব।”[২৩১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجارالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل- وما ملكت أيمانكم- ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا-

“তোমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত করিবে ও কোনো কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না ; এবং পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পসন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।”[২৩২]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

[২৩০] *আল-কুর'আন*, ১৭:২৩-২৪
[২৩১] *আল-কুর'আন*, ৩১:১৪-১৫
[২৩২] *আল-কুর'আন*, ০৪:৩৬

وصينا الانسان بوالديه احسانا - حملته أمه كرها ووضعته كرها - وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة - قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التى أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي- اني تبت اليك واني من المسلمين-

"আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সঙ্গে এবং প্রসব করে কষ্টের সঙ্গে, তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয় তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকর্ম করিতে পারি যাহা তুমি পসন্দ কর ; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[২৩৩]

উপরিউক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পিতা-মাতার সাথে সন্তান কেমন ব্যবহার করবে, তাদের সেবা-যত্ন কিভাবে করবে এবং তাদের সামনে উফ্ শব্দটি পর্যন্ত করবে না এ সকল অধিকারসমূহ নিশ্চিত করেছেন। তবে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য মৃত্যুর মাধ্যমেই শেষ হয় না। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের জানাজার নামাজ, তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, তাদের বন্ধুদের সাথে ভালো ব্যবহার করা ও তাদের জন্য দোয়া মাগফিরাতের ব্যবস্থা করা সন্তানের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।[২৩৪] অনুরূপভাবে পিতা-মাতারও সন্তানের ওপর অধিকার রয়েছে। সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের যত্ন করা, তাকে বুকের দুধ খাওয়ানো মায়ের কর্তব্য। সন্তানের সুস্বাস্থ্য, বলিষ্ঠতা ও সুস্থতা নির্ভর করে মায়ের যত্ন, আদর, ভালোবাসা ও বুকের দুধের উপর। তাই সন্তানকে মায়ের বুকের দুধ জন্ম থেকে দুই বছর পর্যন্ত খাওয়ানো মায়ের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। সন্তান মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত হলে সে সুস্থ, সবলভাবে বিকাশ লাভ করতে পারবে না এবং তা মানবাধিকার হরণ হবে। পিতা-মাতার কর্তব্য প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة- وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف-

"যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করিতে চাহে তাহার জন্য জননীগণ তাহাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্যপান করাইবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাহাদের ভরণ-পোষণ করা।"[২৩৫]

---

[২৩৩] *আল-কুর'আন*, ৪৬:১৫
[২৩৪] Dr. Towqueer Alam Falahi, *op. cit*, pp. 143-144
[২৩৫] *আল-কুর'আন*, ০২:২৩৩

পৃথিবীতে সন্তানের আগমনের পথে পিতা-মাতা বাধার কারণ হলে সন্তানের মানবাধিকার হরণ হবে। কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয় সন্তানের আগমনের পথে পিতা-মাতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। মাতৃগর্ভে সন্তান আসার পর ভ্রূণ হত্যা করাও মানুষ হত্যার ন্যায় অপরাধ। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সকল মাখলুকাতের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। ফলে সন্তান জন্মের পর তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে পবিত্র কোরআন শরিফে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق- نحن نرزقهم واياكم- ان قتلهم كان خطا كبيرا-

"তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদেরকেও আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই উহাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"[২৩৬]

পিতা-মাতার ধন-সম্পদে সকল সন্তানেরই সমান অধিকার রয়েছে। সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সাম্য রক্ষা না হলে সন্তানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। আর তাতেও মানবাধিকার হরণ হবে। ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো পিতা-মাতা যদি অমুসলিম হয় তাহলেও তাদের সাথে ভদ্র ও বিনয়ের সাথে ব্যবহার করতে হবে।

বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার

ইসলামি সমাজব্যবস্থায় পরিবার গঠন এবং সংরক্ষণের অধিকার মৌলিক। পরিবার শব্দটির কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন–(১) আত্মীয় বর্গ (২) পত্নী ইত্যাদি। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে পরিবারের সূত্রপাত হয়।[২৩৭] একজন পুরুষ ও একজন নারী যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবাহ করে তখন এ বিয়ের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন গড়ে উঠে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের বিস্তার ঘটে। স্বামী-স্ত্রী এই দুইজনের পারস্পরিক সম্পর্ক যতই সুষ্ঠু-সম্প্রীতি ও সহৃদয়তাপূর্ণ ও আন্তরিক হবে, পরিবারটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ততই দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য হবে। বিয়ে সন্তান জন্মাদানের সর্বোত্তম পদ্ধতি। মানব বংশবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা এবং মনোগত প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য ইসলাম যেমন বিবাহকে অপরিহার্য হিসেবে গণ্য করে তেমনি 'চিরকুমারব্রত' গ্রহণকেও অনুৎসাহিত করে। রাসূল (স.) বলেছেন, "আমি আল্লাহ্কে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি আনুগত্যশীল; অথচ আমি রোযা পালন করি, আবার রোযা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই ও বিয়ে-শাদী করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ ভাব পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।"[২৩৮] পবিত্র কোরআনের বর্ণনার আলোকে কৌমার্যব্রত সম্পর্কে জানা যায় যে, বৈরাগ্যবাদ খ্রিস্টান পাদ্রীগণের কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। ইসলামি বিধান অনুসারে একজন মুসলমান পুরুষ

---

[২৩৬] *আল-কুর'আন*, ১৭:৩১
[২৩৭] এ, কে, এম, সিরাজুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১
[২৩৮] ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ৪৬৯৭, অষ্টম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৩

ইহুদি বা খ্রিস্টান নারীকে বিবাহ করতে পারে।[২৩৯] ইহুদি ও খ্রিস্টান নারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اليوم احل لكم الطيبت- وطعام الذين اوتوا الكتب حل لكم- وطعامكم حل لهم- والمحصنت من المؤمنت
والمحصنت من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسفحين ولا متخذى اخدان-
ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله- وهو فى الاخرة من الخسرين-

"আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভালো জিনিস হালাল করা হইল, যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাহাদের জন্য হালাল; এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল যদি তোমরা তাহাদের মাহ্‌র প্রদান কর বিবাহের জন্য– প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নয়। কেহ ঈমান প্রত্যাখান করিলে তাহার কর্ম নিষ্ফল হইবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"[২৪০]

কিন্তু একজন মুসলিম মহিলার জন্য অমুসলিম পুরুষদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সে পুরুষ আহলে কিতাবভুক্ত হোক বা অন্য ধর্মাবলম্বী হোক। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن- ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم- ولا تنكحوا المشركين حتى
يؤمنوا- ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم- اولئك يدعون الى النلر- والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه-
ويبين ايته للناس لعلهم يتذكرون-

"ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক নারীকে তোমরা বিবাহ করিও না– মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করিলেও, নিশ্চয় মু'মিন ক্রীতদাসী তাহা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সঙ্গে তোমরা বিবাহ দিও না– মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করিলেও, মু'মিন ক্রীতদাস তাহা অপেক্ষা উত্তম। উহারা অগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।"[২৪১]

আল্লাহ্ কোরআনের অন্যত্র ইরশাদ করেন,

---

[২৩৯] Maulana Mohd. Taqi Amini, *The Agrarian System of Islam*, Tr. Syed Ahmad Ali, Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 1991, p. 183
[২৪০] *আল-কুর'আন*, ০৫:০৫
[২৪১] *আল-কুর'আন*, ০২:২২১

يايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنت مهجرت فامتحنوهن- الله اعلم بايمانهن- فان علمتموهن مؤمنت فلا ترجعوهن الى الكفار-لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن- واتوهم ما انفقوا- ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن- ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما انفقتم وليسئلوا ما انفقوا- ذلكم حكم الله- يحكم بينكم- والله عليم حكيم-

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করিয়া আসিলে তাহাদেরকে পরীক্ষা করিও, আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন তবে তাহাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাইও না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহা উহাদেরকে ফিরাইয়া দিও। অতঃপর তোমরা তাহাদেরকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোনো অপরাধ হইবে না যদি তোমরা তাহাদেরকে তাহাদের মাহর দাও। তোমরা কাফির নারীদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখিও না। তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ তাহা ফেরত চাইবে এবং কাফিররা ফেরত চাইবে যাহা তাহারা ব্যয় করিয়াছে। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[২৪২]

উল্লিখিত আয়াত দুটির মাধ্যমে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম নারীদের জন্য অমুসলিম পুরুষদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিয়ের অত্যাবশ্যক ধর্ম হলো একতা ও অবিচ্ছেদ্যতা। ইসলামে বিবাহ কেবলমাত্র জৈবিক প্রয়োজন মেটায় না অধিকন্তু অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, অবকাশরঞ্জক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এমনকি সংস্কৃতির মতো সামাজিক প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে সক্ষম। কোরআনে বলা হয়েছে,

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة- ان فى ذالك لايت لقوم يتفكرون-

"আর আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলির মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের সংগিনীদেরকে যাহাতে তোমরা উহাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে।"[২৪৩]

ইসলামে বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি। এ চুক্তির ভিত্তি হলো নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মতি তথা ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। স্বামী-স্ত্রী দুই ভিন্ন পরিবারে লালিত-পালিত হওয়ায় মন-মানসিকতা, আচার-ব্যবহার, আদর্শ, মেজাজ-প্রকৃতিতে উভয়ের মাঝে পার্থক্য হওয়া বিচিত্র বা অস্বাভাবিক

[২৪২] *আল-কুর'আন*, ৬০:১০
[২৪৩] *আল-কুর'আন*, ৩০:২১

নয়। তাই উভয়ের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ ও মতের অমিল দেখা দিলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে না দিয়ে পারস্পরিক মিলমিশ স্থাপনের মাধ্যমে পরিবারটিকে রক্ষা করা ও স্থায়িত্ব দিতে চেষ্টা করা মানবাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তালাকের (বিবাহ বিচ্ছেদের) ব্যাপারেও ইসলাম নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার প্রদান করেছে। কোরআনে বলা হয়েছে :

وان خفتم شقاق بينها فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها- ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما- ان الله كان عليما خبيرا-

"তাহারা উভয়ের মধ্যে (স্বামী-স্ত্রীর) বিরোধ আশংকা করিলে তোমরা তাহার পরিবার হইতে একজন ও উহার পরিবার হইতে একজন সালিস নিযুক্ত করিবে; তাহারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাহিলে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।"[২৪৪]

অমুসলিমদের বিশেষ অধিকার

ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, মুসলিম নাগরিক দ্বিতীয়ত, অমুসলিম নাগরিক। ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম নাগরিকদের বলা হয় যিম্মি যারা ইসলামের আইন মেনে জিয্ইয়া বা নিরাপত্তা কর প্রদান করে। ইসলামি রাষ্ট্র মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহ্র নির্ধারিত নীতিমালা ও অধিকারসমূহের প্রয়োগ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। ফলে ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিক রাষ্ট্রীয় ও আন্তজার্তিক পরিমণ্ডলে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো- বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া তারা মুসলমান নাগরিকদের মতোই অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, জীবনের নিরাপত্তা, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ভোগ করবে। ইসলামি আইনতত্ত্ববিদগণের ভাষায়, "মুসলিমদের জন্য (রাষ্ট্র) যে রূপ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তাদের জন্যও ঠিক একই রূপ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে। উপরন্তু, মুসলিমরা যে রূপ শাস্তি ও দণ্ডের সম্মুখীন হবে, তারাও অনুরূপ শাস্তি ও দণ্ডের সম্মুখীন হবে।"[২৪৫] ইসলামি সমাজে জীবন চলার পথে ইসলামই একমাত্র পাথেয়। ব্যষ্টিক-সমষ্টিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামই একচ্ছত্র আইনদাতা ও একমাত্র অবলম্বন হলেও মুসলিম সমাজে যিম্মিদের অধিকারও অবিচ্ছেদ্য। তাদের এ অধিকার একটি রাষ্ট্রের অংশীদারিত্বের চাহিদা। ইসলামে যিম্মিদেরকে প্রদত্ত অধিকারসমূহ কেউ সংশোধন বা বাতিল করতে পারে না। রাষ্ট্র ইসলামি শরিয়াত নির্ধারিত যিম্মিদের অধিকারসমূহ হ্রাস করতে পারে না, বরং রাষ্ট্র ইসলামি নীতিমালার সাথে অসংগতিপূর্ণ না হলে যিম্মিদের আরও

---

[২৪৪] *আল-কুর'আন*, ০৪:৩৫

[২৪৫] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল কা'সানী, *বাদায়েউস সানা'য়ে ফী তারতীবিশ শারা'য়ে*, খণ্ড-৭, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৮৬, পৃ. ২৮৮

অধিকার দিতে পারে। সুতরাং এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি রাষ্ট্রের অধিকার নির্ধারণ এবং তা সংরক্ষণের দিক থেকে মুসলমান ও অমুসলমানের মর্যাদা সমান। ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিম সকলের অধিকার ও মর্যাদা সমান হলেও মুমিনগণ যেন অমুসলিমদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে সে নির্দেশনা পবিত্র কোরআনে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

يايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصرى اولياء- بعضهم اولياء بعض- ومن يتولهم منكم فانه منهم- ان الله لا يهدى القوم الظلمين-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[২৪৬]

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের সর্বপ্রথম ন্যায্য অধিকার হলো– তারা ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ভোগ করবে। অভ্যন্তরীণ শোষণ-জুলুম, নির্যাতন-নিপীড়ন ও আন্তর্জাতিক বহিঃআক্রমণসহ সকল ধরনের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা দেবে ইসলামি রাষ্ট্র। সামরিক শক্তি ব্যয়ে হোক বা রাজনৈতিক কৌশলে হোক না কেন বহিঃশত্রু হতে নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। মুসলিম শাসক বা সরকারের ওপর এ সুবিধা প্রদান করা কর্তব্য। যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের যিম্মায় থাকতে চায় তাহলে এ যিম্মাহ অন্বেষী ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য অমুসলিমদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তাকে হস্তান্তর করা যাবে না। আর অমুসলিমদের কোনো ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে অমুসলিমকে আশ্রয় দেওয়া ও নিরাপদে তাকে পৌঁছে দেওয়া মুসলমানদের আবশ্যকীয় কর্তব্য। অমুসলিমদেরকে আশ্রয়দানের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা-

وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلم الله ثم ابلغه ما منه- ذلك بانهم قوم لا يعلمون-

"মুশরিকদের মধ্যে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহ্র বাণী শুনিতে পায় ; অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে; কারণ তাহারা অজ্ঞ লোক।"[২৪৭]

ইসলামি রাষ্ট্র মুসলমানদের জান-মাল, মান-মর্যাদা ও ইয্যত-আব্রু রক্ষণের ব্যাপারে যেমন অনঢ়, তেমনি অমুসলিম নাগরিকের জান-মাল, মান-মর্যাদা ও সম্মান-সম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারেও কঠোর, বদ্ধপরিকর।[২৪৮]

[২৪৬] *আল-কুর'আন*, ০৫:৫১
[২৪৭] *আল-কুর'আন*, ০৯:০৬

সুতরাং অমুসলিমকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, বেপরোয়া গালাগাল করা, মন্দ-ভৎসনা করা, দোষারোপ ও নিন্দা করা ক্ষমার অযোগ্য। এককথায় তার সাথে যে কোনো ধরনের মানহানিকর আচরণ করা অবৈধ ও পরিত্যাজ্য।

চুক্তিবদ্ধ যিম্মিদের সম্পর্কে শরিয়তের মৌলিক বিধান এই যে, তাদের সাথে চুক্তির শর্ত (Condition) অনুযায়ী আচরণ ও ব্যবহার করতে হবে। এ চুক্তি রক্ষা করা মুসলমানদের আবশ্যকীয় কর্তব্য। চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের সাথে চুক্তিপত্রে যেসব শর্ত নির্ধারিত হবে, তার লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং খুবই গর্হিত ও নিন্দনীয়। মুসলমানরা একবার চুক্তিবদ্ধ হলে তা ভঙ্গ করতে পারবে না বিধায় ইসলামি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী আচরণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। সরকার পরিবর্তন হলেও এই শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন : "তাদের সন্ধিপত্র অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে যা নেওয়া স্থির হয়েছে, তাদের কাছ থেকে শুধু তাই নেওয়া হবে। তাদের সাথে সম্পাদিত সন্ধির শর্ত পূরণ করা হবে। কোনো কিছু বাড়ানো হবে না।"[২৪৯] পক্ষান্তরে অমুসলিমদের জন্য ইখতিয়ার রয়েছে যে, তারা চুক্তিতে যদি কোনো সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন করতে চায় তা তারা করতে পারে অথবা চুক্তিটি তারা তাদের খুশিমতো বহাল রাখতে পারে বা যখন ইচ্ছা ভাঙ্গতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ইসলামি রাষ্ট্র যিম্মিদের ওপর কোনো নতুন শর্তাবলি আরোপ করতে পারবে না কিংবা একতরফাভাবে তা রহিতও করতে পারবে না। মহানবি (স.) ইরশাদ করেন ঃ

الا من ظلم معاهدا او كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه ثيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة-

"সাবধান! তোমাদের যে কেউ কোন যিম্মীর উপর অত্যাচার করবে, বা তার হক নষ্ট করবে, কিংবা তার সামর্থের বাইরে তাকে কষ্ট দিবে, অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে (জোরপূর্বক) তার কোন জিনিস নিবে, আমি কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।"[২৫০]

অমুসলিমরা বিচারের ক্ষেত্রেও স্বাধীন। তাদের পারিবারিক বিচার তাদের নিজস্ব আইন দ্বারা পরিচালিত। এ ক্ষেত্রে তারা ইসলামি রাষ্ট্রের অধিবাসী হওয়ার কারণে ইসলামি আইন-বিধান তাদের উপর কার্যকরী নয়। যেমন তাদের মধ্যে সাক্ষী ছাড়া বিবাহ, মোহর[২৫১] ব্যতীত বিয়ে, ইদ্দত[২৫২] চলাকালে দ্বিতীয় বিয়ে অথবা

---

[২৪৮] আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল বাসরী আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকাম আল-সুলতানীয়া*, দারুল হাদিস, কায়রো, ২০০৬, পৃ. ২২৩

[২৪৯] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩

[২৫০] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস্‌সিজিস্তানী (র), হাদিস নং- ৩০৪১, চতুর্থ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৭

[২৫১] ইসলাম বিয়ের মাধ্যমে নারীর প্রতি মহানুভবতা ও সম্মান প্রদর্শন করেছে। বিয়ে এমন একটি পবিত্র বন্ধন ও শরিয়তি চুক্তি, যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক করে পরস্পর পরস্পরকে তৃপ্তি সহকারে উপভোগ করার বৈধতা ও সন্তানের বংশ পরিচয় স্বীকৃত হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেউয়ানি অধিকার ও কর্তব্য সাব্যস্ত হয়। এ বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে অর্থ বা সম্পত্তি লাভ করেন, তা মোহর তথা দেনমোহর নামে পরিচিত। মোহরানা এজন্য আদায় করতে হয়, কারণ তা হলো স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ইয্যতের নিদর্শন। মোহরানা ছাড়া বিবাহ ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামি শরিয়তে মোহরের নির্দিষ্ট কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। প্রত্যেকের নিজ নিজ ক্ষমতার ভিত্তিতে মোহরানা নির্ধারিত হয়ে থাকে। মোহরানা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা মুস্তাহাব। তবে কেউ যদি আকদের সময় মোহরানা আদায় করতে না পারে তাহলে বিলম্বেও দেওয়া যাবে।

ইসলামে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদের সাথে বিয়ে প্রভৃতি যদি তাদের আইনে বৈধ হয়ে থাকে, তা হলে তাদের জন্য এ সব কাজ বৈধ বলে মেনে নেওয়া হবে। এ সকল পারিবারিক বিষয়গুলোতে ইসলামি আইন বা বিধান কার্যকরী নয়।

ইসলামে দেউয়ানি ও ফৌজদারি আইন মুসলিম ও অমুসলিমদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে অমুসলিমদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

ولا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم- ان الله يحب المقسطين-

"দীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করে নাই তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করিতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।"[২৫৩]

খুন-খারাবি, চুরি, ব্যভিচার এ সকল অপরাধের বিচার মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য সমান। যদি শুধুমাত্র এ সকল অপরাধে অমুসলিমরা লিপ্ত হয় তাহলে তাদের বিচার ইসলামি আইনে করা যাবে। অমুসলিমদের ধর্মমতে যে সকল কাজ তাদের ধর্ম মতে বৈধ, কিন্তু মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ, সে সকল কাজের জন্য তাদের লোকদের তাদের আইন অনুযায়ী বিচার করতে হবে। ইসলামি আইনে তাদের বিচার বৈধ নয়। যেমন মদ খাওয়া, কুকুর/ শূকরের মাংস ভক্ষণ করা বা ব্যবসা করা ইত্যাদি। অমুসলিমদের নিকট এ দুটি বস্তুর মূল্য ও বৈধতা আছে। তাই তারা মদ তৈরি করতে, পান করতে এবং নিজেদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। তবে মদের ব্যবসা তারা তাদের সমাজে করতে পারলেও মুসলিম সমাজে প্রকাশ্যে তারা করতে পারবে না।[২৫৪] তারা শূকর পালন, ভক্ষণ এবং নিজেদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। যদি কোনো মুসলমান কোনো যিম্মির মদ কিংবা শূকর নষ্ট করে তাহলে অবশ্যই তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[২৫৫]

বিবাহের সময় মোহরানা দেওয়া না হয়ে থাকলে, মৃত্যু বা তালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হবার পর স্ত্রী মোহরানা আদায় করতে পারত। বিস্তারিত দেখুন, Dr. Towqueer Alam Falahi, *op.cit*, pp. 214-215; সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিক্হুস্ সুন্নাহ্*, অনু. আকরাম ফারুক, আবদুস শহীদ নাসিম,খণ্ড-২, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৩৩-১৪৪; গাজী শামসুর রহমান, *ইসলামী আইনতত্ত্ব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৮

[২৫২] স্বামীর মৃত্যু হওয়ার কারণে বিধবা বা স্বামীর সাথে তালাক হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অন্য স্বামীকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকার সময়কালীন সময়ের নাম হল ইদ্দত। হায়েযধারী মহিলার ক্ষেত্রে তিন হায়েয, হায়েযের বয়স অতিবাহিত হলে তিন মাস, স্বামী মারা গেলে চার মাস দশদিন, যদি গর্ভবতী না হয়, আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত সময়কাল হলো ইদ্দতের সময়। এ সময় পর্যন্ত অন্য স্বামীকে বিয়ে করা যাবে না। তবে স্বামী-স্ত্রী বিবাহ হওয়ার পর যদি তারা যৌন মিলনে মিলিত না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে ঐ মহিলাকে ইদ্দত পালন করা লাগবে না। সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিক্হুস্ সুন্নাহ্*, খ-২, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৩-২৭২

[২৫৩] *আল-কুর'আন*, ৬০:০৮

[২৫৪] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল কা'সানী, খণ্ড-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১১৩

[২৫৫] শামসুদ্দীন আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খণ্ড-৫, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, পৃ. ৪৩

অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব মহল্লা ও বসতিতে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও জাতীয় উৎসবাদি পালন করার ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। তাদের জন্য নির্ধারিত এলাকার মধ্যে পুরাতন উপাসনালয়গুলোর সংরক্ষণ ও সংস্কারের পাশাপাশি নতুন উপাসনালয়ও তৈরি করতে কোনো রকমের বাধা নিষেধ ইসলামে নেই। তবে মুসলিম জনপদের অভ্যন্তরে তাদের বসবাস হলে তারা এক্ষেত্রে নতুন উপাসনালয় তৈরি করতে পারবে না এবং প্রকাশ্যে ঢাক-ঢোল পিঠিয়ে ধর্ম-কর্ম পালন করলে সরকার তাতে কঠোরতা আরোপ করতে পারবে। অবশ্য তাদের উপাসনালয়ে সব সময়েই পূজাপার্বণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি পালনের ক্ষেত্রে তাদের অনুমতি দেওয়া যাবে। তবে মুসলিম জনপদের তাদের প্রাচীন উপাসনালয় থাকলে তাতে হস্তক্ষেপ তো দূরের কথা বরং যদি তা ভেঙ্গে যায়, তাহলে একই জায়গায় তা পুনঃনির্মাণের অধিকার রয়েছে।[২৫৬]

মুসলমানদের মত সংখ্যালঘুদেরও সরকারি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হবার অধিকার আছে তবে যে সব বিষয়ে ধর্মীয় দিকটির প্রাধান্য থাকবে সে সব পদে নয়। যেমন– ইমামত, রাষ্ট্রপ্রধানের পদ, সেনাপ্রধানের পদ, মুসলমানদের আদালতে বিচারকের পদ, সাদাকা[২৫৭] বিতরণের দায়িত্ব।

বস্তুত ইসলাম যিম্মিদের যে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে তা সকল বিবেচনাতেই মানবাধিকার সমুন্নত রাখার এক অবিস্মরণীয় দলিল। এ অধিকার ও মর্যাদা ইসলামি নীতির আলোকে বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু হ্রাস করা যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, উপরে উল্লিখিত মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কে মানুষের জন্যে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম যে ঘোষণা দিয়েছে, তা সার্বজনীন, শাশ্বত ও চিরন্তন। ইসলামের আদর্শ হলো সকল জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণিগত এবং অর্থনৈতিক অবস্থার কৃত্রিম ব্যবধানগুলোর মূলোচ্ছেদ করা এবং স্থাপন করা সর্বজনগ্রাহ্য সকলের জন্য মানবাধিকারভিত্তিক একটি আদর্শ জীবনধারা। মহান আল্লাহর বাণী পবিত্র কোরআন এবং মহানবি (স.) এর পবিত্র হাদিস ইসলাম যেসব মানবাধিকার মানুষের জন্য নিশ্চিত করেছে তার নজির সভ্যতাগর্বী আজকের বিশ্বের কোনো আদর্শে বা রাষ্ট্রে এমনকি অন্য কোনো ধর্মেও খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলামে মৌলিক মানবাধিকারের সংজ্ঞা, সীমারেখা, পরিধি ও ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল, ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবাধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। ইসলাম সাম্যের

[২৫৬] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল কা'সানী, *বাদাই*, খণ্ড-৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

[২৫৭] আল কুরআনে সাদাকা শব্দটি যাকাতের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। তবে যাকাত হলো আবশ্যকীয় পালনীয় কর্তব্য আর সাদাকা হলো ঐচ্ছিক । সাদাকা দ্বারা আত্মার পরিচর্যা ও পবিত্রতা সূচিত হয় এবং তা ধন-সম্পদও পবিত্র করে। সাদাকা ব্যক্তিগত দান বিধায় তা আদায় করা সম্পূর্ণ ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের তার নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, অসহায় পথিক কিংবা আকস্মিক বিপদগ্রস্ত লোকদেরকে গোপনে বা প্রকাশ্যে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এ রকম দান-সাদাকা করা যাবে না। আল্লাহর প্রতি ভালবাসার নিমিত্তেই সাদাকা প্রদান করা হয়। পবিত্র কালামুল্লাহ শরিফে সাদাকাকে আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার স্বরূপ উল্লেখ করে পরকালে তার যথার্থ প্রতিদান দেওয়ার নিশ্চয়তা আল্লাহ তায়ালা প্রদান করেন। মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৬; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩০২

ধর্ম। ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্যক্তি ও জনগণের সম্পত্তির নিরাপত্তা প্রদানসহ ইসলাম প্রতিটি নাগরিকের একটি নিরপেক্ষ, অবাধ ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থার অধীনে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের সর্বোচ্চ আদর্শ মানবজাতির সামনে সুস্পষ্ট তুলে ধরে আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের সব ধরনের মানবাধিকার বিরোধী প্রথার বিলোপ সাধন করেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি মানবরচিত বিধান যতই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হোক না কেন, মানবিক সীমাবদ্ধতার কারণেই তা কখনো নির্ভুল ও চিরন্তন হতে পারে না বলেই বর্তমান অশান্তিপূর্ণ, হিংসা-বিদ্বেষ-বিভেদ ও সংঘর্ষপূর্ণ পৃথিবীতে ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার বিষয়ক জীবনব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি, কল্যাণ ও সুষম মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়

অমুসলিমদের নাগরিকত্বলাভ ও বাতিল সম্পর্কিত নীতিমালা

ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয় জীবনব্যবস্থাও- যা মানুষের মাঝে মানবতাবোধকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছে। ইসলাম ভাষা ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ ও পার্থক্য করে না। এক সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং এক আদমের উত্তরসূরী হিসেবে ইসলাম সার্বজনীন মানবতাবাদে বিশ্বাসী। আর এজন্যই মুসলিম ও অমুসলিম নিজেদের অধিকারের সীমারেখার মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার পক্ষে। রাসূলুল্লাহ (স.) ও খোলাফায়ে রাশিদুনের আমলে (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। এসময় রাষ্ট্র যেমন তাদের জীবন, ধন-সম্পদ, ইযযাত-আব্রু রক্ষায় ভূমিকা রেখেছে, তেমনি তাদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনেরও ব্যবস্থা করেছে। এ সময় রাষ্ট্র অমুসলিমদের নিজস্ব আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। তবে পরবর্তীতে উমাইয়া খিলাফত আমলে (৬৬১-৭৫০খ্রি.) অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় ইসলামি রাষ্ট্রের ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়। উমাইয়া খলিফাদের ইসলামি আদর্শ থেকে বিচ্যুতি এবং তাদের পার্থিব জীবনের প্রতি বিশেষ মোহ ইত্যাদি কারণে ইসলামি অনুশাসন ও রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থা উপেক্ষিত হয়। উমাইয়া খলিফাগণ ইসলামি রাষ্ট্রে বিধি ব্যবস্থা উপেক্ষা করে অনারব মুসলিম নাগরিকদের ব্যাপারেই রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্যমূলক বিধিবিধান কার্যকর করেন। এমতাবস্থায় অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিও যে তারা সুবিচার করেন নি তা বলার অবকাশ রাখে না। তবে উমাইয়াদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (৭১৭-৭২০ খ্রি.)। ইসলামি অনুশাসনের একনিষ্ঠ প্রতিপালনকারী হিসেবে তিনি অমুসলিম নাগরিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার চেষ্টা করেন। আব্বাসীয় আমলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) এ ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আসে। আব্বাসীয় শাসনের গোড়াপত্তনে অমুসলিমদের বেশ ভূমিকা ছিল। শেষ দিকের উমাইয়া অপশাসনে ক্লিষ্ট অমুসলিমরা স্বভাবতই আব্বাসীয়দের ক্ষমতা গ্রহণের পথকে যথাসম্ভব মসৃণ করে তুলেছিল। কিন্তু অমুসলিমদের সামাজিক অধিকারলাভের ক্ষেত্রে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। উমাইয়াদের মতো আব্বসীয়রাও ধর্মের আদর্শিক নীতি উপেক্ষা করে অমুসলিমদের নানা শ্রেণিবিভাগে বিভক্ত করে রাখে। খিলাফত শাসনামলে (৬৩২-১২৫৮ খ্রি.) রাষ্ট্রে এই অমুসলিম সমাজ, তাদের শ্রেণিবিভাগ এবং নাগরিকত্বলাভের পদ্ধতি ও উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

অমুসলিমদের শ্রেণিবিভাগ

অবস্থানগত দিক বিবেচনা করে খিলাফত যুগে অমুসলিম সমাজকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা: (ক) আহলুয যিম্মাহ, (খ) মু'আহাদ, (গ) মুস্তা'মান এবং (ঘ) হারবি।

ক. আহলুয যিম্মাহ

খিলাফত যুগে রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিকদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে ‘আহলে যিম্মাহ’ বা ‘যিম্মি’[১] শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। ‘যিম্মিদের’ কে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় ইসলামি দেশের অধিবাসী,[২] এবং আধুনিক পরিভাষায় ইসলামি নাগরিকত্বের বাহক বলা যায়।[৩] চলমান রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব (Citizenship) প্রাপ্তির কারণে মুসলিমদের মতো তারাও রাষ্ট্রের সকল নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। তাদের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান ঠিক মুসলিম নাগরিকদের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মানের মতোই মূল্যবান ও পবিত্র বলে বিবেচিত হতো।

অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ‘যিম্মি’ শব্দ ব্যবহার করা হয় বলে অনেকেই ‘যিম্মি’ শব্দটিকে নেতিবাচক বলে মনে করেন। অথচ ‘যিম্মা’ শব্দটির অর্থ হলো এমন চুক্তি, ঈমানদার মুসলিম যার মর্যাদা দিতে স্বীকৃত হন।[৪] মুসলমান এ চুক্তি লঙ্ঘন করতে পারে না। আবার কেউ কেউ একে উপমহাদেশে প্রচলিত শুদ্র বা ম্লেচ্ছের সমার্থক বলেও প্রচার করে, যেভাবে বাংলা সাহিত্যে যবন ও ম্লেচ্ছ শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এরূপ ধারণার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বস্তুত শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা ইচ্ছাপ্রসূত কারণেই এরূপ মনে করা হয়ে থাকে। যিম্মি শব্দটি কোনো মর্যাদাহানিকর শব্দ নয়। আরবি ভাষায় ‘যিম্মাহ’ শব্দটি দায়িত্বভার, সুরক্ষা, নিরাপত্তা দান, প্রতিশ্রুতি দান ও অধিকার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূলত এর দ্বারা এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝানো হয় যারা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে এবং তাদেরকে বিশ্বাস করা হয়েছে। তারা একটি স্থায়ী চুক্তিপত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রধান ও মুসলিমগণের কাছ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। যিম্মী বলতে বুঝায়,

الذمي: المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله وعرضه و دينه-

“যিম্মি হলো এমন অমুসলিম চুক্তিবদ্ধ নাগরিক যার সাথে তার ধর্ম, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তার ব্যাপারে চুক্তি করা হয়েছে।”[৫]

ড. আবদুল করিম যায়দান যিম্মির সংজ্ঞা প্রদানে বলেন,

والأصل في أهل دار الإسلام ان يكونوا مسلمين، ولكن قد يكون من سكانها غير المسلمين وهم ذميون-

---

[১] যিম্মি হচ্ছে أهل الذمة هم الكفار الذين أقروا في دار الاسلام على كفرهم بالتزام الجزية و نفود احكام الاسلام فيهم. , অর্থাৎ জিয্ইয়া আদায় ও ইসলামের (রাষ্ট্রীয়) বিধি-বিধান মেনে নেওয়ার শর্তে ইসলামি রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিমকে নিজ নিজ ধর্মের ওপর অবস্থান করতে দেওয়া হয়, তাদেরকে যিম্মি বলা হয়। যিম্মি চুক্তি কোনো সাময়িক চুক্তি নয়। এ চুক্তির ফলে তারা নিজ নিজ ধর্মমত স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে । রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব প্রাপ্তির কারণে অন্যান্য নাগরিকের মতো সব ধরনের সুযোগসুবিধা লাভ করবে। এ চুক্তির ফলে মুসলিম-অমুসলিম উভয়পক্ষের উপর নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়। বিস্তারিত দেখুন, *আল-মাওসু‘আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬, খ.৭, পৃ. ১০৪

[২] শামসুদ্দীন আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খণ্ড-১০, দারুল মা’রিফা, বৈরুত, পৃ. ৮১-৮২

[৩] ড. আবদুল করিম যায়দান, *আহকাম আল যিম্মীইন ওয়াল মুস্তামিনিন ফি দার আল-ইসলাম*, মুয়াস্‌সাসাত আল রিসালা, বৈরুত, ১৯৮২, পৃ. ৬৩

[৪] মজিদ কাদ্‌দুরী, অনু: অধ্যাপক হাসান জামান, *ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১২৬

[৫] *আল-মু’জামুল ওয়াসীত*, (আরবী), মাকতাবাতু সুরুক আদ-দাওলিয়্যাহ, মিসর, ২০০৪, পৃ. ৩১৫

“মূলত ইসলামি রাষ্ট্রের অধিবাসীরা হবে মুসলিম কিন্তু তারা যদি অমুসলিম হয়, তাহলে এ অমুসলিম অধিবাসীরাই হবে যিম্মি।”[৬] ইসলামের পার্থিব আইন-কানুন মেনে নেওয়া এবং জিয্‌ইয়া আদায় করার মাধ্যমে তারা তাদের জীবন, সম্মান ও সম্পত্তির নিরাপত্তা লাভ করে বলে তাদেরকে আহ্‌লুয যিম্মাহ বা যিম্মি বলা হয়।”[৭] মূলত যিম্মি বলা হয় ঐ সকল অমুসলিম এলাকার লোকদেরকে যারা মুসলমানদের নিকট পরাজয় বরণ করেছে।[৮] তবে উল্লেখ্য যে, পবিত্র কোরআনের নির্দেশ অনুসারে কেবল ‘People of the Book’ বা আহল আল কিতাবগণই আহল আল-যিম্মাহর যোগ্য বলে বিবেচিত হতো।[৯] মহানবি (স.) আরবের ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সাথে নিরাপত্তামূলক চুক্তি সম্পাদন করেন। তাদের বলা হতো “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত” বা সংক্ষেপে আহল আল যিম্মাহ বা যিম্মি। পরবর্তীকালে ইসলামের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের জেরোথুস্ট্রীয়ান, ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধদের, হাররানের মূর্তিপূজক এবং উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের প্রতি যিম্মির মর্যাদা সম্প্রসারিত করা হয়।[১০] ইসলামি রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকল মানুষের মাঝে সমতা নির্ধারণ করা আবশ্যক। রাষ্ট্রের জনগণের মাঝে ন্যায়বিচার ও সাম্যের অভাব থাকলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ফলে রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপনের জন্য সাদা-কালো, ধনী-গরিব, মালিক-দাস, ভালো-মন্দ, সভ্য-অসভ্যসহ সকল মানুষের মাঝে ইসলাম সমতা নিশ্চিত করেছে।[১১] মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে সমতা, ন্যায়বিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলাম মহাবিপ্লব সাধন করেছে। মানবতার মাঝে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা, অন্যায়, অশান্তি সৃষ্টি না করে সবার মাঝে সমতা, ন্যায়বিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়ে মহান আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

ان الله يأمركم أن تؤدا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالدل-

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।”[১২] আইনের বিচারে দেখা যায় যে, ‘যিম্মা’ বলতে একটি বিশেষ অবস্থা বুঝায়। এ অবস্থা লাভ করলে ব্যক্তি কতকগুলো অধিকার লাভ করেন, যেগুলো রাষ্ট্রকর্তৃক সংরক্ষিত হয়। এ অধিকারের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাসহ যিম্মিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আমান বা নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।[১৩] ইসলাম সমতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কে মুসলিম

---

[৬] ড. আবদুল করিম যায়দান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

[৭] Jurji Zayadan, *History of Islamic Civilization Umayyads and Abbasids,* Tr. D.S. Margoliouth, Kitab Bhavan, New Delhi, 2006, p. 120

[৮] Allama Yusuf Alqarzavi, Abu Masud Azhar Nadvi, *Islam Muslims & non Muslims,* Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2010, pp. 7-8

[৯] কুর'আন অনুসারে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং সাবীয়ানগণ আহল আল-কিতাব। আল-কুর'আন : ২:৫৯, ৫:৭৩ এবং ২২:১৭

[১০] Reuben Levy, *The Social Structure of Islam,* Cambridge University Press, London, 1969 pp. 66-67; W. M. Watt; *Islam and the Integration of Society,* London, 1961, p. 150

[১১] Dr. Mehboob Desai, *Islam and Non-violence,* Gyan Publishing House, New Delhi, 2009, pp. 75-76

[১২] *আল-কুর'আন*, ০৪:৫৮

[১৩] মজিদ কাদ্দুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬

আর কে যিম্মি এ পার্থক্য করে নি। 'যিম্মি' শব্দটি ব্যবহার বা প্রয়োগ করার আর একটি সুন্দর উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায় খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক নাজরানবাসীদেরকে লেখা একটি চিঠিতে :

> শুরু করছি পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নামে। এ চিঠি নবি ও রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর খলিফা বান্দা আবু বকরের পক্ষ হতে। তিনি আপনাকে আপনার সম্পত্তি, আপনার ধর্মীয় গোত্র, আপনার সম্পদ, আপনার মালিকানাধীন চাকর ও পোষ্য, যারা আপনার কাছে অথবা দূরে আছে, আপনাদের যাজক, সন্ন্যাসী/ ভিক্ষু এবং আশ্রম, এছাড়া ছোট-বড় অন্য যা কিছুর আপনারা অধিকারী সেসব ব্যাপারে একজন প্রতিবেশী হিসাবে নিরাপত্তার অঙ্গীকার করছি। এসবের কোনো কিছুর ব্যাপারেই আপনার অধিকার হরণ করা হবে না এবং সবকিছুর উপর আপনার কর্তৃত্ব বজায় থাকবে।[১৪]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দেশ, গোত্র, বর্ণ, মর্যাদা নির্বিশেষে সকলে ইসলামের ছায়াতলে থেকে যে মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করেছে তা অন্য কোনো ধর্মে কখনও কেউ লাভ করে নি। মুসলিম রাষ্ট্রের আইনসভাও তাদের অধিকারসমূহ ছিনিয়ে নেওয়ার আদৌ কোনো অধিকার রাখে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

من اذى ذميا فانا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة-

"যে ব্যক্তি যিম্মিকে কষ্ট দেবে আমি তার প্রতিপক্ষ হবো। আর আমি যার প্রতিপক্ষ হবো, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে ঝগড়া করব।"[১৫]

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে যে কোনো অভিযানের নেতৃত্ব প্রদানকারী সেনাবাহিনীর প্রধানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয় আহলুয যিম্মাহ বা চুক্তিবদ্ধ লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য। শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট একটি অভিযানে এ নির্দেশনা প্রদান করা হয় নি। সকল অভিযানের ক্ষেত্রে এ নির্দেশনা প্রদান করা হয়।[১৬] আর এ নির্দেশনা প্রদান করা হয় এ জন্য যে, আমরা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ। যাদের সাথে যুদ্ধ হতো যুদ্ধ চলাকালে সেনানায়কদের অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি অসদাচরণ না করতে নির্দেশ দিতেন।

খ. মু'আহাদ

মু'আহাদ শব্দের অর্থ চুক্তিবদ্ধ। দারুল হারবের[১৭] চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমরা হলো মু'আহাদ। ইসলামি পরিভাষায় মু'আহাদ বলতে বুঝায়,

---

[১৪] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *কিতাবুল খারাজ* (আরবি), দারুল মারেফা, লেবানন, বৈরুত, ১৯৭৯, পৃ. ৭৯

[১৫] মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী, *আল জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু*, হাদিস নং- ৫৩১৪, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৮, পৃ. ৭৬৭

[১৬] Jurji Zayadan, *op. cit*, p. 120

[১৭] দারুল হারব' বলতে এমন অমুসলিম রাষ্ট্রকে বুঝানো হয়, যার সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের সাময়িক বা স্থায়িভাবে কোনরূপ শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় নি এবং যেখানে প্রকাশ্যে অনৈসলামিক বিধিবিধান চালু রয়েছে। দারুল হারবে অবস্থানকারীদেরই হারবি বলা হয়। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের বাহিরে যে কোনো দেশের লোকই হারবি নামে পরিচিত। দারুল হারবের বাসিন্দা কিতাবি বা মুশরিক উভয়ই থাকতে পারেন। দারুল হারব বা অমুসলিম ভূখণ্ডে মুসলমানগণ তাদের নিজস্ব বিধি-বিধান পালন করতে পারে না। বিস্তারিত দেখুন, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খণ্ড-২০, পৃ. ২১৭; মজিদ কাদ্দুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫, ১২১

هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يراها-

সাময়িকভাবে যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলিমদেরকে আহলুল আহাদ বা মু'আহাদুন বলা হয়।[১৮] মু'আহাদ বলতে বুঝায় এমন রাষ্ট্রগুলোকে যাদের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম নয় কিন্তু তারা ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে অথবা নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের চুক্তিতে আবদ্ধ।[১৯] যারা যুদ্ধ ছাড়া বা যুদ্ধ চলমান অবস্থায় বশ্যতা স্বীকার করে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি স্থির করে রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ বা সন্ধিবদ্ধ হয় তাদের জন্য ইসলামের বিধান এই যে, তাদের সাথে সকল আচরণ চুক্তির শর্তানুযায়ী করা হবে। মূলত মু'আহাদ হলো সে সমস্ত এলাকার অমুসলিমগণ যাদের সাথে শান্তিচুক্তি হয়েছে কোনো রকম যুদ্ধ ছাড়া। মু'আহাদ ও আহলে যিম্মার উভয় শ্রেণির লোকদেরকে যিম্মি বা আহলে যিম্মা বলা হয়। তাদের উভয়ের অধিকার একই। মু'আহাদ ও যিম্মিদের অধিকার কখনোও পরিবর্তনশীল নয়।[২০] কিন্তু মু'আহাদদের সাথে চুক্তির শর্তসমূহ ততদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারা চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করবে। সন্ধিপত্রে যেসব শর্ত নির্ধারিত হবে, তাতে কোনো রকম কমবেশি করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল কোরআনে বলা হয়েছে-

فما استقاموا لكم فاستقموا لهم- ان الله يحب المتقين-

"যে পর্যন্ত তাহারা তোমাদের জন্য চুক্তিতে স্থির থাকিবে তোমরাও তাহাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পসন্দ করেন।"[২১]

তাদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করতে হবে। তাদের সাথে তর্কযুদ্ধে জড়ানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে তাদের সাথে বিতর্ক করলে উত্তম পন্থা অবলম্বন করে বিতর্ক করার জন্য পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা। ইরশাদ হচ্ছে :

ولا تجادلوا اهل الكتب الا بالتى هى احسن- الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذى انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون-

"তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সঙ্গে বিতর্ক করিবে না, তবে তাহাদের সঙ্গে করিতে পার, যাহারা উহাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।"[২২]

---

[১৮] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, পূর্বোক্ত*, খণ্ড-৭, পৃ. ১০৫
[১৯] S. A. Siddiqi, *Public Finance in Islam,* Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2007, p. 1
[২০]Allama Yusuf Alqarzavi, Abu Masud Azhar Nadvi, *op.cit*, p. 8
[২১] *আল-কুর'আন*, ০৯:০৭
[২২] *আল-কুর'আন*, ২৯:৪৬

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم باموالهم دون أنفسهم وابنائهم قال سعيد في حديثه فيصالحونكم على صلح ثم اتفقا فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذالك فانه لا يصلح لكم-

"সম্ভবত তোমরা এমন এক কওমের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের উপর তোমরা বিজয়ী হওয়ার পর তারা তোমাদের কিছু মাল দিয়ে নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের রক্ষা করবে। রাবী সাঈদ (র.) তাঁর বর্ণিত হাদীছে এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, তারা (কিছু মালের বিনিময়ে) তোমাদের সংঙ্গে সন্ধি করবে। এরপর উভয় রাবী ঐকমত্যে এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ তোমরা তাদের নিকট হতে এর অধিক মাল গ্রহণ করবে না। কেননা, তা তোমাদের জন্য বৈধ নয়।"[২৩]

উপরে িল্লেখিত কোরআনের আয়াত ও হাদিসগুলোর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের সাথে চুক্তিপত্রে যেসব শর্ত নির্ধারিত হবে, তার লঙ্ঘন খুবই গর্হিত ও নিন্দনীয়। চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী আচরণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। চুক্তি করার জন্য যারা আসবে, তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের নিকট থেকে জিয্‌ইয়া আদায় করার মাধ্যমে তাদের সকল নাগরিক নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে চুক্তির শর্তানুযায়ী। অমুসলিমদের সাথে রাষ্ট্রের চুক্তি সম্পাদিত হলে রাষ্ট্রের সকল মুসলিম নাগরিকগণ তাদের নিরাপত্তা দিবেন।[২৪] শুধুমাত্র চুক্তিবদ্ধ নাগরিকই নয়, রাষ্ট্রের যে কোনো নাগরিক মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক রাষ্ট্রকর্তৃক আরোপিত সকল অধিকারে সমান অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের যে কোনো সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে কোনো নাগরিক অভিযোগ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তার পদবি বিবেচ্য নয়। একদা হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতের সময় খলিফা সম্পর্কে রাষ্ট্রের একজন নাগরিক কথা বলা শুরু করলে একজন অফিসার তাকে থামিয়ে দেন এবং বলেন খলিফার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলো না। তখন খলিফা উমর (রা.) উক্ত অফিসারকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তাকে কথা বলতে দাও। যদি সে ভয়হীনভাবে কথা বলতে না পারে তাহলে সে রাষ্ট্রের প্রকৃত নাগরিক নয় আর আমি যদি তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে না শুনি তাহলে আমি প্রকৃত খলিফা নই।[২৫] রাষ্ট্রের যে কোনো নাগরিক সে চুক্তিবদ্ধ হোক অথবা চুক্তিবদ্ধ ছাড়া হোক যদি সে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে তাহলে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তার অধিকার সমান। নাগরিকদের যেসব অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে ইসলাম অনঢ় ও কঠোর, সে সবের শীর্ষে হলো তাদের স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য। আর স্বাধীনতার প্রধান দিকটি হলো বিশ্বাস, উপাসনা ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। এক্ষেত্রে ইসলামের মনোভঙ্গি হলো- ধর্ম যার যার। ফলে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায়

---

[২৩] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস্‌সিজিস্তানী (র), অনু. ডঃ আ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক, *আবূ দাউদ শরীফ*, হাদিস নং- ৩০৪০, চতুর্থ খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২২৬-২২৭

[২৪] Jurji Zayadan, *op.cit* p. 120

[২৫] Dr. Mehboob Desai, o*p.cit*, pp. 98-99

কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তাছাড়া তাদের ওপর কর খাজনাও বাড়ানো যাবে না। তাদের জমিজমাও দখল করা যাবে না, তাদের ঘরবাড়ি, দালান-কোঠাও কেড়ে নেওয়া যাবে না, যা যুলুম, অধিকারহরণ, সামর্থ্যের মাত্রাতিরিক্ত বোঝা চাপানো অথবা সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পদ হস্তগত করার পর্যায়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন: "তাদের সন্ধিপত্র অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে যা নেওয়া স্থির হয়েছে, তাদের কাছ থেকে শুধু তাই নেওয়া হবে। তাদের সাথে সম্পাদিত সন্ধির শর্ত পূরণ করা হবে। কোনো কিছু বাড়ানো হবে না।"[২৬]

চুক্তি সম্পাদনের সময় শত্রুপক্ষকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার জন্য উদার ও সহজ শর্ত দিয়ে কার্য হাসিল করে পরবর্তীতে চুক্তি বহির্ভূত ভিন্ন ধরনের আচরণ ইসলামে মহাপাপ হিসাবে স্বীকৃত। সুতরাং চুক্তি করার সময়ই সকল বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে করতে হবে। অবশ্য শত্রুপক্ষের আক্রমণ আসন্ন হয়ে পড়লে বা তারা চুক্তি অমান্য করলে বা চুক্তিটি নাকচ করে দিলে মুসলিম রাষ্ট্রের চুক্তির ধারাগুলো যথাযথভাবে পালনের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এ অবস্থায় রাষ্ট্র চুক্তির পরিসমাপ্তিও ঘটাতে পারে এবং তা চুক্তিবদ্ধদের জানিয়ে দিতে পারে। কেননা মেয়াদের শেষ দিন অবধি চুক্তিটি পালন করার জন্য কোরআনের নির্দেশ রয়েছে।"[২৭]

গ. মুস্তা'মান

মুস্তামান অর্থ যে আত্মরক্ষা চায় বা নিরাপত্তা আশ্রিত। পরিভাষায় মুস্তা'মান হলো,

هو الكافر يدخل دار الإسلام بأمان-

"মুস্তা'মান হলো ইসলামি রাষ্ট্রে সাময়িক সুবিধাপ্রাপ্ত অমুসলিম শ্রেণি- যারা বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে সাময়িক সময়ের জন্য মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করে।"[২৮] মুস্তা'মান হলো যে অমুসলিম সাময়িকভাবে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা কোনো মুসলিম নাগরিকের নিরাপত্তায় থাকে। এক্ষেত্রে যিম্মি আর মুস্তা'মানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর সেটি হলো- যিম্মি হলো ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক।[২৯] মুস্তামান নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য। অবশ্য দারুল আমানের অধিবাসীগণও মুস্তামিন হিসেবে পরিচিত। দারুল আমান বলতে ঐ অঞ্চলকে বুঝানো হয় যার সাথে মুসলমানদের শান্তি চুক্তি রয়েছে।[৩০] অগ্রিম অনুমতি ব্যতীত অমুসলিম বিদেশিকে আমান বা বাস করার অনুমতি দেওয়া হতো না। অমুসলিম বিদেশি ইসলামি রাষ্ট্রে এসে নাগরিকত্বের আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ তার আবেদন মঞ্জুর করতে পারে। অমুসলিম বিদেশিকে আমান বা বাস করার অনুমতি ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, তাঁর প্রতিনিধি, যে কোনো মুসলিম নাগরিক, এমন কি ক্রীতদাস কিংবা স্ত্রীলোকও দিতে পারে। অমুসলিম বিদেশিকে আমান বা বাস

---

[২৬] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩

[২৭] *আল-কুরআন*, ৯:৪

[২৮] আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড-০৭, পৃ. ১০৫

[২৯] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, (আরবী), *পূর্বোক্ত*,পৃ. ৩১৫

[৩০]Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, Cosimo Classics, New York, 2010, pp. 214-215

করার অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইসলামি রাষ্ট্রের কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে অনুমতি প্রদান করা হতো। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে প্রতিটি মুসলিম নাগরিকের অমুসলিম বিদেশিকে আমান বা বাস করার অনুমতি দেওয়ার অধিকার থাকলেও রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থি হলে মুসলিম প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সে অনুমতি বাতিল করার অধিকার ছিল।[৩১] চার শ্রেণির লোককে মুস্তা'মান হিসেবে গ্রহণ করার রীতি ছিল। যথাঃ ১. দারুল হারবের দূত বা বাহক, ২. ব্যবসায়ী, ৩. আশ্রয়প্রার্থী এবং ৪. দর্শণার্থী, পর্যটক, ছাত্র এবং অন্য যে কোনো প্রয়োজনে আগত অমুসলিম। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুস্তামিন যদি গুপ্তচরবৃত্তি করে, তাহলে সে তার নিরাপত্তা হারাবে।

মুসলিম আইনে কেবল মুসলমানেরাই পূর্ণ আইনগত অধিকার ভোগ করে। অনুমতি সাপেক্ষে মুসলিম রাষ্ট্রে আগত অমুসলিমগণও রাষ্ট্রের নিকট হতে কতকগুলো আইনগত অধিকার ভোগ করতে পারতেন। মুসলিম রাষ্ট্রের নীতি অনুযায়ী যে সমস্ত বিদেশি অনুমতি সাপেক্ষে ইসলামি রাষ্ট্রে প্রবেশ করে, ততদিন তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা এবং তাদেরকে রক্ষা করা ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আবশ্যিক কর্তব্য।[৩২] অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশকারী অমুসলিমগণ যতদিন পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করবে ততদিন পর্যন্ত তারা যিম্মি নাগরিকদের ন্যায় সমমর্যাদার অধিকারী হবেন।[৩৩] বিদেশি নাগরিক মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানকালে ইসলামি আদালতের অধীনে থাকবে। মুসলিমদের জন্য যে সকল নিয়ম-কানুন আছে সে সকল নিয়ম-কানুন সে যথাযথভাবে যতদিন ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করবে ততদিন পালন করতে বাধ্য। তবে মদ পান করার ক্ষেত্রে তাকে কোনো বাধা দেওয়া যাবে না। যদিও মদ পান ইসলামি আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ।[৩৪] তারা সেই সব অধিকারই ভোগ করতেন যা মুসলিম রাষ্ট্রের অন্য অমুসলিম নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। খিলাফত যুগের শুরুতে একজন মুস্তা'মান মুসলিম রাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত থাকতে পারত, যা সর্বোচ্চ এক বছরের বেশি নয়। এক বছরের বেশি সময় থাকতে হলে তাকে স্থায়ী অমুসলিম নাগরিকের মতো একই রাজস্ব দিতে হতো এবং অন্যান্য বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করতে হতো।[৩৫] ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসের ক্ষেত্রে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিষ্যগণের শত্রুদের প্রতি নির্দেশনার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের ভাষ্য আমীর আলী তাঁর গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেন,

> Cease all hostility to us, and be our allies, and we shall be faithful to you; or pay trubute, and we will secure and protect you in all your rights; or adopt our religion, and you shall enjoy every privilege we ourselves possess.[36]

---

[৩১] Muhammad Hamidullah, *Muslim conduct of State,* SH. Muhammad Ashraf, Lahore, 1977, pp. 317-318

[৩২] মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস সরখসী, *শরহে সিয়ারুল কাবীর*, খণ্ড-৫, দারুল কুতবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৭, পৃ. ১১০

[৩৩] সরখসী, *সিয়ারুল কবীর*, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ১৩৩; মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস সরখসী, খণ্ড-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৫

[৩৪] মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস সরখসী, খণ্ড-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১০

[৩৫] Muhammad Hamidullah, *op.cit,* p. 318

[৩৬] Syed Ameer Ali, *op.cit,* p. 215

রাসূল (স.) বলেন,

ذمة المسلمين واحدة يسعى بها اذانهم فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين-

“সকল মুসলমানদের নিরাপত্তা একই পর্যায়ের। একজন নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিও এ নিরাপত্তা দান করতে পারবে। যদি কোনো ব্যক্তি অপর একজন মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তাকে লংঘন করে, তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা ও সকল মানুষের লা'নাত পতিত হবে।[৩৭]

কোনো অমুসলিম যখন মুস্তা'মিন হিসাবে গণ্য হয়, তখন তার সঙ্গে তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মা, দাদি, নানি, গৃহপরিচারক ও পরিচারিকাগণ এবং ধন-সম্পদ নিয়ে আসতে অনুমতি দেওয়া হয়। মুস্তা'মিনকে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদিকে সম্মানের চোখে দেখতে হবে এবং সে এমন কিছু বলবে না বা করবে না যাতে ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পেতে পারে। তার কার্যক্রমে ইসলামের স্বার্থ যাতে বিপন্ন না হয়, সে সম্পর্কেও তাকে সতর্ক হতে হবে।[৩৮] তবে রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকের জন্য কোনো মুস্তা'মানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা, তাকে হত্যা করা কিংবা তার জানমাল, স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার, অন্যান্য অধিকার ও ইযযাত-আবরুর প্রতি কোনো প্রকার আক্রমণ করার সুযোগ নেই।[৩৯] নিরাপদ আশ্রয় লাভের কারণে মুস্তামিনদের সম্পদ নিরাপত্তা লাভ করবে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه-

“আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়; অত:পর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে। কারণ তারা অজ্ঞ লোক।”[৪০] একে ফকিহগণ এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন : আশ্রয়দান অর্থে তাদের বিরোধিতা থেকে বিরত রাখা (অর্থাৎ যুদ্ধমানপক্ষের কথা বলা হচ্ছে) আল্লাহর নামে তাদেরকে হত্যা বা বন্দি না করা। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন–

ايما رجل امن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريئ من القاتل وان كان المقتول كافرا-

“যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে নিরাপত্তা প্রদান করার পর তাকে হত্যা করে, নিহত ব্যক্তি কাফির হলেও আমি এ হত্যাকারীর ব্যাপারে সম্পূর্ণ যিম্মামুক্ত।”[৪১]

---

[৩৭] ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বুখারী শরীফ*, হাদিস নং- ৬৮০২, দশম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৫২৭

[৩৮] মজিদ কাদ্‌দুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৭-১১৮

[৩৯] মুহাম্মদ আমীন ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খণ্ড-৬, দারু আলামিল কুতুব, রিয়াদ, ২০০৩, পৃ. ২৯৬

[৪০] *আল-কুরআন*, ৯:৬

[৪১] মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী, *সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, তৃতীয় খণ্ড, হাদিস নং- ৩০০৭, মাকতাবুল মা'আরিফ, রিয়াদ, ২০০০, পৃ. ১৫৬-১৫৭

মুস্তামিন যদি কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে বন্দি হয়ে দাসে পরিণত হয়, তাহলে ইসলামি রাষ্ট্রে তার যে সকল সম্পদ আছে সে সকল সম্পদ থেকে তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন তার উত্তরাধিকারীরাও তার সম্পদের কোনো অংশীদার হবে না। এ অবস্থায় তার সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে গনিমত হিসেবে জমা হবে। আর যদি মুস্তামিন কোনো রকম যুদ্ধ বা গুপ্তচর বৃত্তিতে নিয়োজিত না থাকে এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারীরা তার স্বত্বাধিকারী হবে।[৪২] মুস্তামিনের সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের কাছে পৌঁছে দেয়া ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। আর যদি কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে অথবা খোঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত সম্পদ ফাই সম্পদ হিসেবে পরিণত হবে।

ঘ. হারবি

হারবি শব্দের অর্থ হলো দারুর হারবের অধিবাসী। দারুল হারব শব্দের অর্থ যুদ্ধরত এলাকা। হারুল হারব বলতে বুঝায়,

دار الحرب هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة-

"দারুল হারব হলো এমন ভূখণ্ড যেখানে অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।"[৪৩]

ড. আবদুল করিম যায়দান বলেন,

دار الحرب : وهي الدار التي لا سلطان للمسلمين عليها-

"দারুল হারব হলো এমন রাষ্ট যেখানে মুসলিমদের কোন কর্তৃত্ব নেই।"[৪৪] দারুল ইসলামের বিপরীত রাষ্ট্র হলো দারুল হারব। এটা অমুসলিম ভূখণ্ড এবং এর অমুসলিম নাগরিকরা হারবি নামে অভিহিত। দারুল হারব মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন এবং ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে সর্বদা তারা যুদ্ধে লিপ্ত।[৪৫] এককথায় হারবি হলো উপরে আলোচিত তিন শ্রেণির নাগরিক ছাড়া অমুসলিম ভূখণ্ডে বসবাসরত অধিবাসী। দারুল হারব হলো এমন একটি ভূখণ্ড যা মুসলিম আইনের সম্পূর্ণ আওতা বহির্ভূত।[৪৬] দারুল হারবের অমুসলমানগণকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাবার পর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ বা জিয্‌ইয়া প্রদান না করে, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্য ইসলাম কখনো এ অনুমোদন দেয়নি তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করে হত্যা বা অঙ্গচ্ছেদ করা। দারুল হারবের অধিবাসীদেরকে যুদ্ধ অবতীর্ণ হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে না, নিজেদের ধর্মবিশ্বাসে অটুট থাকবে।[৪৭] আইনগত সাম্যের ভিত্তিতে দারুল ইসলামের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা দারুল হারবের নেই। তবে দারুল হারবকে পূর্ণ নৈরাজ্য (No man's land) বলে মনে করা যাবে

---

[৪২] সাইয়্যেদ সাবেক, খ-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫
[৪৩] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, পূর্বোক্ত, খণ্ড-২০, পৃ. ২১৭
[৪৪] ড. আবদুল করিম যায়দান,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯
[৪৫] S. A. Siddiqi, *op.cit,* p. 1
[৪৬] Allama Yusuf Alqarzavi, Abu Masud Azhar Nadvi, *op.cit,* p. 9; Syed Ameer Ali, *op.cit,* p. 215
[৪৭] মজিদ কাদ্দুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

না।[৪৮] দারুল হারবে মুসলমানগণ পরিভ্রমণ বা বসবাস করলে তিনি সেখানকার কর্তৃপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন কিংবা তার বিরোধিতা করতে পারবেন না। তবে নিজেদের আইন-বিধান মেনে চলার মতো সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মানতেও তিনি বাধ্য থাকবেন। মুসলমান ব্যবসায়ীগণ দারুল হারবে গেলে তাদেরকে রাষ্ট্রকর্তৃক আরোপিত কর দিতে হয়। অনুরূপভাবে ইসলামি রাষ্ট্রে দারুল হারবের ব্যবসায়ীগণ আগমন করলে তাদেরকে উশর বা বাণিজ্য কর প্রদান করতে হয়। একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, যদি ব্যবসায়ী খারাজ অঞ্চলের হয়, তাহলে সে সকল ব্যবসায়ীদের উশরের অর্ধেক আর আহলুল হারব হলে পূর্ণ উশর আদায় করতে হয়।[৪৯] দারুল হারবের কোনো ব্যবসায়ী যদি ঋণগ্রস্ত হয় বা অথবা বছর সমাপ্ত হয়নি বলে সে কর প্রদান থেকে অব্যাহতি চায়, তাহলে উক্ত হারবির আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু হারবি এবং মুসলমানের মধ্যে যদি এ ব্যাপারে কোনো চুক্তিপত্র থাকে তাহলে দারুল হারবের ব্যবসায়ী কর প্রদান থেকে অব্যাহতি পাবে।[৫০] হারবী যদি দারুল ইসলামে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে এবং কোনো মুসলিমের নামে বা কোনো যিম্মির নামে তার সমগ্র সম্পদ অসিয়ত করে, তাহলে তা বৈধ হবে।[৫১] দারুল হারবের অধিবাসী থেকে বছরে একবারই কর আদায় করা হবে। যদি কোনো হারবি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ইসলামি রাষ্ট্র ত্যাগ করে পুনরায় দারুল ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে তাকে দ্বিতীয়বার কর দিতে হবে। কেননা উক্ত হারবির সাথে নতুন করে চুক্তি নবায়ন করায় তাকে দ্বিতীয়বার কর দিতে হবে। কিন্তু হারবি যদি দারুল ইসলামে এক বছর থেকে যায়, তাহলে তাকে একবারই কর দিতে হবে।[৫২] দারুল হারবের কোনো নাগরিক অনুমতি ছাড়া মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে সে হারবি বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্র তাকে দারুল হারবের গুপ্তচর বলে ধরে নিবে। মুসলিম সেনাপতিগণ গুপ্তচরবৃত্তির উপযোগিতা স্বীকার করে অন্যান্য জাতির মতো তাঁরা বৈদেশিক গুপ্তচরদের কঠোর শাস্তি দিতেন। আর এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান দেশ ও জনগণের স্বার্থে তাকে হত্যা বা কারারুদ্ধ করতে পারেন অথবা ইচ্ছে করলে বিনিময় নিয়ে বা বিনা বিনিময়ে ছেড়ে দিতে পারেন। দারুল হারবের গুপ্তচরের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তার প্রতিনিধির।[৫৩] রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক সে মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম হোক হারবির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না। রাষ্ট্রের যে কোনো নাগরিক যদি হারবিকে হত্যা করেই ফেলে, তবে এ হত্যাকাণ্ডের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কিসাস বা দিয়াতের বিধান প্রযোজ্য

---

[৪৮] মজিদ কাদ্‌দুরী, পূর্বোক্ত,পৃ. ১২১

[৪৯] Yahya Ben Adam's, *Kitab Al Khataj*, (Taxation in Islam, Vol. I, Edited, Translated and Provided with an Introduction and Notes A. Ben Shemesh), E. J. Brill, Leiden, 1958, p. 109

[৫০] S. A. Siddiqi, *op.cit*, p. 87

[৫১] শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী, অনু. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা ইসহাক ফরিদী, *আল-হিদায়া*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৫৬৯

[৫২] S. A. Siddiqi, *op.cit*, pp. 82-83

[৫৩] শামসুদ্দীন আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*,খণ্ড-১০, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৩

নয়।[৫৪] রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে দারুল হারবের কোনো অমুসলিম ইসলামি রাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ পাবে। হারবি ইসলামি রাষ্ট্রে প্রবেশ করে যদি গুপ্তচরবৃত্তি করে ধরা পড়ে, তবে তাকে রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমাম হত্যা করবেন। রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমাম তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে পারেন। আর যদি কোনো মহিলা ও শিশু আমান নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে গুপ্তচরবৃত্তিতে ধরা পড়ে, তাহলে উক্ত মহিলাকে হত্যা করা উচিত কিন্তু শিশুকে হত্যা করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, উক্ত মহিলাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা বিধেয় নয়।[৫৫] আহলুল হারবের কেউ ইসলামি ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে তাকে উশর আদায় করতে হবে। সে যদি একবছর অবস্থান করে চলে না যায়, তাহলে জিয্ইয়ার বিনিময়ে সে যিম্মি হিসেবে অবস্থান করবে।[৫৬] কোনো হারবি মহিলা নিরাপত্তা নিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রে প্রবেশ করে কোনো যিম্মিকে বিয়ে করলে বা একজন মুসলিমকে বিবাহ করলে সে মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে যায়।[৫৭]

খিলাফত শাসনামলে রাষ্ট্রে অমুসলিমদের স্থায়ী নাগরিকত্বলাভের পদ্ধতি

উপরে বর্ণিত চার প্রকারের অমুসলিমদের মধ্যে আহলুয যিম্মাহ ছিল স্থায়ী নাগরিক। তবে অন্য তিন প্রকারের অমুসলিমদেরও স্থায়ী নাগরিকত্ব অর্জনের সুযোগ ছিল। স্থায়ী নাগরিকত্বলাভের জন্য যে সকল পদ্ধতি রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

প্রথমত :

ইসলামি রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিকত্বলাভের জন্য ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী অমুসলিমগণ স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। তবে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান অমুসলিমদের সাথে ইসলামের মূলনীতিসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে না। এ রকম চুক্তি সম্পাদন করা ইসলামে বৈধ নয়।[৫৮] মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হবে ইসলামের মূলনীতির আলোকে। অমুসলিমরা ইসলামি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়সহ সকল নাগরিক অধিকার মুসলমানদের ন্যায় ভোগ করবে, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন মেনে নিয়ে প্রতি বছর জিয্ইয়া আদায় করার শর্তে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। তাদের ফৌজদারি, দেউয়ানি, পারিবারিক ও অন্যান্য বিষয়সমূহ নিজস্ব আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। নিজস্ব বিচারালয় ও বিচারকমণ্ডলীর মাধ্যমে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী বিচার-আচারের ক্ষেত্রে স্বাধিকার ভোগ করবে।[৫৯] তবে যদি বিবাদে লিপ্ত ব্যক্তি বা

---

[৫৪] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল কা'সানী, *বাদায়েউস সানা'য়ে ফী তারতীবিশ শারা'য়ে*, খণ্ড-৭, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৮৬, পৃ.২৩৬

[৫৫] মজিদ কাদ্দুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৮

[৫৬] Yahya Ben Adam's, *op.cit*, pp. 108-109

[৫৭] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল কা'সানী, খণ্ড-৭,*পূর্বোক্ত*, পৃ.১১০

[৫৮] সাইয়্যেদ সাবেক, পূর্বোক্ত, খণ্ড-৩, পৃ. ৭১; Prof. Muhammad Siddique Qureshi, *Foreign Policy of Hadrat Muhammad (Saw)*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1991, p. 107

[৫৯] Dr. Muhammad Hamidullah, *Introduction to Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2003, p. 137; Dr. Mohammad Muslehuddin, *Islam and its Political System*, Kitab Bhavan,, New Delhi, 1999, p. 40

গোষ্ঠী একই সম্প্রদায়ের না হয়, তাহলে তাদের আইন-কানুনগুলোর মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ও সংঘাত দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে যদি মুসলমানদের সাথে অমুসলিমরা বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে মুসলিম আইন অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পন্ন হবে। আর যদি অমুসলিমদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সংঘাত দেখা দেয়, তাহলে বিচার-আচারের জন্য যে কোনো একটি ধর্মের আইনকে বেছে নেওয়া যেতে পারে।[৬০] তাদের কর কোনোভাবেই বৃদ্ধি করা যাবে না এবং তাদের নিজস্ব জনপদে ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করতে বাধা দেওয়া যাবে না এবং নতুন উপাসনালয় তৈরিতে কোনো আপত্তি মুসলিমদের থাকবে না মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিকত্ব যে কোনো অমুসলিম লাভ করতে পারে।[৬১] যে অমুসলিম এ চুক্তি সম্পাদন করবে তিনি আজীবন এবং তার বংশধরদের উপর এ চুক্তি প্রযোজ্য হবে।[৬২] এ চুক্তি[৬৩] মৌখিক বা লিখিত উভয় প্রকারের হতে পারে। চুক্তি লেখা, দস্তখত করা ও তারিখ দেওয়া (কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা) আইনের দিক থেকে অপরিহার্য নয়। তবে চুক্তি লিখিত হওয়াই উত্তম। চুক্তি লেখার তারিখ, এবং যে তারিখ থেকে চুক্তি বলবৎ হবে এবং চুক্তির মেয়াদ সবকিছু সঠিকভাবে লেখা উত্তম। কেননা এতে তা প্রয়োজনে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায় এবং কোনো পক্ষের অস্বীকারের সুযোগ থাকে না।[৬৪] চুক্তির ফলে নাগরিকত্ব লাভকারী অমুসলিমরা তাদের একমাত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান[৬৫] ব্যতীত সামাজিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্বের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হতো। তারা নিজেদের ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং একজন অমুসলিম যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করলে তাতে রাষ্ট্রের কোনো আপত্তি থাকবে না। কিন্তু তারা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদিকে অসম্মান এবং তার কথা ও কর্মের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোনো কিছু করতে পারবে না। তার কার্যক্রমে ইসলামের স্বার্থ ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যাতে বিপন্ন না হয়, সে সম্পর্কে তাকে অধিক সতর্ক থাকতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্র যদি অমুসলিমদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে ইসলামি রাষ্ট্র জিয্ইয়া ফেরত দিবে। "আনাত" বাসীর সাথে খালিদ বিন ওয়ালিদের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বলা হয়,

---

[৬০] Dr. Muhammad Hamidullah, *Introduction to Islam*,op.cit, p. 137

[৬১] Sayed Afzal Peerzade, *On Islamic Taxation,* Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 2009, p. 96

[৬২] সাইয়্যেদ সাবেক, খণ্ড-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১

[৬৩] চুক্তি বা সন্ধি হলো এক ধরনের বন্ধন। চুক্তির মাধ্যমে দুটি দল কতিপয় শর্তের বিনিময়ে একত্রিত হয়। একদল প্রস্তাব করে আর অন্য দল তাতে সম্মতি দিলে চুক্তি কার্যকর হয়। আইনগ্রন্থ 'মুজাল্লা' তে চুক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে, " কোনো বিষয়ে দুটি দল যখন করণীয় পন্থা স্থির করে তা পালনের জন্য বাধ্যবাধকতার আওতায় পরস্পরকে আবদ্ধ করে, তার নামই চুক্তি। প্রস্তাব ও সম্মতির সমন্বয়েই এর সৃষ্টি।" চুক্তির ধারাগুলো দু'পক্ষের মধ্যস্থতায় নির্ধারিত হয় বলে উভয়পক্ষকে ধারাগুলোকে যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হয়। চুক্তির সময় চুক্তিটি লিখিত হওয়াই উত্তম। মুসলমানদের পক্ষ থেকে শত্রুপক্ষের আক্রমণের কারণে চুক্তি ভঙ্গ করতে হলে চুক্তির পরিসমাপ্তির কথা তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে। বিস্তারিত দেখুন,মজিদ খাদদুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৬

[৬৪] মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস সরখসী, খণ্ড-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২-৬৩

[৬৫] ইসলাম অমুসলিম যিম্মিগণকে ধর্ম ও কৃষ্টি রক্ষার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে থাকে। ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে সকল বিজিত দেশে অমুসলমানদিগকে বসবাসের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, সে সকল দেশে তাদের ধর্মপালন ও কৃষ্টি রক্ষার অধিকারও দেওয়া হয়েছিল।

> You and your people shall enjoy protection, in return of which you shall pay us jizya but if we fail to provide protection we shall not be entitled to receive jizya from you until we meet our contractual obligation.[66]

হযরত উমর ফারুক (রা.) এর শাসনামলে ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত সিপাহসালার আবু উবায়দা 'হিমস' থেকে উত্তোলিত জিয্‌ইয়া অধিবাসীদের এই বলে ফেরত দিয়েছিল যে, আমরা ইয়ারমূকের প্রান্তরে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও তার সৈন্যদের মোকাবিলায় ব্যস্ত থাকব। এ সময়ে তোমরা নিজেদের রক্ষা করো। জিয্‌ইয়া হলো নিরাপত্তার বিনিময়। যেহেতু এ সময়ে আমরা তোমাদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারছি না সেহেতু এটা রাখার অধিকার আমাদের নেই।[৬৭] চুক্তি রক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানরা সর্বদাই ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতেন। খলিফা মুয়াবিয়া ও রুমিদের (এশিয়া মাইনরের খ্রিস্টান) মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করলে খলিফা মুয়াবিয়া তাদের উপর চটে গিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। তখন সাহাবি উমর ইবনে আস বলে উঠলেন, আপনি তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অঙ্গীকার পালন করুন। খলিফা মুয়াবিয়া তাৎক্ষণিক যুদ্ধের প্রস্তুতি বন্ধ করেন। সুতরাং প্রমাণিত যে, ইসলামি রাষ্ট্র অমুসলিমদের চুক্তির ব্যাপারে সর্বদা শ্রদ্ধাশীল ছিল।

চুক্তির ভিত্তিতে অমুসলিমদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার পেছনে রাষ্ট্রের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। আর তা হলো ইসলামের বিস্তার ঘটানো। এক্ষেত্রে মনে করা হতো যে মুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব লাভকারী অমুসলিমগণ মুসলমানদের সাহচর্যে এসে ইসলাম সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবে এবং এক পর্যায়ে ইসলামের সৌন্দর্য ও আদর্শে অভিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে।[৬৮] খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ জিয্‌ইয়া আদায় করার ক্ষেত্রে দয়া ও ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে বলেন। মিসরের একজন গভর্নর তাঁকে লিখেন, মুসলিম হলে যদি জিয্‌ইয়া রহিত হয়ে যায়, তাহলে মিসরে সকল খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে যাবে এবং রাষ্ট্র রেভিনিউ তথা কর হারাবে। হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ প্রত্যুত্তরে লিখেন, যদি সকল খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে এটা হবে সবচেয়ে বড়

আশীর্বাদ। কারণ পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করা সবচেয়ে কঠিন কাজ। আর ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা তা তারা পাবে। আর আল্লাহ রাসূল (স.) কে কর আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন নি।[৬৯] এটি প্রমাণিত যে, কোনোরূপ বৈষয়িক স্বার্থ ছাড়া দীনের পথে আকৃষ্ট করার মানসে অমুসলিমদের সাথে চুক্তি করা যাবে। এরূপ চুক্তি করাতে ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে।

---

[৬৬] Oran, Ahmed and Salim Rashid, *Fiscal Policy in Early Islam*, Public Finance/ Finance Publique, Vol. 44, No. 1, 1989, p.88

[৬৭] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯

[৬৮] মোঃ মাহমুদ বিন সাঈদ, *ইসলামের উদারতা ও অমুসলিমদের অধিকার*, পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২২

[৬৯] Bhargava K.D. *A Survey of Islamic Culture and Institutions*, Kitab Mahal, Allahabad, 1981, p. 30

অধিকাংশ ইমামের মতে, এ চুক্তির মাধ্যমে অমুসলিমরা যেহেতু স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভ করবে, সেহেতু রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তাঁর প্রতিনিধি ভিন্ন এ চুক্তি কার্যকর হবে না। রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে যে কোনো অমুসলিমের সাথে এ চুক্তি করতে পারবেন। মুসলমানদের সাথে একত্রে ও মুসলিম শাসনের অধীনে বসবাসকারী অমুসলিমদের সাথে এ চুক্তি করা যেমন বৈধ, ঠিক তেমনি মুসলিম শাসনের অধীন নয় দূরে স্বতন্ত্রভাবে বসবাসকারীর সাথেও এ চুক্তি করা বৈধ। নাজরানের খ্রিস্টানরা তাদের নিজস্ব আবাসভূমিতে বসবাস করে রাসূল (স.)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন।[৭০]

ইসলাম সমস্ত ধর্মাবলম্বীকে নাগরিক হিসাবে স্বীকার করে।[৭১] যে সকল অমুসিলমদের সাথে স্থায়ী নাগরিকত্ব চুক্তি সম্পাদন করা যাবে, তার হলো: ১. ইহুদি[৭২], ২. খ্রিস্টান[৭৩], ৩.সাবিঈন[৭৪] ৪. অগ্নিপূজক ও প্রস্তরপূজক[৭৫] ৫. কাফের[৭৬], ৬. মুশরিক[৭৭] ৭. উল্লিখিত ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য যে কোনো ধর্মাবলম্বী।[৭৮]

---

৭০ সাইয়্যেদ সাবেক, খণ্ড-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪

৭১ আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩

৭২ ইহুদি এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Jews. এটা হিব্রু Yehudhi অথবা Yehudim শব্দ থেকে এসেছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন এ শব্দটি Judaeus এবং গ্রিক শব্দ Ioudaios থেকে এসেছে। Old Testament অনুযায়ী প্রাচীন হিব্রুদের অনুসারীদেরকে ইহুদি বলে আখ্যায়িত করা হয়। তবে তারা ইহুদি লোক বলে পরিচিত। এরা এমন এক ধর্মীয় গোষ্ঠী বা জাতি যারা প্রাচীন নিকটবর্তী প্রাচ্য অঞ্চলের ইসরাঈলের বংশধর থেকে এসেছে। এদের নৃতাত্ত্বিক, জাতীয়তা ও ধর্মীয় বিশ্বাস একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। ইহুদিবাদ এ জাতির সচরাচর বিশ্বাস। North American Jewish Data Bank এর ২০১০ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে ইহুদিদের সংখ্যা ১৩.৪ মিলিয়ন যা বিশ্বের জনসংখ্যার ০.২% এর কম। সবচেয়ে বেশি ইহুদি বসবাস করে ইসরাঈলে। এ ছাড়া ইউরোপ, আমেরিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে ইহুদিরা বসবাস করে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে পৃথিবীতে প্রথম ইহুদি রাষ্ট্র তথা ইসরাঈল নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সময় থেকে ইসরাঈলীরা মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। বিস্তারিত দেখুন, *The New Encyclopaedia Britannica*, Micropaedia, Vol. 6, Encyclopaedia Britannica ; Inc, London, 2002, P. 544; Thomas Patrick Huges, *A Dictionary of Islam*, Vol. 1, Cosmo Publications, New Delhi, 2004, p.245; Muhammad Munir, *Islam in History*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2005, pp. 154-156

৭৩ খ্রিস্টান সম্প্রদায় পৃথিবীতে বড় বড় ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের একটি। ইহার ইংরেজি প্রতিশব্দ Christianity. ইহা প্রাচীন গ্রিক শব্দ ‘Christos’ থেকে এসেছে। New Testament অনুযায়ী, ইহা যিশুখ্রিস্ট এর জীবন ও মৌখিক শিক্ষার একেশ্বরবাদের ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা ২.২ বিলিয়ন। ইহার অনুসারীদেরকে খ্রিস্টান বলা হয়। এদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় । যেমন : ক. রোমান ক্যাথলিক চার্চ খ. পূর্বাঞ্চলীয় অর্থোডক্স চার্চ গ. প্রোটেস্টট্যান্ট । খ্রিস্টানরা ঈসা (আ:) কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে। এ ছাড়া তারা মৃত্যু, দোযখ, পুনরুত্থান, যিশুর পুনরাগমন, গির্জা, সাধুদের সাথে পরস্পর কথোপকথন ; দ্বিতীয় খ্রিস্টের আগমন, বিচার দিবস ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে। মূলত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উত্থান যিশুখ্রিস্টের জন্মের পর হলেও মূলত তাদের আন্দোলন ইহুদিদের সাথে শুরু হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রচার ও প্রসার ঘটে সারা বিশ্বে। প্রাথমিকভাবে এ সম্প্রদায় সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, এশিয়া মাইনর এবং মিসরে প্রসার লাভ করে। এর পরবর্তীতে পুরো মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইথিওপিয়া, ভারতবর্ষ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং পুরো ইউরোপে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। বিশেষ করে এ সম্প্রদায় পাশ্চাত্য সভ্যতা গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বিস্তারিত দেখুন, *The New Encyclopaedia Britannica*, Micropaedia, Vol. 6, London, 2002, P. ; *The Encyclopaedia of Religion*, (Ed.) Mircea Eliade, Vol. 5, Macmillan Publishing Company, New York, 1987, pp. 348-62; Ghulam Haider Aasi, *Muslim Understanding of Other Religions*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2010, pp. 115-187

৭৪ সাবিঈন বহুবচন, সাবী একবচন, অর্থ যে নিজের দীন পরিত্যাগ করে অন্য দীন গ্রহণ করে। (কুরতবী)। সে সময়ে প্রচলিত সকল দীন হতে তাদের পছন্দমতো কিছু কিছু বিষয় তারা গ্রহণ করে নিয়েছিলো। তারা নক্ষত্র ও মালাইকা পূজা করতো। উমর (রা.) তাদেরকে কিতাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। *আল কুরআনুল করীম*, ইফাবা, টীকা ৫০, পৃ.১৬

৭৫ অগ্নিপূজক শব্দটি ইংরেজি প্রতিশব্দ Magians. এ শব্দটি ইংরেজি ‘Magi’ শব্দ এসেছে। অনেকের মতে এ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ‘Mag’ থেকে নির্গত অথবা গ্রিক শব্দ ‘Magos’ থেকে এসেছে। এ শব্দটির ব্যবহার হয় ৬ষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ পূর্ব। এর অর্থ হচ্ছে আগুনের উপাসনা করা। সাধারণ অর্থে অগ্নিপূজক সে সকল ব্যক্তি যারা জরথুস্ত্রবাদে বিশ্বাস করে। বর্তমানে তাদেরকে জরথুস্ত্রবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর প্রস্তরপূজক বলতে প্রস্তর যুগের মানুষদেরকে বুঝানো হয়, যেসব মানুষ পাথরের পূজা করত। বিশেষ করে ফিনিশীয়দের আমলের লোকেরা প্রস্তর-এর পূজা করত এবং তা তাদের জীবনচলার পথের পাথেয় হিসাবে মনে করত। তখনকার সময়ে আরব অঞ্চলের লোকেরা প্রস্তরপূজা করত এবং এর থেকে সাহায্য প্রার্থনা করত। অনুরুপভাবে সিরিয়া অঞ্চলের লোকেরাও এর পূজক ছিল। দেখুন, Thomas Patrick Huges, *A Dictionary of Islam*, Vol. 1, Cosmo Publications, New Delhi, 2004, p.324

৭৬ কাফির শব্দটি আরবি। ইহা আরবি শব্দ কুফরুন শব্দ থেকে এসেছে। ইহার অর্থ এমন ব্যক্তি যে আচ্ছাদন করে অথবা যে ইসলামি বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে। আবার কৃষককেও কাফির বলা হয়। যেসব বিষয় রাসূল (স.) দাবি করেছেন যেমন তাওহিদ, রিসালাত, নবুয়াত সমাপ্তি, আখিরাত, নামাজ, যাকাত, হজ্জ ও রোজা ইত্যাদিকে অস্বীকার করা কুফরী। আর যে অস্বীকার করে সে কাফির। সুতরাং কাফির এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে আল্লাহর

চুক্তির শর্তাবলি

১. অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত নাগরিক চুক্তি মূল কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্থায়ী প্রকৃতির। সুতরাং এগুলো কখনো বাতিল বা পরিসমাপ্তি হতে পারে না। রাসূলে করিম (স.) বলেছেন,

أنا أحق من وفى بذمته-

"যে অমুসলিম নাগরিক তার চুক্তি রক্ষা করবে, তার রক্তের বদলা নেওয়ার দায়িত্ব আমারই।"[৭৯] তবে অমুসলিমদের এখতিয়ার আছে যে, তারা যতদিন খুশি তা বহাল রাখতে পারে এবং যখন ইচ্ছা ভেঙ্গে দিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين-

"যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ থাকবে, তোমরাও তাদের জন্য স্থির থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকিদের পছন্দ করেন।"[৮০] কিন্তু মুসলমানরা কোনো অবস্থাতেই চুক্তি ভঙ্গ করতে পারবে না।

২. পারস্পরিক অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামি বিধান মেনে চলা যিম্মিদের জন্য অত্যাবশক। ইসলামি বিধান অনুসারে ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে আর সুদকে হারাম করা হয়েছে। কিন্তু যিম্মিগন যদি ইসলামি বিধান অমান্য করে সুদ গ্রহণ করে তাহলে তাদের সাথে যিম্মা চুক্তি বাতিল হবে।[৮১]

৩. তারা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় নিয়মকানুন প্রতিপালন, জান-মাল ও ইয্যতের সম্ভ্রম ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা পাবে।

৪. ইসলামসম্মত বিধান অনুযায়ী মুসলিম শাসককর্তৃক জারিকৃত আইনের বিধিবিধান মেনে চলতে হবে। এক কথায় ইসলামি রাষ্ট্রের সকল বিধি-বিধান যিম্মিকে মেনে চলতে হবে। আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থি কোনো শর্ত তাদের প্রতি আরোপ করা যাবে না।

অস্তিত্বকে ইসলামে প্রত্যাখান করে এবং ইসলামি সংস্কৃতি, মূল্যবোধ তথা বিশ্বাসকে লুকায়। মোদ্দাকথা ইসলামধর্মে অবিশ্বাসীদেরকে কাফির বলা হয়। ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে, কাফিরের সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ড আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য ও অমার্জনীয়। পবিত্র কোরআন শরিফে এ শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায় যে ব্যক্তি আল্লাহর কতৃত্ব ও রাজত্ব গ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করে, সে ব্যক্তি কাফের। দেখুন, Thomas Patrick Huges, *A Dictionary of Islam*, Vol. 1, Cosmo Publications, New Delhi, 2004, P.271; *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৬০৮-১০

[৭৭] মুশরিক শব্দটি আরবি শিরকুন শব্দ থেকে এসেছে। কোরআন শরিফে এর ব্যবহার হয়েছে নেতিবাচক অর্থে। ইহার অর্থ হলো অংশীদারিত্ব করা অথবা আল্লাহর একত্ববাদের সাথে কাউকে অংশীদার করা। অন্য অর্থে বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করাকে বুঝানো হয়। মূলত আল্লাহ তা'আলার কোনো সৃষ্টিকে তাঁহার সমকক্ষ মনে করা। একমাত্র আল্লাহই সম্মান, মর্যাদা, ইবাদত-বন্দেগি পাওয়ার যোগ্য, যা অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। সুতরাং যে আল্লাহর একত্ববাদের সাথে কাউকে শরিক করে তাকে মুশরিক বলা হয়। পবিত্র কোরআন শরিফে মুশরিকদেরকে ইসলামের শত্রু বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং মুশরিক ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার সাথে সাথে অন্যান্য ব্যক্তি বা বস্তু তার ইবাদতের মধ্যে শামিল হয় এবং আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে। মুশরিক তার অংশীদারিত্ব ইবাদত দুইভাবে সম্পন্ন করে। যেমন :১. মানুষ অথবা জীব-জন্তুর উপাসনার মাধ্যমে। ২. মূর্তি পূজা করার মাধ্যমে। সর্বোপরি মুশরিকগণকে কঠিন শাস্তি প্রদানের ঘোষণা আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ব্যক্ত করেন। *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৭১৪-৩০

[৭৮] উল্লিখিত ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য যে সমস্ত ধর্মাবলম্বীর সে সময়ে অস্তিত্ব পাওয়া যায় যেমনঃ বৌদ্ধধর্ম (Buddahism), সিন্তধর্ম (Shintoism), বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী (Polythism), পৌত্তলিকতা (New-Pagamaism) ও অন্যান্য ধর্মসমূহ। বিস্তারিত দেখুন, ড. মোঃ শাহজাহান কবির, *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, দিক দিগন্ত, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২০৬-৩৩৮

[৭৯] মুওয়াফফাকুদ্দীন আবি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু কুদামা, (বিশ্লেষক ড. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুহসীন আত্-তুর্কী, ড. আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ), *আল মুগনী*, খ. ১১, দারু আলামিল কুতুব, রিয়াদ, ১৯৯৭, পৃ. ৪৬৬

[৮০] *আল-কুর'আন*, ৯:৭

[৮১] সাইয়্যেদ সাবেক, খ-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫

৫. উপার্জনক্ষম প্রত্যেক পুরুষকে বার্ষিক জিয্ইয়া আদায় করা বাধ্যতামূলক। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো বিশেষ কারণে যদি জিয্ইয়া দিতে অপারগ হয়, তাহলে তাদের সাথে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। জিয্ইয়া না দিলে তাদের রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত নয় অথবা তাদের প্রহার করা উচিত নয়। তবে জিয্ইয়া না দিলে তাদেরকে কয়েদ করে রাখা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের বসবাসের অন্যতম শর্ত হলো ফি বছর জিয্ইয়া আদায় করতে হবে।

উপর্যুক্ত শর্তাবলির ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই।[৮২] তবে কোনো কোনো ইমাম এ শর্তগুলোর বাইরে আরো কিছু শর্ত যোগ করেছেন। এদের মধ্যে আল্লামা মাওয়ার্দী আরো অতিরিক্ত ছয়টি শর্তের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো : কোরআন, রাসূল (স.), ইসলামের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য, বিবাহের নামে কোনো মুসলিম মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, কারো ধন-সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা মুসলিমকে দীনের ব্যাপারে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত এবং হারবি বা তাদের গুপ্তচরদেরকে কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করা।[৮৩] মাওয়ার্দী যে ছয়টি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন প্রকৃতপক্ষে এ সকল শর্তগুলোর কোনো কর্মকাণ্ড যিম্মি নাগরিকগণ কর্তৃক বাস্তবায়িত হলে তার জন্য ইসলাম প্রদত্ত শাস্তির বিধান রয়েছে। ফলে এ সকল শর্তগুলো নাগরিকত্ব চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় এগুলো পালনের ব্যাপারে ইমামগণ একমত হননি। কোনো যিম্মি ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে যদি যিম্মা চুক্তি লংঘন করে তাহলে সে ইসলামি রাষ্ট্রের শত্রুতে পরিণত হবে এবং তাকে যুদ্ধবন্দিতে পরিণত করা হবে।[৮৪]

দ্বিতীয়ত:

খিলাফত শাসনামলে রাষ্ট্রের প্রতি অমুসলিমের সন্তুষ্টি ও আনুগত্য বুঝা যায়- এ ধরনের কোনো কোনো কাজের মাধ্যমেও রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভ করা যেতো। কোনো অমুসলিম দীর্ঘদিন ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করলে সে ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত হয়। কিন্তু কোনো অমুসলিম চুক্তি ছাড়া ইসলামি রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বসবাস করার সুযোগ পায় না। তবে রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তার প্রতিনিধি বা যে কোনো মুসলমান নাগরিক, এমনকি ক্রীতদাস, কিংবা স্ত্রীলোকও ব্যক্তিগত আশ্রয়ে সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য অমুসলিমকে রাষ্ট্রে বসবাসের সুযোগ দেওয়ার বিধান ছিল। এ ধরনের আশ্রিত ব্যক্তিকে ইসলামি আইনের পরিভাষায় 'মুস্তা'মান' (নিরাপত্তা আশ্রিত) বলা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খিলাফতের শুরুতে একজন বিদেশি অমুসলমান অনুমতি সাপেক্ষে মুসলিম রাষ্ট্রে এক বছর বাস করতে পারতো। তারও অধিককাল অতিবাহিত করতে হলে তাকে

---

[৮২] মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামাহ, খণ্ড-১৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১২; আলাউদ্দীন আবূ বকর ইব্‌ন মাস'উদ আল কা'সানী, খ. ৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১১

[৮৩] আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল বাসরী আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকাম আল-সুলতানীয়া*, দারুল হাদিস, কায়রো, ২০০৬, পৃ. ২২৫

[৮৪] সাইয়্যেদ সাবেক, খ-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬

সাধারণ অমুসলিম নাগরিকের মতো একই রাজস্ব দিতে হতো এবং অন্যান্য বাধ্যবাধকতা মেনে নিতে হতো।[৮৫]

অধিকাংশ ইমামের মতে, ‘মুস্তা’মিন’ এক বছরের কম সময়ের জন্য রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবে। তবে মুস্তা’মিন এক বছর শেষ হওয়ার আগেই দারুল ইসলাম[৮৬] পরিত্যাগ করলে আমানের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। সে যদি আবার দারুল ইসলামে ফিরে আসতে চায়, তবে তাকে নতুন করে আমান সংগ্রহ করতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান যদি বুঝতে পারেন যে, মুস্তা’মিন গোপনে দূরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত আছে বা তার কার্যাবলি মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থি, তবে তার আমান নাকচ করে মুস্তা’মিনকে রাষ্ট্র থেকে বহিস্কার করে দিতে পারবেন।[৮৭] মুস্তা’মিন যদি কোনো রাষ্ট্র বা মুসলিমবিরোধী কাজ না করে এবং এক বছর কিংবা তারও বেশি সময় মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে, তবে সে জিয্ইয়া পরিশোধ করে রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভ করতে পারবে। কেননা, দীর্ঘদিন যাবত মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করলে বুঝা যাবে যে, সে দারুল ইসলামে বসবাস করতে এবং যিম্মিদের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি মেনে নিতে সম্মত আছে।

৩. খারাজি জমি ক্রয়

খারাজি জমি হলো যে জমি বলপ্রয়োগে দখল করে মালিকদের হাতেই নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনার বিনিময়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। খারাজ হলো খাজনা বা কর।[৮৮] খারাজি ভূমির খারাজ মালিককে প্রদান করা বাধ্যতামূলক। তা আবাদি হোক বা অনাবাদি হোক। খারাজি ভূমি যদি মুসলমানদের দখলে থাকে তাহলে উক্ত ভূমির জন্য খারাজ প্রদান করতে হবে আর শস্যের জন্য যাকাত প্রদান করতে হবে।[৮৯] খারাজি ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে খারাজি ভূমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আর যিম্মি যদি উশর ভূমি ক্রয় করে তাহলে তা খারাজ ভূমিতে পরিণত হবে। কোনো কোনো ফিকাহবিদদের মতে, তাতে দ্বিগুণ উশর আরোপিত হবে।[৯০]

গ. অপরের অনুবর্তন

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা সূত্রেও মুসলিম রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভ করা যায়। এ ধরনের অবস্থাগুলো হলো :

---

[৮৫] Muhammad Hamidullah, *Muslim conduct of State, op.cit*, pp. 318

[৮৬] ‘দারুল ইসলাম’ কথাটি হলো ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি পরিভাষা। এ পরিভাষা অনুযায়ী রাষ্ট্রই হলো দারুল ইসলাম বা ইসলামের দেশ। মুসলিম ফিক্হবিদগণ ইসলামি রাষ্ট্রকে ‘দারুল ইসলাম’ বলেই উল্লেখ করেছেন। এখানে ‘দার’ শব্দটি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাষ্ট্র বা এরই সমার্থক। ফিকহবিদগণ দারুল ইসলামের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন :
دار الإسلام هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام-
“দারুল ইসলাম এমন দেশ বা এলাকা যেখানে ইসলামের বিধিবিধানসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে। বিস্তারিত দেখুন, *আল-মাওসু‘আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাহ, ৮ম সংস্করন, ১৯৯০, খ-২০, পৃ. ২০১

[৮৭] মজিদ কাদ্দুরী , *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৯

[৮৮] সাইয়্যেদ সাবেক, খণ্ড-১, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৩

[৮৯] Yahya Ben Adam’s, *op.cit*, pp. 103-104

[৯০] Qudama B. Jafar, *Kitab Al Kharaj*, (Taxation in Islam, Vol. II, Edited, Translated and Provided with an Introduction and Notes A. Ben Shemesh), E. J. Brill, Leiden, 1965, p.38

১. ছোট ছেলেমেয়ে

ইসলাম সমস্ত ধর্মাবলম্বীকে নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে। ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান অনুযায়ী তাঁর রাষ্ট্রের নাগরিকগণের সন্তান পিতা-মাতার অনুবর্তী হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিক হবে। মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য একই রকম আইন প্রযোজ্য। তবে অমুসলিম পিতা-মাতার ছেলেরা বয়োঃপ্রাপ্ত হলে তাদেরকে জিয্ইয়া পরিশোধ করতে হবে। এ জন্য তাদের সাথে নতুনভাবে চুক্তি করার প্রয়োজন পড়বে না।[৯১] মেয়েদের জন্য জিয্ইয়া মাফ হওয়ায় তাদেরকে কোনো জিয্ইয়া প্রদান করতে হবে না। তবে কোনো শিশুর পিতা-মাতার মধ্যে একজন মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক এবং অন্যজন যদি বিদেশি হয়, তাহলে সেই শিশু মুসলিম রাষ্ট্রেরই নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হবে।

২. স্ত্রী

ইসলামি বিধি-বিধান মতে একজন স্ত্রী স্বামীর অধীনভুক্ত বিধায় সে স্বামীর আদেশ-নির্দেশ মানতে বাধ্য। স্বামী স্ত্রীকে ন্যায়সঙ্গতভাবে যে আদেশ দিবে, তা প্রতিপালন করা স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। এ বিষয়ে স্ত্রীর উপর স্বামীর অভিভাবকসুলভ ও শাসকসুলভ ক্ষমতা রয়েছে। ফলে ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক স্ত্রী আপনা হতেই স্বামীর দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে।[৯২] উল্লিখিত নীতির কারণে স্ত্রীরা স্বামীর অনুবর্তী হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে। যদি কোন বিদেশি মহিলা কোনো মুসলিমকে বিবাহ করে, তাহলে উক্ত মহিলা তাঁর স্বামীর রাষ্ট্রে নাগরিকে পরিণত হবে।[৯৩] আর যদি কোনো বিদেশি মহিলা ইসলামি রাষ্ট্রের কোনো অমুসলিম যিম্মি নাগরিকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে সে ইসলামি রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিকে পরিণত হবে। যদি কোনো বিদেশি দম্পতি ইসলামি রাষ্ট্রে আসে আর স্বামী যদি ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে, তাহলে স্বামীর অনুগামী হিসেবে স্ত্রী আপনা হতেই রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিকে পরিণত হবে। অর্থাৎ তার স্ত্রীও মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করবে।[৯৪] যদি কোনো বিদেশি অমুসলিম ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক এমন কোনো নারী বিবাহ করে সেক্ষেত্রে উক্ত বিদেশি ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাবে না।[৯৫] তবে তার স্ত্রীর নাগরিকত্ব ততদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, যতদিন সে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করবে। উক্ত মহিলা স্বামীর অনুগামী হওয়ায় স্বামী নাগরিকত্ব লাভ করবে না। তবে উক্ত বিদেশি যদি ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করার শর্তাবলি মেনে নেয়, তাহলে সে যিম্মিতে পরিণত হবে। আর যদি উক্ত মহিলাকে ইসলামি রাষ্ট্র ত্যাগ করে চলে যেতে হয়, তাহলে সে ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হারাবে।

[৯১] মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খণ্ড- ১৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৭

[৯২] মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস সরখসী, খণ্ড-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৭

[৯৩] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *Islamic Toleration & Justice : Non-Muslims under Muslim Rule*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2007, p. 143

[৯৪] মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস সরখসী, খণ্ড-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৭-১১৮

[৯৫] মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস সরখসী, খণ্ড-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮

অমুসলিমদের নাগরিকত্ব বাতিলের কারণ

খিলাফত শাসনামলে রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের জন্যেও পূর্ণমাত্রায় ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত ছিল। ইসলামি আইনবিদদের মতে- আমাদের জন্য যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা, তাদের জন্যেও তাই এবং আমাদের ওপর যেসব দায়িত্ব তাদের ওপরও তাই। হযরত আলী (রা:) বলেছেন –

انما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا و دمائهم كدمائنا-

"অমুসলিম নাগরিকরা জিয্‌ইয়া আদায় করে এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের ধনসম্পদ ও জানপ্রাণ মুসলিম নাগরিকদের মতোই সংরক্ষিত হবে।"[৯৬] বস্তুত ইসলামি শরিয়তভিত্তিক রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যে বিরাট অধিকার ও সর্ববিদ সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে, দুনিয়ার অপর কোনো আদর্শিক রাষ্ট্রেও তার কোনো তুলনা নেই। ফলে অমুসলিম নাগরিকদের নাগরিক মর্যাদা রক্ষা করা এবং তাদের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা ইসলামি রাষ্ট্রের একান্ত দায়িত্ব। অপরাধের কারণে নাগরিকত্ব বাতিল হয় না, অপরাধীরা তাদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করবে। ছোট বা বড় যে কোনো অপরাধের জন্য তাদেরকে দেশ থেকে বের করা যাবে না। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আল্লাহ, রাসূল (স.) বা কোরআনের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করতে পারবে না। তারপরেও যদি কেউ আল্লাহ বা রাসূলের বিরুদ্ধে কুৎসা বা নিন্দাবাদ করে এজন্য অমুসলিমদের নাগরিকত্ব বাতিল হয় না। তবে আল্লাহ, রাসূল (স.) ও কোরআনের বিরুদ্ধে কটূক্তি করলে তারা রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি পাবেন। দামেস্কের ক্যালাসেভিয়ান বিশপ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে কটূক্তি করলে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ শাস্তিস্বরূপ তার জিহ্বা কেটে নেন।[৯৭] একটি বিষয় পরিষ্কার যে, উক্ত বিশপকে খলিফা শাস্তি দিয়েছিলেন সত্যি কিন্তু তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে রাষ্ট্র থেকে বের করে দেন নি। কটূক্তির কারণে যদি নাগরিকত্ব বাতিল হতো তাহলে উমাইয়া খলিফারা এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতেন না। খিলাফত শাসনামলে রাষ্ট্রের সাধারণ কোষাগারে যে সকল রাজস্ব জমা হতো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জিয্‌ইয়া বা নিরাপত্তামূলক সামরিক কর। রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য এ কর অত্যাবশ্যকীয় ছিল। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে কোনো অমুসলিম জিয্‌ইয়া নামক এ কর প্রদান না করতেন তাহলেও তার রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বাতিল হতো না। হযরত উমর (রা.) জিয্‌ইয়া আদায়কালে অমুসলিমদের সাথে সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় কথা বলা ও সুমিষ্ট ব্যবহার করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, যদি তারা জিয্‌ইয়া আদায়ে অক্ষম হয় তাহলে তাকে সাহায্য করো। কারণ আমরা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ। আর এ জিয্‌ইয়া কর আমরা তাদের থেকে এক বা দুই বছরের

---

[৯৬] মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী, *ইউরাউল গালীল ফি তাখরিজী আহাদিসি মানারিস সাবিল*, পঞ্চম খণ্ড, হাদিস নং- ১২৬৪, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ১৯৭৯, পৃ. ১০৩; মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামাহ, খণ্ড- ১৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫০

[৯৭] A. S. Tritton, *The Caliphs and their non-Muslim Subjects*, Frank Cass and Company Limited, London, 1970, p. 128

জন্য নিচ্ছি না।[৯৮] যদি জিয্ইয়া বন্ধ করে দিলে নাগরিকত্ব চলে যেত, তাহলে হযরত উমর (রা.) এ রকম নির্দেশনা প্রদান করতেন না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি অমুসলিমরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে জিয্ইয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে তাদের সাথে চুক্তির শর্তানুয়ায়ী নাগরিকত্ব চলে যাবে। কোনো অমুসলিম কোনো মুসলিমকে হত্যা করলে তার জন্য তার নাগরিকত্ব যাবে না। কেননা হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসলামি রাষ্ট্রে শাস্তি নির্ধারিত আছে। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান সমভাবে প্রযোজ্য। ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম অমুসলিমকে বা অমুসলিম মুসলিমকে হত্যা করলে হত্যাকারীর শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। এ ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য করার সুযোগ নাই।[৯৯] আর যদি হত্যাকাণ্ড নির্দিষ্ট কোনো কারণে বা ভুলবশত সংঘটিত হয় তাহলে হত্যাকারীর শাস্তি হলো দিয়াত। দিয়াতের ক্ষেত্রে উভয়ের জন্য আইন সমান। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

من كان له عهدا أو ذمة فديته دية المسلم-

"চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম বা যিম্মির দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের সমান।"[১০০] অমুসলিমরা মুসলমানকে হত্যা করলে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে যে সকল কারণে নাগরিকত্ব বাতিল হয় তা হলো যথা:

প্রথমত: কোনো অমুসলিম যদি ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করা ছেড়ে দিয়ে শত্রুরাষ্ট্রে গিয়ে বসবাস করে তাহলে তার নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: কেউ যদি ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করে তাহলে তার নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়।

ইসলামি শরিয়ত ও ইতিহাসের তথ্য উপাত্তের আলোকে উপস্থাপিত উপর্যুক্ত আলোচনা হতে একথা সুস্পষ্ট যে, ভিন্নধর্মী অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে ইসলামি উদারনীতি একটি মহাসত্য ও অনস্বীকার্য বাস্তব। শ্রেণি ও বর্ণ বৈষম্যহীন একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠাই ইসলামের উদ্দেশ্য। অন্যধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর প্রতি সহনশীলতা হচ্ছে এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইসলাম যে সমস্ত ধর্মাবলম্বীকে নাগরিক হিসাবে স্বীকার করে তার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে খিলাফত শাসনামলে রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যে বিরাট ও সর্ববিদ সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে দুনিয়ার অপর কোনো আদর্শিক রাষ্ট্রেও তার কোনো তুলনা নেই। ফলে অমুসলিম নাগরিকদের নাগরিক মর্যাদা রক্ষা করা এবং তাদের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা খিলাফত রাষ্ট্রের একান্ত দায়িত্ব। তারা যত বড় অপরাধই করুক, এ জন্য তাদের নাগরিকত্ব বাতিল হবে না। ইসলামি রাষ্ট্র অমুসলিমদের নাগরিকত্বলাভ ও অধিকার নিশ্চিতকরণের

[৯৮] Allama Yusuf Alqarzavi, Abu Masud Azhar Nadvi, *op.cit*, p. 132

[৯৯] আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ-২৬, পৃ: ১৩১-১৩২

[১০০] আবু বকর আহমদ ইবনু আল হোসাইন আলী আল বাইহাকী, (বিশ্লেষক, মুহাম্মদ আবদুল কাদের আতা) *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং- ১৬৩৫৫, খ-৮, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ২০০৩, পৃ. ১৭৯-১৮০

বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকে। অমুসলিমদের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যাতে কোনোরুপ অবিচার করা না হয় তা নিশ্চিত করতেই এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। বর্তমান সময়েও যেখানে মানবতা বিপন্ন ও ভুলণ্ঠিত সেখানে খেলাফত আমলের ধর্মাশ্রিত রাষ্ট্র প্রমাণ করেছে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণমূলক কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা একমাত্র ইসলামেই মান।

পঞ্চম অধ্যায়

অমুসলিম জনগোষ্ঠী, মর্যাদা ও অধিকার: খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বিজিত ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রায়ই হরণ করা হয়েছে বলে সর্বজনবিদিত। বিশ্বের প্রায় সকল ধর্মমত, দর্শন এবং রাষ্ট্রপরিচালনার নিমিত্তে মানবরচিত সংবিধানে শাসক-শাসিত এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদার নিশ্চয়তা বিধিবদ্ধ থাকলেও সর্বক্ষেত্রে এর যথাযথ প্রয়োগ না ঘটায় যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক শাসিত বিশেষ করে ভিন্ন ধর্ম-মত জাতিগোষ্ঠীদেরকে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে দেখা যায়। একই ভূখণ্ড, একই আবহাওয়া ও জলবায়ুতে একই রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় পাশাপাশি বাস করে অমুসলিম নাগরিকগণ তাদের নাগরিক এমনকি মানবিক অধিকার ও মর্যাদা থেকেও বঞ্চিত হয়। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা কেবল মানুষের পারলৌকিক মুক্তির ও আধ্যাত্মিক জীবনচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে মানবজীবনের রাষ্ট্রীকসহ পার্থিব ক্রিয়া-কর্মের নানাদিক সম্পর্কেও এর সুস্পষ্ট নীতি নির্দেশনা ও বিধানাবলি রয়েছে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) কেবল একজন ধর্ম প্রচারক বা নবি-রাসূলই ছিলেন না। একই সাথে তিনি ছিলেন একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক। পবিত্র কোরআন ছাড়াও মহানবির জীবনাদর্শ ও সুন্নাহর মধ্যে মানবজাতির জন্য রয়েছে দৈনন্দিন জীবনাচরণ, তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালনার পথনির্দেশিকা। মহানবি মদিনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার মৃত্যুর পর এর শাসনভার অর্পিত হয় তাঁর অনুসারী খলিফা বা প্রতিনিধিদের ওপর। এভাবে মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয় খিলাফত নামক ধর্মীয় রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা। মহানবির মৃত্যুর পর খিলাফত নামক রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম চারজন খলিফার শাসনামল (৬৩২-৬৬১খ্রি.) খোলাফায়ে রাশেদিনের[১] যুগ নামে পরিচিত। এ যুগে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হয়েছে মূলত ইসলামের মৌল নীতি, আদর্শ এবং মহানবির পরিচালিত রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দেশনা অনুযায়ী। তবে খোলাফায়ে রাশেদুনের যুগে রাষ্ট্র ও সরকারের বৈশিষ্ট্য ও তাঁদের কার্যক্রম পর্যালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য প্রবন্ধটির মূল লক্ষ্য হলো খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে অমুসলিম নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনা ও পর্যালোচনা। প্রসঙ্গত অমুসলিমদের সম্পর্কে কোরআন সুন্নাহর নীতি-আদর্শ এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে এর বাস্তব

---

[১] খোলাফায়ে রাশেদিন বলতে ইসলামের ইতিহাসে মূলত প্রথম চার খলিফা হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.)-এর শাসনকালকে বুঝানো হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত সময়ের প্রয়োজনে পবিত্র কোরআন শরিফ নাযিল করেন। আর এ কোরআন হলো ইসলামের পবিত্র সংবিধান। এ সংবিধান অনুসারে রাসূল (স.) ইসলাম ধর্ম ও মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর প্রদর্শিত নির্দেশনা অনুসারে উপরিউক্ত চারজন খলিফা তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও রাজ্যের শাসন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে গেছেন বলে তাঁদেরকে 'খোলাফায়ে রাশেদিন' বলা হয়। তাঁদের খেলাফত কালকে 'খিলাফতে রাশিদা' বলা হয়ে থাকে। খিলাফতে রাশিদা (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) পর্যন্ত মোট ত্রিশ বৎসর সময় কালকে বলা হয়ে থাকে। Philip K Hitti, *History of the Arabs*, Macmillan St Martin's Press, London, Tenth edition, Reprinted 1972, p.140

প্রয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদির মাধ্যমে উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধটিতে। ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ রয়েছে। তবে সে আলোকে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে এর প্রায়োগিক বিষয়ে পৃথক ও স্বতন্ত্র আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম পরিলক্ষিত হয়। এ সংক্রান্ত যেসব আলোচনা পাওয়া যায় তা বিক্ষিপ্ত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত। বর্তমান প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে আরবি ভাষায় লিখিত বিদ্যমান কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক তথ্যসূত্র ছাড়াও দ্বৈতীয়িক সূত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতির বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী শৈলী প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে।

খোলাফায়ে রাশেদিন যুগের রাষ্ট্রের নাগরিক

খোলাফায়ে রাশেদিন যুগে ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ক. মুসলিম নাগরিক খ. অমুসলিম নাগরিক। নিম্নের চিত্রে তৎকালীন সময়ে বিদ্যমান অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীসমূহের একটি বিবরণ তুলে ধরা হলো।

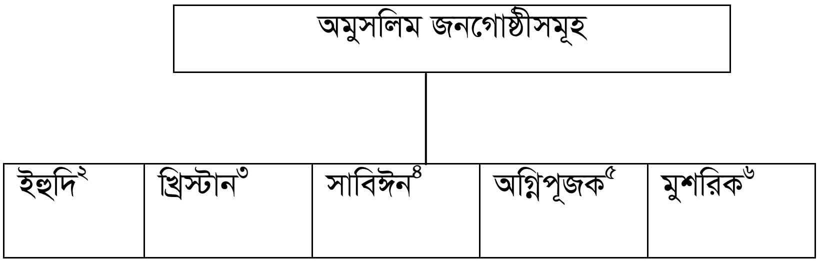

খোলাফায়ে রাশেদিন যুগের প্রারম্ভিক সময়ে অমুসলিম নাগরিকদের সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত না করা গেলেও ইসলামের ক্রমবিস্তার এবং গণধর্মান্তকরণের ফলে মুসলিমদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে অমুসলিম নাগরিকগণ ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। তাই অমুসলিম নাগরিকদের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। আর এ কারণেই মূল আলোচনার পূর্বে সংখ্যালঘু সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা প্রদান সঙ্গত ।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিচয়

কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে একটি জনগোষ্ঠীর পৃথকীকরণই হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিচয়। *Shorter Oxford English Dictionary*-তে সংখ্যালঘু বলতে বোঝানো হয়েছে, ‘A small group of

[২] ইহুদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে, পৃ. ২১৬
[৩] খ্রিস্টান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে, পৃ. ২১৬
[৪] সাবিঈন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে, পৃ. ২১৬
[৫] অগ্নিপূজক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে, পৃ. ২১৬
[৬] মুশরিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে, পৃ. ২১৬

people differing from the rest of community in the ethnic, origin, religion, language or culture.'[7]

The American Heritage College Dictionary-তে সংখ্যালঘু বলতে বোঝানো হয়েছে, 'A group having little power or representation relative to other groups within a society.'[8]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, সংখ্যালঘু হচ্ছে কোনো বৃহৎ সমাজ বা দেশে বসবাসরত এমন এক সম্প্রদায় যারা সংখ্যায় স্বল্প, ক্ষমতাসীনদের চেয়ে কম ক্ষমতার অধিকারী এবং আর্থ-সামাজিক দিক থেকে প্রভাবশালী বৃহৎ জনগোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত। এদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, জাতিগত অথবা সত্ত্বাগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির অনেক পার্থক্য থাকে কিংবা এদের মধ্যে যে কোনো একটির পার্থক্য দেখা যায়।

অধিকার ও মর্যাদা

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করার পূর্বে অধিকার ও মর্যাদা ধারণাটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। অধিকার ব্যাপক ও বিচিত্র অর্থবোধক। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে আত্মবিকাশের জন্য মানুষের প্রয়োজন কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা। সাধারণভাবে এসব সুযোগ-সুবিধাকে অধিকার বলা হয়। অন্য কথায় অধিকার হচ্ছে সে সকল বাহ্যিক অবস্থা যা ব্যক্তির মানসিক পরিপুষ্টি সাধন করে। সামাজিক চেতনাবোধ হতে মানবসমাজে অধিকার ধারণাটির উদ্ভব। একে সামাজিক জীবনের সে সকল শর্ত বলা যায়, যা ছাড়া কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিজের সর্বোচ্চ বিকাশ অর্জন সম্ভব নয়। বস্তুত, মানুষের ব্যক্তিত্ব ও জীবনকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য সমাজ তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দান করে এবং এ সকল সুযোগ-সুবিধার সমষ্টিই হলো অধিকার। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কি অধিকারের সংজ্ঞায় বলেন- "Rights are those conditions of social life without which one man can seek in general to be himself at his best."[9] এ সকল সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয় এবং এগুলোর লক্ষ্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সার্বজনীন কল্যাণ সাধন। একটি রাষ্ট্র ও সরকারের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র বুঝা যায় নাগরিকদের প্রদত্ত অধিকার নিশ্চিতকরণে তার ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড থেকে। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- মানবিক ও মৌলিক অধিকার, আর্থ-সামাজিক অধিকার

---

৭ William R. Trumble, Angus Stevenson, (Ed.), *Shorter Oxford English Dictionary*, Vol. 1, Oxford University Press, New York, Fifth edition, 2002, p. 1786

৮ Joseph P. Pickett, (Ed.),*The American Heritage College Dictionary*, Houghton Mifflin Company, New York, Fourth Edition, 2002, p. 886

৯ Harold J. Laski, *Grammar of Politics*, New South Wales: Unwin Hyman, 5th edition, 1967, p. 91

এবং রাজনৈতিক অধিকার। কিন্তু ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের সহায়ক হওয়া সত্ত্বেও কোনো সুযোগ-সুবিধা আইনের দ্বারা স্বীকৃত না হলে তাকে অধিকার বলা যায় না।[১০]

মর্যাদা হচ্ছে সামাজিক সম্মানের উপর ভিত্তি করে একজন ব্যক্তির বা একটি সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট অবস্থান যা তার বা তাদের অধিকার, কর্তব্য এবং জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে। Max. Weber মর্যাদার সংজ্ঞায় বলেন- "Status honour to be a more important basis for people forming themselves into groups or communities."[11] একটি রাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন মর্যাদার নাগরিক থাকতে পারে। নাগরিকদের মধ্যে মর্যাদার ভিন্নতা সমাজে সামাজিক স্তর বিন্যাসের সূচনা ঘটায়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে মর্যাদার ভিন্নতাহেতু সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রচলন লক্ষণীয়। তবে ইসলাম ধর্মে সামাজিক বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। এরই ধারাবাহিকতায় খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকদের সম-মর্যাদা প্রদানের বিষয়টি লক্ষণীয়।

অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকারসমূহ

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকারসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

জীবন রক্ষার অধিকার

ইসলাম সকল মানুষের মৌলিক মানবাধিকারকে সংরক্ষণ করে। মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের মধ্যে জীবনধারণের অধিকারই হলো তার শীর্ষ অধিকার। এ অত্যাবশ্যকীয় অধিকারের শক্তিতে মানুষ নিজের ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা এবং কর্মক্ষেত্র ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে খিলাফতের সীমানায় বসবাসকারী আনুগত্যশীল প্রত্যেক সংখ্যালঘু মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করা শুধু খলিফা বা সরকারের নয়, বরং প্রত্যেক মুসলমানের আবশ্যকীয় কর্তব্য ছিল। একজন মুসলিম নাগরিককে হত্যা যেমন দণ্ডনীয় অপরাধ তেমনি অমুসলিম নাগরিকের ক্ষেত্রেও। এতে দণ্ড বা শাস্তির কোনো তারতম্য হতো না। ফিকাহবিদদের সম্মিলিত রায় তথা আইনের দৃষ্টিতে একজন অমুসলিম নাগরিকের প্রাণ একজন মুসলমান নাগরিকের প্রাণের সমতুল্য।[১২] কেননা ইসলামি শরিয়ায় মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। বেঁচে থাকার অধিকারের প্রশ্নে সকল মানুষের অধিকার সমান। বৃদ্ধ-তরুণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নিহত ব্যক্তির 'দিয়াত' তথা রক্তপণ নেওয়ার অধিকার রয়েছে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর শাসনামলে বকর বিন ওয়াইল গোত্রের এক ব্যক্তি আল-হিরা নামক স্থানে অবস্থানরত চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের একজন

---

[১০] ড. অনাধিকুমার মহাপাত্র, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, সুহৃদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩৫৫

[11] Max. Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Eds. G. Roth and Wittich, Vols. 2, Berkely: University of California Press, 1978, pp. 305

[১২] সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিক্হুস সুন্নাহ*, অনু. আকরাম ফারুক, খ.২, শতাব্দী প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪২১

খ্রিস্টানকে হত্যা করলে উমর (রা.) হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের তথা অভিভাবকদের হাতে অর্পণ করতে আদেশ দেন, যেন তাকেও অনুরূপভাবে হত্যা করা যায়।[১৩] তদানুসারে তাকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণ করা হলে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হুনাইন তাকে হত্যা করে।[১৪] জীবন রক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য খলিফা হযরত উমর (রা.) মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস (রা.) কে এক প্রশাসনিক পত্রে লিখেছেন, "তোমার সাথে যিম্মি ও চুক্তিবদ্ধ লোকেরা রয়েছে। সুতরাং, হে আমর! সাবধান থেকো যেন আল্লাহর রাসূল (সা.) তোমার প্রতিপক্ষ না হন।"[১৫]

আবু লুলু নামক একজন দাস রোমানদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে হযরত উমর (রা.)-কে হত্যা করলে হযরত উসমান (রা.) খলিফা হিসেবে ক্ষমতায় বসেন। খলিফা উমর (রা.) নিহত হওয়ার পর তার ছেলে উবায়দুল্লাহ হত্যাকারীকে খুন করে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ায় তাকে হত্যার পক্ষে ফতোয়া দেওয়া হয়। অপরাধী কাস্টডিতে থাকাকালীন সময় তাকে বিনা বিচারে হত্যা করা ইসলামি আইনবিরোধী। আর এই কারণে খলিফা আবু লুলুর পরিবারকে অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও হত্যার বিনিময় স্বরূপ 'দিয়াত' তথা রক্তপণ দেন।[১৬]

হযরত আলী (রা.)-এর শাসনামলে জনৈক মুসলিম চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের এক লোককে হত্যা করলে অভিযুক্ত মুসলমানকে হত্যার দায়ে গ্রেফতার করা হয়। সাক্ষ্য প্রমাণে হত্যার বিষয়টি প্রমাণিত হলে আলী (রা.) তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। যাকে হত্যা করা হয়েছিল তার ভাই এসে খলিফাকে জানান যে, "আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এ কথা শুনে তিনি সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, তাহলে তারা কি তোমাদেরকে ভয়-ভীতি দেখিয়েছে? হুমকি দিয়েছে? তাই কিনা তুমি বাধ্য হয়ে ক্ষমা করে দিচ্ছো নাকি স্বপ্রণোদিত হয়ে ক্ষমা করে দিচ্ছো? উত্তরে সে বলল, অভিযুক্ত ব্যক্তি কখনোই তা করার চেষ্টা করেনি। তবে ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হলে আমার ভাই ফিরে আসবে না। তারা আমাকে 'দিয়াত' তথা রক্তপণ দিয়েছে। আমি তা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছি। তখন খলিফা বললেন, "তুমি ভালো জান। তুমি যা চেয়েছো তাই হবে। তবে আমরা যখন কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হই, তখন

[১৩] সাধারণত কিসাস অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা কার্যকর করার দায়িত্ব বর্তায় সরকারের উপর। তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক নিজ হাতে হত্যার প্রতিশোধ যথাযথভাবে কার্যকরী করতে সক্ষম হলে আর সরকার বা তাঁর প্রতিনিধি তাকে এ কাজের জন্য যথোপযুক্ত মনে করলে সরকার বা তাঁর প্রতিনিধি নিজ হাতেই হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনুমতি দিতে পারে। সরকার বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে। এটা এই জন্যই যে, নতুবা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও তার লোকেরা বাড়াবাড়ি করতে পারে। নিহত ব্যক্তির অভিভাবক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় সরকার বা তাঁর প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকলে কোনো ভাবেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারবে না। ফলে মৃত্যুদণ্ড করার সময় সরকারপক্ষীয় প্রতিনিধির উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, খণ্ড ৭, ওয়াযারাতুস শুয়ূন আল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল আওকাফ ওয়াদ দাওয়্যাহ ওয়াল ইশরাত, সউদী আরব,তা.বি., পৃ. ১৪৬-২১১; মুওয়াফফাকুদ্দীন আবি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু কুদামা, (বিশ্লেষক ড. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুহসীন আত্-তুর্কী, ড. আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ), *আল মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, দারু আলামিল কুতুব, রিয়াদ, ১৯৯৭, পৃ. ৩০৭-৪৭২

[১৪] Shibli Nu'mani, *Al-Farooq The Life of Omar The Great*, Eng. Tr. By Maulana Zafar Ali Khan, International Islamic Publishers, New Delhi, 1992, p. 336

[১৫] ড. আলী আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফী, *আল-মুসাওয়াত ফী আল-ইসলাম*, দার আল-মা'আরিফ, বৈরূত, ১৯৯৩, পৃ. ৮৫

[১৬] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *Islamic Toleration & Justice : Non-Muslims under Muslim Rule*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2007, p. 132

তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতো এবং তাদের ক্ষতিপূরণ আমাদের ক্ষতিপূরণের সমতুল্য।"[১৭] খিলাফত শাসনামলে রাষ্ট্র এ দায়িত্ব শুধু নিজের পক্ষ থেকে বা মুসলিম অধিবাসীদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করেছিল তা নয়; বরং আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকেও এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।[১৮]

সম্পদ রক্ষার অধিকার

জীবনের ন্যায় সম্পদ ভোগ ও রক্ষাকেও খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে গণ্য করা হতো। এ ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করা হতো না। রাষ্ট্রে প্রচলিত দেউয়ানি আইনের আলোকে মুসলিম নাগরিকদের সম্পত্তি রক্ষা ও তাদের উপর যেসব দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয় অমুসলিম নাগরিকদের উপরও তা অর্পিত হতো। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, "অমুসলিম নাগরিকরা জিয্ইয়া প্রদান করে এই জন্য যে, তাদের ধন-সম্পদ আমাদের ধন-সম্পদের মতো এবং তাদের জান-প্রাণ আমাদের জান-প্রাণের মতো সংরক্ষিত হবে।"[১৯] রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুন মেনে মুসলিম ব্যক্তি যেভাবে ধন-সম্পদ অর্জন এবং বিধিসম্মত নিয়মে তার প্রবৃদ্ধি ঘটাতো ঠিক তেমনি অমুসলিম ব্যক্তিও ধন-সম্পদ অর্জন ও বৃদ্ধি করতে পারতো। তাদের অর্জিত ধন-সম্পদ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার সকল দায়িত্ব রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন। যদি কেউ অমুসলিমদের কাছ থেকে কোনো ঋণ নিতো তাহলে অবশ্যই তাকে সে ঋণ পরিশোধ করতে হতো। যদি যথাসময়ে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করতো, তাহলে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাকে আটক করে রাখা হতো। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে লক্ষ করা যায় যে, মুসলমানরা অমুসলিম যিম্মিদের মহল্লায় গিয়ে অর্থমূল্য প্রদান না করে কিছু জিনিসপত্র গ্রহণ করতো। উপহারস্বরূপ এসব মাল গ্রহণ করা তারা বৈধ মনে করতো। অথচ এরূপ কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ।

খলিফা উমর (রা.) এর নিকট একবার একজন যিম্মি এসে অভিযোগ করলেন যে, মুসলমানরা তার বাগানের আঙ্গুর ফল নিয়ে গেছে। এ সংবাদ শুনে হযরত উমর (রা.) ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য নিজেই তদন্তে গেলেন। দেখলেন, তার একজন সহচর ঢালে করে আঙ্গুর নিয়ে তাঁর দিকে আসছে। হযরত উমর বললেন, "তুমি এ রকম কাজ করলে? সহচর বললেন, ক্ষুধার তাড়না সহ্য করতে না পেরে আমি এরূপ কাজ করতে

---

[১৭] মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ শাওকানী, খণ্ড-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৪

[১৮] হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

الا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما-

"যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে, যার দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স.)। সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। আর তার সুগন্ধ পাওয়া যাবে সত্তর বছরের দুরত্ব থেকে।" (আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবিনী, সম্পাদিত, ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, মাওলানা এ. কে. এম আবদুস সালাম, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, হাদিস নং- ২৬৮৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৫০৫) এ হাদিস থেকে জানা যায় যে. ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারই কেবল নিজের পক্ষ থেকে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা নয়; বরং আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকেও এ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

[১৯] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল কা'সানী, *বাদায়েউস সানা'য়ে ফী তারতীবিশ শারা'য়ে*, খ-৭, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৮৬, পৃ.১১১

বাধ্য হয়েছি। তখন হযরত উমর (রা.) বাগানের সমস্ত আঙ্গুরের দাম পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন।”[২০] শুধু শান্তির সময়ে নয় যুদ্ধের সময়েও মুসলমান সেনাদল যিম্মিদের সাথে মানবিক আচরণ করতো, তাদের সম্পদ ও ফসলের কোনো ক্ষতি করা হতো না। সেনাদলের অগ্রযাত্রায় যদি কোনো ফসলের ক্ষতি হতো, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হতো। একবার সিরিয়ার কৃষকগণ খলিফার দরবারে এসে নালিশ করেন সৈন্যগণ তাদের শস্যক্ষেত্র নষ্ট করেছেন। তখন খলিফা উমর (রা.) ‘বায়তুল মাল’ হতে ১০০০০ দিরহাম ফসলের ক্ষতি বাবদ পরিশোধ করেছিলেন। যিম্মিদের যাবতীয় হক সম্পর্কে বিশেষ সাবধান থাকার জন্য হযরত উমর (রা.) সবসময় লোকদিগকে তাগিদ প্রদান করতেন।[২১]

রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতার কারণে খলিফা হযরত উমর (রা.) বাধ্য হয়ে খাইবারের ইহুদি ও নাজরানের খ্রিস্টানদের নিজেদের আবাসস্থল থেকে বহিস্কার করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে অপরাধীদের সম্পত্তির যথাযথ ক্ষতিপূরণ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদান করা হয়েছিল।[২২] ইহুদিদের সম্পত্তির সমান মূল্য পরিশোধ করা হয় এবং খ্রিস্টানদের নাজরানের পরিবর্তে ইরাকে ভূসম্পত্তি প্রদান করা হয়। অন্যদিকে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী শহর আরবাসাসেও খ্রিস্টানগণ রোমানদের হয়ে গোপনে কাজ শুরু করলে সেনাপতি উমর ইবনে সাদ খলিফাকে তা অবহিত করেন। খলিফা তখন তাদের সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করে তাদের অন্যত্র প্রেরণ অথবা তাদের সংশোধনের জন্য একবছর সময় প্রদানের নির্দেশ দেন। এ সময় তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেনাপতিকে আদেশ দেওয়া হয়। খলিফার এ মহানুভবতায় সন্তুষ্ট হয়ে খ্রিস্টান নাগরিকরা তাদের ভুল বুঝতে পারেন এবং নিজেদের শুধরে নেন। এ সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়, মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মসজিদ সংগল্ন একজন ইহুদি নারীর ঘর ভেঙ্গে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। ক্ষতিগ্রস্ত নারী খলিফার নিকট অভিযোগ করলে তিনি আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কাছে এর কৈফিয়ত চান। তখন আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন, মসজিদে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় এ কাজ করেছেন। তিনি ইহুদি নারীকে তার ঘরের মূল্যের চেয়ে অধিক পরিমাণ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই এ বাড়ি বিক্রি করবেন না বিধায় এ টাকা বায়তুল মালে জমা রাখা হয়। খলিফা তা শুনে মসজিদের সম্প্রসারিত অংশটি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন এবং জমির মালিককে উক্ত জমিতে ঘর ভেঙ্গে ফেলার আগে যে রকম ঘর ছিলো ঠিক অনুরূপ ঘর তৈরি করে দিতে বলেন। লেবাননের একজন খ্রিস্টান পণ্ডিত কারদাহি ১৯৩৩ সালে লিখেন, উক্ত ভূমিতে নির্মিত ভবন ‘বাইতুল ইহুদি’ আজো বিদ্যমান।[২৩]

---

[২০] আবু উবায়দ আল কাসিম ইবন সালাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, আল মাকতাবাতু তিজারিয়্যাহ আল কুবরা, কায়রো, ১৩৫৩ হি., পৃ. ১৫১

[২১] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit*, p. 129

[২২] Maulana Muhammad Ali, *Early Caliphate*, Ahmadiyya Anjuman-i-Isha’at-i-Islam, Lahore, 1947, pp. 182-83

[২৩] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit*, p. 123; Dr. Muhammad Hamidullah, *Introduction to Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2003, pp. 210-211

হযরত আলী (রা.)-এর শাসনামলে একজন ইহুদি নারী ইরাকের গভর্নরের বিরুদ্ধে খলিফার দরবারে তার ভূমি অধিগ্রহণের অভিযোগ দায়ের করেন। তা শুনে তিনি গভর্নরকে নির্দেশ দেন যে, অভিযোগ সত্য হলে যেন তার জমি ফেরত দেন অথবা পদত্যাগ করেন।[২৪] উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে মুসলিম নাগরিকদের সম্পদ যেমন রাষ্ট্রের কাছে পবিত্র আমানত ছিল, তেমনি অমুসলিম নাগরিকদেরও। বলপূর্বক অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ হরণ বা ভোগ দখলের অধিকার ক্ষুন্ন করার কোনো সুযোগ কারো ছিল না।

সম্মান রক্ষার অধিকার

ইসলাম মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকদের মান-সম্মান অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে কঠোর ও বদ্ধপরিকর। অমুসলিমকে জিহ্বা বা হাত পা দিয়ে কষ্ট দেওয়া, গালি দেওয়া, গীবত করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, তিরস্কার করা, নাম ও উপাধি বিকৃতকরণ, দোষারোপ বা সমালোচনা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সম্মান রক্ষায় ইসলামের নীতিমালা মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য সুনির্দিষ্ট।

খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে আরব ভূখণ্ডে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের কারণে মুসলমানদের সামরিক অভিযানে খ্রিস্টানগণ স্বেচ্ছায় সামরিক সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। সেতুর যুদ্ধে ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বাহিনী এক মারাত্মক পরাজয়ের মুখে পড়লে তাঈ গোত্রের জনৈক খ্রিস্টান সর্দার মুসলিম সেনাপতি মুসান্নার নিকট হাজির হয়ে নৌকার সেতুর নিরাপত্তা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। মুসলমানরা ফোরাত নদী ও পারসিক বাহিনীর মধ্যে আটকা পড়ায় শুধু ওই সেতুটিই ছিল মুসলমানদের সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাৎপসারণের একমাত্র উপায়।[২৫] পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য খলিফা উমর (রা.) এর সেনাপতি মুসান্না বিন হারিছা পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে তীব্র গতিতে আক্রমণ পরিচালনা করেন। সে সময় সেনাপতি মুসান্না খ্রিস্টান গোত্র বনি-তগলিবের থানাহ বিন-হিলাল নমরী ও কহর তগলবী নামক দুই খ্রিস্টান নেতাকে যুদ্ধে শরিক হতে অনুরোধ করেন। সর্দারদের নিকট গিয়ে বলেন, "আপনাদের রক্ত ও আমাদের রক্ত একই; আমার সঙ্গে চলে আসুন এবং আমি যেভাবে আক্রমণ করি, সেভাবে আক্রমণ করুন।" এ যুদ্ধে বনি-তগলিবের এক যুবকই শত্রু সেনাপতি মিহরানকে হত্যা করে। যুদ্ধে মুসান্নার ভ্রাতা সইদ এবং হিলাল নমরী নিহত হলে সেনাপতি মুসান্না নিজের ভাইয়ের লাশকে যেভাবে বক্ষে ধারণ করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে হিলাল নমরীর লাশকে বক্ষে ধারণ করেছিলেন এবং উভয়ের জন্য সমানভাবে শোক প্রকাশ করে ইতিহাসে অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পারসিকরা

---

[২৪] *Ibid*, p. 136
[২৫] T.W.Arnold, *The Preaching of Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1999, p. 44

পশ্চাপসারণ করতে বাধ্য হয়।[২৬] এভাবে খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য মুসলিম সৈন্যদের পাশে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন এবং শত্রু সৈন্যদের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে অবগত করেছিলেন।[২৭] খ্রিস্টান সেনাপতিদের সহযোগিতার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, খিলাফত শাসনামলের প্রারম্ভিক সময়কালে শুধু মুসলিমগণ অমুসলিমদের সম্মান রক্ষা করতেন না, বিনিময়ে অমুসলিম নাগরিকগণও মুসলমানদের সম্মান রক্ষায় এগিয়ে আসতেন।

মহান খলিফাদের যুগে অমুসলিমদের মান-সম্মান ও ইয্যত যথাযথভাবে সংরক্ষণের অসংখ্য নজির রয়েছে। হযরত উমর (রা.) এর আমলে হিমসের গভর্নর উমাইর বিন সা'দ এর মুখ থেকে কোনো এক অমুসলিমের সম্পর্কে 'আযাকাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন' এমন একটি বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল। অথচ খেলাফত যুগে সমস্ত কর্মচারীর মধ্যে তিনি নম্র, ভদ্র ও খোদাভীরু হিসেবে গণ্য ছিলেন। পরে তিনি এতে অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং স্বীয় পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তিনি বলেন, এ পদে আমি আসীন থাকি এটা ইনসাফের পরিপন্থি এ জন্যই যে, পদের গর্বেই আমার মুখ থেকে এমন বাণী উচ্চারিত হয়েছে।[২৮]

হযরত উমর ফারুক (রা.) এর খিলাফতকালে জনৈক ইহুদি হযরত আলী (রা.) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সে সময় হযরত আলী (রা.) খলিফার সাথে আলোচনায় রত ছিলেন। হযরত উমর (রা.) অভিযোগের বিষয়ে হযরত আলী (রা.) কে বললেন:

> হে আবুল হাসান! আপনি অভিযোগকারীর পাশে বসুন এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করুন। হযরত আলী (রা.) অভিযোগকারীর পাশে গিয়ে বসলেন কিন্তু তখন তিনি ভ্রু কুঞ্চিত করলেন। বিচার কার্য শেষ হওয়ার পর অভিযোগকারী চলে গেলে খলিফা আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বলায় আপনি প্রতিপক্ষের পাশে বসতে গিয়ে ভ্রু কুচকালেন কেন? জবাবে আলী (রা.) বললেন, তাকে ব্যাখ্যা করতে বলায় তিনি ভ্রু কুচকাননি বরং তিনি বিরক্ত হয়েছেন তাকে 'হাসানের বাবা' বলে সম্বোধন করার কারণে। কারণ কোনো অভিযুক্তকে যখন বিচারকালে কোনো পরিচয়ে ডাকা হয় তাহলে সেখানে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এজন্য আমি শঙ্কাবোধ করছিলাম যে, ইহুদি হয়ত ভাববে মুসলমানদের নিরপেক্ষ বিচার, সমতা ও ন্যায়পরায়ণতা বুঝি বিলীন হয়ে গেছে।[২৯]

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি কবিদের বিশেষ মর্যাদা দান করতেন। এ মর্যাদা দান শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্যই ছিল না। তিনি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে সমান চোখে

---

[২৬] *Ibid*, p. 44

[২৭] Jurji Zayadan, *History of Islamic Civilization Umayyads and Abbasids,* Tr. D.S. Margoliouth, Kitab Bhavan, 2006, New Delhi, p. 30; Von Kremer, *The Orient Under the Caliphs,* Tr. S. Khuda Bukhsh, Idarah-I Adabiyat-I Delli, New Delhi, 1983, p. 123

[২৮] *Izalat-ul-Khifa*', p. 203, quoted in Shibli Nu'mani, *op.cit*, p. 342

[২৯] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit*, p. 134

দেখতেন। তাঁর সময়ে আবু যুবাইদ নামক একজন কবি যখনই দরবারে আসতো তখন তিনি তাকে তাঁর পাশের আসনে বসাতেন।[৩০] অমুসলিমদের ব্যাপারে অনর্থক কোনো অবমাননাকর শব্দও ব্যবহার করা রাষ্ট্র পছন্দ করতো না। উল্লিখিত তথ্যাদির নিরিখে দেখা যায় যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে রাষ্ট্র কেবল মুসলিম নাগরিকদের সম্মান রক্ষায় নিয়োজিত ছিল না। একইভাবে অমুসলিম নাগরিকদের সম্মান রক্ষার্থেও বদ্ধপরিকর ছিল ।

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক অধিকার

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে অমুসলিম যিম্মিগণকে ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল। ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সকল বিজিত দেশে অমুসলিমদের বসবাস করার অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি তাদের ধর্মপালন ও কৃষ্টি রক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছিল।[৩১] খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে কখনো খলিফাগণ তার অধীনের লোকদেরকে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করেনি। তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম কবুল করতে বলা হয়নি এবং তাদেরকে তাদের স্ব-স্ব ধর্ম পালনে পূর্ণাঙ্গ 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'[৩২] দেওয়া হয়েছিল। কোনো অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কোনো ধরনের চাপ সৃষ্টি করা বিধেয় নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى-

"দীন গ্রহণে কোনো-জবরদস্তি নাই; সত্যপথ ভ্রান্তপথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে।"[৩৩] ইসলামি বিধান মতে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম গ্রহণে বা তার নিজস্ব ধর্মমত পরিবর্তনে কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করা যাবে না।[৩৪] ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তিমূলে রয়েছে পবিত্র কোরআনের পরিষ্কার ঘোষণা। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

---

[৩০] A. S. Tritton, *The Caliphs and their non-Muslim Subjects*, Frank Cass and Company Limited, London, 1970, p. 141

[৩১] G. E. Von Grunebaum, *Classical Islam A History 600-1258*, Tr. Katherine Watson, George Alien and Unwin Ltd., London, 1970, p.64; নূর মোহাম্মদ আযমী, *ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা*, সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডীজ, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৭০,পৃ. ৭৯

[৩২] ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি- মানুষ ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে অথবা যে কোনো আকীদাভুক্ত হতে পারবে। আবার সে কোনো প্রকার ধর্মের অনুসারী না হয়েও থাকতে পারবে। তার জন্য কোনো ধর্ম বা আকীদাভুক্ত হওয়ার দরকার নেই। ধর্মীয় আইনকানুন মানুক বা না মানুক এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ধর্মীয় আইনকানুন বা কোনো আকীদাভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তার উপর কোনো জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। ইসলাম কোনো মানুষকে ইসলামি আকীদা গ্রহণে জোরপূর্বক বাধ্য করে না। তবে ইসলাম যেভাবে মানুষকে কোনো ধর্ম গ্রহণ করা বা না করার স্বাধীনতা দিয়েছে অপরদিকে তাকে ইসলামের দিকে ডাকারও অধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ ইসলাম এমন একটি সমাজব্যবস্থার জন্ম দেয় যেখানে প্রত্যেকে তাদের সম্পদ, বিশ্বাস এবং অধিকার পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারে। কারো ধর্ম ও আকীদা নিয়ে হাসি-তামাশা করার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান খুবই কঠোর। কেননা ধর্ম ও আকীদাকে মানুষ তার নিজের জীবনের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান মনে করে। বিস্তারিত দেখুন, আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল্ মান্নান, *ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা*, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ঢাকা, তা.বি, পৃ. ৫৪

[৩৩] *আল-কুর'আন*, ০২:২৫৬

[৩৪] ড. আবদুর করিম যায়দান, *আদ দাওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ*, দারুল ইসলামিয়াহ, মিশর, তা.বি., পৃ. ৮২

افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين-

"তবে কি তুমি মু'মিন হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে?"[৩৫] অর্থাৎ জোর করে কাউকে ইসলামে প্রবেশ করানো আপনার কাজ নয়। আপনার দায়িত্ব হলো লোকদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া। কারণ ইসলাম স্পষ্ট ও প্রমাণিত সত্য। তবে কেউ যদি ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তা ভিন্ন কথা।

মুসলিমদের সমাজ সংস্কৃতি অমুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। অমুসলিমরা নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতি অনুযায়ী তাদের জীবন পরিচালনা করবে।[৩৬] খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে অমুসলমানরা নিজেদের এলাকা ও পরিমণ্ডলে স্ব স্ব ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে প্রকাশ্য ঢাকঢোল পিটিয়ে পালন করতো। হযরত মুহাম্মদ (স.) ইয়েমেন দেশীয় নাজরানের অধিবাসীদের সাথে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেছিলেন, এতে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, তাদের ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হলো এবং তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। তাদের কোনো পুরোহিতকে পদ থেকে সরানো যাবে না। তাদের ধর্মীয় সাধু-সন্ন্যাসীদেরকে উত্ত্যক্ত ও ব্রত পালন হতে বিরত রাখা হবে না।[৩৭] হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল (স.) এর আদর্শ অনুসরণ করে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ বিষয়ের আলোকেই তিনি হিরার অধিবাসীদের সাথে চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হন। খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ হিরার অধিবাসীদিগকে যে সনদ দান করেছিলেন, তাতে লেখা হয়েছিল যে, "তাদের ধর্মমন্দির বা গির্জাগুলো বিনষ্ট করা হবে না। প্রয়োজনের সময় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেসব দুর্গে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে সেগুলো ধ্বংস করা হবে না। তাদেরকে ঘণ্টা বা শঙ্খধ্বনি বাজাতে নিষেধ করা হবে না, তাদের উৎসবের সময় তাদের ক্রুশ শোভাযাত্রা বের করতে কোনো প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে না।"[৩৮] হযরত আবু বকর (রা.) যুদ্ধকালে সেনানায়কদের অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি অসদাচরণ না করতে নির্দেশ দিতেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

ক. কোনো বৃদ্ধ, শিশু ও মহিলাকে হত্যা করা যাবে না।

খ. কোনো যাজক বা তপস্বীকে উত্ত্যক্ত করা যাবে না অথবা তার উপাসনালয়ের কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

গ. ফসলের কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

---

[৩৫] *আল-কুর'আন*, ১০:৯৯

[৩৬] Maulana Mohd. Taqi Amini, *The Agrarian System of Islam,* Tr. Syed Ahmad Ali, Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 1991, p. 82

[৩৭] আবু 'উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সালাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮; Jurji Zayadan, *op.cit*, p. 120

[৩৮] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *কিতাবুল খারাজ* (আরবি), দারুল মারেফা, লেবানন, বৈরুত, ১৯৭৯, পৃ. ১৪১-১৪৩

ঘ. কোনো ফলবান বৃক্ষ ধ্বংস করা যাবে না।

ঙ. সকল অবস্থায় অমুসলিমদের সাথে চুক্তি রক্ষা করতে হবে।

চ. যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের মুসলমানদের ন্যায় মর্যাদা দিতে হবে।[৩৯]

অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা যাতে কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয় সে জন্য খলিফাগণ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাদের ধর্মীয় স্থানসমূহ সর্বদা রক্ষা করাসহ তাদের দুর্গগুলো ধ্বংস করা যাবে না। যুদ্ধচলাকালীন সময় তাদেরকে শত্রুদের থেকে রক্ষা করতে হবে।[৪০] হযরত উসামাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে সিরিয়া অভিযানের সময় হযরত আবু বকর (রা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা এই ছিল যে, "যুদ্ধে যাওয়ার পথে তোমাদের সাথে এরূপ অনেক লোকের সাক্ষাৎ ঘটবে, যারা উপাসনালয়ের মধ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে। তাদেরকে তোমরা তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিবে।"[৪১]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট জেরুজালেম সমর্পণের সময় যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তার কিছু অংশ ছিল নিম্নরূপ :

> করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা ও আমিরুল মুমেনিন উমরের পক্ষ থেকে জেরুজালেমের অধিবাসীদেরকে এই নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে যে, তাদের জীবন, তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, তাদের গির্জা, তাদের ক্রুস, তাদের ধর্মসংক্রান্ত সবকিছু এবং তাদের সাথে যারা সম্পর্কযুক্ত তা সে সুস্থ থাকুক অথবা অসুস্থ থাকুক, তাদের গোত্রের সকলে নিরাপত্তার অধীনে থাকবে। গির্জাগুলো পরিবর্তন করে আবাসিক গৃহে পরিবর্তন করা যাবে না বা ধ্বংস করা যাবে না। বলপূর্বক তাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা হবে না , তাদেরকে কোনোভাবেই খাটো করা যাবে না, ক্ষতিগ্রস্ত করাও যাবে না। তাদের ধর্মের ব্যাপারে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা যাবে না বা তাদের কারোরই কোনোরূপ ক্ষতি করা যাবে না।[৪২]

হযরত উমর (রা.) জেরুজালেমে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর জেরুজালেমের প্রধান ধর্মযাজকের সঙ্গে পবিত্র স্থানগুলো ঘুরে দেখেন। ঘুরাঘুরির সময়ে নামাজের সময় হলে প্রধান যাজক খলিফাকে গির্জায় নামাজ আদায় করতে বলেন। তখন খলিফা সেখানে নামাজ পড়তে আপত্তি জানান এই জন্য যে, যদি তিনি গির্জায় নামাজ আদায় করেন, তাহলে ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি এখানে নামাজ আদায় করলে পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীরা এটাকে মুসলমানদের উপাসনালয় বলে দাবি করতে পারে।[৪৩] মুসলমানরা এ স্থানটিকে যেন তাদের উপাসনালয় তৈরি করতে না পারে এবং

---

[৩৯] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit*, p. 120

[৪০] Dr. Mehboob Desai, *Islam and Non-violence*, Gyan Publishing House, New Delhi, 2009, p. 103

[৪১] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, *তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক*, খণ্ড-৩, দারুল মা'রিফ, মিসর, ১৯৬৭, পৃ. ২২৭

[৪২] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০৯-৬১০

[৪৩] T. W. Arnold, *The Preaching of Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1999, pp. 51-52; M. M. Picthall, *The Cultural Side of Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2007, p. 103; Maulana Muhammad Ali, *op.cit*, pp. 137-38

অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা যেন অক্ষুন্ন থাকে সেজন্য হযরত উমর (রা.) প্রধান ধর্মযাজকের অনুরোধ সত্ত্বেও গির্জায় নামাজ আদায় করেন নি।

হযরত উমর (রা.)-এর সময় অমুসলিম নাগরিকরা তাদের নিজ ধর্মের চেয়েও ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে থাকাকে অধিক পছন্দ করতেন। 'আনাত' বাসীর সাথে খালিদ বিন ওয়ালিদ স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বলা হয়- "তাদের ধর্মমন্দিরসমূহ বিনষ্ট করা হবে না। তাদেরকে নাক্কোস বা ঘণ্টাধ্বনি বাজাতে বাধা দেওয়া হবে না, নামাজের সময় ব্যতীত যখন ইচ্ছা তখন তারা নাক্কোস বাজাতে পারবে। তাদের উৎসবের দিনে তারা ক্রুশ শোভাযাত্রা বের করতে পারবে।"[৪৪] হযরত উমর (রা.) যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীকে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারের ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেওয়ার কথা বলেছিলেন এবং তাদের সাধ্যের বাইরে কোনো বোঝা চাপানোর জন্য নিষেধ করেন। তাদের মান-সম্মান ও জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে হবে। চুক্তির বাইরে তাদের উপর করারোপ করা যাবে না।[৪৫]

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলে মার্ভের খ্রিস্টান পেট্রিয়ার্ক ফার্সের বিশপ সিমীয়নকে বলেছিলেন, "যে আরবদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার রাজত্ব দান করেছেন তারা খ্রিস্টধর্মের ওপর আক্রমণ করে না, তারা আমাদের ধর্মের সহায়তা করেন। আমাদের পাদ্রী ও প্রভুভক্তদেরকে সম্মান করেন এবং গির্জা ও খানকাসমূহের জন্য অনুদান প্রদান করেন।[৪৬]

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে অমুসলিমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ উপাসনালয়ে যাতায়াত করতে পারতো। তাদের জনপদের মধ্যে পুরাতন উপাসনালয়গুলোর সংরক্ষণ ও সংস্কারের পাশাপাশি নতুন উপাসনালয় তৈরি করতে পারতো। *আমসারুল মুসলিমিন* বা মুসলমানদের হাতে যে সকল নগরীর পতন হয়েছে, যেমনঃ কুফা, বসরা, ওয়াসিত প্রভৃতি বা যেসব শহরকে ইসলামি সংস্কৃতির জন্য সরকার সংরক্ষিত ঘোষণা করেছিল। এগুলো ছাড়া যে কোনো শহরে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, মেলা, গির্জা ও উপাসনালয় তৈরি করা, বাদ্য বাজনার পূর্ণ অধিকার ছিল। তবে রাষ্ট্র অমুসলিমদের নিকট থেকে আশা করে তারা মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। যে সকল মুসলিম জনপদে অমুসলিমদের প্রাচীন কোনো গির্জা নেই, সেখানে নতুন করে কোনো গির্জা নির্মাণ করা যাবে না। কিন্তু মুসলিম জনপদের অভ্যন্তরে অমুসলিমদের প্রাচীন উপাসনালয় থাকলে সেখানে তারা তাদের সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে

---

[৪৪] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৬

[৪৫] Maulana Muhammad Ali, *op.cit*, p. 182; Muhammad Hamidullah, *Muslim conduct of State*, SH. Muhammad Ashraf, Lahore, 1977, p. 113

[৪৬] Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, Cosimo Classics, New York, 2010, p. 274

পারবে এবং কোনো কারণে গির্জার সংস্কার প্রয়োজন হলে তা পুনঃনির্মাণের অধিকার তাদের থাকবে।[৪৭] এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যাতে প্রমাণিত হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের সময় রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল।

জীবিকা উপার্জন ও চাকুরির অধিকার

ইসলাম সকল মানুষকে জীবিকার জন্য সমান অধিকার দিয়েছে। কর্মগ্রহণ ও পেশা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়াহ যেমন মুসলিম নাগরিকদের জন্য যেমন নির্দিষ্ট কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি ঠিক তেমনি অমুসলিম নাগরিকদের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি কিংবা তাদের জন্য কোনো কর্মের দ্বার রুদ্ধ করেনি। সকল ধরনের বৈধ কাজ করার ব্যাপারে ইসলাম আগ্রহ যুগিয়েছে এবং কাজ ও কর্মীর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন,

هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه-

"তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়াছেন। অতএব, তোমরা উহার দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর।"[৪৮] ইসলামি শরিয়াহ এর নীতিমালার আলোকে আমরা দেখতে পাই, খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে শিল্প, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষিসহ বিভিন্ন পেশা ও চাকুরিতে যোগদানের ব্যাপারে মুসলমানদের মতো অমুসলিমদেরও সমান অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল। যোগ্যতা, দক্ষতা, বিশ্বস্ততা, কর্মনিষ্ঠা ও সামর্থ্য অনুযায়ী মুসলমানদের মতো অমুসলিমরাও স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন চাকুরি, যে কোনো কর্ম ও পেশা গ্রহণ করতে পারত। তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন চাকুরি, কর্ম ও পেশা অবলম্বনে বাধ্য করা হতো না। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফ্ইয়ান (রা.) কে সিরিয়ার আমির নিয়োগ করে প্রেরণের সময় বলেন,

> হে ইয়াযিদ, তোমার আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। আমি তোমার দিক থেকে এটা সর্বাধিক আশঙ্কা করছি যে, তুমি বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাপারে তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে যদি আত্মীয়তার কারণে কাউকে কোনো কাজে তাদের কর্তা নিয়োগ করে, তা হলে তার ওপর আল্লাহর লা'নত পতিত হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার কোনো ধরনের ফরজ ও নফল ইবাদত (অথবা তার কোনো তওবা বা বিনিময়) গ্রহণ করবেন না, যে যাবত না তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।[৪৯]

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফইয়ান (রা.) কে ইসলামের নীতিমালা ও বিধিবিধান যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। রাষ্ট্রের ভিতরে বসবাসকারী সকলের যোগ্যতার

---

[৪৭] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল কা'সানী, খ.৭ *পূর্বোক্ত*, পৃ.১১৩-১১৪

[৪৮] *আল-কুর'আন*, ৬৭:১৫

[৪৯] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, (বিশ্লেষক, শোয়াইব আল আরনাবুত), *মুসনাদুল ইমামে আহমদ ইবনু হাম্বল*, প্রথম খণ্ড, হাদিস নং-২১, মুয়াসাসাতু আর রিসালা, বইরুত, ১৯৯৫, পৃ. ২০২

মাপকাঠি হবে একই রকম। কাউকে ধর্মীয় পরিচয়ে নয় বরং যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জীবিকা অর্জনের জন্য চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের মতো অমুসলিমদেরও সরকারি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হবার সম অধিকার ছিল। হযরত উমর (রা.) ইরাকের ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করার ব্যাপারে তৎকালীন অমুসলিম অধিবাসীদের মোড়লদের ডেকে পরামর্শ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রতি আদেশ দিয়েছিলেন।[৫০] আরবদের রাজ্য বিজয়ের প্রথমদিকে আমরা লক্ষ্য করি যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের করণিক কাজকর্মগুলো করার জন্য আরবদের মধ্যে থেকে কাউকে পাওয়া যেত না বা তাদের দ্বারা কাজ করানো সম্ভব হতো না। তখন স্থানীয় লোকজনকে এ কাজের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হতো। মাঝে আরবরা উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পেতে ঝামেলায় পড়তেন। মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ (রা.), ওয়াকিদী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'কায়সারিয়ায়' প্রায় চার হাজার লোক তাদের হাতে বন্দী হয়। মুয়াবিয়া (রা.) তাদেরকে হযরত ওমর (রা.) এর নিকট পাঠালে খলিফা ওমর (রা.) তাদেরকে 'জুরফে' অবস্থান করতে নির্দেশ দেন। তাদের মধ্য থেকে তিনি কয়েকজনকে দাস হিসেবে এতিম আনসারদের দিলেন। আর কাউকে মুসলমানদের লেখাপড়ার কাজে নিয়োজিত করেন।[৫১] খলিফা উমরের (রা.) সময় একজন অমুসলিম ইঞ্জিনিয়ার মিসরের একটি নদীর নক্শা প্রস্তুত করেছিলেন। সেই নক্শা অনুসারে হযরত উমর (রা.) কায়রো থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল খনন করেন।[৫২] আবু মুসা আশআরীর একজন খ্রিস্টান সচিব ছিল।[৫৩] তবে সংরক্ষিত কিছু পদে অমুসলিমদেরকে নিয়োগ দেওয়া হতো না। আর এ নিয়োগ না দেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও আদর্শ। যেমন- রাষ্ট্রপ্রধানের পদ, সেনাপ্রধানের পদ, মুসলিম আদালতের কাযি তথা বিচারক, সদ্কা বিতরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। এ সকল পদগুলোর দায়িত্ব পালনের জন্য মুসলিম হওয়ার শর্ত থাকার কারণে অমুসলিমদেরকে এ সকল পদে নিয়োগ দেওয়া হতো না। এগুলো ছাড়া প্রশাসনের বাকি অন্যান্য বড় বড় পদে অমুসলিমদেরকে নিয়োগ দেওয়া হতো। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে সকল চাকুরিতে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা ভিন্ন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

অর্থনৈতিক অধিকার

রাষ্ট্রীয় পরিসীমার মাঝে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না পেলে সে রাষ্ট্র বা ব্যক্তির গোলামে পরিণত হয়। তখন তার বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই ইসলাম মুসলিমদের মতো অমুসলিমদেরকে

---

[৫০] Shibli Nu'mani, *op.cit.*, p. 337

[৫১] আহমাদ ইবন্ ইয়াহইয়া ইব্ন জাবির আল বাগদাদী আল-বালাযুরী, *ফুতহুল বুলদান*, তবউল কুতুব আল আরাবিয়্যাহ, কায়রো, ১৯০১,পৃ. ১৪৮-১৪৯

[৫২] ফরীদুদ্দীন মাস্উদ, *ইসলামি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২৩ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৪১৫

[৫৩] A. S. Tritton, *op.cit*, p. 18

স্বাধীনভাবে যে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একাকী বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালনা করার বৈধ অধিকার দিয়েছে। অবশ্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য যে সকল ব্যবসা অবৈধ সে সকল ব্যবসা ছাড়া বাকি সকল ব্যবসা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে করার ক্ষেত্রে ইসলামে কোনো বাধা নেই।[৫৪] একটি দেশ বা জাতির সমৃদ্ধির ও উন্নয়নের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণের মাপকাঠি হলো উক্ত দেশের নাগরিকদের ধর্ম-বিশ্বাসের দিকে না তাকিয়ে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হস্ত প্রসারিত করা।[৫৫] বৈশ্বিক বিষয়ে উভয়েই সমান সুযোগ ও মর্যাদা লাভের অধিকারী। অর্থনৈতিক লেনদেন ও কারবার পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা বাইয়ে মুশারাকাহ (co-ownership)[৫৬], বাইয়ে মুদারাবাহ (profit & loss sharing)[৫৭], বাইয়ে মুয়াজ্জাল[৫৮] প্রভৃতি পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অমুসলিমদের জীবিকা উপার্জনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যা মুসলমানদেরকে প্রদান করা হয়নি। যেমন- নেশাজাতীয় পানীয় পানের আসর খোলা ও ক্রয়-বিক্রয়, শূকর লালন-পালন, ক্রয়-বিক্রয় ও এর গোস্ত ভক্ষণ করা। এ ক্ষেত্রে মুসলিমরা এ কাজকে পাপ ও অপরাধ মনে করলেও অমুসলিমদের নিকট এ দুটির আর্থিক মূল্য থাকায় তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন বৈধ। এ সকল কর্মকাণ্ড মুসলিম প্রধান শহরগুলোতে তারা প্রকাশ্য মুসলিমদের মধ্যে সম্পাদন করতে পারবে না।[৫৯] ফিকাহবিদগণের মতে ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সব ধরনের আর্থিক চুক্তি ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে অমুসলিমদেরকে মুসলমানদের সমঅধিকার প্রদান করা হয়েছে। তবে রিবা বা সুদ এ অধিকার বহির্ভূত। কারণ মুসলমানদের মতো অমুসলিমদের জন্যও সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও পরিত্যাজ্য। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.)-এর ভাষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জাতীয় সম্পদ বণ্টন প্রসঙ্গে নিজের জিম্মাদারির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন : "আল্লাহর শপথ! আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে সানআর পার্বত্য অঞ্চলের মেষচালক তার স্বস্থানে বসে

---

[৫৪] S. M. Yusuf, *Economic Justice in Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2009, p. 14

[৫৫] ড. এডওয়ার্ড গালী আদ-দাহাবী, *মু'আমিলাতু গাইরিল মুসলিমীনা ফিল মুজতামি'ইল ইসলামি*, মাকতাবাতু গারীব, কায়রো, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৯

[৫৬] বাইয়ে মুশারাকাহ এমন এক ধরনের অংশীদারি কারবার, যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে কারবার পরিচালনা করে। এতে সকল অংশীদার মূলধন গঠনে অংশ নেন। ব্যবস্থাপনায় সকল অংশীদারের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী অংশীদারদের মাঝে লাভ-ক্ষতি আনুপাতিক হারে বণ্টিত হয়। এ কারবার শুরু করার পূর্বে লিখিত চুক্তি করা বাধ্যতামূলক। কোন অংশীদার কারবারের কর্মচারী হলে নির্ধারিত বেতন-ভাতাদি পাবেন। যৌথ মালিকানা অংশীদারি ব্যবস্থার পূর্বশর্ত নহে। *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ২০শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩৫

[৫৭] বাইয়ে মুদারাবাহ্ এমন এক ধরনের অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসা, যেখানে একজন বা একপক্ষ পুঁজি সরবরাহ করে এবং অপরপক্ষ ব্যবসায় অভিজ্ঞতা, মেধা, দক্ষতা, সময় ও শ্রম নিয়োগ করে। এ পদ্ধতিতে যিনি অর্থের যোগানদাতা তাকে সাহিবুল মাল আর যিনি কারবারে চুক্তি অনুযায়ী সময়, মেধা, অভিজ্ঞতা ও শ্রম প্রদান করেন তাকে মুদারিব বলা হয়। এ ধরনের ব্যবসায় যে মুনাফা অর্জিত হয় তা দু পক্ষের মধ্যে পূর্বসম্মত হারে ভাগ হয়। আর লোকসান হলে আর্থিক তহবিল প্রদানকারী অর্থাৎ সাহিবুল মাল ক্ষতির অংশ বহন করবেন। চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য এমন দুই ব্যক্তির একজনের প্রস্তাব ও অপরজনের প্রস্তাব গ্রহণই এর মূল উপাদান। সাইয়্যেদ সাবেক, খণ্ড-৩, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১-১৭৩

[৫৮] বাইয়ে মুয়াজ্জাল হচ্ছে ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা। এটি বাকিতে পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি। চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, পণ্য সরবরাহের স্থান ও সময়, দাম পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্টভাব উল্লেখ থাকে। চুক্তিটি অবশ্যই লিখিত হতে হবে। এ পদ্ধতিতে বিক্রেতা মুনাফার পরিমাণ চুক্তিতে উল্লেখ করতে বাধ্য নন। এ. এ. এম. হাবীবুর রহমান, *ইসলামি ব্যাংকিং*, হক প্রিন্টার্স, ঢাকা, ৭ম সংস্করণ, ২০১৬, পৃ. ১৭০-১৭১

[৫৯] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল কা'সানী, খ-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১১৩; Dr. Mohammad Muslehuddin, *Islam and its Political System*, Kitab Bgavan, New Delhi, 1999, p. 50

তার প্রাপ্য অংশটুকু পেয়ে যাবে কোনোরূপ চেষ্টা তদবির ছাড়া এবং চেহারায় বিষন্নতার ছাপ ব্যতীরেকে।”[৬০] এ সংক্রান্ত অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। আবু আবদুল্লাহ বা আবু আবদুর রহমান বলেন, “একবার হযরত সা'দের সঙ্গে সফরে রাস্তায় আমাদের রাত্রিযাপন করতে হয়। নিকটেই একজন যিম্মির বাড়ি ছিল। আমরা বাড়ির মালিকের সন্ধান করলাম কিন্তু সে বাড়িতে ছিল না। তখন সা'আদ বললেন, ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করে যদি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে চাও, তাহলে যিম্মিদের কোনো কিছুই স্পর্শ করো না। সুতরাং আমরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় সমস্ত রাতটা তার দেয়ালের পাশে কাটিয়ে দিলাম।”[৬১] খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের আমরা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এরকম অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

রাজনৈতিক অধিকার

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে একজন মুসলমান নাগরিকের মতই একজন অমুসলিম নাগরিক গঠনমূলক মতামত প্রকাশ করতে পারতেন। রাষ্ট্রের সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আইনসঙ্গতভাবে সরকার, সরকারের শাসননীতি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকার প্রধানের সমালোচনা করার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে কখনো বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং মতামত ও বিবেকের স্বাধীনতা অমুসলিমদের খর্ব হয়েছে এমন লক্ষ করা যায়নি বরং প্রশাসকদেরকে তাদের মতামত নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হতো। হযরত উমর (রা.)-এর সময় বিনয়ামীন নামে মিসরে কিতবীদের একজন বড় নেতা ছিলেন। হযরত উমর (রা.) জানতে পারলেন যে, স্বীয় সম্প্রদায়ে তাঁর বিশ্বস্ততা, মর্যাদা ও প্রভাব রয়েছে। তখন তিনি মিসরের গভর্নর আমর বিন আস (রা.) কে সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য লিখে পাঠান। খলিফার পরামর্শ মোতাবেক আমর বিন আস (রা.) পরামর্শ গ্রহণ করেন।[৬২]

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে খলিফাগণ অমুসলিমদের নিজস্ব ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, পরামর্শ ছাড়া খিলাফত পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই আমরা হযরত উমর (রা.)-এর সময় লক্ষ করি যে, তিনি অমুসলিমদের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রশাসন, অর্থনীতি ও সামরিকসহ নানান বিষয়ে পরামর্শ করতেন। ইরাকের রাজস্ব নির্ধারণকালে তিনি পূর্ববর্তী জেরোষ্টাইন ও মেজিয়াইনদের কাছ থেকে সহযোগিতা চেয়েছিলেন। ভূমিতে রাজস্ব নির্ধারণের জন্য সেখানকার নেতাদেরকে মদিনায় আমন্ত্রণ করেন এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ইরাকের ভূমিতে করারোপ করেন। মিসরের প্রশাসন সংক্রান্ত

[৬০] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১২
[৬১] আবূ ‘উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সালাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫০
[৬২] ফরীদুদ্দীন মাস্‌উদ, *পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩;* নূর মোহাম্মদ আযমী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৫

জটিলতায় সাবেক শাসক মাকাউক্কাম এর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে তিনি সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজান।[৬৩]

অমুসলিমদের ধর্মীয় বিষয়াদিতে শুধু তাদের মতামতই গ্রহণযোগ্য। তারা নিজেদের ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং একজন অমুসলিম যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করলে সরকারের কোনো আপত্তি থাকতো না। তারা তাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা যা দিতেন তা সরকার মেনে নিতো। এ ক্ষেত্রে অন্য কারো মতামত গ্রহণযোগ্য হতো না। হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে ইয়ামামার গভর্নর মুহাজির ইবনু আবু উমাইয়্যাহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচারণা চালানোর অভিযোগে জনৈকা অমুসলিম মহিলার হাত কর্তন করেন এবং দাঁত উপড়ে ফেলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাকে ভৎর্সনা করে পত্র লিখেন। এ পত্রে তিনি কাজটি যে মোটেই ঠিক হয়নি তা উল্লেখ করেন। তাছাড়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচারণা বড় ধরনের কোনো অন্যায় নয় বলে পত্রে উল্লেখ করেন।[৬৪] অবশ্য খিলাফত রাষ্ট্র যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে অবমাননা করার অধিকার মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে দেশের কোনো অধিবাসীকে দেওয়া হয়নি। ইসলাম অমুসলিমদেরকে তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেও ইসলাম বিষয়ক কোনো বিষয়ে তারা মতামত প্রদান করতে পারতো না। অমুসলিমরা রাষ্ট্রীয় সীমানার ভেতর যে কোনো ধর্মমত গ্রহণ করতে পারলেও মুসলিমরা আপন ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারতো না।

বিচার প্রাপ্তির অধিকার

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল নাগরিকই বিচারের ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাওয়ার উপযোগী ছিল। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের মর্যাদা সমান ছিল। খলিফা কিংবা তার সরকারের যে কোনো উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও মুসলিম অমুসলিম যে কোনো নাগরিক বিচার প্রার্থী হতে পারতো। বিচারক বাদী বিবাদীর মাঝে কে মুসলিম, আর কে অমুসলিম, কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা কে খলিফা অথবা কে সাধারণ নাগরিক এই বিবেচনায় বিচারকার্য পরিচালনা করতেন না। বিচারক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। বস্তুত আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ও বিচারের ক্ষেত্রে সাম্য–এ দুটোই ছিল খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমিরুল মু'মিনিন হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতের সময় জনৈক ইহুদি তাঁর একটি বর্ম চুরি করে নিয়ে যান। হযরত আলী (রা.) মামলা দায়ের করেন কাযির আদালতে। খলিফা হয়েও তিনি একজন সাধারণ নাগরিকের মতোই আদালতে উপস্থিত হন। তখন কাযি সুরায়িহ ইবন আল হারিস আল কিনদি খলিফাকে তার পক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করতে বলেন। হযরত আলী (রা.) দুজন সাক্ষী উপস্থিত করলেন। একজন হলেন তাঁর ছেলে হযরত হাসান (রা.) ও এবং কানবার।

---

[৬৩] Shibli Nu'mani, *op.cit.*, p. 337 ; Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit*, p. 126
[৬৪] আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫০

বিচারক মামলাটি খারিজ করে দেয় এই বলে যে, কোনো পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। ইহুদি ব্যক্তিটি ইসলামের সাম্য, ন্যায়, ইনসাফ ও সুমহান বিচারনীতি প্রত্যক্ষ করে সে অকপটে স্বীকার করে যে, বর্মটি তার নয়। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করে বর্মটি হযরত আলী (রা.) কে ফেরত দেয়।[৬৫]

সংখ্যালঘুদের পারিবারিক আইন

অমুসলিমদের পারিবারিক কর্মকাণ্ড তাদের নিজস্ব 'ব্যক্তিগত আইন' (Personal Law) অনুসারে নিষ্পত্তি হতো। মুসলিম আইনের বাইরেও তারা তাদের নিজস্ব বিধানেরও সুযোগ গ্রহণ করতে পারতো এবং সেসব ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর জন্য থাকে নিজস্ব বিচারালয় ও বিচারকমণ্ডলী। স্ব-স্ব ধর্মীয় প্রধানগণ তাদের বিচার করতেন। ঐতিহাসিক P. K. Hitti বলেন,

> Being outside the pale of Moslem law they were allowed the jurisdiction of their own canon laws as administered by the respective heads of their religious communities.[৬৬]

এ বিষয়ে রাষ্ট্র তাদের উপর ইসলামি বিধি-বিধান কার্যকর করতে পারতো না। অমুসলিমদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী একে অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে পারতো না যতক্ষণ না তারা তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণরূপে প্রমাণিত না হয়।[৬৭] মুসলিমদের ধর্মীয় আইনে মুসলমানদের পারিবারিক জীবনে যেসব বিষয় অবৈধ তাদের ধর্মীয় আইনে তা যদি বৈধ হয় তাহলে আদালত তাদের আইন অনুযায়ী ফয়সালা করতো। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে মুসলিম শাসকবর্গ কখনোই তাদের ধর্মীয় আইনের আওতায় অমুসলিমদের বিচারকার্য পরিচালনা করেননি। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে মিসরের শাসনকর্তা আমর বিন আস মিসরের কিবতীদের নেতা বিনয়ামীনকে কিতবীদের ব্যক্তিগত আইনের ভার অর্পণ করেন। ইসলাম অমুসলিমদেরকে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী বিয়ে, তালাক, পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা কিংবা এ ধরনের অন্যান্য কার্যাবলিতে নিজস্ব আইন প্রয়োগ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে।[৬৮] যেমন : সাক্ষী ব্যতিরেকে বিয়ে, মোহর ব্যতিরেকে বিয়ে, ইদ্দত চলাকালে দ্বিতীয় বিয়ে অথবা মুহরিম মহিলাদের বিবাহ করা জায়েজ যদি তাদের আইনে বৈধ হয়ে থাকে তাহলে এসব কাজ তাদের জন্য জায়েজ হবে। এ সকল ক্ষেত্রে বিচারের জন্য তারা ইসলামি আদালতে আসতে বাধ্য নয়। তবে পারিবারিক আইনের সাথে জড়িত কোনো বিবাদে যদি একপক্ষ অমুসলিম হয় আর এক পক্ষ মুসলিম হয় তাহলে এ বিচারকার্য ইসলামি আইন অনুসারে সম্পাদিত হতো। যেমন কোনো খ্রিস্টান মহিলার স্বামী যদি মুসলিম হয়

---

[৬৫] সালেহ হুসাইন আল-আয়েদ, *মুসলিম বিশ্বে অমুসলিমদের অধিকার*, অনু. ইউসুফ ইয়াসীন, আল্লামা আলীমুদ্দীন একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ.৪৩-৪৪
[৬৬] Philip K Hitti, *op.cit*, p.170
[৬৭] শামসুদ্দীন আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খণ্ড-৫, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, পৃ. ১২৫
[৬৮] সাইয়্যেদ সাবেক,*প্রাগুক্ত*, খণ্ড-৩, পৃ. ৩২

আর সে যদি মারা যায়, তাহলে ঐ মহিলা স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালন না করে বিয়ে করতে পারতো না। কেননা ইসলামি রীতি অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পর পুরোপুরি ইদ্দত পালন করতে হবে। যদি সে মহিলা তার নিজের ধর্মের নিয়মানুযায়ী ইদ্দত পালন না করে বিয়ে করে তাহলে তার বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে।[৬৯] ইসলামি বিধি-বিধান মোতাবেক একজন মুসলিম পুরুষ আহলে কিতাবভুক্ত কোনো নারীকে বিয়ে করতে পারলেও একজন মুসলিম নারীর অমুসলিম পুরুষের সাথে বিয়ে অবৈধ, চাই সে পুরুষ মুশরিক হোক বা আহলে কিতাব হোক। মহান আল্লাহর বাণী,

يايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنت مهجرت فامتحنوهن- الله اعلم بايمانهن- فان علمتموهن مؤمنت فلا ترجعوهن الى الكفار-لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن-

"হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে আসে, তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নিও। তাদের ঈমান সম্বন্ধে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন। যদি তোমরা জানতে পারো তারা ঈমানদার, তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না। তারাও কাফেরদের জন্য হালাল নয়, কাফেররাও তাদের জন্য হালাল নয়।"[৭০]

আর যদি কখনো এমন হয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিরোধ ঘটে এবং কোনো আদালতে বিচারকার্য সম্পন্ন হবে তা স্থির না হয় এবং নিজেদের আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা না করে ইসলামি আদালতে মামলা দাখিল করে তাহলে তাদের বিচার ফয়সালা করা হবে ইসলামি আইন অনুযায়ী। তখন উক্ত মামলা ইসলামি আইন অনুযায়ী বিচার করবে, নতুবা মামলা খারিজ করে দিবে। আল্লাহ বলেন,

فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم- وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا- وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط- ان الله يحب المقسطين-

"তাহারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদেরকে উপেক্ষা করিও। তুমি যদি তাহাদেরকে উপেক্ষা কর তবে তাহারা তোমার কোনো ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর তবে তাহাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিও ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।"[৭১]

ফৌজদারি ও দেউয়ানি আইন

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ফৌজদারি ও দেউয়ানি আইনে মুসলিম-অমুসলিমের অধিকার সমান ও অভিন্ন ছিলো। ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে মুসলিমকে যে সাজা দেওয়া হয়, অমুসলিম নাগরিককেও তাই দেওয়া হয়।

[৬৯] শামসুদ্দীন আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খণ্ড-৫, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮-৪১
[৭০] *আল-কুর'আন*, ৬০:১০
[৭১] *আল-কুর'আন*, ০৫:৪২

ইসলামে আন্তজার্তিক সম্পর্কের বিষয়ে একটি মৌলিক নীতি এই যে, পার্থিব জগতে শাস্তি ভোগের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সকলেই সমান।[৭২] মুসলিমের জিনিস অমুসলিম অথবা অমুসলিমের জিনিস যদি মুসলিম চুরি করে তাহলে উভয় ক্ষেত্রে চুরির অপরাধে চোরের হাত কেটে ফেলা হবে। যিনার ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের শাস্তি সমান। তবে যিম্মি যদি নিজেদের মাঝে যিনায় লিপ্ত হয় তাহলে তাদেরকে তাদের সমাজের হাতে অর্পণ করতো। কিন্তু মদ্যপানের ব্যাপারে অমুসলিমরা ব্যতিক্রম। কেননা মদ তাদের জন্য বৈধ বিধায় মদ পানের শাস্তি থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হতো।[৭৩] ব্যবসা-বাণিজ্যের যেসব নিয়ম-নীতি মুসলমানদের জন্য বৈধ ঠিক তেমনিভাবে সেগুলো অমুসলিমদের জন্যও বৈধ। আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সকল পন্থা মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ ঠিক তেমনি সেগুলো অমুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ ছিলো। সুদি কারবার মুসলিম-অমুসলিম সবার জন্য নিষিদ্ধ হলেও মদ্যপান ও শূকর এর ব্যতিক্রম। অমুসলিমরা নিজস্ব জনপদে শূকর লালন-পালন, কেনাবেচা, খাওয়া এবং মদ বানানো, পান করা ও কেনাবেচা করতে পারতো। যদি কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিমের মদ কিংবা শূকর নষ্ট করে বা কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করে তাহলে তাকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হতো। তবে কোনো অমুসলিম যদি কোন মুসলিমের মদ নষ্ট করে কিংবা তার শূকরের ক্ষতি সাধন করে তাহলে ঐ দুটি বস্তুর জন্য অমুসলিমকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হতো না। কেননা ইসলাম মদ ও শূকরের ব্যবসা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে।[৭৪]

শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের অধিকার

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে খলিফাগণ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষাপদ্ধতি বিস্তারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সে সময় বর্তমান সময়ের ন্যায় কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান না থাকায় মসজিদ ও ব্যক্তিগত গৃহে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হতো। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই সে সময় উপরিউক্ত দুটি পদ্ধতির যে কোনো একটি পদ্ধতি গ্রহণ করে শিক্ষা গ্রহণ করতো। প্রত্যেক ব্যক্তিরই শিক্ষালাভের অধিকার ছিল। আর শিক্ষালাভের মাধ্যমে মানুষের বিবেক আলোকিত হয়, তার সত্তা উন্নতি লাভ করে এবং তার মর্যাদার স্তর উন্নত হয়।[৭৫] হযরত উমর (রা.) জনসাধারণের শিক্ষার জন্য সর্বপ্রথম সুব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষক ও পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। সে সময় অমুসলিমদের মধ্য হতেও শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হতো। সে সময় খলিফা ও সাধারণ নাগরিকগণ অমুসলিম পণ্ডিতদেরকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। অমুসলিমদেরকে ইসলামের ধর্মীয় বিধি-বিধানের পুস্তক পাঠদানে বাধ্য করা হতো না। দেশের সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিংবা নিজেদের বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

[৭২] Dr. Muhammad Hamidullah, *Introduction to Islam*, *op.cit*, p. 140
[৭৩] শামসুদ্দীন আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খণ্ড-৯, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮
[৭৪] শাম্স আল দীন আবু বকর মুহাম্মদ বিন আহম্মদ আস-সারাখসী, খণ্ড-৫, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪৩
[৭৫] সাইয়্যেদ সাবেক, খণ্ড-৩, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

নিজেদের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং নিজেদের মধ্যে স্ব-স্ব ধর্মের প্রচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের ছিল। তারা তাদের ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করে ধর্ম প্রচারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো। অমুসলিমদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে খ্যাতি অর্জন করে সাহিত্য-সংস্কৃতির ময়দানে খলিফাদের সাথে এক চমৎকার বলিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।[৭৬] খলিফাগণও কাব্যচর্চা করতেন। তদানীন্তন বিশ্বে আরবীয় সাহিত্য যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলো। খলিফাগণ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করায় খিলাফত রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও আইন অথবা ফিক্‌হ, আরবি ব্যাকরণ, অঙ্ক, দর্শন প্রভৃতি চর্চা করা হতো। হযরত আলী (রা.)-এর শাসনামলে কুফা ও বসরা দুইটি প্রধান শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়।

অমুসলিমদের জন্য বৃত্তি বা ভাতা

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে রাষ্ট্রের সমুদয় রাজস্ব বায়তুল মালে জমা হতো। সেখান থেকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করে বাকি সমুদয় অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করা হতো। রাষ্ট্রের যে সকল অমুসলিম অধিবাসী জীবিকা উপার্জনে অক্ষম তাদের ভাতা 'বায়তুল মাল' হতে প্রদান করা হতো। খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে সেনাপতি খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা.) ইরাকের 'আল হিরা' অঞ্চল জয় করে তাদের সাথে যে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তার একটি অংশ এখানে উল্লেখযোগ্য। তাতে তিনি লিখেছিলেন : "অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে যে লোক কর্মক্ষমহীন বৃদ্ধ, যারা চলৎ শক্তিহীন তথা পঙ্গুত্ব বা প্রাকৃতিক কোনো বিপদ-আপদের কারণে অথবা ধনী থাকার পর দরিদ্র হয়ে পড়ার কারণে যদি এমন অবস্থায় পড়ে যায় যে, তার স্বধর্মীরা তাকে দান-খয়রাত দিতে শুরু করে, তাহলে তার নিকট থেকে জিয্‌ইয়া নেওয়া বন্ধ করা হবে। তাদের সমুদয় ব্যয়ভার রাষ্ট্র বহন করবে।"[৭৭] সেনাপতি খালিদ ইব্‌ন ওলীদ হিরা শহর জয় করার পর বিজয়ের সংবাদ হযরত আবু বকর (রা.) জানাতে গিয়ে বলেন, আমি হিরার পুরুষ জনসংখ্যা গণনা করেছি । তাদের সংখ্যা সাত হাজার। অনুসন্ধান করে দেখলাম যে, তাদের মধ্যে ছয় হাজার জিয্‌ইয়া প্রদানে সক্ষম। আর বাকি এক হাজার জিয্‌ইয়া প্রদানে অক্ষম এবং তারা রুগ্ন ও অসমর্থ। সুতরাং তাদেরকে আমি জিয্‌ইয়া থেকে অব্যাহতি দিয়েছি। তিনি আরও উল্লেখ করেন, তারা যতদিন পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করবে ততদিন পর্যন্ত তার ও তার পরিবারবর্গের ব্যয়ভার মুসলিম রাষ্ট্র বহন করবে।[৭৮] ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা:) এর সময় থেকেই রাষ্ট্রের অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এতে কে মুসলিম আর কে অমুসলিম তা লক্ষ করা হতো না। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিক হিসেবে সকল মানুষ সমান অধিকার ভোগ করতেন।

---

[৭৬] A. Yusuf Alqarzavi, A Azhar Nadvi, *op.cit,* p. 172

[৭৭] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৪

[৭৮] Muhammad Hamidullah, *Muslim conduct of State, op.cit,* p. 117

হযরত উমর (রা.) দামেস্ক থেকে জাবিয়াতে যাওয়ার সময় কয়েকজন খ্রিস্টান কুষ্ঠরোগীকে দেখে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে সাদাকার ফাণ্ড থেকে অর্থ দান করার এবং নিয়মিত ভাতা প্রদান করার নির্দেশ দেন যা দ্বারা তারা তাদের খাদ্য ক্রয় করতে পারে।[৭৯]

একদা হযরত উমর (রা.) মদিনাতে হাঁটা-হাঁটির সময় লক্ষ করেন যে, এক বৃদ্ধ অন্ধলোক ভিক্ষা করছে। তিনি লোকটির কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন:

> তুমি কোন ধর্মে বিশ্বাস কর? উত্তরে বৃদ্ধটি বলল, আমি একজন ইহুদি। হযরত উমর (রা.) বললেন, তুমি ভিক্ষা করছ কেন? সে বলল, আমার কাছে জিয্‌ইয়া তলব করা হচ্ছে অথচ তা পরিশোধ করার সামর্থ্য আমার নেই। আর ভিক্ষা করেই আমি আমার জীবিকা নির্বাহ করি। বৃদ্ধটির কথা শুনে উমর তাকে নিজ গৃহে নিয়ে যান, সেখানে তিনি বৃদ্ধকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে কিছু অর্থ দান করেন। এ সময় তিনি বৃদ্ধের হাতে একটি চিঠি দিয়ে বায়তুল মালের খাজাঞ্চির নিকট পাঠালেন। তিনি বাইতুল মাল কর্মকর্তাকে লিখলেন, তার এবং তার মতো লোকদের (শোচনীয়) অবস্থা দেখ এবং তার জন্য বায়তুল মাল থেকে কিছু নির্ধারণ করো, আর তার এবং তার মতো লোকদের কাছ থেকে জিয্‌ইয়া আদায় করো না। আমরা তাদের যৌবনকাল দ্বারা উপকৃত হব, আর বার্ধক্যে তাদেরকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব, এটা কখনো সুবিচার হতে পারে না।[৮০]

সে সময় খলিফার দরবারে সরাসরি অভিযোগ করার সুযোগ ছিল। খলিফা হযরত উমর (রা.) রাত্রিতে তাঁর প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য বের হতেন। রাজ্যের কোথায় অভাবগ্রস্ত লোক আছে ক্ষুধার তাড়না সহ্য করতে না পেরে রাত্রি জাগরণ করছে তা দেখার জন্য বের হতেন এবং অভাবী লোকদেরকে খোঁজে বের করে তাদের কষ্ট লাঘব করতেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে যদি একটি উটও না খেয়ে মরে তার জন্য আল্লাহর দরবারে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে মর্মে যথাযথ কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[৮১] রাজ্যের অক্ষম, দুর্বল, অসুস্থ ও কর্মবিহীন লোকদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হতো। এ ক্ষেত্রে কে মুসলিম আর কে অমুসলিম তা দেখা হতো না এবং বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা হতো না।[৮২] তিনি সাম্রাজ্যের সকল লোকদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রাত্রি নিশিথে একাকী বের হতেন। হযরত উসামন (রা.) অসহায় ও আর্তপীড়িত লোকদেরকে তাঁর নিজস্ব অর্থায়নে তাদেরকে বৃত্তি প্রদান তথা খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতেন। হযরত আলী (রা.)ও ক্ষুধার্ত লোকদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন।[৮৩] একবার হযরত আলী (রা.) এর শাসনামলে একজন ইহুদি মহিলা খলিফার কাছে এসে বললো যে, তার চারজন বিবাহযোগ্য

[৭৯] আহমাদ ইবন্ ইয়াহইয়া ইব্‌ন জাবির আল বাগদাদী আল-বালাযুরী, *পূর্বোক্ত*,পৃ. ১৩৬
[৮০] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬ ; আবু 'উবায়দ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬
[৮১] Sayed Afzal Peerzade, *On Islamic Taxation*, Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 2009, p. 114
[৮২] Maulana Muhammad Ali, *op.cit*, p. 189
[৮৩] Sayed Afzal Peerzade, *op.cit*, pp. 114-115

মেয়ে আছে কিন্তু সে এতটাই অভাবগ্রস্ত ও অসহায় যে, তাদের বিয়ে দিতে পারছে না। প্রশাসন থেকে এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিলে বৃদ্ধার বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। তখন খলিফা বৃদ্ধার মেয়েদের বিয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বরাদ্দ দেন।[৮৪]

খিলাফত শাসনামলে আমরা এ রকম অনেক উদাহরণ দেখতে পাই। একথা পরিষ্কার যে, ইসলামের স্বর্ণযুগে দরিদ্র, অসহায়, প্রতিবন্ধি অমুসলিমরা শুধু তাদের কর থেকেই অব্যাহতি পেত না, রাষ্ট্র তার কর্তব্য করতে গিয়ে তাদের প্রতি কোনো অবমূল্যায়ন হোক সে সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতো এবং তাদের ভাতার ব্যবস্থা করে দিত।

ভূ-সম্পত্তির মালিকানা

অমুসলিমরা খিলাফত রাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত হওয়ার পর তারা পূর্বের ন্যায় তাদের ভূ-সম্পত্তির মালিক থাকেন। রাষ্ট্র তাদের ভূমি গণিমতের মাল হিসেবে বেদখল করতে পারতো না। রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার পর তারা নতুন জমি ক্রয় করে চাষাবাদ করতো, তখন তার উপর ভূমিকর আরোপিত হতো কিন্তু রাষ্ট্র নতুন জমি ক্রয়ে বাধা প্রদান করতো না। ইমাম মালিক এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, "যে সকল দেশ সন্ধিসূত্রে অধিকার করা হয়েছে, সে সকল দেশের ভূমির মালিক দেশের অধিবাসীরাই। কেননা তারা সন্ধি দ্বারা স্বীয় দেশকে রক্ষা করেছে। এরপর রাষ্ট্রের কিংবা কোনো সাধারণ মুসলিমের এ অধিকার থাকবে না যে, তাদের সম্পত্তি দখল করবে কিংবা তাদেরকে দাস-দাসী বানাবে। পক্ষান্তরে যে সকল দেশ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু সে দেশের লোকজন মুসলমানদের সাথে কোনো ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি তাহলে সে সম্পত্তির মালিক মুসলমানরাই।"[৮৫] যদি কোনো দেশ বা শহর যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকৃত হয় এবং অধিবাসীরা গণিমত বণ্টনের পূর্বেই ধর্মান্তরিত হলে তারা স্বাধীন হিসেবে গণ্য হলেও তাদের সম্পত্তি মুসলমানদের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে।[৮৬] ভূমিতে তাদের মালিকানা বহাল থাকে বলেই হযরত উমর (রা.) বাধ্য হয়ে নাজরানের খ্রিস্টান অধিবাসীদের ষড়যন্ত্রের কারণে তাদেরকে কোনো শাস্তি না দিয়ে সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে এলাকা ত্যাগ করতে বলেন। নাজরানের খ্রিস্টানদেরকে নাজরানের ভূসম্পত্তির পরিবর্তে ইরাকে ভূসম্পত্তি প্রদান করা হয়।[৮৭] বংশ পরম্পরায় তাদের সম্পত্তির মালিকানা উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হয় এবং নিজেদের সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, দান করা এবং প্রয়োজনে বন্ধক রাখা ইত্যাদির নিরঙ্কুশ অধিকারী হয়।[৮৮]

---

[৮৪] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit*, p. 135

[৮৫] আবু 'উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সালাম, *পূর্বোক্ত*,পৃ. ১৪৩

[৮৬] Yahya Ben Adam's, *Kitab Al Khataj*, (Taxation in Islam, Vol. I, Edited, Translated and Provided with an Introduction and Notes A. Ben Shemesh), E. J. Brill, Leiden, 1958, p. 31

[৮৭] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

[৮৮] কামাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়াহ*, খণ্ড-৪, দারুল ফিকর, লেবানন, তা.বি., পৃ. ৩৫৯

প্রতিরক্ষা বিভাগ ও অমুসলিম নাগরিক

শত্রুর আক্রমণ হতে 'আহলুয যিম্মাহ' অমুসলিমদের জান-মাল রক্ষা করা খিলাফত রাষ্ট্রের জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অমুসলিম নাগরিককে তার সম্মতি ছাড়া সামরিক কাজে নিয়োগে বাধ্য করা হতো না। তাদেরকে সামরিক বাহিনীতে যোগদান হতে অব্যাহতি দেওয়া হতো। এর বিনিময়ে রাষ্ট্র তাদের নিকট থেকে 'জিয্ইয়া' নামক প্রতিরক্ষা কর নেয়। মূলত দেশ রক্ষার কাজে ব্যয় নির্বাহে তাদের নিকট থেকে কেবল আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা হতো যা 'জিয্ইয়া' নামে অভিহিত। আর এ কর শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষম ব্যক্তির উপরই অর্পিত হতো। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অন্ধ ও অক্ষম এবং সামরিক বিভাগে কর্মরত অমুসলিমদেরকে এই কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতো।[৮৯] 'আহলুয যিম্মাহর' দেশ রক্ষার কাজে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। 'আহলুয যিম্মাহ' শত্রুদের সাথে মিলিত হয়ে রাষ্ট্রের বিপদ ঘটাতে পারেন বলে তাদেরকে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে তাদের থেকে দেশরক্ষার কাজে অর্থ গ্রহণ করা উচিত, যা দ্বারা দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত সৈনিকদের বৃত্তি দেওয়া যেতে পারে।[৯০] তবে তাদের থেকে আদায়কৃত জিয্ইয়া শুধুমাত্র দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত সৈনিকদের বৃত্তি প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হতো না। তাদের নিকট থেকে আদায়কৃত জিয্ইয়া ও অন্যান্য কর রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেমন রাস্তাঘাট মেরামত, ব্রিজ তৈরি, খালখননসহ সম্প্রদায়ের অনেক উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হতো।[৯১] আর কখনো যদি মুসলিমরা তাদের জান-মাল রক্ষা করতে অপারগ হয়ে পড়ে, তখন তাদের কাছ থেকে আদায়কৃত ঐ কর তথা জিয্ইয়ার টাকা ফেরত দেওয়া হয়। এর অন্যতম প্রমাণ হলো রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়ারমুকের প্রান্তরে মুসলমানদের মোকাবেলা করতে সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তখন 'হিম্স' থেকে উত্তোলিত খারাজ অধিবাসীদের মধ্যে প্রখ্যাত সিপাহসালার আবু উবায়দা এই বলে ফেরত দিয়েছিলেন। আমরা রোমানদের মোকাবেলায় ব্যস্ত, এই সময়ে নিজেদের রক্ষা করো। এ জিয্ইয়া ছিল হিফাজতের বিনিময়ে। কিন্তু আমরা এখন তোমাদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারছি না তাই এটা রাখার অধিকারও আমাদের নেই।[৯২] কিন্তু হিম্সবাসী উত্তর দেয় যে, আমরা পূর্বের তুলনায় অনেক ভালো আছি, আমরা অন্য ধর্মের অনুসারী হলেও তোমাদের শাসনব্যবস্থাকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করি। আমরা তোমাদের সঙ্গে থেকে হিরাক্লিয়াসের মোকাবেলা করব। এ সময় ইহুদিরা শপথ করে বলে যে, আমাদের হত্যা বা পরাজিত না করে হিরাক্লিয়াসের কোনো গভর্নরকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। মুসলিম শাসিত অন্যান্য শহরের অবস্থা ছিল একই রকম। তারা বলতে শুরু করে যদি রোমান শাসন আবার চালু হয় তাহলে তাদের অবস্থা আগের মতোই হবে। সুতরাং যে করেই হোক তা প্রতিহত করতে হবে। মুসলিম

[৮৯] S. M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1984, p. 33
[৯০] শাম্স আল দীন আবু বকর মুহাম্মদ বিন আহম্মদ আস-সারাখসী, খ-১০, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬-৮৭
[৯১] Oran, Ahmed and Salim Rshid, *Fiscal Policy in Early Islam,* Public Finance/ Finance Publique, Vol. 44, No. 1, 1989, p.88
[৯২] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯

শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। যখন মুসলমানদের হাতে রোমানদের পরাজয় ঘটলো তখন তারা শহরের প্রধান ফটক খুলে বাদ্য যন্ত্র সহকারে আনন্দ উল্লাস শুরু করে।[৯৩] তবে কোনো অমুসলিম যদি নিজের সম্মতিতে সামরিক কাজে অংশ নেয়, তাদের জিয্ইয়া দিতে হয় না এবং যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যের আনুপাতিকভাবে গণিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাবে। হযরত উমর (র.) হিজরি ১৭ সনে ইরাকের জনৈক অফিসারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'অশ্বারোহীদের মধ্যে থেকে যাদের সাহায্য নেওয়া দরকার মনে কর তাদের থেকে সাহায্য নাও, কিন্তু বিনিময়ে তাদের জিয্ইয়া কর রহিত কর।'[৯৪] তবে কোনো যিম্মি যদি এক বছরের জন্য সামরিক কাজে অংশগ্রহণ করে তাহলে তার এক বছরের জিয্ইয়া মওকুফ হবে।

হযরত উসমান (রা.) এর শাসনামলে সাইপ্রাস বিজিত হওয়ার পর সেখান অধিবাসীদের উপর জিয্ইয়া আরোপ করেন নি। কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে, শত্রুদের নিকট থেকে সাইপ্রাসকে রক্ষা করতে পারবেন কিনা। সাইপ্রাসকে রক্ষা করার বিষয়ে সন্দিহান থাকায় তিনি সাইপ্রাস জয় করার পরও সেখান থেকে কোনো প্রকার জিয্ইয়া গ্রহণ করেন নি।[৯৫]

পোশাক পরিচ্ছদ

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিমদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও বেশ-ভূষার মধ্যে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলের প্রথম দিকে কোন পার্থক্য না থাকলেও পরবর্তীতে তাঁর ও অন্যান্য খলিফাদের সময় পার্থক্য ছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে পুরুষরা আলখাল্লা, এক টুকরা চামড়ার বেল্ট দিয়ে তৈরি ঢিলা পায়জামা ও মাথায় পাগড়ি পরিধান করতো। মহিলাগণ ঢিলা পায়জামা, পিরহান ও মস্তকে দোপাট্টা ব্যবহার করতেন। সে সময় অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিগণ রেশমি ও পশমি কাপড় ব্যবহার করতেন। আমিরুল মুমিনিন দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) অমুসলিমদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতা, ঘোড়ার জিন প্রভৃতিতে মুসলমানদের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।[৯৬] হযরত উমর (রা.) চুক্তি অনুসারে যিম্মিদের 'জুন্নর' পরিধান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের পোশাক পরিধান করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পোশাক পরিধানে ব্যাপারে হযরত উমর (রা.) যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন তা হলো মুসলমান ও যিম্মি প্রত্যেকের জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা । পরস্পরের মাঝে যেন ঘৃণার ও ক্ষোভের সৃষ্টি না হয়। অমুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই মুসলিমদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৯৭] আবু ইউসুফ এর বর্ণনামতে ইবনুল হাকাম বর্ণনা করেন

---

[৯৩] আহমাদ ইবন্ ইয়াহইয়া ইব্ন জাবির আল বাগদাদী আল-বালাযুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৩-১৪৪

[৯৪] ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, অনু. আবদুল মতীন জালালাবাদী, ঢাকা ইসলঅমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ২১৮

[৯৫] S. M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1984, p. 33

[৯৬] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৭

[৯৭] Shibli Nu'mani, *op.cit*, p. 344; Muhammad Hamidullah, *Muslim conduct of State,op.cit*, pp. 212-13

যে, তিনি খ্রিস্টানদেরকে চুল সামনের দিকে খাঁটো করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাবারি ও বালাযুরির বর্ণনায় এই বিষয়টি উল্লেখ নেই। কায়তানি সন্দেহ পোষণ করেন যে, জেরুযালেমের চুক্তির ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়টি পরবর্তীতে বিকৃত করা হয় এবং তিনি সন্দিহান যে, উমর এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা প্রদান করেননি। পোশাকের বিষয়টি আবু ইউসুফ ও ইবনুল হাকামের বর্ণনাতেও আছে। এ.এস, ট্রিটন এর মতে, খ্রিস্টানদের উপর পোশাকের বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে সে সময় হযরত উমর (রা.)-এর এ ধরনের কোনো নির্দেশনা দেওয়ার কথা না। পরবর্তীতে আরবরা যখন শক্তি সামর্থ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে তখন তারা প্রজাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য এ পোশাকের বিষয়টি চালু করে। ট্রিটনের ভাষ্য অনুযায়ী ঐতিহাসিকরা যিম্মিদের পোশাক নিয়ে তেমন কোন বর্ণনা দেননি এবং এ বিষয়ে খুব কম বর্ণনাই পাওয়া যায়।[৯৮] আল-কাসানী বলেন, মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছেদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকা প্রয়োজন।[৯৯]

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে এক কথায় বলা যায় যে, সে সময় কে মুসলিম আর কে অমুসলিম এ পার্থক্য করার একমাত্র উপায় ছিল পোশাকের ভিন্নতা। সে সময় ধর্ম, নাম, উপাধি, ঠিকানা সম্বলিত পরিচয়পত্রের কোনো ব্যবস্থা ছিল না বিধায় পরিচয় লাভের সুবিধার্থে পরস্পরের পোশাকের মাঝে পার্থক্য থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানে ফকিহবিদরা পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা গ্রহণকে অত্যাবশ্যক মনে করেন না। আর একটি বিষয় পরিষ্কার যে, হযরত উমর (রা.) পোশাকের ব্যাপারে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন তা হলো সৈন্যদের পোশাক পরিচ্ছদ। সারা দুনিয়ার কোনো জাতিই সৈনিকদের বিশেষ পোশাক অন্যদের পরিধান করতে দেয় না।

প্রতিবেশীর অধিকার

প্রতিবেশীত্ব নৈকট্যের মাধ্যম। কাছাকাছি বাড়ি-ঘরে অবস্থানের ফলে প্রতিবেশী অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়ের চেয়েও নিকটবর্তী হয়ে যায়। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রতিবেশী বা সহকর্মীর প্রতি স্বভাবসুলভ ভালো আচরণ করতে ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে। ইসলামে প্রতিবেশীর অবস্থান ও মর্যাদা খুবই সুদৃঢ়। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীকে প্রথমে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কে মুসলিম আর কে অমুসলিম এ বিবেচনা করা যাবে না।[১০০] আর ফকিহগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কোনো কিছু ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দূরের লোক অপেক্ষা প্রতিবেশীরা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এ নীতি মুসলিম-অমুসলিম সকলের ক্ষেত্রে সমান। সকল ক্ষেত্রেই প্রতিবেশীর অধিকার বেশি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কখনো তার

---

[৯৮] A. S. Tritton, *op.cit,* p.115
[৯৯] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল কা'সানী, খ.৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১১৩
[১০০] Dr. Mohammad Muslehuddin, *Islam and its Political System*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1999, p. 57

প্রতিবেশী ইহুদিকে না দিয়ে কোনো মাংস খেতেন না। তিনি মনে করতেন প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেওয়া ও তার আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা নৈতিক দায়িত্ব।

> একদিন উমর (রা.) দেখেন জুবাইর ইবনে আবদুল্লাহ মাংস নিয়ে যাচ্ছেন। তখন তিনি জুবাইরকে বলেন, তুমি কি প্রতিবেশীর জন্য মাংস এনেছ? উত্তরে জুবাইর বলেন আপনি বরং কসাইকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কসাইকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে জুবাইর যখনই মাংস কিনেন, তখন প্রতিবেশীর জন্যও কিনেন। পরে জুবাইরকে তিনি বলেন, জুবাইর আমি জানি তুমি রাসূল (স.) এর কাছ থেকে তা শিখেছো । কিন্তু যদি কোনো ইহুদি তোমার প্রতিবেশী হতো তাহলে আমি তোমাকে তার ক্ষেত্রেও একই কাজ করতে বলতাম।[১০১]

উপরোল্লিখিত আলোচনার আলোকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলাম একটি শ্বাশত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি-নির্দেশনা রয়েছে। একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মহানবি (স.) ইসলামের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী মদিনা রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের সাথে ন্যায্য আচরণ করেছেন। তাদের যথাযথ মানবিক ও নাগরিক মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনার এবং সামাজিক জীবনাচরণে মহানবির আদর্শের যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছিল। সেদিক থেকে মহান খলিফাগণ ইসলামের নীতি, আদর্শ ও মহানবি (স.) এর প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে সমস্ত অধিকার তাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। এ অধিকার শুধুমাত্র স্থানীয় অধিবাসীদের জন্যই নয়, বরং যারা সাময়িকভাবে আশ্রয় লাভ করেন তাদের জন্যও প্রযোজ্য। একথা পরিষ্কার যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে অমুসলিমরা কখনো প্রশাসন, সমাজ ও নাগরিকদের দ্বারা বৈষম্যের শিকার ও ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়নি। তাদের সাথে রাষ্ট্র মানবিক আচরণ, তাদের মানবাধিকার রক্ষা, প্রাপ্য নাগরিক মর্যাদা নিশ্চিত করে তাদের জীবনমানের উন্নয়নের চেষ্টা করেছে। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের অধিকার একটি বহুল চর্চিত বিষয়। জাতিসংঘসহ আন্তজার্তিক মানবাধিকারী সংগঠনসমূহ দেশে দেশে সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিতকরণে নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অমুসলিমদের নাগরিক মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এমনকি বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশেও ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। মুসলিম দেশসমূহের এরূপ বিচ্যুতির পিছনে সংখ্যালঘু সম্পর্কে ইসলামের নীতি ও আদর্শের বিচ্যুতি অন্যতম কারণ বলে সঙ্গতভাবেই ধরে নেওয়া হয়। সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ইসলামের মৌলনীতি ও আদর্শ অনুসরণ এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে তাদের মানবিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের

---

[১০১] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit*, p. 128

দৃষ্টান্তগুলো অনুসরণ করলে কোনো মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ এবং রাষ্ট্র তাদের দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মানবিক, নাগরিক ও অন্যকোনো অধিকার হরণ করতে পারেন না। এককথায় ইসলামের প্রারম্ভিক সময় থেকে খিলাফত রাষ্ট্র যিম্মিদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছে, যা মধ্যযুগে বিদ্যমান অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিশ্বের সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিপীড়নমুক্ত হয়ে মানবিক ও নাগরিক অধিকার ও মর্যাদার সাথে বাস করবে এটিই ইসলামের নির্দেশনা যার দৃষ্টান্ত খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে স্থাপন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার (৬৬১-১২৫৮ খ্রি.)

হযরত আদম (আ:) থেকে মানুষের আদি ইতিহাস শুরু। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মুসলিম কিংবা অমুসলিম সবাই তাঁরই বংশধর। পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবি হযরত আদম (আ:) হতে ইসলামের যে পবিত্র সূচনা হয়েছে, সর্বযুগের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবি হযরত রাসূলে করিম (স.)-এর মাধ্যমে যে সত্য দীন ও নিখুঁত জীবনাদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান প্রেরিত হয়েছে, তা বিশেষ কোনো অঞ্চল, জনগোষ্ঠী বা বিশেষ শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, বরং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে মদিনা সনদ প্রণয়নসহ যে ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন তাতে পরিপূর্ণভাবে সংখ্যালঘু তথা আহলে কিতাব ও অমুসলিমদের মর্যাদা ও অধিকারের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। আর খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে একটি উন্নত শাসন কাঠামো প্রণীত হয়েছিল। খোলাফায়ে রাশেদিনের খলিফাগণ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর রাষ্ট্রপরিচালনার আদর্শ, নীতি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে মুসলিম-অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ লক্ষ করা যায়নি। পরবর্তীকালে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সিন্ধুনদ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এ সময় বিভিন্ন অঞ্চল বিজয়ের সাথে সাথে সে অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর ইসলাম ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। যেহেতু ইসলামে বিশ্বাস স্থাপনে কোনো জবরদস্তি নেই সেহেতু স্বাধীনভাবে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ইসলাম অস্বীকার করে না। ইসলামি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস বা নাগরিকত্ব একটি স্বাভাবিক বিষয় হওয়ায় ইসলামি রাষ্ট্র মূলতঃ Multi Cultural হয়। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে অমুসলিমদের প্রতি খলিফাগণ উদারনীতি প্রদর্শন করতেন। খলিফাগণ এ যুগে অমুসলিমদের উচ্চপদে চাকুরি দিয়ে উদারতা প্রদর্শন করেছেন। সে সময় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে তারা সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিভাগে উচ্চ পদে চাকরি পেত। এ যুগে জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে সম্মনিত করা হয়েছে এবং তাদের ধর্ম ও জাতীয়তার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে তাদের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এ সময় মুসলমানগণ ছাড়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিস্টান, ইহুদি, সাবীয়, জরথুস্ত্রীয়, মানিকী ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর বসবাস ছিল। সাম্রাজ্যে বহু জাতি ও বর্ণের লোকদের সমবেত চেষ্টায় এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে আর্থিক উৎকর্ষের পাশাপাশি সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ফলে গ্রিক, পারসিক ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে মুসলমানগণ সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধন করে স্বকীয় মৌলিক অবদান রেখে যায়। এ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অনারব মুসলমান ও অমুসলিমদের দান সর্বাধিক।

অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তাদের সাহায্য ছাড়া আরবরা পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হতো না। ফলে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, মানুষ মৌলিকভাবে এক, অভিন্ন ও সর্বতোভাবে সমান হওয়ায় মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত করা যায় না। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকারসমূহ

উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মর্যাদা ও অধিকারসমূহ আলোচনা করা হলো।

জান-মালের নিরাপত্তা

ইসলামি রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকের সকল অধিকার নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সুস্পষ্টভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত করার ফলে কোনো প্রকার বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় না। ইসলাম প্রদত্ত মানুষের যে সকল মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে জান-মালের অধিকার হলো অন্যতম অধিকার। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য এ অধিকার সমান। তাছাড়া অমুসলিমদের জান-মাল রক্ষার জন্য তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশও ইসলামে রয়েছে। এ সকল নির্দেশনার বাস্তবায়ন আমরা হযরত মুহাম্মদ (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে প্রত্যক্ষ করি। উমাইয়ারা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ইসলামের শাসন নীতি ও আদর্শের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল যার যথাযথ স্বীকৃতি ঐতিহাসিক আমীর আলী ব্যক্ত করেছেন। আমীর আলী বলেন,

> The accession of Ommeyades did not simply imply a change of dynasty; it meant the reversal of a principle and the birth of new factors which, as we shall see, exercised the most potent influence on the fortunes of the Empire and the development of the nation.[1]

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা খলিফা মুয়াবিয়া (রা.) স্বীয় পুত্র ইয়াযিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মৃত্যু ঘটিয়ে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের সূচনা করলে আব্বাসীয় খলিফাগণ একই ধারা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাছাড়া উমাইয়া যুগে রাষ্ট্রের সর্বক্ষমতা একচেটিয়া আরবদের হাতে ছিল কিন্তু আব্বাসীয় শাসনামলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অনারবদের হাতে গেলে আরবদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হতে থাকে। এ সময় মাওয়ালী[২] ও অমুসলিমদের ক্ষমতা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি করতে থাকে।

---

[১] Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, Kitab Bhawan, New Delhi, 1977, p. 72

[২] মাওয়ালি আরবি শব্দ। এটি বহুবচন এর একবচন হলো 'মাওলা'। এর অর্থ প্রভু, প্রতিবেশী, অভিভাবক, মিত্র বা আশ্রিত ব্যক্তি। প্রাচীন আরব সমাজে আশ্রিত জনগোষ্ঠীকে মাওয়ালী বলা হতো। ইসলাম পূর্ব যুগে তিন প্রকারে মাওয়ালী হওয়া যেত। প্রথমত: কোনো মুক্তিপ্রাপ্ত লোক কোনো পরিবারে

খলিফা মুয়াবিয়া তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে অধিকতর সতর্ক ছিলেন। এ সময়ে খলিফা প্রাদেশিক প্রশাসনকে অমুসলিমদের সম্পত্তি অধিগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।[৩] তবে উমাইয়া শাসনামলে সাম্রাজ্যে আরবীয়করণ নীতি বাস্তবায়িত হলেও অমুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তা খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের মতোই লক্ষ করা যায়। দামেস্কের ক্যালাসেভিয়ান বিশপ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে কটূক্তি করে। কটূক্তি করার কারণে খলিফা ওয়ালিদ শাস্তিস্বরূপ তার জিহ্বা কেটে নেন।[৪] এতে করে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মাঝে অসন্তুষ্টি দেখা যায়। খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের চুক্তিগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সে সময়ে খ্রিস্টানসহ অন্যান্য অমুসলিমরা ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করলে তাদেরকে চুক্তি রক্ষা করতে হতো। কিন্তু দামেস্কের খ্রিস্টান বিশপ মুসলমানদের সাথে যে চুক্তি ছিল তার দিকে লক্ষ না করে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে কটূক্তি করে। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে ইসলামের পথপদর্শক সম্পর্কে কটূক্তি করলে তার পরিণতি এ রকম হবে এটাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং মুসলমানরা বা ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান যে শাস্তি প্রদান করেছেন তা যথাযথই ছিল।

জান-মালের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম সকলের মর্যাদা সমান। উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজের একজন মুসলিম কর্মচারী রাবিয়া সুজুকী তাঁর অফিসের কাজের জন্য একজন অমুসলিমের ঘোড়া বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করেন। তখন অমুসলিম ব্যক্তি খলিফার দরবারে অফিসারের বিরুদ্ধে নালিশ দেন। তখন খলিফা বিনা ভাড়ায় ঘোড়া নেওয়ার অপরাধে বিশ্বস্ত কর্মচারীকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন।[৫] রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের। জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করলে রাষ্ট্রকর্তৃক

আশ্রিত হওয়ার আবেদন জানালে উক্ত পরিবার তাকে আশ্রয় প্রদান করলে সে উক্ত পরিবারের মাওলা হিসেবে পরিচিত হতো। দ্বিতীয়তঃ কোনো মুক্তিপ্রাপ্ত দাস তাঁর প্রভুর দরবারে থেকে যাওয়ার ইচ্ছা করলে সে উক্ত পরিবারের মাওলা হিসেবে পরিচিত হতো। তৃতীয়তঃ বহিরাগত কোনো ব্যক্তি আরব পরিবারের আশ্রিত হয়ে উক্ত গোত্রে বসবাস করলে সে উক্ত পরিবারের মাওলা হতো। এরূপ মাওয়ালীদের বলা হতো আদ্-দাখিল। ইসলাম পরবর্তীকালে আরবদেশের বাইরে যে সকল অনারব ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতো তাদেরকে মাওয়ালী বলা হতো। যুদ্ধবন্দি, মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দি বা দাস-দাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাদেরকে মাওয়ালী বলা হতো। ইসলামের বিজয়ের সাথে সাথে মাওয়ালীদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে তারা কোন গোত্রের মাওয়ালী না হয়ে তারা ইসলামের মাওয়ালী হিসেবে পরিগণিত হতো। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে অনারব মুসলমানগণ তথা মাওয়ালীগণ আরব মুসলমানদের ন্যায় সমতা, মর্যাদা ও সম্মান লাভ করে যেমনটি আমরা অমুসলিমদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। কিন্তু উমাইয়া শাসনামলে মাওয়ালীদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই তাদেরকে সুবিধাবঞ্চিত করা হয়। আরবদের উন্নতি, দেশ বিজয়, শিক্ষা সংস্কৃতিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে মাওয়ালীদের অবদান থাকলেও আরবগণ তাদেরকে সমমর্যাদা প্রদান করতেন না। উমাইয়া প্রশাসনের বড় বড় পদগুলোতে আরবদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল শুধুমাত্র অফিসের কেরানি বা নিম্ন শ্রেণির চাকুরিতে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল। উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ মাওয়ালী নীতি পরিবর্তন করে তাদেরকে আরব মুসলমানদের সমান সুযোগসুবিধা দিলেও পরবর্তী উমাইয়া খলিফাদের সময়ে মাওয়ালীদের প্রতি আচরণ পূর্বের ন্যায়ই ছিল। আব্বাসীয়গণ মাওয়ালীদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে ক্ষমতায় এসে সাম্রাজ্যের রাজনীতি ও চাকুরিতে সম অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। আরব মুসলমান ও অনারব মুসলমানদের মাঝে ইসলামের বিধান অনুযায়ী বৈষম্য দূরীভূত করার চেষ্টা করলেও ইতোপূর্বে সৃষ্ট বৈষম্য পরিপূর্ণভাবে বিদূরিত করা সম্ভব হয়নি। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৪শ খণ্ড, ১ম ভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৫৬-৬৩; শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *ইসলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২৩৪-৪৪; মোঃ আবু তাহের, *ইসলামের সামাজিক ইতিহাস*, কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২২৮-৪২

[৩] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *Islamic Toleration & Justice* : Non-Muslims under Muslim Rule, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2007, p. 144

[৪] A. S. Tritton, *The Caliphs and their non-Muslim Subjects*, Frank Cass and Company Limited, London, 1970, p. 128

[৫] Rafi Ahmad Fidai, *Concise History of Muslim World*, Vol. II, Kitab Bhavan, New Delhi, 2004, p. 88

আরোপিত শাস্তি তাকে ভোগ করতে হতো। এ ক্ষেত্রে দেখা হতো না কে আমীর, কে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অফিসার আর কে রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক। সকলের জন্য একই রকম রীতি-নীতি অবলম্বন করা হতো।

আব্বাসীয়দের দামেস্ক বিজয়ের সময় এবং মিসরে মারওয়ানের সাথে সংঘর্ষে খ্রিস্টানদের হত্যা করা হয়। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের সৈন্যরা মার্দ্রা পর্বতমালায় অবস্থিত অনেক গির্জায় হত্যাযজ্ঞ চালায়, যার মধ্যে রাসউল আইন পাহাড়ে অবস্থিত 'পাঁচ বোনের গির্জা' অন্যতম।[৬] এ সকল হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, উমাইয়াদের পতনকালে এবং আব্বাসীয়দের ক্ষমতায় আরোহণের প্রাক্কালে খ্রিস্টানদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। এ সময় তাদের জান-মালের কোনো নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। এ ঘটনাটি স্বাভাবিকভাবে চিন্তা-ভাবনা না করলে মনে হয়, মুসলমানরা এ সময় অমুসলিমদের উপর যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং অত্যাচার নির্যাতন করেছে তাতে মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে তারা অনেক দূরে। অন্যকোনো সময় তাদের মাঝে এ আচরণ লক্ষ করা যায়নি। বিষয়টি হলো মুসলমানরা যখন তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিতে পারেনি তখন মূলত ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মাঝে সংঘর্ষ চলছে। আর এ সংঘর্ষের সময় খ্রিস্টানদেরকে কারো না কারো পক্ষাবলম্বন করার কারণে তারাও হত্যার স্বীকার হয়েছে। যুদ্ধের সময় নিরাপত্তা কেউ কাউকে দিতে পারে না। ফলে এ ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণ করা যাবে না যে, মুসলিমরা অমুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে পারেনি।

আব্বাসীয় শাসনামলে অমুসলিমদের প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্য ও অধিকার বঞ্চিতকরণের মতো বিষয়াবলিকে খুব কঠোরভাবে দেখা হতো। খলিফা আল-হাদীর (৭৮৫-৮৬ খ্রি.) শাসনামলে মিসরের গভর্নর আলী বিন সুলাইমান খ্রিস্টানদের কিছু বসতি নির্দিষ্ট কারণে ভেঙ্গে দেন। এ রকম অবিচার অমুসলিমরা সহ্য করতে পারেনি। কিছুদিনের মাঝেই খলিফা আল-হাদী মৃত্যুবরণ করলে পরবর্তী খলিফা হন হারুন-অর-রশিদ। নতুন খলিফার নিকট অমুসলিমগণ বিচারের দাবি উত্থাপিত করলে খলিফা হারুন দ্বিধাহীনভাবে গভর্নর আলী বিন সুলাইমানকে পদচ্যুত করে সেখানে মুসা বিন ঈসাকে নিয়োগ দেন। বিষয়টি তদন্তের জন্য প্রধান বিচারপতিকে নির্দেশ দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। বিচারক মামলার রায় প্রদান করেন যে, অমুসলিমদের ভূমি যেখানে তারা বসবাস করতো তা যেন গভর্নর ফিরিয়ে দেন।[৭] গভর্নর বিচারকের নির্দেশ মোতাবেক তাদের বসতি ফিরিয়ে দেন। বিচারক বিচার চলাকালীন সময়ে এ বিষয়ে খলিফার সাথে কোনো পরামর্শ করেনি। ইসলামের নিয়ম-নীতি মোতাবেক তিনি বিচার কার্যটি সম্পন্ন করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, আব্বাসীয় শাসনামলে অমুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যাপারে খলিফাগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। খিলাফত রাষ্ট্রে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা হতো না। এ যুগে মুসলিমসহ

---

[৬] A. S. Tritton, *op.cit*, p. 127
[৭] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit*, p. 148

বহু জাতি ও বর্ণের লোকদের সমবেত চেষ্টার ফলে রাষ্ট্রে মুসলিম-অমুসলিম সকলের মর্যাদা সমান প্রত্যক্ষ করা যায়।

ক্রুসেড যুদ্ধের অন্যতম নায়ক সপ্তম লূই এর অন্যতম সাথী পাদ্রী ডেনিস বায়তুল মোকাদ্দিস অভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি ধ্রুব সত্য ঘটনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ১১৪৮ সালে বায়তুল মোকাদ্দিস অভিযান কালে ফিঙ্গজীয়র দুর্গম পার্বত্য পথে খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। তখন খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা তাদের বাহিনীর শত শত আহত সৈনিক, রোগী ও নারীদের ফেলে পলায়ন করে। তারা পলায়ন করার সময় গ্রিক খ্রিস্টানদের হাতে তাদের দায়িত্ব অর্পণ করে যায়। কিন্তু গ্রিকরা তাদের সেবাদান, রক্ষণাবেক্ষণ ও খাদ্যদানের বিনিময়ে ক্রুসেডারদের নিকট থেকে বিরাট অর্থ আদায় করে নিল। এ সময় মুসলমানরা অসহায়, দুর্বল, অসুস্থ ও অভুক্ত লোকদের সেবায় এগিয়ে গিয়ে তাদের বিনামূল্যে খাদ্য, পানীয় ও আহতদের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলো।[৮] মুসলমানদের এ উদারতা ও মহানুভবতার কারণে অনেক খ্রিস্টান ক্রুসেডার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায় এবং তাদের সম্পদ রক্ষা পায়।

মান-সম্মান ও ইয্যাত আব্রু রক্ষার অধিকার

ইসলামের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বসবাসকারী আনুগত্যশীল প্রতিটি অমুসলিম নাগরিকের মান-সম্মান ও ইয্যাত আব্রু রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রতিটি মুসলিমের। প্রত্যেকেই এর যিম্মাদার। সুতরাং এটি প্রমাণিত যে, ইসলাম অমুসলিমদের মান-সম্মান ও ইয্যাত আব্রু সংরক্ষণ করেছে। কারণ তারাও মানুষ। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত মানুষের আগমন ঘটেছে সে সকল মানুষ এক আদম থেকে তৈরি। গোটা আদম জাতকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করার কথা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

ولقد كرمنا بنى ادم وحملنهم فى البر والبحر ورزقنهم من الطيبت وفضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا-

“আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি; স্থলে ও সমুদ্রে উহাদের চলাচলের বাহন দিয়াছি; উহাদেরকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের অনেকের উপর উহাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।”[৯] মানুষের কাছে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় অবলম্বন হলো তার নিজের ইজ্জত-আব্রু। নিজের ইয্যত-আব্রুর জন্য মানুষ নিজের জীবনকে অনায়াসে বিলীন করে দিতে পারে। প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো সংখ্যাগুরুরা সময় ও সুযোগ পেলেই সংখ্যালঘুদের মান-সম্মান ও ইয্যত আব্রুর উপর হামলা করেছে। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের মান-সম্মান ও ইয্যত-আব্রুতে কখনোই মুসলিম সরকার বা মুসলমানগণ আক্রমণ করেননি বরং সর্বদাই

[৮] ডক্টর মোঃ শফিকুল ইসলাম, *ইসলাম ও ধর্মীয় স্বাধীনতা*, বর্ষা প্রাইভেট লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৭৯
[৯] *আল কোরআন*, ১৭:৭০

তাদের ইয্যত রক্ষায় সরব ছিল। আইনের দৃষ্টিতে একজন অমুসলিমের ইয্যত-আব্রু একজন মুসলমানের ইয্যত-আব্রুর অনুরূপ। উমাইয়া খলিফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজের শাসনামলে একটি স্থানের লোক এসে অভিযোগ করলো যে, তাঁর একজন কমকর্তা তাদের প্রতি কঠোর ও অন্যায় ব্যবহার করেছে এবং তাদের উপর নির্যাতন করেছে। তখন খলিফা ঐ কর্মকর্তাকে একটি চিঠির মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন যে, আমার চিঠি পাওয়া মাত্রই লোকদের উপর যাবতীয় অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করে দিবে।[১০] অমুসলিমদের মান-সম্মান যে মুসলমানদের মতো তা ইমাম আবু হানিফার মতামত থেকে জানা যায়। হানাফী আইনের বিখ্যাত সংকলন 'আল বাহরুররাইখ' এ স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মুসলিমদের সমাধিক্ষেত্রের ন্যায় অমুসলিমদের সমাধিক্ষেত্রও সুরক্ষা পাবে যেমন করে জীবিত অবস্থায় তাদের সুরক্ষা দেওয়া হতো এবং তাদের জান-মাল ও ধন-সম্পদের সুরক্ষাও দেওয়া হতো। অমুসলিম বিদ্রোহীদের সাথে মুসলমান বিদ্রোহীদের মতো আচরণ করা হবে। খলিফা দ্বিতীয় উমর (রা.)-এর শাসনামলে জারি করা হয় যে, শত্রুদের হাতে বন্দি অমুসলিম প্রজাদের ক্ষেত্রে মুসলিম প্রজাদের মতো রাষ্ট্রীয় খরচে মুক্তিপণ প্রদান করে মুক্ত করতে হবে। একইভাবে অগ্রক্রয়ের বিধানের ক্ষেত্রেও অমুসলিম নাগরিকদের এর সুবিধার আওতায় আনা হয়।[১১] আমরা তাদের সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে আমাদের চুক্তি বলবৎ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে কোনো রকম অন্যায় আচরণ করা যাবে না। মান-সম্মানে আঘাত আসে এ রকম কোনো রকম কর্ম সম্পাদন করা যাবে না। তাদের সাথে অত্যাচার তো দূরের কথা এমনকি রুঢ়ভাবে কথা বলা যাবে না। যিম্মি সমাজ মুসলমানদের অধীনে কতটুকু মান-সম্মান পেতেন সে সম্পর্কে অসংখ্য তথ্যের মধ্যে দু একটির উল্লেখই যথেষ্ট। আব্বাসীয় খলিফা মুকতাদিরের শাসনামলে আমরা দেখতে পাই যখন কোনো খ্রিস্টান পাদ্রী নিয়োগ পেত তখন তাকে খলিফার পক্ষ থেকে অভিবাদন জানানো হতো। এ সকল যাজকরা রাষ্ট্রে নিয়োগ পাওয়া কাজী ও মুফতীদের মতো সম্মান ও সুবিধা ভোগ করতো।[১২] উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় আমলেই আমরা কেন্দ্র বা প্রাদেশিক সরকারকে যিম্মিদের উপর কোনো নিপীড়নমূলক আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি চালু করতে দেখা যায় না। সকল সময় দেখা যায় যে, তাদের সুরক্ষা ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে।[১৩] তাদের কর্মকাণ্ড ইসলাম ধর্মের মৌলিক আচার বিরোধী হলেও তাদের মান-সম্মান ও ইয্যত-আব্রুর প্রতি কখনো অসম্মান করা হয়নি।

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের অধিকার

অমুসলিমরা নিজস্ব জনপদ ও পরিমণ্ডলে অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্রকর্তৃক যা বিধিবদ্ধ জনপদ ও পরিমণ্ডল নয়, এমন জনপদ ও পরিমণ্ডলে স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম-কর্ম প্রকাশ্যে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করতে পারবে। তবে

---

[১০] রশীদ আখতার নদভী, অনু. মাওলানা আবুল বাশার, *ওমর ইবনে আবদুল আজীজ*, ঢাকা বুক কর্ণার, ২০১২, পৃ. ২০৩

[১১] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit*, p. 143; Muhammad Hamidullah, *Muslim conduct of State,* SH. Muhammad Ashraf, Lahore, 1977, pp. 116-17

[১২] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *Ibid*, p. 152

[১৩] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *Ibid*, p. 142

একান্ত মুসলিম জনপদ ও মুসলমানদের হাতে যে সব নগরীর গোড়াপত্তন হয়েছে সেখানে প্রকাশ্য তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে বাধা দেওয়া এবং নতুনভাবে কোনো উপাসনালয় তৈরি করার অনুমতি প্রদান করতে বাধা দেওয়া অসঙ্গত নয়। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে ইসলামি রাষ্ট্র ও এর নিরাপত্তার অধীনে বসবাসকারী সকল অমুসলিমদের পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। যে সকল অঞ্চলে অমুসলমানদিগকে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, সে সকল দেশে তাদের ধর্মপালন ও কৃষ্টি রক্ষার অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে কোনো ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হতো না। এরই ধারাবাহিকতায় খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনকালের পর উমাইয়া (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) ও আব্বাসীয় (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) খিলাফতে অমুসলিমরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে। এ সময় রাষ্ট্রের অমুসলমানদের প্রতি উদার ব্যবহার উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসন নীতির এক উল্লেখযোগ্য দিক।

উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা খলিফা মুয়াবিয়া (৬৬১-৬৮০ খ্রি.) খিলাফত লাভ করে রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করার পাশাপাশি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি সিন্ধুনদের তীর হতে আটলান্টিক পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং একে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করে খ্যাতি লাভ করেন। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "Muawiyah's reign witnessed not only the consolidation but the extension of the territories of the caliphate."[14]

মুয়াবিয়া মূলত সিংহাসন লাভ ও ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমা বাড়ানোর জন্য খ্রিস্টধর্মাবলম্বী সিরিয়াবাসীদের উপর নির্ভর করেছিলেন।[১৫] তিনি তাঁর অনেক স্ত্রীর মধ্যে সিরীয় জাতের আরব কালব উপজাতিভুক্ত জ্যাকোবাইট খ্রিস্টান Maysun নামক একজন রমণীকে প্রিয়তমা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[১৬] তিনি সিরিয়ার কালবী বা হিমারীয় গোত্রের সমর্থনলাভের জন্য এ গোত্রের নেতা বাহদালের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। বাইজানটেনীয় সিজারদের নিকৃষ্ট ধর্মান্ধতার পরিবর্তে তিনি খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত উদার ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন। মুয়াবিয়ার সময় অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কগুলো শান্তিময় ছিল। পার্সিয়া ও বাইজান্টাইনের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রাখতেন।[১৭] শুধুমাত্র খ্রিস্টান নয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি সমান ব্যবহার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি উদার ও সৌজন্যমূলক ব্যবহারের জন্য জ্যাকোবিয়ান ও ম্যারোনিয়ান খ্রিস্টানগণ

---

[১৪] Philip K Hitti, *History of the Arabs,* Macmillan St Martin's Press, London, Tenth edition, Reprinted 1972, p.194

[১৫] Philip K Hitti, *Ibid,* p. 194

[১৬] Philip K Hitti, *Ibid,* p. 195

[১৭] G. E. Von Grunebaum, *Classical Islam A History 600-1258,* Tr. Katherine Watson, George Allen and Unwin Ltd., London, 1970, p. 70

তাদের ধর্মীয় বিবাদ-কলহ নিয়ে খলিফার দরবারে বিচার প্রার্থনা করতেন।[১৮] খলিফা মুয়াবিয়া তাদের ধর্মীয় কলহ-বিবাদ মিটিয়ে খ্রিস্টানদের মাঝে শান্তি আনয়ন করেন। তাঁর সুশাসনে প্রজারা সুখ-শান্তিতে বসবাস করতো এবং মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। থিয়োফ্যানিসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এডেসার যে গির্জাটি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছিল তিনি উক্ত গির্জা পুনরায় নির্মাণের সকল প্রকার ব্যবস্থা করেন এবং গির্জাটি পুনরায় নির্মাণ করেন।[১৯] তাঁর শাসনামলে যিম্মিদের ধর্মীয় অবস্থার সার্বিক চিত্র বর্ণনা করে Rafi Ahmad Fidai বলেন, “The Zimmis or the non-Muslims were fully safe and secure and no interference was allowed in their religious affairs. There was full freedom of worship to every Zimmi.”[20]

খলিফা ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুতে উবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের নেতৃত্বে দুইটি অভিযান পরিচালনা করেন কিন্তু দুইটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। তখন তিনি তাঁর ভ্রাতষ্পুত্র ও জামাতা ১৭ বছরের টগবগে তরুণ যুবক মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করে সেখানকার ব্রাহ্মণ ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম পালনের অধিকার দেন এবং তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করেন। ফলে তারা পূর্বের ন্যায় তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, মেলা, গির্জা ও উপাসনালয় তৈরি করা, বাদ্য বাজনা বাজানোসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজন করতে থাকে। আরবগণ উন্নত ধরনের ভারতীয় দর্শন, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক পাণ্ডিত্য লাভ করে শুধুমাত্র স্বদেশই গমন করেননি বরং ইউরোপে এর বিস্তার ঘটান। সিন্ধুর প্রশাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় হিন্দুদেরকে কাজে লাগান। প্রশাসনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড স্থানীয় ব্রাহ্মণদের উপর ন্যাস্ত করেন।[২১] সিন্ধুর আরব (মুসলিম) শাসকগণ ইসলামের বিধিমালা যথাযথ অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালনা করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম যুদ্ধাভিযান পরিচালনার সময় সূর্য দেবের মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তা সংস্কারের সকল ব্যবস্থা করেন। বাস্তবপক্ষে, খ্রিস্টানদের গির্জা, ইহুদীদের সিনেগগ এবং ম্যাজিয়ানদের বেদীর মতো দেব-মন্দির (হিন্দুদের) অলঙ্ঘিত ছিল।[২২] ভারতবর্ষে মুসলমানগণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর অমুসলিমদের উপর বলপ্রয়োগ করে ইসলাম ধর্ম বিস্তার করেন নি। সে সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ করে ব্রাহ্মণগণের একচ্ছত্র প্রভাব ও হিন্দু নৃপতিদের অনাচারে জৈন, বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের হিন্দু জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ইসলামের ছায়াতলে এসে সামাজিক মর্যাদা লাভ

---

[১৮] Philip K Hitti, *op.cit,* p. 196
[১৯] Philip K Hitti, *Ibid,* p. 196
[২০] Rafi Ahmad Fidai, Vol. II, *op.cit,* p. 17
[২১] Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India,* The Indian Press (Publication) Private Ltd., Allahabad, 1994, p. 35; R. C. Majumdar, H.G. Raychaudhuri, Kalikinkar Datta, *An Advanced History of India,* Macmillan, New Delhi, 1978, p. 267; Allama Yusuf Alqarzavi, Abu Masud Azhar Nadvi, *Islam Muslims & non Muslims,* Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2010, p. 22
[২২] ডক্টর মো: শফিকুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯০-৯১

করে।[২৩] হিন্দুদের বর্ণপ্রথার কারণেই মূলত তারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একবারের জন্যও বলা যাবে না যে, অমুসলিমদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে। খলিফা ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকে ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেন বিজয়ে প্রেরণ করেন। রডারিক বাহিনী মুসলমানদের হাতে পরাজয় বরণ করেন। এ বিজয়ের ফলে সেখানকার অমুসলিমগণ শুধুমাত্র নিরাপত্তামূলক জিয্ইয়া কর প্রদান করে জান-মালের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করলো। অবশ্য ইতোপূর্বে সেখানে খ্রিস্টানদের অত্যাচারে ইহুদীদের কোনো ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। ইহুদি ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল এবং জোরপূর্বক ইহুদিদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। যদি ইহুদিদিরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ না করত তাহলে তাদেরকে সেবাদাসের জীবনযাপন করতে হতো। তাদের বিবাহ-সাদি জোর করে খ্রিস্টান দাস-দাসীর সাথে দেওয়া হতো। এককথায় স্পেনে সে সময় খ্রিস্টধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম বরদাস্ত করা হতো না।[২৪] মুসলমানরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে সেখানকার উৎপীড়িত ও পদদলিত ইহুদীগণ সম্পূর্ণ বিনা বাধায় স্বধর্ম পালনের অধিকার লাভ করলো। এ সময় তারা মেধা ও যোগ্যতার বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টানদের থেকে ভালো অবস্থানে পৌঁছায়। ধর্মের ব্যাপারে কারও প্রতি কোনো প্রকার অবিচার করা হতো নাএবং পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।[২৫] নতুন বিজিত অঞ্চল সিন্ধু এবং স্পেনে অমুসলিমরা যে রকম ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছিল ঠিক একই রকম ধর্মীয় স্বাধীনতা উমাইয়া শাসিত অঞ্চলে লক্ষ করা যায়। যিম্মিদের প্রতি খলিফা ওয়ালিদ কোনো অন্যায় আচরণ করেছেন এ রকম প্রত্যক্ষ করা যায় না।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ শাসনক্ষমতা লাভ করার পর তিনি ইসলামের প্রকৃত রীতিনীতির আলোকে খ্রিস্টানদের গির্জা, ইহুদিদের সিনাগগ (ধর্মমন্দির) এবং পারসিকদের অগ্নি উপাসনাগুলো ধবংস করেন নাই বরং সেইগুলোর সংস্কার ও বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় কর্তৃক সংরক্ষণের অনুমতি দেন এবং অমুসলিম প্রজাদের সার্বিক কল্যাণ ও দায়িত্ববোধ নিশ্চিন্ত করেন। অবশ্য মুসলিম অধ্যষিত শহরগুলোতে নতুন ধর্মমন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন। তবে নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ এ খলিফার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনীত হয় যে, তাঁর সময়ে ধর্মমন্দির নির্মাণ করা নিষিদ্ধ করা হয়। এ তথ্যটি মোটেও ঠিক নয়। কেননা তাঁর শাসনামলে স্পেনের সারাগোসায় খ্রিস্টানদের একটি গির্জা নির্মিত হয়। তিনি প্রশাসনের সকল বিভাগকে যিম্মিদের সাথে আবদুল মালেক "চার্চ অফ জন" এর কিছু অংশ মসজিদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ছেড়ে দিতে বললে খ্রিস্টানরা যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাবার শর্তে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়। খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য "চার্চ অফ জন" এর কিছু অংশ খ্রিস্টানদের কাছ থেকে নেওয়ার জন্য বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন এবং

---

[২৩] Ishwari Prasad, *op.cit*, 1994, p. 9

[২৪] Sahibzada Masud-ul-Hassan Khan Sabri, *History of Muslim Spain,* Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2004, p. 5

[২৫] S. M. Bijli, *Dharmic Culture and Islam*, Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 1999, p. 33

তাদেরকে সে অর্থের বিনিময়ে চার্চের কিছু অংশ মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তারা চার্চের অংশ দিতে অসম্মতি জানায়। তখন তিনি অঙ্গিকার ভঙ্গের কারণে খ্রিস্টানদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, যদি তোমরা মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জায়গা না দাও তাহলে তোমাদের চার্চ ভেঙে দেওয়া হবে। তখন মুসলমানদের মাঝে কেউ কেউ বললো, যদি গির্জা ভাঙ্গা হয় তাহলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে এবং মানুষজন উম্মাদ হয়ে যাবে। এতে খলিফা কর্ণপাত করলেন না এবং নিজ হাতে হাতুরি নিয়ে চার্চ ভাঙ্গতে শুরু করলেন। তিনি নিজ হাতে দেয়ালের কিছু অংশ ভাঙ্গলেন এবং বাকি অংশটুকু মিস্ত্রী দিয়ে ভেঙে মসজিদের অংশে রূপান্তরিত করা হলো। যখন উমার বিন আবদুল আজিজ শাসনভার গ্রহণ করলেন তখন খ্রিস্টান জনগণ তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে তাদের গির্জা কিভাবে ভেঙ্গে দেওয়া হলো এবং তাদের সাথে খলিফা ওয়ালিদের উগ্র আচরণের কথা জানাল। তখন খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ তাঁর গভর্নরের কাছে পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা দিলেন যে- খ্রিস্টানদের চার্চের যে অংশটুকু অধিগ্রহণ করা হয়েছিল সে জায়গার পরিবর্তে যথোপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ অথবা অন্যত্র জায়গা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারলে ভালো তা না হলে তা যেন তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ তার প্রতি তাদেরই একমাত্র অধিকার রয়েছে। দামেস্কবাসীর নিকট খলিফার এ নির্দেশ অপছন্দনীয় হলো। মুসলমানরা গির্জার যে জায়গাটুকু মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করেছে সে অংশটুকু না নেওয়ার জন্য খ্রিস্টানদেরকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলো। অবশেষে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিজয়কালে মুসলিমদের কর্তৃক দখলকৃত সকল গির্জা ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে "চার্চ অফ জন" এর দাবি ছাড়তে রাজি হলো। এ ব্যাপারে একটি লিখিত চুক্তি হয় যে, মুসলিমরা অন্যান্য সকল গির্জা খ্রিস্টানদেরকে দিয়ে দিবে। হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ সকল ঘটনা অবহিত হয় এ বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে অনুমতি প্রদান করলেন।[২৬] আমীর আলী বলেন যে, "প্রাচীন আত্মসমর্পণ রীতি অনুযায়ী তাঁরা (মুসলমানগণ) খ্রিস্টানদের যে সমস্ত গির্জা ও ইহুদীদের ধর্মমন্দির (সিনাগগ) লাভ করেছিলেন তিনি সেগুলো তাদের প্রত্যার্পণ করেন।"[২৭] প্রাচীন উপাসনালয়গুলো ধ্বংস করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ না হওয়াতে খলিফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ আঞ্চলিক গভর্নরদেরকে এর মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন যে, "তারা যেন কোন উপাসনালয়, গির্জা ও অগ্নিকুণ্ড ধ্বংস না করে।[২৮] খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ হুলওয়ান প্রদেশে নতুন গির্জা নির্মাণের সংবাদ পেয়ে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন নি বরং তিনি গির্জা নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেছেন। অনুরূপ তিনি প্রধান ধর্মযাজক বিশপদের আবেদনের প্রেক্ষিতেও চার্চ নির্মাণে অনুমতি দিয়েছিলেন।[২৯] খলিফা হিশামের শাসনামলে তাঁর অধীন ইরাকের রাজ্যপাল খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ আল

---

[২৬] রশীদ আখতার নদভী, অনু. মাওলানা আবুল বাশার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৫-২০৬, ড. সালেহ হোসাইন আল আয়েদ, অনু. ইউসুফ ইয়াসীন, *মুসলিম বিশ্বে অমুসলিমদের অধিকার*, 'আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৯

[২৭] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 126

[২৮] *আল-মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬, খণ্ড-৭, পৃ. ১২৯

[২৯] Allama Yusuf Alqarzavi, Abu Masud Azhar Nadvi, *op.cit*, p. 109

কাসরি ফুসতাতে তাঁর গ্রিক খ্রিস্টান মাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মাতা রাজি না হওয়ায় মাকে সন্তুষ্ট করতে একটি গির্জা নির্মাণ করেন। তাঁর শাসনামলে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, খ্রিস্টান ও ইহুদীদের ধর্মস্থান নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়।[৩০] যদি ধর্মীয় স্বাধীনতা না থাকতো তাহলে ধর্মমন্দির নির্মাণের অনুমতি পাওয়ার কথা না। খলিফা হিশামের রাজত্বকালে সুদান বিজয়ের পর তিনি সুদানীদের উদ্দেশ্য বলেন, সকলের নিরাপত্তার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, পূর্ববর্তী কোনো কাজের জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না। ধর্মপালনে কোনো বাধা দেওয়া হবে না। যদি কেহ পূর্বের ধর্ম পালন করতে চায় তাহলে তাকে জিয্ইয়া দিতে হবে। তাদের সম্পত্তিরও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। খেলাফত তা করতে বাধ্য।[৩১]

আব্বাসীয় শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতো। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে তারা কখনো বাধার সম্মুখীন হননি। উমাইয়া রাজবংশের পতন এবং আব্বাসীয় রাজবংশের উত্থানের পেছনে অমুসলিম নাগরিকদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। আব্বাসীয়রা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বিশেষভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অমুসলিম নাগরিকরা কোনো হয়রানির স্বীকার হয় নি।[৩২] প্রথম আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে ফরমান জারি করেন যে, তাঁর প্রজাদের মধ্যে যারা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর মত ইবাদত-বন্দেগি করবে, তাদের তিনি জিয্ইয়া হতে অব্যাহতি দান করবেন।[৩৩] আর যারা তাদের স্বধর্মে বহাল থাকবে, তারা তাদের ধর্ম-কর্ম যথারীতি পালন করবে। তবে তাদেরকে জিয্ইয়া প্রদান করতে হবে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হননি। আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর ৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে পেটের জটিল পীড়ায় আক্রান্ত হন। রোগ নিরাময় করতে গিয়ে চিকিৎসকরা ব্যর্থ হন। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর চিকিৎসকরা পেটের পীড়ার চিকিৎসা করেন। তখন খলিফা জুন্দে শাহপুর হাসপাতালের বিভাগীয় প্রধান নেষ্টোরীয় খ্রিস্টান চিকিৎসক জুরজিস ইবনে বখতিশুকে ৭৭১ খ্রিস্টাব্দে ডাকেন। ডাক্তার জুরজিস ইবনে বখতিশু খলিফাকে চিকিৎসা দিলে খলিফা রোগমুক্ত হন। খলিফা ডাক্তারের চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ার পর তার চিকিৎসার উপর আস্থাভাজন হয়ে রাজসভায় চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ দেন। ধার্মিক খলিফা আল-মনসুর তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান জানান। খলিফার আহ্বানে ডাক্তার কোনো সাড়া দেননি। ডাক্তার বলেন, স্বর্গ-নরক কোথায় জানি না তবে আমি আমার পূর্ব-পুরুষদের ধর্মকেই অধিক পছন্দ করি। ফলে পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।[৩৪] খলিফা মনসুর ডাক্তারের এরূপ আচরণে কোনো প্রকার

---

[৩০] Jurji Zayadan, *History of Islamic Civilization Umayyads and Abbasids,* Tr. D.S. Margoliouth, Kitab Bhavan, 2006, New Delhi, p. 137
[৩১] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit,* pp. 147
[৩২] Jurji Zayadan, *op.cit,* p. 167
[৩৩] T.W.Arnold, *The Preaching of Islam,* Kitab Bhavan, New Delhi, 1999, p. 97
[৩৪] *Ibn-al-Ibri,* p. 215, quoted in P. K. Hitti, *History of the Arabs,* p. 309

কষ্ট পাননি। বরং ডাক্তার তার ধর্মীয় আচার-আচরণ এবং ধর্মপালনে রাজদরবারে কোনো প্রকার বাধার সম্মুখীন হননি। কেননা তাঁর এই পরিবার প্রজন্ম ধরে রাজসভার মূল চিকিৎসকদের দায়িত্ব পালন করেন। প্রায় ২৫০ বছর যাবত তাঁর পরিবারের সদস্যগণ রাজসভায় প্রধান চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করেন। যদি খলিফা মনসুর তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে কোনো প্রকার বাধা প্রদান করতো তাহলে তাদের পক্ষে রাজকীয় চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতো না।

আব্বাসীয় শাসনামলের শুরুতে খলিফারা বিশপদেরকে উচ্চ সম্মানী প্রদান করতেন। খলিফা মুসা আল-হাদী প্রায় প্রতিদিনই ধর্মীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য বিশপ তিমুথিউসকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং ধর্মের বিভিন্ন বিষয়াবলি সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আব্বাসীয় খিলাফতে যদি অমুসলিম নাগরিকরা ধর্মীয় স্বাধীনতা না পেতেন তাহলে ধর্মীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কখনো পরিবেশই সৃষ্টি হতো না। তাছাড়া তাদের আলোচনার বিষয়গুলোকে খলিফা একত্রিত করে একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।[৩৫]

খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনামলে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত অমুসলিমদের উপসনালয় নতুন করে নির্মাণের অনুমতি ছিলনা। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল ছাড়া যেখানে অমুসলিমগণ বসবাস করেন সেসব অঞ্চলে তাদের উপাসনালয় তৈরি হয়নি বিষয়টি এমন নয়। আরব অধ্যুষিত অঞ্চলে অমুসলিমগণ উপাসনালয় তৈরি ও নাকুশ বাজাতে না পারলেও যে সকল অঞ্চল আরবদের দখলে যেত সে সকল অঞ্চলে বিদ্যমান উপাসনালয়গুলোর ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য ছিলনা। প্রসিদ্ধ দাতা ও ধার্মিক খলিফা হারুন-অর-রশিদ তাঁর সাম্রাজ্যে যেন অমুসলিমরা কোনোভাবেই তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধার সম্মুখীন না হন এবং এ সংক্রান্ত ইসলামের বিধি-বিধান কি জানার জন্য প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত এ সকল অঞ্চলে ও দেশে ইহুদী, খ্রিস্টানসহ সকল অমুসলিমদের উপাসনালয়গুলো ধ্বংস করা হলো না কেন? কীভাবে তারা তাদের ধর্ম মন্দিরগুলো বহাল রাখিল এবং সময়ে সময়ে তারা এগুলোর সংস্কার সাধন করিতেছে এবং তাদের পার্বণ উপলক্ষে ক্রুশ শোভাযাত্রা বাহির করতে পারে? উত্তরে প্রধান ইমাম বলেন, তারা আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ। এ চুক্তির বিনিময়ে আমরা তাদের জীবন, ধন-সম্পদের নিরাপত্তা দেব। তারা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ক্রুশ শোভাযাত্রা করতে পারবে, নাকুশ বাজাতে পারবে। শত্রুর আক্রমণ হতে নিরাপদ রাখার দায়িত্বও আমাদের। এর বিনিময়ে তারা 'জিয্ইয়া' নামক কর প্রদান করবে। এছাড়াও তারা সামরিক দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি পাবে।[৩৬] খলিফা হারুন-অর-রশিদ অমুসলিমদের প্রতি যেন কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করা না হয় সেজন্য সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

---

[৩৫] Jurji Zayadan, *op.cit*, p. 168

[৩৬] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *কিতাবুল খারাজ* (আরবি), দারুল মারেফা, লেবানন, বৈরুত, ১৯৭৯, পৃ. ১৩৮

ধর্ম পালনে যেন কেউ বাধার সম্মুখীন না হন তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় খলিফা হারুনের প্রশংসা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক মুর বলেন,– "No Caliph, either before or after, displayed such energy and activity in his various progresses whether for pilgrimage, for administration, or for war."[37] কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, খলিফা হারুন-অর-রশিদ অমুসলিমদের প্রতি কিছু ধর্মীয় বৈষম্যমূলক আইন জারি করেন এবং জ্যাকবী খ্রিস্টানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। খলিফা ৮০৭ খ্রিস্টাব্দে বাইজান্টাইন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সকল গির্জা ও বিজিত এলাকার গির্জাসমূহ ধ্বংস করার নির্দেশ জারি করেন।[৩৮] এটা উল্লেখ্য যে, খলিফা হারুন-অর-রশিদ যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে। বাইজান্টাইনদের সাথে যখন খলিফা যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন জ্যাকবী প্রজাদেরকে বাইজান্টাইনদের সমর্থক মনে করে তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। তবে খলিফা নেস্টোরিয়া খ্রিস্টান ও অন্যান্য অমুসলিমদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন নি। নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের মাধ্যমে প্রমাণ করা যাবে না যে, তিনি অমুসলিমদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন বরং তাদের প্রতি তিনি উদার ও সৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন। তিনি যদি অমুসলিমদের সাথে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করতেন তাহলে তাঁর ভ্রাতা হাদির শাসনামলে মিসরে যে চার্চ ধ্বংস করে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন, খলিফা হারুন-অর-রশিদ খলিফা হওয়ার পর নতুন করে পুনঃনির্মাণের আদেশ দিতেন না। উল্লেখ্য যে, খলিফা হারুন অর রশিদের শাসনামলে মিসরের গভর্নর মুসা বিন ঈসা উলেমাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন ধ্বংসকৃত চার্চসমূহের পুনঃমেরামত করার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। উলেমাদের নেতা লেইথ ইবনে সা'দ ও আবদুল্লাহ ইবনে লাহিয়া সরকারের টাকায় এ সকল চার্চগুলো পুনঃনির্মাণ করে দেওয়ার জন্য রায় দেন।[৩৯] এতে প্রমাণিত হয় যে, খলিফা হারুণ-অর-রশিদ বিশেষ পরিস্থিতিতে অমুসলিমদের সাথে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন।

আব্বাসীয় শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো খলিফা আল মামুনের যুগ (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)। তাঁর রাজত্বকাল ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এ যুগটি বিশেষভাবে প্রমাণ করেছে ইসলাম মানবতার ধর্ম, সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণির প্রজার জন্য তাঁর আইন সমান ছিল। তিনি যুক্তিবাদী মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও তাঁর সময়ে সকল সম্প্রদায়কে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। এ সময়ে কোনো অমুসলিমকে নিজের ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া হয়েছে বা জোরপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হয়েছে এ রকম উদাহরণ নেই। যিম্মিদের ধর্মান্তরের বিষয়ে প্রশাসন

---

[৩৭] William Muir, *The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall,* Khayats, Beirut,1963, p. 488

[৩৮] মুসা আনসারী, *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, চয়নিকা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩০৪

[৩৯] Maulana Mohd. Taqi Amini, *The Agrarian System of Islam,* Tr. Syed Ahmad Ali, Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 1991, p. 83

থেকে চাপ প্রয়োগের কোনো নজির পাওয়া যায় না। তবে যারা ইসলামের মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো খলিফা তাদেরকে অভিবাধন জানাতেন। এ সময় সকল অমুসলিম নাগরিক সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ উপাসনালয়ে যাতায়াত করতে পারতো। প্রশাসন থেকে ধর্মের প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক চেতনার কোনোরূপ বিচ্যুতি আমরা অবলোকন করি না। এ সময় খ্রিস্টানদের ১১০০০ চার্চ, ইহুদীদের শত শত সিনেগগ্ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মন্দির তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যমান ছিল।[৪০]

নিষ্ঠুরতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার জন্য খলিফা মুতাওয়াক্কিলকে 'আরবদের নীরো' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। গোড়া সুন্নি[৪১] মতাবলম্বী খলিফা শিয়া, মুতাযিলা, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম ব্যবহার করেন। তিনি শুধুমাত্র অমুসলিমদেরকে সরকারি কার্য হতে বহিষ্কার করেননি বরং মুতাযিলাপন্থি মুসলিমদেরকে মসজিদ, রাজদরবার ও সরকারি চাকুরি হতে বহিষ্কার করেন। অমুসলিমদেরকে তাঁর শাসনামলে রাজকার্যে নিয়োগে তিনি অনীহা প্রকাশ করেন। প্রতিক্রিয়াশীল সুন্নিদের প্রতিভূ খলিফা মুতাওয়াক্কিল ৮৫০ ও ৮৫৪ সালে যিম্মিদের বিরুদ্ধে কিছু ধর্মীয় বৈষম্যমূলক আইন জারি করেন।[৪২] অমুসলিমদেরকে মুসলমানদের তুলনায় অধিক কর প্রদান করতে হতো। রাষ্ট্রীয় কর্ম থেকে তাদের বহিষ্কৃত এবং তাদের উপর করের বোঝা আরোপ করে ধর্মান্ধতার পরিচয় দেন। শিয়াদের[৪৩] সাথে দুর্ব্যবহার, কারবালায় ইমাম হুসাইনের মাজার ধ্বংসসহ সর্বোপরি হযরত আলী (রা.) এর পরিবারের সাথে দুর্ব্যবহার,

[৪০] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit*, p. 149; Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, Cosimo Classics, New York, 2010, p. 274

[৪১] সুন্নি শব্দটি সুন্নাহ শব্দ থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো রীতি-নীতি, প্রথা ও অভ্যাস। মুসলিম সম্প্রদায় প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত । যথা : সুন্নি ও শিয়া। মুসলমানদের প্রধান সম্প্রদায়ের নাম সুন্নি। যে সকল মুসলমানগণ রাসূল (স.)-এর আদেশ, নির্দেশ ও কর্মপ্রণালী যথাযথভাবে অনুসরণ করে তারা সুন্নি নামে অভিহিত। সুন্নি সম্প্রদায়ের সমর্থকগণ খোলাফায়ে রাশেদিনের পথ নির্দেশিকা ও তাদের সিদ্ধান্ত , ইজমা ও কিয়াসের নীতিসমূহকে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের পরিপূরক রূপে গণ্য করে থাকে। সুন্নিগণ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হলেও ইসলামের মৌলিক উৎসের ক্ষেত্রে সকলেই দৃঢ় আস্থাশীল ও ঐকমত্য পোষণ করে। সুন্নিদের চারজন বিখ্যাত ইমাম রয়েছেন। তারা হলেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম আল-শাফীই এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতেই ফিকাহশাস্ত্রে চারটি মতামত বা ধারা সৃষ্টি হয়েছে। এই মতামত বা ধারাসমূহকে এক সাথে চার মাযহাব (Four Sunni School of Law) বলা হয়। মুসলিম সমাজ কর্তৃক এ চারটি মাযহাব স্বীকৃত এবং সকল সুন্নি মুসলমানগণই এ চারটি মাযহাব হতে যে কোনো একটির আনুগত্য প্রদর্শন করে। ফলে সকল মুসলমানের নিকট এ চারটি মাযহাব সমভাবে শ্রদ্ধেয় ও গ্রহণীয়। আব্বাসীয় শাসনামলে সুন্নি সম্প্রদায়ের মাযহাব চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সুন্নিরা ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার মতের ধারণা পোষণ করে। Syed Abdul Hai, *Muslim Philosophy*, Vol. I, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1982, pp. 46-49; মোঃ আবু তাহের, *ইসলামের সামাজিক ইতিহাস*, কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২২৩-২২৯

[৪২] মুসা আনসারী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৪

[৪৩] খিলাফত ও ইমামত প্রশ্নে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর মুসলমানগণ দুটি প্রধান বিবাদমান দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এর মধ্যে একটি হলো শিয়া দল। খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত আরোহণের পর শিয়াদের জন্ম হয়ে থাকলেও তারা খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। শিয়াদের মতে, প্রথম তিন খলিফা ছিলেন জোরপূর্বক ক্ষমতার অধিকারী। তারা হযরত আলী (রা.) নেতৃত্বের একমাত্র বৈধ অধিকারী। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর থেকে দুটি দলের মাঝে পার্থক্য থাকলেও মুয়াবিয়ার শাসনক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত এটি স্পস্টরূপ ধারণ করেনি। মুয়াবিয়া রাজক্ষমতায় আরোহণের পর হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থকবৃন্দ নিজেদেরকে শিয়া-ই-আলী বা সংক্ষেপে শিয়া নামে অভিহিত করতে আরম্ভ করে। এরা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি রাজনৈতিক দল। শিয়াদের মতে হযরত আলী এবং তাঁর বংশধরগণই প্রকৃত ইমাম। শিয়াদের মতে, ইমামত বা নেতৃত্ব হযরত আলী (রা.)-এর বংশধরদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। শিয়াদের মতে, জনগণের খলিফা নির্বাচন করার কোনো অধিকার নেই। তারা উমাইয়া ও আব্বাসী খলিফাদের স্বীকার করে না। শিয়াদের মাঝে ইমামত প্রশ্নে তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক দলের সৃষ্টি হয়। এসব দলের মধ্যে সাবিয়া তথা সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী, ইস্না আশারিয়া তথা দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী এবং যায়দিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Syed Abdul Hai, Vol. I, *op.cit*, pp. 50-56; ড. আবদুল বাছির, *মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তার রূপরেখা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৮, পৃ; ৪০-৪৬, শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬২-২৮৬

মুতাযিলা নেতাদের কারারুদ্ধ করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, মুতাযিলা মতবাদ প্রকাশ্য ব্যক্ত করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, অমুসলিমদেরকে নির্যাতন খলিফা মুতাওয়াক্কিলের ধর্মীয় গোড়ামি ভিন্ন কিছু নয়।

খলিফা মুতাওয়াক্কিলের ধর্মীয় নীতির কারণে অমুসলমানগণ বিশেষ করে মাজুস, ইহুদী, খ্রিস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। খলিফা মুতাওয়াক্কিল ৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে সব নতুন চার্চ ধ্বংস করতে আদেশ দেন। এ সময় ইচ্ছেমতো চার্চ নির্মাণ করা হতো বলে খলিফা নিষিদ্ধের আইন করেন।[৪৪] তবে এটা সত্য যে, সে সময় নয় সকল উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের সময় লক্ষ করা যায় যে, চার্চ নির্মাণ ও ধ্বংস সবকিছুই শাসকদের মেজাজ-মর্জির উপর নির্ভর করতো। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতার পটপরিবর্তনের সময় তা ব্যাপক আকার ধারণ করতো। আল-মুতাওয়াক্কিলের আইনই শেষ কথা নয়। তিনি যে চার্চ ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিলেন তা শুধুমাত্র তাঁর শাসনামলেই বিদ্যমান ছিল কিন্তু পরবর্তীতে নতুন চার্চ নির্মাণ ও পুরাতন চার্চ সংস্কার করাসহ অনুমতি লাভ করেছিলেন। খলিফা মুকতাফি (১১৩৬-৬০ খ্রি.) শাসন ক্ষমতায় এসে যিম্মিদের প্রতি সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য যথাযথ নির্দেশনা জারি করেন। তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড যেন তারা নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে পারে সেজন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁর আদেশ বলে তাদের ভোগ করা আগের সকল সুযোগ-সুবিধা পুনর্বহাল করেন। তিনি তাদের মাঝে যারা সক্ষম শুধু তাদের থেকে কর আদায় করার জন্য নির্দেশ দেন।[৪৫]

উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া থেকে শুরু করে শেষ আব্বাসীয় খলিফা আল-মুসতাসিমের শাসনকাল পর্যন্ত মুসলিম শাসকরা অমুসলিমদের সামগ্রিক কল্যাণ ও জীবনমানের উন্নয়নের ব্যাপারে বেশ সতর্ক ছিলেন। এ সময় তাদের ধর্মীয় বিষয়াবলিতে হস্তক্ষেপ করা হতো না। অমুসলিমদেরকে উজিরের পদ পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছিল। তারপরেও দু'একজন খলিফা ধর্মান্ধ হয়ে অমুসলিমদের প্রতি ধর্মীয় বৈষম্যমূলক আইন জারি করে অসন্তোস সৃষ্টি করে। এ রকম দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া অমুসলিমগণ সর্বদা মুসলিম শাসনে সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে।

রাজনৈতিক অধিকার

আরবরা তাদের বিজিত অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক ছিল। সংখ্যা স্বল্পতার কারণে তারা বড় ধরনের সমস্যার সাথে নিজেদের জড়াতে আগ্রহী ছিল না।[৪৬] তবে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য তারা নও-মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর উপর রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার

[৪৪] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, *তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক*, খণ্ড-৯, দারুল মা'রিফ, মিসর, ১৯৭৫, পৃ. ১৯৬
[৪৫] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit*, p. 150
[৪৬] G. E. Von Grunebaum, *op.cit*, p. 70

করেছেন। উমাইয়া শাসনামলে লক্ষ করা যায় যে, আরব মুসলিম ও নও মুসলিমরা একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্র থেকে পেত না। নব-মুসলিমগণ সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদা লাভ করতেন। অথচ ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী আরব মুসলিম, নব-মুসলিম ও অমুসলিম সকলের মর্যাদা সমান। উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের শাসনামলে খ্রিস্টান-আরব উপজাতির বানু তাগলিব প্রধান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে হত্যা করা হয়।[৪৭] এ রকম কর্ম খলিফার শাসনামলে সম্পাদিত হয়েছে যা ইসলামের আচারবিরোধী। এ সময় খ্রিস্টানদেরকে রাজনৈতিকভাবে হেয় করা হয়েছে। খলিফা সুলায়মানের (৭১৫-৭১৭ খ্রি.) রাজত্বকালে উসামা বিন যায়েদ মিশরে পাদ্রী গণনাকালে প্রত্যেকের বাম হাতে লোহার রিং পরিয়ে সেখানে চার্চের নাম লিপিবদ্ধ করে দেন। যারা তা মানতে চায়নি তাদের খোঁড়া, অন্ধ করা সহ নানাবিধ শাস্তি দেন। হিসামের শাসনকালে হানযালা ২০ থেকে ১০০ বছর বয়সী সকলের সীল বাধ্যতামূলক করে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করেন। এতে মনে হয় খলিফা সুলায়মান ও খলিফা হিশামের রাজত্বকালে রাজনৈতিক অধিকার বলতে অমুসলিমদের কিছুই ছিল না। কিন্তু উপরিউক্ত বর্ণনাটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সে সময় প্রশাসনের কাছে সকল করদাতাদের তালিকা ছিল। করদাতাদের তালিকা থাকলে সিলাঙ্কিত করার কোনো যুক্তি নেই।[৪৮] উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজক্ষমতায় আসে আব্বাসীয়রা। উমাইয়াদের পতনের পর সৃষ্ট অরাজকতার সময় একদল মানুষ মিসরে বিভিন্ন গির্জায় লুণ্ঠন চালায়। এদের মধ্যে একজন গির্জার সুন্দরী মহিলা পাদ্রীকে অপহরণ করে যে তিন বছর বয়সে পাদ্রী হওয়ার শপথ করেছিল। মহিলা পাদ্রীকে নিজের কাছে রেখে দিবে নাকি খলিফার কাছে হস্তান্তর করবে এ নিয়ে লোকটি দ্বিধায় পড়ে যায়। লোকটি যখন পাদ্রীর কাছে যায় তখন সে (মহিলা পাদ্রী) বলে তার পিতা একজন সৈনিক ছিলেন এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেও তার কিছু হবে না। এরপর সে লোকটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে বিষয়টি পরীক্ষা করতে বলে। লোকটি মহিলাকে আঘাত করার সাথে সাথে ঘাড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে যায়। তখন অপহরণকারী দল তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং আটককৃত মহিলা পাদ্রীদেরকে মুক্তি দেয়।[৪৯] উক্ত ঘটনার কারণে প্রতীয়মান হয় যে, আব্বাসীয়রা রাজক্ষমতায় আসার পর অমুসলিমদের কোনো ধরনের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। ঘটনাটি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, আসলে কোনো সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন কোনো সাম্রাজ্যের উত্থান হয় তখন বিভিন্ন দল তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের অরাজকতা করে থাকে। আব্বাসীয় উত্থানে এমন একটি দল এ রকম অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ রকম আর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আব্বাসীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহকারী বিধর্মী জিনদীক সম্প্রদায়ের প্রতি

---

[৪৭] Philip K Hitti, *op.cit*, p. 234
[৪৮] A. S. Tritton, *op.cit*, p. 125
[৪৯] A. S. Tritton, *op.cit*, pp. 150-51

ধর্মপ্রাণ খলিফা মাহ্দী কোনোরকম দয়া প্রদর্শন না করে কঠোর হস্তে এদের বিদ্রোহ দমন করেন। এ সকল বিদ্রোহ কঠোরতার সাথে মোকাবিলা না করলে এ সকল সম্প্রদায় আব্বাসীয় খলিফা ও সাম্রাজ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াত। এ রকম বিধর্মী সম্প্রদায়কে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিলে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করতে তৎপর হতো।[৫০] খলিফা মাহদী যদি বিদ্রোহ কঠোরতার সাথে মোকাবিলা না করতেন তাহলে বিদ্রোহীরা খলিফাকে সিংহাসনচ্যুত করতেন। খলিফার শাসনামলে মুসলিম-অমুসলিম সমাজ বিবেকের স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা একই রকম ভোগ করতেন। খলিফার দরবারে ধর্মীয় বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হতো যে রকম ধর্মীয় বিতর্ক সভা উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া ও আবদুল মালেকের দরবারে অনুষ্ঠিত হতো। এতে মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি, জরথুষ্ট্র বা মাজুসী সম্প্রদায়সহ অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হতেন। উল্লেখ্য যে, ৭৮১ সালে ধর্মযাজক টমোথী খলিফা আল মাহ্দীর দরবারে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে যে ধর্মীয় বিতর্ক হয় তার সারসংকলন করেন।[৫১] যদি রাজনৈতিক অধিকার থেকে অমুসলিমরা বঞ্চিত হতেন তাহলে এ রকম ধর্মীয় সভায় উপস্থিত হওয়া অমুসলিমদের জন্য সম্ভব হতো না। খলিফা মাহদীর শাসনামলে বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করে তাদেরকে রাজনেতিকভাবে দমন করলেও ধর্মীয় সভার আয়োজনের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, তাঁর শাসনামলে উদার রাজনীতির চর্চা ছিল।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ বাইজান্টাইনদের সাথে যখন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন তিনি জ্যাকবী প্রজাদের প্রতি বাইজান্টাইন সমর্থক ধরে নিয়ে তাদের প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন করেন এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। এ আচরণ কিন্তু তিনি ধর্মীয় কারণে করেননি বরং তাদের প্রতি তিনি এ আচরণ করেছেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে।[৫২] খলিফা আল-মামুনের শাসনের পূর্ব পর্যন্ত খ্রিস্টানরা মিসরে অনেকবার মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের দ্বন্দ্ব হয়েছে। খ্রিস্টানরা সে সময় রাজনৈতিকভাবে তাদের অধিকারের নিশ্চয়তা চেয়েছে। অমুসলিমদেরকে কখনো কখনো তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে।

খলিফা আল-মামুন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর অধীনে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে একটি রাষ্ট্র পরিষদ (Council of State) গঠন করেছিলেন। এটি খলিফা আল-মামুনের সময়ে একটি রাজনৈতিক সংগঠন। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে Council of State বা রাষ্ট্র পরিষদ তিনি মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান, সাবিয়ী ও জরথুষ্ট্রীগণ নিয়ে গঠন করেন যা সর্বোতভাবে খলিফাকে সাহায্য করতো।[৫৩] এ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে খলিফাকে অবহিত করতেন এবং এ সমস্ত বিষয়ে খলিফাকে গুরত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতেন। তাঁর সময় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল সিদ্ধান্ত এ পরিষদ থেকে নেওয়া হতো। যে সকল অমুসলিম এ

---

[৫০] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 232
[৫১] মুসা আনসারী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৫
[৫২] মুসা আনসারী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৫
[৫৩] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 274

পরিষদের সদস্য ছিল তাদের ধর্মীয় বিষয়ের পরিপন্থি কোনো শপথ করতে হয় নি। এই রাজনৈতিক অধিকার লাভের মাধ্যমে তারা নিজেদের দাবি-দাওয়া ও প্রস্তাবসমূহ সম্পূর্ণ বিনা বাধায় খলিফার সামনে উপস্থাপন করতে পারতো। এ সময় কোনো সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয়ভাবে নিগৃহের স্বীকার হয়েছে এ রকম তথ্য পাওয়া যায় না। রাজনৈতিকভাবে অমুসলিমরা যে বঞ্চিত ছিল না তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো খলিফা মামুন মিশনারিদের কার্যক্রমে কখনো বাধা প্রদান করেন নি। একবার মেনভাইট খ্রিস্টান গোত্রের প্রধান বাগদাদের খলিফা আল-মামুনের দরবারে মুসলিম পণ্ডিতদের কাছে তর্কে হেরে যান। যাবার সময় খলিফা যাত্রাপথের নিরাপত্তা বিধানের জন্য লোকদের প্রেরণ করেন যা ছিল তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অন্যতম নিদর্শন। তার সময়ে যে সকল বিশপ ধর্মান্তরিত হয়েছে অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের কেউই বলপ্রয়োগে নয়, স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছে।[৫৪] রাজনৈতিকভাবে খলিফা মামুন যে সংকীর্ণমনা ছিল না তার অন্যতম উদাহরণ হলো, খারিজি[৫৫] দলপতি খলিফার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে কতিপয় প্রশ্ন করলেন। এক প্রশ্নের উত্তরে খলিফা বললেন যে, যদি তারা একমত হয়ে রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে খলিফা পদে নির্বাচন করেন, তাহলে তিনি তাঁর অনুকূলে পদত্যাগ করবেন। প্রশ্নের জবাবে খারিজি নেতা সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। রাষ্ট্রে যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার না থাকতো তাহলে খারিজি নেতার পক্ষে এ রকম বক্তব্য প্রদান করা সম্ভব হতো না। খলিফার দরবারে বাকুম নামক মিসরের বুরাতে বসবাসকারী এক ধনী ব্যক্তি আগমন করে নগরের প্রধান হওয়ার জন্য আর্জি পেশ করেন। খলিফা বলেছিলেন, তুমি মুসলমান হয়ে আমার অনুসারী হলে তোমাকে উক্ত পদে নিয়োগ করব। বাকুম জবাবে বলেছিলেন, আপনার নিকট দশ হাজার মাওয়ালী আছে কিন্তু একজনও খ্রিস্টান নেই। খলিফা মামুন হাসলেন এবং তাকে তার জেলা বুরাতে প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিলেন।[৫৬] যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকতো তাহলে তিনি খলিফার দরবারে গিয়ে উক্ত কথোপকথন করতে পারতেন না এবং উক্ত নগরীর প্রধান হতে পারতেন না। সুতরাং এটা প্রমাণিত

---

[৫৪] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit*, pp. 149

[৫৫] খারেজি শব্দটি আরবি। এর অর্থ বের হওয়া, দল ত্যাগ করা, ভিন্ন মত পোষণ করা। অতএব খারেজি শব্দের অর্থ হলো দলত্যাগী। যেহেতু খারিজিগণ অন্য মুসলমানদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন সেহেতু তাদেরকে খারিজি বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে খারিজি সম্প্রদায় প্রথম ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল। ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা.)-এর সমর্থকগণ যখন সিফফিনের যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তখন মুয়াবিয়া দেখতে পেলেন যুদ্ধে জয়লাভ করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব তখন তিনি বর্ষার অগ্রভাগে কোরআন শরিফ বেঁধে যুদ্ধ বিরতির আহবান জানালেন। তখন আলী (রা.) যুদ্ধবিরতি দিয়ে দুমাতুল জন্দাল নামক স্থানে আপোস মীমাংসার জন্য বসলেন। ৬৫৭ খি. ২৮ শে জুলাই খিলাফতে বিশ্বাস ও ধর্মের যৌক্তিকতার প্রশ্ন তুলে বা দুমাতুল জান্দলের মীমাংসার প্রতিবাদে আবদুল্লাহ বিন-ওহাব আল-রাশিবীর নেতৃত্বে প্রায় বার হাজার সৈন্যের একটি দল ‘লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ’ ধ্বনি দিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ ত্যাগ করে ইতিহাসে এরাই খারিজি নামে পরিচিত। এরা হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) উভয়ের বিরোধিতা শুরু করেন। হযরত আলী (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। ইসলাম সম্পর্কে খারিজিদের ধারণা খুবই সংকীর্ণ ও গোঁড়া। তারা হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) ব্যতীত খোলাফায়ে রাশেদিনের আর কোনো খলিফার নেতৃত্ব স্বীকার করে না। তারা অমুসলিমদের ধ্বংস বা হত্যা করা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতো। উমাইয়া খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ ছাড়া আর কোন খলিফাকে স্বীকার করতো না। আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন ছাড়া তারা আর অন্য কোনো খলিফাকে স্বীকৃতি দেয়নি। খারিজিরা সময়ের পরিক্রমায় নিজেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে আযারিকা ও ইবাদিয়া গুরত্বপুর্ণ দলগুলোর মাঝে অন্যতম ছিল। Syed Abdul Hai, Vol. I, *op.cit*, pp. 58-59; S. Khuda Bakhsh, *Politics in Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2003, pp. 79-91; অধ্যাপক হাসান আইয়ূব, অনু. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৯৪-৯৫ ড. আবদুল বাছির, *পূর্বোক্ত*, পৃ; ৩৫-৩৯, শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৩-২৬২.

[৫৬] A. S. Tritton, *op.cit*, p. 23

যে, খলিফা মামুনের শাসনামলে কোনো প্রকার রাজনৈতিক হয়রানির শিকার কেউ হয়নি। মূলত ইহুদী ও খিস্টানদের সাথে খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর সময় সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে উঠলেও উমাইয়া শাসনামলে তা পূর্ণতা পায়নি। কিন্তু এর পূর্ণতা পেয়েছিল উমাইয়া পরবর্তী শাসনামলে। এ সময় উচ্চ বংশীয় কিতাবীরা সমাজে অধিকতর সুবিধা ভোগ করতো। বিশেষত উচ্চ বংশীয় যিম্মিরা নবম ও দশম শতাব্দীতে Intellectual ও Administrative ক্ষেত্রে অনেক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।[৫৭] উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলের রাজনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করলে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, উমাইয়া শাসনামলে রাজ্যে নও মুসলিম ও অমুসলিমরা রাজনৈতিকভাবে কখনো কখনো হেয় প্রতিপন্ন হলেও আব্বাসীয় শাসনামলে তেমনটা লক্ষ করা যায় না।

নাগরিক ও সামাজিক অধিকার

অমুসলিমরা খিলাফত রাষ্ট্রের বিশেষ সম্মানিত নাগরিক। রাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে শত্রুদের সাথে হাত মিলালে এবং ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করলে অমুসলিমরা নাগরিকত্বহীন হয়ে যায়। এ দুই অবস্থা ছাড়া আর যতবড় অপরাধ করুক না কেন তাদের নাগরিকত্ব যাবে না। কেউ যদি জিয্ইয়া দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং কোনো মুসলিমকে হত্যা করে তাহলেও তার নাগরিকত্ব যাবে না। অবশ্য কৃত অপকর্মের জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের নাগরিক নিরাপত্তা ও সকল প্রকার সামাজিক সুবিধা প্রদান করা ইসলামি রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। সকল সম্প্রদায়ের সমমর্যাদা নিশ্চিত করা কঠিন হলেও অবাস্তব নয়। উমাইয়া শাসনামলে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা একই এলাকায় বসবাস করতো।[৫৮] বিভিন্ন ধর্মের লোকদের একসাথে বসবাসের কারণে তাদের মাঝে কোনো রকম অনৈক্য বা সরকারের নিকট কোনো অভিযোগ প্রদান করতে খুব কম দেখা যেত। উমাইয়া আমলে নাগরিকদের যথাযথ মর্যাদা ও সামাজিক অধিকারের বিষয়টি নিম্নোক্ত ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়। উমাইয়া আমলের বিশিষ্ট কবি আল-আখতাল বকর বিন ওয়ালী গোত্রের পক্ষে সমঝোতা করার জন্য একটি মসজিদে হাজির হন। তিনি সিল্কের জুব্বা ও গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে খলিফার সামনে হাজির হয়েছিলেন এবং তার দাড়িতে মদের চিহ্ন ছিল। কাজী যাহাফ কবিকে বললেন, তোমার আচরণে আমি হতবাক। তুমি খ্রিস্টান হয়ে যেভাবে মসজিদে এসেছে এটা কাম্য নয়। এ কথা শুনে আল-আখতাল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলেন। তখন খলিফা তাকে আশ্বস্ত করেন, তোমার ভয়ের কিছুই নেই।[৫৯]

হযরত উমর বিন আবদুল আজিজের শাসনামলে তাঁর ভ্রাতষ্পুত্র ওয়ালিদ বিন আব্বাসের বিরুদ্ধে একজন অমুসলিম তার জামি অন্যায়ভাবে দখল করার অভিযোগ প্রদান করে। অমুসলিম ব্যক্তিটি অভিযোগ করলো

---

[৫৭] G. E. Von Grunebaum, *op.cit*, pp. 76-77
[৫৮] G. E. Von Grunebaum, *Ibid*, p. 76
[৫৯] Jurji Zayadan, *op.cit*, p. 137

ওয়ালিদ বিন আব্বাস তাঁর ভূমিটি তাঁর পিতা ওয়ালিদের শাসনামলে নিয়েছে। খলিফা ভ্রাতুষ্পুত্রকে জমি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়ালিদ বিন আব্বাস বললো, আমি দলিলের মাধ্যমে এ জমির মালিক হয়েছি। ন্যায়পরায়ণ খলিফা প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করে দেখলেন এ জমির প্রকৃত মালিক অমুসলিম ব্যক্তি। তখন উক্ত জমি ওয়ালিদ বিন আব্বাসের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে অমুসলিমকে প্রদান করেন।[৬০] যদি উক্ত অমুসলিম ব্যক্তি তার ভূমি ফেরত না পেত, তাহলে সে সামাজিক বৈষম্যের স্বীকার হতো এবং তাঁর নাগরিকত্ব হুমকির সম্মুখীন হতো। কেননা মুসলমানরা এ রকম পদ্ধতিতে অমুসলিমদের ভূমি দখল করে নিত। উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ উক্ত ঘটনার বাস্তব অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে তাঁর বা তাঁর পরিবারবর্গের নিকট যে সমস্ত মালামাল অবৈধ ছিল বলে মনে করেছেন বা বংশ পরম্পরায় খলিফাদের আত্মীয়-স্বজনরা এ রকম যে সকল ভোগ করেছেন তা প্রকৃত মালিকদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, উমাইয়া আমলে অমুসলিম নাগরিকরা কখনো সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার হয়নি।

আব্বাসীয় খলিফা হারুনের শাসনকালে কিন্দার ইয়াকুব বিন ইসহাক একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসক ছিলেন। একজন ইহুদী হয়েও তার যোগ্যতার কারণে তিনি মামুনের শিক্ষক হতে পেরেছিলেন। একদিন তিনি খলিফা হারুনের দরবারে আসলেন। খলিফার দরবারে এসে তিনি একটি উঁচু আসনে বসলেন অথচ অন্যান্য প্রভাবশালী মুসলিমরা তার চেয়ে নিচু আসনে বসে ছিলেন। তখন একজন মুসলমান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, একজন ইহুদী হয়ে তুমি কেন উঁচু আসনে বসলে। তখন ইয়াকুব উত্তর দিল তুমি যা জানো তা আমি জানি। কিন্তু আমি যা জানি তা তুমি জানো না।[৬১] ইয়াকুব তার জ্ঞানের জন্য উঁচু আসনে বসতে পেরেছেন। বিদ্বান ব্যক্তি সর্বত্রই সম্মানীয়। সম্মানীত ব্যক্তিকে আব্বাসীয় খিলাফতে অসম্মানিত করা হয় নি। সমাজে যে মর্যাদা নিয়ে বিদ্বান ব্যক্তির বসবাস করা উচিত তা নিয়েই বিদ্বান ব্যক্তিরা বসবাস করতেন। এক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর কোনো তারতম্য করা হয়নি।

চুক্তি রক্ষা

মুসলমানদের আবশ্যকীয় পালনীয় কর্তব্য হলো চুক্তি রক্ষা করা। ইসলামের প্রারম্ভিক কাল থেকে অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি হতো। যাদের সাথে এ চুক্তি সম্পাদন হতো তাদেরকে যিম্মি বলা হতো।[৬২] চুক্তিবদ্ধ লোকদের সাথে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে নিজেকে গণনা করতে হবে তাদের একজন, তাদের সম্মান ও তোমার সম্মান এবং তাদের প্রতিজ্ঞা ও তোমার প্রতিজ্ঞার মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না। তাদের সাথে

---

৬০ Rafi Ahmad Fidai, Vol. II, *op.cit*, p. 88
৬১ A. S. Tritton, *op.cit*, p. 148
৬২ Jurji Zayadan, *op.cit*, p. 119

কখনো চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না।[৬৩] আর এ চুক্তির বিনিময়ে তারা রাষ্ট্রে যিম্মির মর্যাদা পেতো। ফলে তারা স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম পালন, তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা পেত।[৬৪] ইসলামি রাষ্ট্র কখনো চুক্তি ভঙ্গ করতে পারবে না যতক্ষণ না শত্রুরাষ্ট্রের পক্ষ হতে প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া হতো। শত্রু রাষ্ট্রের প্রতারনার কারণে যদি চুক্তি বাতিল করতে হয়, তাহলে চুক্তি বাতিলের পূর্বে শত্রু রাষ্ট্রকে এ সম্পর্কে অবহিত করে তাদের চুক্তিনামা ফেরত দিতে হবে। চুক্তিনামা স্থায়ী না হয়ে যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হতো, তাহেল সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে তা বাতিল করা হতো।[৬৫] সামান্য অজুহাতে চুক্তি ভঙ্গ করলে তার জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে পরকালে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৬৬]

হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন,

من آمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة-

"যে কেহ কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান করিয়া পরে তাহাকে হত্যা করে, কিয়ামতের দিন উক্ত আশ্রয় প্রদানকারীকে বিশ্বাসঘাতকতার ঝাণ্ডা দেওয়া হইবে।"[৬৭]

খলিফা মুয়াবিয়া ও রুমিদের (এশিয়া মাইনরের খ্রিস্টানদের) মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল। এশিয়া মাইনরের খ্রিস্টানরা চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করলে খলিফা মুয়াবিয়া তাদের উপর চটে যান এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেন। সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই খলিফা তাদের বিরুদ্ধে সীমান্ত অভিমুখে অভিযান প্রেরণ করেন। এমন সময় একজন অশ্বারোহী তার নিকট এসে বলতে লাগলো, আল্লাহ মহান, প্রত্যেকের উচিত সন্ধির শর্ত মেনে চলা এবং তার খেলাপ না করা। তখন অশ্বারোহী সাহাবি উমর ইবনে আস বলে উঠলেন, খলিফা, আপনি তাদের সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ। সুতরাং আপনি অঙ্গীকার পূর্ণ করুন। অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি, "কারো সাথে কারো সন্ধি থাকলে কখনো যেন উহার ব্যতিক্রম না করে, যে পর্যন্ত না উহার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, অথবা পূর্বাহ্নে যদি প্রতিপক্ষকে সন্ধি রহিত হলো বলে জানিয়ে দেওয়া না হয়।"[৬৮] সুতরাং সন্ধি ভঙ্গ করতে হলে অপর পক্ষকে তা যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে। খলিফা মুয়াবিয়া তা শুনে তাৎক্ষণিক যুদ্ধের প্রস্তুতি বন্ধ করতে বললেন।

---

[৬৩] Danial C. Dennett, *Conversion and Poll Tax in Early Islam*, Idarah-i Adabyat-i Delli, Delhi, 1950, p. 68
[৬৪] G. E. Von Grunebaum, *op.cit*, p. 76
[৬৫] S. A. Siddiqi, *Public Finance in Islam*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2007, p. 2
[৬৬] *আল কোরআন*, ১৭:৩৪
[৬৭] মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব আত্ তাবরিজী, অনু. এম আফলাতুন কায়সার, *মেশকাত শরীফ*, হাদিস নং-৩৮০৩, ৮ম খণ্ড, এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৬
[৬৮] মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব আত্ তাবরিজী, ৮ম খণ্ড, হাদিস নং-৩৮০৪,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭

আব্বাসীয় খলিফা মাহ্দীর রাজত্বকালে বাইজান্টাইন সম্রাট প্রথম কনস্টান্টাইন আর্মেনিয়া ও এশিয়া মাইনরে মুসলিম রাজ্যের সীমানায় অতর্কিত আক্রমণ করে। প্রায় লক্ষাধিক সৈন্যসহ যুবরাজ হারুন ও খালিদ-বিন-বার্মাক সৈন্যবাহিনীকে বাধা দেন। ভীত ও শঙ্কিত হয়ে চতুর্থ লিওর বিধবা সম্রাজ্ঞী আইরিন খলিফা মাহদীর সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। খলিফা হারুন-অর-রশিদ সিংহাসনে আরোহণ করলে গ্রিকগণ পূর্বোক্ত সন্ধি অগ্রাহ্য করলে খলিফা ৭৯১ খ্রিস্টাব্দে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ৭৯১ থেকে ৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত বাইজান্টাইনদের সাথে সংঘর্ষ চলতে থাকে। বাইজান্টাইন সম্রাজ্ঞী আইরিন ৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে অধিকতর বিপদের আশঙ্কায় নতুন করে চার বছরের জন্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত করেন। ৮০২ খ্রিস্টাব্দে নাইসিফোরাস সম্রাজ্ঞী আইরিনকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজক্ষমতা দখল করে খলিফা হারুন-অর-রশিদের নিকট অপমানজনক পত্র লিখেন। পত্রের বিষয়বস্তু হলো এরকম যে, আমার পূর্ববর্তী শাসক নারীসুলভ দুর্বলতার কারণে আপনার সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে যে কর প্রদান করেছে, তার দ্বিগুণ কর আপনি পত্র পাঠান্তে পাঠাবেন তা না হলে তরবারী আপনার ও আমার মাঝে মীমাংসা করবে। খলিফা হারুন-অর-রশিদ পত্র পাঠ করে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে চিঠির উল্টো পিঠে জবাব লিখলেন, পত্রের উত্তর কর্ণে শুনতে হবে না, স্বচক্ষে দেখবে। খলিফা কালবিলম্ব না করে সেইদিনই নাইসিফোরাসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। রোমান সম্রাট যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে শান্তিচুক্তি করেন এবং বর্ধিতহারে কর প্রদানে বাধ্য হন। খলিফা হারুন-অর-রশিদ রাক্কায় ফিরতে না ফিরতে নাইসিফোরাস সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে প্রতি আক্রমণ করলে খলিফা তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে সমুচিত শিক্ষা দেন। বাইজান্টাইন সম্রাট পুনরায় করদানে সম্মত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলে খলিফা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। খলিফা ট্রান্সঅক্রিয়ানায় যখন বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন নাইসিফোরাস মুসলিম সীমান্তে অত্যাচার শুরু করলে হারুন ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রিক সম্রাট নাইসিফোরাসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন । তৃতীয়বার পরাজিত হয়ে নাইসিফোরাস আবারও ক্ষমা প্রার্থনা করলে খলিফা হারুন-অর-রশিদ দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমা করেন। এভাবে পরপর তিনবার খলিফা তাকে ক্ষমা করেন।[৬৯] খলিফা হারুন-অর-রশিদ একবারও নাইসিফোরাসের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন নি। কেননা শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হলে তা রক্ষা করা মুসলমানদের পক্ষে ধর্মীয় কর্তব্য। খলিফা প্রত্যেকবারই তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ রকম উদারতা অমুসলিম শাসকদের নিকট চিন্তা করা যায় না। মুসলমানরা অঙ্গীকার পালনে কতটুকু বাধ্য উল্লিখিত ঘটনা হলো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আব্বাসীয় খিলাফতে লেবাননের অমুসলিম মুয়াহিদগণের কেউ কেউ সন্ধি শর্তের বিরুদ্ধাচারণ করে সরকারি কর ও খাজনা আদায়কারীর উপর চড়াও হয়। আব্বাসী গভর্নর সালেহ বিন আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (যিনি ছিলেন খলিফার আত্মীয় ও বংশধর) এ সকল অমুসলিম অধিবাসীদেরকে লেবানন হতে নির্বাসিত

[৬৯] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 249

করেন। এতে করে কিছু নিরীহ লোকও অসুবিধায় পড়ে। এ ঘটনার পর ইমাম আওযায়ী (বিচারক) গভর্নরের নিকট এক দীর্ঘ পত্র লিখেন, "বিশেষ চক্রের অপরাধে লেবানন হতে সকল আহলে যিম্মাহকে কোন যুক্তিতে তাদের ঘর-বাড়ি, বাস্তু-ভিটে হতে উচ্ছেদ করে নির্বাসিত করা হয়েছে, অথচ সকল লোক তো একই অপরাধে অপরাধী ছিল না। যারা সত্যিকার অপরাধী তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে নিরপরাধীদিগকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ প্রদান করা হউক। অথচ আল্লাহর নির্দেশ হলো–"কোনো ব্যক্তি অন্য কারো গোনাহর সাজা নিজে ভোগ করবে না।"[৭০] তারা তো তোমার দাস বা গোলাম নয় যে, তাদেরকে তোমার ইচ্ছামতো স্থানান্তরিত করবে। তারা সংখ্যালঘু হলেও তারা স্বাধীন আহলে যিম্মা। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনার। কারণ তাদের সাথে আপনি চুক্তিবদ্ধ।[৭১]

সমতা ও ন্যায়বিচার

সকলের মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামের অনন্য কৃতিত্বগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম কৃতিত্ব। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের মাঝে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে সমতা নির্ধারণের জন্য কর আরোপ সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তি ও অন্যান্য অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করেন। প্রত্যেককেই তার ন্যায্য পাওনা ভোগ করতে দাও। মৃত্যু অবধারিত ও প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ বরণ করতে হবে। কিন্তু কেউ যদি অত্যাচার ও নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার উত্তরাধিকারীর নিকট তার পাওনা হস্তান্তর করো।[৭২] সমতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমের মর্যাদা সমান। খলিফা হিশামের রাজত্বকালে একদল খ্রিস্টান স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে ইসলামি আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন। বিচারক খলিফাকে আদালতে ডেকে নেন। উমাইয়া খলিফা হিশাম একজন সাধারণ মানুষ ও বিবাদীর মতো আদালতে হাজির হন।[৭৩] বিচারক বিচার পদ্ধতির নিয়ম মেনে উক্ত বিচার কার্য সম্পাদন করেন। এমন কী তিনি তাকে আদালত চলাকালীন সময়ে খলিফাকে বসতে দেননি। খলিফা অভিযোগকারীকে তিরস্কার করলে বিচারক তাকে আদালত চলাকালীন নিয়মনীতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আপনি যদি পুনরায় তা করেন তাহলে আপনাকে শাস্তি পেতে হবে। তা শুনে হিশাম শান্ত হয়ে যান। বিচারক খলিফার বিরুদ্ধে গিয়ে রায় দেন।[৭৪] উমাইয়া খলিফাদের শাসনামলে উক্ত ঘটনার কারণে বলা যায় যে, খিলাফত রাষ্ট্রে মুসলিম-অমুসলিমের মর্যাদা সমান ছিল। কেননা যদি অন্যান্য প্রগতিশীল রাষ্ট্রের মতো উমাইয়া খিলাফত হতো তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান কখনো আদালতে একজন সাধারণ আসামির ন্যায় উপস্থিত হতেন না।

---

[৭০] *আল কোরআন*, ৫৩:৩৮
[৭১] আবু উবায়দ আল কাসিম ইবন সালাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, আল মাকতাবাতু তিজারিয়্যাহ আল কুবরা, কায়রো, ১৩৫৩ হি., পৃ. ১৭০-১৭১
[৭২] Dr. Muhammad Hamidullah, *Introduction to Islam,* Kitab Bhavan, New Delhi, 2003, p. 212
[৭৩] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঐ, পৃ. ৬০৮
[৭৪] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit,* pp. 147-48

মিসরের শাসনকর্তা আহমাদ ইবনে তুলুনের শাসনকালে তাঁর একটি শহরের একজন গভর্নর একজন খিস্টান যাজকের নিকট থেকে কিছু দিরহাম নেন। উক্ত গভর্নর আহমাদ ইবনে তুলুনের একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। গভর্নরের বিরুদ্ধে নালিশ দেওয়ার জন্য খ্রিস্টান যাজক আহমাদ ইবনে তুলুনের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন। প্রাসাদের একজন প্রহরী খিস্টান যাজকের নিকট জানতে চান কোন সমস্যায় কারণে তিনি শাসনকর্তার দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। তখন ধর্মযাজকটি বললেন, গভর্নর জোরপূর্বক আমার নিকট থেকে ৩০০ দিরহাম কেড়ে নিয়েছেন। আমার টাকা প্রাপ্তির জন্য আমি শাসনকর্তার নিকট এসেছি। আমি জানি, আহমাদ ইবনে তুলুন আমার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। প্রহরীটি তখন ধর্মযাজককে বললেন, আপনার বিচার দেওয়ার দরকার নেই। আমি আপনার নালিশকৃত সমপরিমাণ মুদ্রা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। প্রহরীটি তাঁকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সমপরিমাণ মুদ্রা দিয়ে দিলে ধর্মযাজক খুশি মনে ফিরে গেল। ঘটনাক্রমে আহমাদ ইবনে তুলুন বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পেরে গভর্নর, প্রহরী ও ধর্মযাজককে তার দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলো। শাসনকর্তার নির্দেশ মোতাবেক সবাই উপস্থিত হলে তিনি গভর্নরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, জীবন-জীবিকা সুন্দর ও পরিকল্পিত উপায়ে নির্বাহের জন্য কি যথেষ্ট পরিমাণে ভাতা দেওয়া হচ্ছে না? তখন গভর্নর তার দোষ স্বীকার করে নিলেন। আহমাদ ইবনে তুলুন তাকে গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত করেন। এরপর তিনি খ্রিষ্টান যাজকের নিকট প্রশ্ন করেন, আপনার নিকট থেকে এ গভর্নর কত দিরহাম নিয়েছে? যাজকটি বলল, আমার নিকট থেকে ৩০০ দিরহাম নিয়েছে যা ইতোমধ্যে আমি পেয়ে গেছি। আহমাদ ইবনে তুলুন বললেন, আপনি যদি ৩০০০ দিরহাম দাবি করতেন তাহলে আরো উত্তম হতো, তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া যেত। আমি আপনার অভিযোগের উপর ভিত্তি করে বিচার করেছি।[৭৫] বনু আব্বাসের খলিফাদের মধ্যে আল-মুতাযদ বিল্লাহ অপরাধীদের জীবন্ত পুঁতে ফেলতেন বলে তিনি বনু আব্বাসের খিলাফতের ইতিহাসে দ্বিতীয় সাফফাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করার পর কখনো অনুসন্ধান ছাড়া কাউকে হত্যা করতেন না। তিনি প্রজাদের উপর আরোপিত সকল প্রকার অন্যায় অত্যাচার বিদূরিত করেন। তিনি খারাজ হ্রাস ও শুল্ক মওকুফ করেন। তিনি সুশাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করে বনু আব্বাসের খিলাফতের ইমারতকে রক্ষা করেন।[৭৬]

চাকুরি

উমাইয়া শাসনামলে যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে চাচুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। উমাইয়া খলিফা বিখ্যাত খ্রিস্টান চিকিৎসক ইবনে আসালকে দরবারে নিমন্ত্রণ করে এনে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ দেন। তাঁর মাধ্যমে অনেক গুলো চিকিৎসাশাস্ত্রের বই আরবি ভাষায় অনুবাদ করান। চিকিৎসা শাস্ত্রের

[৭৫] প্রফেসর ড. সালেহ হুসাইন আল-আয়েদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৭
[৭৬] Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit*, pp. 498-499

পাশাপাশি তিনি অর্থ শাস্ত্রেও পারদর্শিতা প্রদর্শনের কারণে খলিফা মুয়াবিয়া তাঁকে হিম্‌স প্রদেশের অর্থ বিভাগের প্রশাসক নিয়োগ করেছিলেন। সে সময়ে একজন খ্রিস্টান নাগরিককে অর্থ বিভাগের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে দায়িত্ব প্রদান করা নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব ঘটনা।[৭৭] সারজুন খলিফা মুয়াবিয়া কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে নিজের যোগ্যতাবলে খলিফার সচিব হয়েছিলেন। তিনি খলিফার সর্বধর্মমত অনুসারী ছিলেন।[৭৮] আল-আখ্‌তল[৭৯] নামক অপর একজন খ্রিস্টান নাগরিক খলিফার দরবারের সভাকবি ছিলেন। বিচক্ষণ খলিফা মুয়াবিয়া উমাইয়া বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জাতিবর্গের মধ্যে কোনোরূপ অনুগ্রহ বা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন না করে গোত্রীয় নীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন। কুরাইশ বংশের কারও প্রতি তিনি কোনো অনুগ্রহ দেখান নি। এর অন্যতম প্রমাণ হলো তিনি এ বংশের কাউকে উচ্চ রাজকার্যে নিয়োগ করেন নি। তাছাড়া তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতিদের মধ্যে কেউ উমাইয়া বা কুরাইশ বংশের লোক ছিলেন না। থিওডোসিয়াস আলেকজান্দ্রিয়ার উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। তিনি দামেস্কে ইয়াজিদের নিকট গিয়েছিলেন এবং ফিরে আসার সময় উপহার হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন বড় অংকের অর্থ এবং স্বাধীন মিসরে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া, মেরিওটিস ও তাদের অধীন অঞ্চলের গভর্নরের স্বীকৃতি।[৮০] এ সময় অনেক অমুসলিম সাম্রাজ্যের উচ্চ পদগুলোতে নিয়োগ পেতেন।[৮১] তবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ সময় খ্রিস্টানরা ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করতো। খলিফা আবদুল মালিকের তারাযুক নামে একজন খ্রিস্টান চিকিৎসক ছিলেন যিনি পরবর্তীকালে খলিফা আল-ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের চিকিৎসক ছিলেন।

---

[৭৭] Philip K Hitti, *op.cit*, p. 196

[৭৮] আবুল কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনুল হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আসাকির, *তারিখু মদিনাতু দিমাস্ক*, খণ্ড-২০, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, ১৯৯৫, পৃ. ১৬১

[৭৯] আল-আখ্‌তল ২০ হিজরিতে হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর শাসনামলে তৎকালীন আরবের মেসোপটেমিয়ার বিখ্যাত তাগলিব গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মাতৃহারা হয়ে অযত্ন অবহেলায় বিমাতার কাছে লালিত পালিত হন। মেষ চড়ানোর জন্য তাকে মাঠে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতো হতো বলে তিনি লেখাপড়ার তেমন সুযোগ পান নি। ছোট বয়সেই তিনি কবিতা বলতে শুরু করেন। তাঁর কবিতার বিকাশ ঘটে মাঠে প্রান্তরে। পিতৃ-মাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে বাল্যকালেই তিনি মদ্যপায়ী ও কর্কশ হয়ে ওঠেন এবং পিতা-মাতার কুৎসা করে কবিতা রচনা করেন। এ কারণে তাকে 'আখ্‌তল' বা নির্বোধ বলা হয়। আখ্‌তলের অধিকাংশ কবিতা উমাইয়া বিরোধীদের কেন্দ্র করে রচিত। আবার প্রশংসামূলক যে সকল কবিতা তিনি লিখেছেন তাও উমাইয়া শাসক ও তাদের খিলাফতের পক্ষে জনসমর্থনের জন্য। আখ্‌তল আজীবন উমাইয়া রাজপরিবারের সাথে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে রাখেন এবং রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। একবার আনসারদের কবি আব্দুর রহমান ইবনে হাসান ইবনে সাবিত ইয়াজিদের ভগ্নি 'রামালা'কে লক্ষ করে কবিতা রচনা করেন। তখন ইয়াজিদ আনসারদের কুৎসা রটনার জন্য আখ্‌তলের শরণাপন্ন হন। তখন আখতল তাঁর বিখ্যাত রা'ইয়াহ কসীদা রচনা করে আনসারদের প্রেমমূলক কবিতার জবাব দেন এবং ইয়াজিদের অন্তরঙ্গ সহচর হন। আবদুল মালিক বিন মারওয়ান আখতলের মাধ্যমে কয়স গোত্রের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। খলিফা আবদুল মালিকের প্রশংসায় তিনি বহু কবিতা রচনা করেন এবং খলিফার দরবারে সভাকবির মর্যাদা লাভ করেন। কবি মদের নেশায় এতই বুদ হতেন যে, কখনো কবিকে শরাব পান অবস্থায় রাজদরবারে আসতে দেখা যায়। অনেক সময় তার দাড়িতে ফোটা ফোটা শরাব লেগে থাকতো। সারা জীবনই তিনি খ্রিস্টধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গির্জায় তিনি যাতায়াত করতেন এবং পাদ্রীদের ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। আবদুল মালিক তাঁকে উমাইয়াদের কবি, আমিরুল মুমেনিনের কবি ও আরবদের কবি উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। একথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, উমাইয়া যুগের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে আল-আখ্‌তল ছিলেন অন্যতম। অন্য দু'জন হলেন জরীর ও ফরয্‌দক। এ তিনজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ছিল তা নিয়ে উমাইয়া রাজদরবারে প্রায়ই আলোচনা হতো। এ তিনজনকে নিয়ে আলোচনা হওয়ার কারণ ছিল একজন এককে বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। তারপরেও তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এ প্রশ্ন থেকেই যায়। এ প্রসঙ্গে R. A. Nicholson বলেন, R. A. "Akhtal is commended by Arahian critics for the bumber and excellent of his long poems, as well as for the purity, polishess and correctness of style." R. A. Nicholson, *A literary History of the Arabs*, Cambridge, 1953, p. 242। তিনি ৭০ বছর বয়সে ৯৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, আ. ত. ম. মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মে, ২০০৭, পৃ. ২১৪-১৭

[৮০] A. S. Tritton, *op.cit*, pp. 20-21

[৮১] Rafi Ahmad Fidai, Vol. II, *op.cit*, p. 17

ইরানি শত্রুরা তাঁকে 'সাকিফ-এর ক্রীতদাস' বলে অভিহিত করতো।[৮২] খলিফা আবদুল মালিকের প্রধান উপদেষ্টা সারজুন ছিলেন একজন খ্রিস্টান।[৮৩] তবে খলিফা আবদুল মালিকের আরবীয়করণ নীতির ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অফিস-আদালতে আরবি ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। তাঁর আরবীয়করণ নীতির ফলে ইতোপূর্বে ইরাক ও পারস্যে ফারসি ও পাহলভী, মিসরে কিবতী বা গ্রিক এবং সিরিয়ায় সিরীয় ভাষার পরিবর্তে আরবি ভাষার প্রচলন শুরু হলে রাজস্ব ও অর্থ দফতরে খ্রিস্টান ও পারসিক অমুসলিমরা কর্মচ্যুত হলেন এবং তদস্থলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে আরব মুসলমানগণ নিযুক্ত হন। খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমানগণ মেধার ভিত্তিতে চাকুরি নিশ্চয়তা পেলেন। প্রথম মারওয়ান ইসাক নামক একজন কর্মকর্তার সাথে অ্যাথানসিয়াস নামক একজন খ্রিস্টানকে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার সরকারি কর্মকর্তাদের প্রধান ছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে খ্রিস্টানরা গভর্নরের নিকট গির্জা সম্পর্কিত একটি ব্যাপারে নিবেদন পেশ করেছিল। সরকারি ভাষ্য মতে, তিনি ছিলেন একজন সচিব এবং তার অধীনে প্রথমত ২০ জন এবং পরবর্তীতে ৪৪ জন করনিক কাজ করতেন। তিনি আব্দুল আজিজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রত্যেক সৈনিকের কাছ থেকে ১ দিনার নেওয়ার কারণে তাকে চাকুরিচ্যুৎ করা হয়।[৮৪] খলিফা সুলায়মান বাতরিক বিন নাকা নামক একজন খ্রিস্টান সচিবকে নিয়োগ করেছিলেন, যিনি ছিলেন খলিফার রামলা (ফিলিস্তিন) স্থাপনার পানির খাল, কূপ ও মসজিদের পরিদর্শক।[৮৫] ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক উমর ইবনে আবদুল আজিজ অমুসলমানদের রাজকার্য হতে অব্যাহতি দেন বলে অভিযোগ করা হয়। এ অভিযোগ মোটেও সত্য নয়। কেননা তিনি যাদেরকে রাজকার্য হতে অব্যাহতি দেন তারা ছিলেন লোভী ও দুর্নীতিবাজ। তিনি অমুসলিমদেরকে বিনা কারণে চাকুরিচ্যুৎ করেন এ রকম প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর শাসনামলে যদি অমুসলিমদেরকে চাকুরিচ্যুৎ করা হতো তাহলে অমুসলিমদের মধ্যে থেকে খ্রিস্টান ও ইহুদিগণ ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু এ সময়ে খ্রিস্টান ও ইহুদিগণ কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। মূলত তিনি দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে ন্যায়-নীতি ও নিরপেক্ষতার পরকাষ্ঠা দেখিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতেন। খলিফা হিশামের শাসনামলে তাঁর সাম্রাজ্যে জরথুস্ত্রের অনুগামীদের সরকারি পদে নিয়োগ করা হয়।[৮৬]

উমাইয়া সাম্রাজ্য ছিল আরবদের, আর আব্বাসীয় খিলাফতের চরিত্র ছিল বহুলাংশে আন্তর্জাতিক। এ সময় আরব-অনারব, মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হতো না। এর অন্যতম প্রমাণ হলো আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা যোগ্য, উদ্যমশীল, বিবেচক ও মিতব্যয়ী শাসক খলিফা আবু জাফর আল-

---

[৮২] Philip K Hitti, *op.cit*, p. 220
[৮৩] আবুল কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনুল হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আসাকির, খণ্ড-২০, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১
[৮৪] A. S. Tritton, *op.cit*, p. 20
[৮৫] আহমাদ ইবন্ ইয়াহইয়া ইব্ন জাবির আল বাগদাদী আল-বালাযুরী, *ফুতহুল বুলদান*, তবউল কুতুব আল আরাবিয়্যাহ, কায়রো, ১৯০১,পৃ. ১৫০
[৮৬] Philip K Hitti, *op.cit*, p. 234

মনসুর খ্রিস্টান চিকিৎসক জুরজিস বিন বখতিশুকে রাজবৈদ্য পদে নিয়োগ প্রদান করেন।[৮৭] ইসলাম ধর্মের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ অনুসরণকারী খলিফা আল-মনসুর রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মে যোগ্য লোকদের নিয়োগ প্রদান করতেন। এ ক্ষেত্রে ধর্ম কোনো রকম বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

খলিফা মামুনের সময় সকল প্রজাকে যোগ্যতা অনুসারে রাজকার্যে নিয়োগ করা হতো। তাঁর শাসনামলে বুকাম নামক একজন খ্রিস্টান সেনাধ্যক্ষ শুক্রবারে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মসজিদের সামনে অপেক্ষা করে, যেখানে তার অধীন সৈনিক জুমার নামাজ আদায় করেন। জুমার নামাজরত থাকা অবস্থায় সেনাধ্যক্ষ তার অধীন সৈনিকের জন্য অপেক্ষারত ছিলেন।[৮৮] প্রতীয়মান হয় যে, আব্বাসীয় শাসনামলে খলিফা মামুনের শাসনামলে অমুসলিমরা প্রতিরক্ষা বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে চাকুরি করতেন। এ সময় অমুসলিমরা মুসলিমদের মতো যোগ্যতার ভিত্তিতে সকল চাকুরির ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করতেন।

গোঁড়া সুন্নি মতাবলম্বী খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের নিষ্ঠুরতার জন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁকে 'আরবদের নীরো' (Nero of Arabs) নামে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর রাজত্বে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। তাদেরকে রাজকার্যে নিযুক্ত করা হতো না। তাঁর শাসনামলে মুতাযিলা মতাবলম্বী আলিম ও সরকারি কর্মচারীগণকে চাকরি হারাতে হলো এবং তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। অমুসলিমদেরকে তাদের সরকারি চাকুরি হতে বহিষ্কার করলেও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় নাই কিন্তু তাদের উপর অন্যান্য বিদ্বেষমূলক বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়।[৮৯] খলিফা মুতাওয়াক্কিল তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে নিলোমিটার-এর খ্রিস্টান রক্ষককে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেন। অথচ তিনি রাজক্ষমতায় ছিলেন দীর্ঘ ১৫ বছর। তিনি রাজক্ষমতায় আরোহণের পরপরই মুতাযিলা ও অমুসলিমদেরকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করেন। তিনি মূলত সকল অমুসলিমদেরকে রাজক্ষমতা হতে বহিষ্কৃত করেন নি। অধিক যোগ্যতাবান লোকদেরকে তিনি রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য রাজকার্যে রেখে দিয়েছিলেন। যার অন্যতম প্রমাণ হলো তাঁর রাজত্বের শেষের বছর নিলোমিটারের খ্রিস্টান রক্ষককে বরখাস্ত করন। তবে একথা সত্যি যে, তাঁর শাসনামলে মুতাযিলা, শিয়া ও অমুসলিমরা অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হন। খলিফা আবু জাফর আল-মুকতাদির বিল্লাহ ৯০৭ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করে প্রায় পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণের সময় খ্রিস্টান সচিবরা পূনরায় ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে। খিলাফতে আরোহণের দুই বছরের অতিক্রান্ত হওয়ার পর খলিফার নিকট খ্রিস্টান সচিবদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে তিনি ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তাদরে বরখাস্ত করেন। কিন্তু এ বরখাস্তকরণ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ৯২৭ খ্রিস্টাব্দে একজন খ্রিস্টান নিম্ন

[৮৭] মুসা আনসারী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭১
[৮৮] A. S. Tritton, *op.cit,* p. 118
[৮৯] Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens, op.cit,* p. 289

মেসোপটেমিয়ার প্রধান দিউয়ানের সচিব ছিলেন। সে সময়ে বহু নামকরা লোক খ্রিস্টান সচিব রাখতেন। এদের মধ্যে যাদের নাম স্মরণীয় তারা হলেন ইবনে আবী সাজ, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার গভর্নর খোজা মুফলিহ, উজির আলী-বিন ইসা, মসুল শাসনকারী একটি পরিবার যার প্রধান ছিলেন আবু সুলাইমান বিন দাউদ বিন হামাদান, বিজয়ী মুনিস এবং রাইক এর পুত্ররা। তাদের সচিবরা সে সময়ে এত বেশি ক্ষমতাশালী ছিল যে, ৩১৯ হিজরিতে হুসাই বিন কাসিম উজির হওয়ার জন্য এ সকল খ্রিস্টান সচিবদের তোষামোদ করতেন।[৯০] এ সকল খ্রিস্টান সচিবদের তোষামোদি করার একমাত্র কারণ ছিল সে সময় যারা বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নর ছিলেন তাদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা। এ খ্রিস্টান সচিবরা মুসলিম শাসকদের আস্থাভাজন একমাত্র কারণ ছিল তাদের যোগ্যতা ও সততা। আল মুত্তাকির (৯৪০-৪৪ খ্রি.) একজন খ্রিস্টান উজির ছিল।[৯১] আবু বকর আবদুল করিম আত্-তায়ী বিল্লাহ্ এর শাসনামলে ৩৬৯ হিজরিতে বাগদাদের উজির ছিলেন নসর বিন হারুন।[৯২] যিনি নিজ যোগ্যতাবলে একজন খ্রিস্টান হয়েও উজির হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। আব্বাসীয় শাসনামলে বেশিরভাগ ব্যাংকিং দায়-দায়িত্ব পালন করেছে ইহুদীরা। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ করণিক ছিল খ্রিস্টানগণ। খ্রিস্টানগণ সে সময় রাষ্ট্রীয় বড় বড় পদগুলোতে চাকুরি করতেন। কখনো কখনো তারা War Office এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আব্বাসীয় খিলাফতে এ পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল।[৯৩] সুতরাং এটা প্রমাণিত যে, গুটিকয়েক খলিফা ছাড়া উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে সাম্রাজ্যে চাকুরি-বাকুরির ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম পার্থক্য করা হতো না। যোগ্যতাই ছিল উচ্চপদে নিয়োগের চাবিকাঠি।

বৃত্তি প্রদান

উমাইয়া খলিফা হযরত মুয়বিয়া (রা.) খিলাফতের সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার পর সাম্রাজ্যের অসহায়, গরিব, নির্যাতিত লোকদের অসহায়ত্ব দূর করার জন্য একজন অফিসার নিয়োগ করলেন। অফিসারের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল সাম্রাজ্যের আর্ত-পীড়িত অসহায় লোকদের খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করা। উমাইয়া খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজও অসহায়, দরিদ্র, ঘরবাড়িবিহীন অসহায় লোক, বার্ধক্যে উপনীত ও এতিম লোকদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।[৯৪] খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ যিম্মিদের সাথে ভালো আচরণের পাশাপাশি তাদের সার্বিক অবস্থার দিকে নির্দেশ দেন। খলিফা বসরার শাসনকর্তা আরতাত বিন আদীকে সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধ যিম্মিদের ব্যাপারে যে নির্দেশনা প্রদান করেন তা হলো,

---

[৯০] A. S. Tritton, *op.cit*, p. 23
[৯১] Al-Tanukhi, *al-Faraj ba'd al-Shiddah*, Vol. ii, Cairo, 1904, p. 149
[৯২] A.S triton, p. 25
[৯৩] Jurji Zayadan, *op.cit*, p. 167
[৯৪] Sayed Afzal Peerzade, *On Islamic Taxation*, Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 2009, p. 115

তোমার অঞ্চলের যে সকল যিম্মি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে এবং নিজেদের আর্থিক সঙ্গতি নেই তাহলে তার যাবতীয় ব্যয়ভার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বহন করা হবে। অতপর তিনি খলিফা হযরত উমর (রা.) কর্তৃক সেই বৃত্তিদানের কথা উল্লেখ করেন।[৯৫] মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শাসনামল থেকে নাজরানের খ্রিস্টানগণ বার্ষিক ২০০০ বস্ত্রখণ্ড কর হিসেবে আদায় করতো। খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া আমলের খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের রাজত্বকাল পর্যন্ত নাজরানের খ্রিস্টানদেরকে বার্ষিক ২০০০ বস্ত্রখণ্ড কর আদায় করতে হতো। অথচ ইতোমধ্যে অনেকে মুসলিম হয়েছে, অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে আবার অনেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে কিন্তু উক্ত এলাকার খ্রিস্টানদের উপর করের পরিমাণ আগের মতোই আছে। ফলে উক্ত অঞ্চলের খ্রিস্টানদের পক্ষে উক্ত কর প্রদান করতে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। উক্ত পরিস্থিতিতে তারা খলিফার কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি তাদের বার্ষিক কর ২০০০ বস্ত্রখণ্ড হতে ২০০ বস্ত্রখণ্ড করেন। জাতি, ধর্ম-বর্ণ, গোত্র, কৌলিন্য, মতবাদ নির্বিশেষে খলিফা হারুন-অর-রশিদ সাম্রাজ্যের বহু গরিব-দুঃখীর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। খলিফা হারুন-অর-রশিদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিসাধন এবং বাগদাদ নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রথিতযশা চিকিৎসক জরজিস বিন বখতিশুর পরিবারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। পরিবারটি খলিফা হারুন-অর-রশিদ, মামুন এবং বার্মেকী উজির পরিবারের চিকিৎসক হিসেবে নিয়োজিত থেকে ব্যাপক বৃত্তি লাভ করেন। বখতিশু পরিবারের ছয় বা সাতটি প্রজন্মে কোনো না কোনো ব্যক্তি বিশিষ্ট চিকিৎসকরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। চিকিৎসা বৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিরা দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তাদের এ সকল গুণাবলির কারণে তারা তৎকালীন সমাজে হাকিম বলে অভিহিত হতেন।[৯৬]

আহমেদ ইবনে তুলুন একজন খ্রিস্টান স্থপতির মাধ্যমে কোনোরূপ পিলার ছাড়া শুধুমাত্র মিহরাবের পাশে দুইটি পিলারের মাধ্যমে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন। এটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে স্থপতিকে আহমেদ ইবনে তুলুন নগদ দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।[৯৭]

শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির মর্যাদা ও অধিকার

খলিফা মুয়াবিয়ার শাসনামলে মুসলিম খলিফা ও তাঁর অনুগামীদের আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কবিতার পাঠের আসর বসানো হতো। এ সকল কবিতা খলিফাদেরকে তোষামোদি করে লেখা হতো। ইয়াজিদের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার রাজকবি আল-আখতাল নিজ যোগ্যতাবলে একজন খ্রিস্টান হয়েও রাজদরবারে এমনভাবে যাতায়াত করতেন যা দেখে বোধগম্য করা যেত না যে, তিনি অমুসলিম না মুসলিম।

[৯৫] Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *op.cit*, pp. 145-146
[৯৬] Philip K Hitti, *op.cit*, p. 364
[৯৭] A. S. Tritton, *op.cit*, p. 24

তাছাড়া খ্রিস্টান আরব সম্প্রদায়ের মানুষ আল-হিরার তাগলিব রাজকবি হিসেবে খলিফার দরবারে প্রবেশের সময় গলায় একটি ক্রস ঝুলিয়ে প্রবেশ করতেন।[৯৮] এতে কেউ কোনোদিন বাধা প্রদান করেনি। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে সময় উমাইয়া সাম্রাজ্যে মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হতো না। খলিফা আবদুল মালিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্যের একজন পৃষ্টপোষক ছিলেন। কবিতার প্রতি তাঁর ব্যাপক অনুরাগ ছিল। কবিমনা খলিফার দরবারে বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির আগমন ঘটত যারা তাঁর দরবারকে অলঙ্কৃত করতো। কবিতার প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাঁর দরবারে কবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তাঁদেরকে উদারহস্তে পুরস্কার দিতেন। তাঁর দরবারে রোমান, পাহলভী, সিরিয়াক, হিমারী প্রভৃতি ভাষার পরিবর্তে আরবি ভাষায় কাব্যচর্চা হতো। আরবি ভাষায় দক্ষ কবিরাই মূলত তাঁর দরবারে স্থান পেত। এসব কবির মধ্যে মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয়েই ছিলেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এ সমস্ত জ্ঞানী-গুণীর মধ্যে জারির, আখতাল ও ফারাজদাকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেদুইন জাতির ব্যঙ্গ সাহিত্যিক 'জারীর' তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আল-ফারাজদাক এবং আল আখতালের সঙ্গে মিলে উমাইয়া আমলের কাব্যময় বিজয়গাঁথা লিখে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। উমাইয়া আমলের সাহিত্যিক ইতিহাস আলোচনা করলে তাঁদেরকে ব্যতীত সম্ভব নয়। রাজ-সাহিত্যিক জারির খলিফা আবদুল মালিক ও খলিফা ওয়ালিদের প্রশংসা করে কবিতা লিখার পাশাপাশি খলিফা ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রশংসা করে যে সাহিত্য রচনা করেন তা উমাইয়া আমলের সাহিত্যিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।[৯৯] নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কবি ও কাব্যপ্রিয় খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উমাইয়া বংশের গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা হয়। কোরআন হাদিসের চর্চা ও ধর্মীয় বিষয়ে গবেষণা সুবিধার্থে খলিফা বিভিন্ন শহরে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। তিনি এতিম বালক-বালিকাদের লালন-পালনের পাশাপাশি শিক্ষা-দীক্ষার জন্য ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উৎসাহে মক্কা, মদিনা, কুফা ও বসরায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কোরআন হাদিস চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[১০০] জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য তাঁর খিলাফতকাল এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, তাঁর খিলাফতকালকে ইসলামের ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর যথার্থই বলেছেন, "Looking at it from first to last, we shall not find in the annals of the Caliphate a more glorious reign than that of Welid."[101] অন্যদিকে খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক স্পেন বিজয়ের ফলে সেখানে উদার ও প্রগতিশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মুসলিম শাসনে স্পেনে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুশীলন শুরু হয়, তা সমগ্র বিশ্বকে বিশেষ করে ইউরোপ

[৯৮] Philip K Hitti, *op.cit,* p. 196
[৯৯] Philip K Hitti, *op.cit,* p. 220
[১০০] William Muir, *op.cit,* p. 374
[১০১] William Muir, *Ibid,* p. 374

মহাদেশকে অজ্ঞতা, কলহ ও বিশৃঙ্খলা হতে আলোর রাজ্যে নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে ইউরোপে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল তা মূলত কর্ডোভার শিক্ষা ও সভ্যতা। সে সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মুসলমানগণ গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজের শাসনামলে খোরাসান, মধ্য এশিয়ার বোখারা, সমরকন্দ, খাওয়ারিজম, নিশাপুরসহ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোত ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তুলেন। আরবি চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য দ্বিতীয় উমর আলেকজান্দ্রিয়া হতে গ্রিক চিকিৎসাবিদদের এন্টিওক ও হাররানে নিয়ে যান। তাছাড়া মুয়াবিয়ার গৃহচিকিৎসক ইবন-উত্থাল, হাজ্জাজের গৃহচিকিৎসক তাযাদুক এবং মারওয়ানের গৃহচিকিৎসক মাসারগ্রাওয়াহ গ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন।

উমাইয়া যুগ ছিল রাজ্য বিস্তারের যুগ। উমাইয়াদের শাসনামলে রাজ্যের বিস্তৃতি ব্যাপক আকার ধারণ করে। রাজ্যবিস্তারে ব্যস্ত থাকায় তারা রাজ্যের সম্প্রসারণে নিজেদের দৃষ্টি সবসময় নিবদ্ধ রাখেন। তারপরেও উমাইয়া খলিফাগণ শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উমাইয়া শাসনামলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন ছিল না সত্যি কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। উমাইয়া খলিফারা তাদের খলিফাজাদাদের শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ করতেন। এসব গৃহশিক্ষক এবং গুরুরা বেশিরভাগই হতেন মাওয়ালী ও খ্রিস্টানরা। এ সকল শিক্ষকরা রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।[১০২] উমাইয়া শাসনামলে মাতৃভাষা পড়তে-লিখতে জানলেই তাকে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হতো। এর সঙ্গে দুটি বিশেষ গুণ থাকলে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষিত বলা হতো। প্রথম গুণটি হলো তীর ধনুক চালানোর জ্ঞান অর্জন করা আর দ্বিতীয়টি হলো সাঁতার কাটতে জানা।[১০৩] উমাইয়া আমলে যারা শিক্ষার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন বিশেষত: গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তারা হয় মাওয়ালী নতুবা খ্রিস্টান। গৃহশিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা মূলত দরবারকেন্দ্রিক হতো। উমাইয়া আমলের শিক্ষাব্যবস্থার দুটি ধারা ছিল। মুসলমানদের জন্য মসজিদভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা। মসজিদে কোরআন ও হাদিসের উপর শিক্ষা দেওয়া হতো। মুসলমানদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষায়তনে কোনো রকম বেতন নেওয়া হতো না। তবে দ্বিতীয় শতকে আমরা এক বেদুঈনের কথা শুনি, যিনি বসরায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত স্কুলে বেতন নেওয়া হতো।[১০৪] দ্বিতীয় শতকের পূর্বে বেতন নেওয়া হতো, এ রকম উদাহরণ পাওয়া দুষ্কর। তবে যারা গৃহশিক্ষক ছিলেন তারা দরবারকেন্দ্রিক মাসোহারা পেতেন। অন্যদিকে আব্বাসীয় যুগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ। তাদের প্রচেষ্টায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য আব্বাসীয় যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। আব্বাসীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান যে সারা বিশ্বে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন, তার

[১০২] Philip K Hitti, *op.cit*, p. 253
[১০৩] Philip K Hitti, *Ibid*, p. 253
[১০৪] Philip K Hitti, *Ibid*, p. 254

গোড়াপত্তন করেছিলেন আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যেৎসাহী নরপতি আবু জাফর আল-মনসুর। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য গ্রিক ও পারস্য ভাষায় লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য একটি দফতর খুলে দেন। সে সময় সাহিত্য, কাব্যচর্চা, গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির চর্চা শুরু হয়। খলিফা নিজেও বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর শাসনামলে আরবি ও ফারসি সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়। আরবি সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের কারণে তিনি প্রাচীন আরবি কবিতাসমূহ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন।[১০৫] আল-মানসুরের রাজদরবারের অন্যতম জ্যোতিষ ফারেসের অধিবাসী ইসলামে নবদীক্ষিত জরথুস্ত্রীয় ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মুকাফ্ফা[১০৬] (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.)। জরথুষ্ট্রপন্থি আবদুল্লাহ ইবনে মুকাফ্ফা 'কালিলা ওয়া দিমনাহ্' (খেঁকশিয়ালের কাহিনী) পাহলভী হতে আরবিতে অনুবাদ করে আরব শিল্পকলা ও সুকুমার সাহিত্যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন।[১০৭] খলিফা আল-মানসুরের খিলাফতকালে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আরবীয়, ভারতীয়, গ্রিক এবং ইরানি সভ্যতার সংমিশ্রণে যে একটি নতুন সভ্যতা গড়ে উঠে তা বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়ায় খ্রিস্টান মঠগুলোতে কেবল ধর্ম শিক্ষাই দেওয়া হতো না বরং সেখানে গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হতো। আরবদের রাজ্য বিজয়ের পর এ সকল প্রতিষ্ঠান পূর্বের মতো টিকেছিল এবং গ্রিক জ্ঞানরশ্মি বিকিরণ করতো। আব্বাসী খলিফাগণ এসবের প্রতি আকৃষ্ট হন। আবু এহিয়া ইবনুল বাতারিকা গ্রিক দর্শন বিজ্ঞানের অগ্রণী অনুবাদকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। খলিফা আল-মানসুরের নির্দেশে তিনি গ্যালেন এবং হিপোক্রাটিসের পুস্তক ছাড়াও টলেমির কুয়াড্রিপারটিউটাইম এর অনুবাদ করেন।[১০৮]

খলিফা হারুন-অর-রশিদ তাঁর পুত্র আল-মামুনকে সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য ইয়াকুব বিন ইসহাককে নিয়োগ দান করেছিলেন যিনি একজন ইহুদি ছিলেন।[১০৯] খলিফার দরবার ছিল তৎকালীন বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীগণের মিলন

---

[১০৫] Dr. Anwar Chejne, *The Role of Arabic in present Arab Society*, The Islamic Literature, Lahore, 1958, pp. 196-197; M. M. Sharif, *Muslim Thought its Origin and Achievements*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2007, p. 17

[১০৬] আবদুল্লাহ ইবনে মুকাফ্ফা ফারেসের অধিবাসী ছিলেন। অগ্নি উপাসক আবদুল্লাহ ইবনে মুকাফ্ফা পাহলভী (প্রাচীন ফার্সী) ভাষার গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করে তৎকালীন সময়ে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থটির নাম 'কালিলা ওয়া দিমনাহ' (খেকশিয়ালের কাহিনী)। মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি দাবাখেলাসহ শাহানশাহ নওশেরোয়ার রাজত্বকালে (৫৩১-৭৮ খ্রি.) ভারত হতে আমদানি করে পাহলভী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। পারসিকরা এ কাহিনি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেন। পাহলভী থেকে আরবিতে তাঁর এ অনুবাদ কর্মটি ছিল সূচারু এক সাহিত্যকর্ম। তার এ অনুবাদ কর্মটি এতই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে, সংস্কৃত ভাষা থেকে পাহলভী ভাষায় অনূদিত অনুবাদটি কালের অতল গর্বে হারিয়ে গিয়েছিল। ফলে তার এই আরবি বইটির সংস্কারণ থেকেই ৪০ টি ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ কর্মটি উচমানের হওয়ায় এটি আরবি ভাষা ও গদ্য সাহিত্যের উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। হিট্টি বলেন, Such Arabic literary works as *al-Aghani, al-'Iqd al-farid* and al-turturshi's *Siraj al-Muluk* teem with reference to earlier Indo-Persian Sources, especially when dealing with etiquette wisdom, polity and history. Philip K Hitti, *op.cit*, p. 308; তিনি জরথুষ্ট্রপন্থি ছিলেন। এ সাহিত্যিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে খলিফা আবু জাফর আল মানসুরের শাসনামলে রাজদরবারে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর কয়েকখানি বিশেষ গ্রন্থ 'সিয়ার আল-মুলক আল-আজম'. 'আল-আদব আস-সগীর', 'আল-আদব আল-কাবীর' উল্লেখযোগ্য। ধর্মান্তর সত্ত্বেও তাঁর প্রতি গোঁড়াদের সন্দেহের জন্য শেষ পর্যন্ত খলিফা আল মানসুরের নির্দেশে বসরার গভর্ণর তাঁকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়ে ৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। ফার্দিনান্দ তোতাল, আল-মুঞ্জিদ ফিল আ'লাম, বৈরুত, দারুল মাশরিক, ১৬ তম সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১৪

[১০৭] D. L. O'Leary, *Arabic Though and its Place in History*, London, 1939, p. 106

[১০৮] M. M. Sharif, *op.cit*, p. 18; মুসা আনসারী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭১-৭২

[১০৯] A. S. Tritton, *op.cit*, p. 148

কেন্দ্র। তাঁর পিতামহ আল-মানসুর কর্তৃক শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য গ্রিক ও পারস্যসহ অন্য ভাষায় লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত অনুবাদ বিভাগের সম্প্রসারণ করে খলিফা হারুন-অর-রশিদ বিভিন্ন ভাষায় বহু মূল্যবান গ্রন্থসমূহকে আরবি ভাষায় অনূদিত করেন। বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধে বিশেষত খলিফা হারুনের নেতৃত্বে আরবরা যে বারবার অভিযান পরিচালনা করে, তার ফলে যুদ্ধে লুণ্ঠিত নানা দ্রব্যের সাথে তাঁরা বেশ কিছু গ্রিক পাণ্ডুলিপিও পেল। মূলত আঙ্কারা ও এ্যামোরিয়াম যুদ্ধক্ষেত্র হতে এ সকল পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল।[১১০] সিরীয় খ্রিস্টান ইউহান্না বিন মাসওয়াহ এ সকল গ্রিক পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের পুস্তকগুলোর অনুবাদের কাজ করেন। ইউহান্না হারুন-অর-রশিদের উত্তরাধিকারীদের আমলেও অনুবাদের কাজ করেন।[১১১]

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খলিফা আল-মামুনের রাজত্বকাল বিশ্বের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রাজ্যজয় অপেক্ষা সংস্কৃতি চর্চার দিকে অধিক বেশি মনোযোগী ছিলেন। সাংস্কৃতিক চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি লাখেরাজ সম্পত্তিসহ প্রচুর অর্থ মঞ্জুরির ব্যবস্থা করেছিলেন। আব্বাসীয় খলিফা আল-মানসুর জ্ঞান চর্চা, বুদ্ধিবৃত্তি, কৃষ্টি ও সভ্যতার যে বীজ বপন করেন তাহা তাঁর উত্তরসূরী খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনামলে অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং খলিফা আল-মামুনের রাজত্বকালে তাঁর প্রচেষ্টায় তা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন,

> Mamun’s Caliphate Constitutes the most glorious epoch in Saracenic history, and has been justly called the Auguston Age of Islam. The twenty years of his reign have left enduring monuments of the intelectual development of the Moslems in all directions of thought.[112]

খলিফা আল-মামুন শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশে এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর ও মিসরের বিভিন্ন খ্রিস্টান সন্ন্যাসাশ্রম হতে পুরাতন গ্রিক দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের গ্রন্থমালাসহ বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন পণ্ডিতগণের উপর সেগুলির অনুবাদের দায়িত্ব অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে, খলিফা আল-মামুন গ্রিক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের করার জন্য মামুন ইবন-মাসওয়া এবং হুনাইন-ইবন-ইসহাকের নেতৃত্বে কন্সট্যান্টিনোপল এবং আর্মেনীয় দরবারে রাজদূত প্রেরণ করেন। আরবরা গ্রিক ভাষা জানতেন না। তাই তাদেরকে অনুবাদের উপর নির্ভর করতে হতো। ইহুদি, পৌত্তলিক এবং নেস্টোরীয় খ্রিস্টান প্রজা পণ্ডিতগণ গ্রিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুবাদের কাজে আরবদেরকে সাহায্য করতেন। সিরীয় নেস্টোরীয় খ্রিস্টানরা প্রথমে তা

---

[১১০] Philip K Hitti, *op.cit*, pp. 309-310
[১১১] Philip K Hitti, *op.cit*, pp. 311-312
[১১২] Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, op.cit, p. 274

সুরিয়ানি ও এরামী ভাষায় অনুবাদ করেন। তারপর সুরিয়ানি বা গ্রিক ভাষা হতে তা আরবি ভাষায় অনুবাদ করে নিতেন।[১১৩] খলিফা আল-মামুনের রাজত্বকালে গ্রিক প্রভাব আরব সভ্যতাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। গ্রিক, সংস্কৃত, পারস্য ও সিরীয় প্রভৃতি ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির অনুবাদ কার্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য খলিফা আল-মামুন ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে 'বায়তুল হিকমা'[১১৪] নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। এ প্রতিষ্ঠানটিতে তিনটি বিভাগ ছিল: গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ কার্যালয়। সুপণ্ডিত আল হিরার নেস্টোরীয় খ্রিস্টান 'হুনাইন বিন-ইসহাক'[১১৫] কে এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। তিনি মূলত: বিজ্ঞানের বই পুস্তকের অনুবাদের প্রধান হিসেবে কাজ করেন। তিনি তার পুত্র ইসহাক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হুবাইশ বিন আল হাসানকে অনুবাদ কর্মের প্রশিক্ষণ দান করলে তারা তাকে একাজে সাহায্য করেন। এ দুজন তার অধীনে প্রধান সহযোগী ছিলেন। তাছাড়া তাঁর অধীনে পারশিক, হিন্দু, গ্রিক, খ্রিস্টান, আরবীয় প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনীষী ও পণ্ডিতগণ শিক্ষামূলক গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, অনুশীলন ও অনুবাদ কার্যে নিয়োজিত থাকতেন। হুনাইন প্রথমে গ্রিক হতে সুরিয়ানি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তার সহযোগীরা পরে তা সুরিয়ানি হতে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। এ্যারিস্টটলের বিখ্যাত গ্রন্থ হারমেনিউটিকা প্রথমে গ্রিক হতে সুরিয়ানি ভাষায় অনুবাদ করলে তদপুত্র ইসহাক সেটা আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। হুনাইন এছাড়া গ্যালেন,

---

[১১৩] Philip K Hitti, *op.cit*, p. 310

[১১৪] খলিফা আল-মামুন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে 'বায়তুল-হিকমা' (Bayt-ul-Hikma or A House of Wisdom) নামে একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। খলিফা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে বায়তুল হিকমা অন্যতম কৃতিত্বের দাবিদার। বায়তুল হিকমা মোট তিনটি শাখা নিয়ে গঠিত ছিল। যথা: গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন এবং অনুবাদ বিভাগ। প্রখ্যাত মনিষী আল হিরার নেস্টোরীয় খ্রিস্টান হুনায়ুন বিন ইসহাক এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন জাতির পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ, ঐতিহাসিকগণ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমাতে একত্রিত হয়ে শিক্ষামূলক গবেষণা, বিজ্ঞান চর্চা ও অনুবাদের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় যে চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হয় তার পেছনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে বায়তুল হিকমা। বস্তুত ব্যাপক অনুবাদ ও গবেষণা এবং সৃষ্টিধর্মী গ্রন্থ প্রণয়নের ফলে আব্বাসীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়। স্বয়ং খলিফা নিজে গ্রিক সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশ্ব সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বায়তুল হিকমাতে নিযুক্ত অনুবাদকগণের অবদান অনস্বীকার্য। বায়তুল হিকমার অনুবাদকারীদের প্রচেষ্টার ফলে প্রাচীন জ্ঞানরাজি আরবিতে অনূদিত হয়ে শুধু ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পায়নি বরং তা শত শত শাখায় প্রসারিত হয়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করে। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর বলেন : 'It was through the Labours of these learned men that the nations of Europe, then Shrouded in the darkness of the Middle ages, became again acquainted with their own proper but forgotten patrimony of Grecian Science and Philosophy.' William Muir, *op.cit* p. 512 তৎকালীন বিশ্বে এত বড় জ্ঞানাগার আর কোথাও ছিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বায়তুল হিকমা অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি সবসময় অম্লান হয়ে থাকবে। মোঃ আবু তাহের, *ইসলামে ধর্ম দর্শন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি*, কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৮১-৮৫

[১১৫] লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৩ খ্রি.) ছিলেন একজন নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান। সমসাময়িককালের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের জন্ম ও বেড়ে উঠা আল হিরায়। প্রথম জীবনে চিকিৎসক হুনাইন বিন ইসহাক ডাক্তার ইবনে মাসওয়াহ্-এর কম্পাউন্ডার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তিনি গ্রিক ভাষা শিক্ষা করেন। গ্রিক ভাষার উপর তিনি ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করেন। পরে খলিফা আল-মানসুরের রাজবৈদ্য জিব্রিল বিন বখতিসুর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। জিব্রিল বিন বখতিসুর সহকর্মী হিসেবে তিনি যথেষ্ট দায়িত্ববোধের পরিচয় দেন। পণ্ডিত হুনাইন বিন ইসহাকের কর্মদক্ষতায় খলিফা আল-মামুন সন্তুষ্ট হয়ে ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বায়তুল হিকমার অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেন। হুনাইন বিন ইসহাক তার পুত্র ইসহাক এবং ভ্রাতুস্পুত্র হুবায়শ আল-হাসানের সহায়তায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রিক গ্রন্থগুলো আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি মূলত গ্রিক হতে সিরীয় ভাষায় গ্রন্থগুলো অনুবাদ করেন আর তার অধীন সহযোগীরা পরবর্তীতে তা আরবি ভাষায় অনুবাদ করতেন। হুনায়ন যে অনুবাদক হিসেবে দক্ষ ছিলেন তার অন্যতম বড় প্রমাণ হলো তাকে বলা হতো অনুবাদকদের শেখ বা প্রধান। তিনি প্রায় নিজে ১০০ সিরীয় অথবা আরবি কিংবা উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, যাদুবিদ্যা ও খাবনামা পর্যন্ত রয়েছে। অনুবাদ গ্রন্থ ছাড়াও তিনি চিকিৎসা বিষয়ক অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত পুস্তক ছাড়াও দর্শন, ভূ-প্রকৃতিবিদ্যা, আবহবিদ্যা, প্রাণী, ভাষাতত্ত্ব এবং ধর্ম বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিশ্ব ইতিহাস রচনা করে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনকাল পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করেন। তাছাড়া খলিফা আল-মামুন অনুবাদকদের প্রত্যেক মাসে প্রত্যেককে ৫০০ দিনার প্রারিশ্রমিক দিতেন কিন্তু হুনাইনকে প্রতিটি অনূদিত গ্রন্থের ওজনের সমান স্বর্ণমুদ্রা দিতেন। খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে তিনি ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন এবং তিনি তাঁর দরবারের প্রধান চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন। এককথায় তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের উৎস ও জ্ঞানের আকর। বিস্তারিত দেখুন, Philip K Hitti, *op.cit*, pp. 312-313; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৬শ খন্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১০-১১৪

হিপোক্রাটিস, ডাইওকোরিডিস এর বহু লেখার অনুবাদ করেন। প্লেটোর রিপাবলিক (সিয়াসাহ), এ্যারিস্টটলের ক্যাটিগরি (মাকুলাত), ফিজিকস (তাবিয়াত) এবং ম্যাগনা মোরালিয়া (কুলিয়াত) অনুবাদ করে অমর হয়ে রয়েছেন।[১১৬] গ্রিক, সিরীয় ও কালদীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকসমূহ অনুবাদ করার দায়িত্ব ছিল লিউকের পুত্র কোস্টারের উপর। পুরাতন পারসিক গ্রন্থসমূহের অনুবাদের দায়িত্ব ছিল ইয়াহ্ইয়া-বিন-হারুনের উপর আর দুবান নামে একজন ব্রাহ্মণের উপর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলোর অনুবাদের ভার ন্যস্ত ছিল।[১১৭] অনুবাদ যুগে ইউহান্না বিন মুসওয়াই এবং হুনাইন বিন ইসহাক চিকিৎসা বিজ্ঞানে মৌলিক অবদান রাখেন। খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের (৮৪৭-৬১) ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবেও হুনাইন সাফল্যের শীর্ষে উঠেছিলেন। হাররানের সাবিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা 'সাবিত বিন কুররা'[১১৮] একজন বিখ্যাত অনুবাদক ছিলেন। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে হাররান দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। সাবিত বিন কুররা ও তার শিষ্যদের নেতৃত্বে গ্রিক গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার অসংখ্য গ্রন্থ অনুবাদ করেন। আর্কিমিডিস এবং পেরাগা এর অ্যাপোলোনিয়াসের বহু গ্রন্থ তারা অনুবাদ করেন। ইতোপূর্বে অনুবাদকৃত অনেক অনুবাদ করা গ্রন্থের ভুল সংশোধন করেন। যেমন, হুনাইনের দ্বারা ইউক্লিডের অনুবাদে ভুল-ত্রুটি সাবিত বিন কুররা সংশোধন করেন।[১১৯] টলেমীর ভূগোল মূল গ্রিক অথবা সুরিয়ানি ভাষা হতে কয়েকদফা আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। টলেমীর ভূগোল গ্রন্থ যারা আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন তাদের মধ্যে সাবিত বিন কুররা অন্যতম।[১২০] খলিফা আল-মুতাযিদের (৮৯২-৯০২) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে সাবিত বিন কুররা খলিফার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন। সে সময় সাবিত বিন কুররার পুত্র সিনান, দু পৌত্র সাবিত ও ইব্রাহিম ও এক প্রপৌত্র আবু আল-ফারাজ অনুবাদক ও বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে তারা তাদের পূর্বের অনুবাদ গ্রন্থগুলো পরিমার্জন করেন।[১২১] দশম শতকের শেষার্ধে জ্যাকোবাইট বা মোনোফাইসাইট খ্রিস্টান অনুবাদকদের প্রধান ইয়াহিয়া বিন আলী এবং আবু আলী ইসা ইবনে জুরা এ্যারিষ্টটলের সকল অনুবাদকৃত পুস্তকের পরিমার্জনার কাজ সম্পাদন করেন।[১২২]

---

[১১৬] Philip K Hitti, *op.cit*, pp. 312-13

[১১৭] Syed Ameer Ali, *op.cit*, p. 279

[১১৮] সাবিত বিন কুররা ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের হাররানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রিক, আরবি, সিরীয় ও রোমান ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি অনুবাদ সাহিত্যে হুনাইন বিন ইসহাকের ন্যায় যুগ সেরা অনুবাদক হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। হাররানের সাবিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা সাবিত বিন কুররা ছিলেন তারকা পূঁজারী। গ্রহ নক্ষত্রের পূঁজারী হওয়ার কারণে তারা যুগযুগ ধরে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। তিনি লেখার মাধ্যমে হাররানীদের ধর্মতত্ব ও দর্শন তুলে ধরেছেন। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে হাররান কেন্দ্রিক দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা চর্চার কেন্দ্র পরিণত হয়। তিনি ইরাকের বাগদাদ নগরীতে ১৮ ফেব্রুয়ারি ৯০১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Philip K Hitti, *op.cit*, p. 314 ; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৪শ খন্ড, ১ম ভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৯৮-৪৯৯

[১১৯] Philip K Hitti, *op.cit*, p. 314

[১২০] Philip K Hitti, *op.cit*, p. 384

[১২১] M. M. Sharif, *op.cit*, pp. 19-20

[১২২] M. M. Sharif, *op.cit*, p. 20

অমুসলিমদের শিক্ষাদানের জন্য সে সময় যে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ছিল তার অন্যতম বড় প্রমাণ হল তৎকালীন সময়ে অনেক অমুসলিম ব্যক্তিদেরকে মুসলিম পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীগণ শিক্ষা দিয়েছেন। হুনাইন বিন ইসহাক (খ্রিস্টান) খলিল বিন আহমদ ও পীরওয়াইহর নিকট আরবি ভাষা, ব্যাকরণ ও সাহিত্যের জ্ঞান লাভ করে আরবি ভাষায় এক খ্যাতিমান পণ্ডিত হতে পেরেছেন। ইয়াহিয়া বিন আদী বিন হুমীদ (খ্রিস্টান) ফারাবীর নিকট গ্রিক দর্শনের জ্ঞান অর্জন করে সমসাময়িক বিশ্বে পণ্ডিত হিসেবে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছিলেন। সাবেত বিন কুবরা বিধর্মী আলী বিন ওয়ালিদের নিকট জ্ঞানার্জন করে আব্বাসীয় শাসনামলকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়েছেন।[১২৩]

আইনের ক্ষেত্রে সমানাধিকার

আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম সবার অধিকার সমান ছিল। উমাইয়া শাসনামলে খলিফাগণ তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াবলি সমাধানের জন্য তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ফৌজদারি ও দেউয়ানি আইনের ব্যাপারে যেখানে কোনো মুসলিম জড়িত নয়, সেসব ক্ষেত্রে অমুসলিমরা কার্যত নিজেদের ধর্মীয় প্রধানের অধীনে বিচারাধীন থাকতো।[১২৪] তবে যদি তারা ইসলামি আদালতে বিচার প্রার্থনা করতো তখন ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাদের বিচার ফয়সালা করা হতো। কখনো মুসলিম আইন তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হতো না। মূলত তাদের বিচারকার্য তাদের ধর্মীয় প্রধানদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যকরী করা হতো। মুসলিম ও অমুসলিমকে কেন্দ্র করে কোনো মামলা হলে সে মামলার বিচারের ভার মুসলিম বিচারকের উপর ন্যাস্ত ছিল।[১২৫] উমাইয়া খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের ন্যায় প্রশাসন পরিচালনা করেন। তিনি কোনো যিম্মি অমুসলিম নাগরিকের প্রতি কোনো প্রকার অন্যায় অবিচার ও জুলুম পছন্দ করতেন না। কোনো মুসলমান যদি কোনো যিম্মির উপর অবিচার করত তাহলে তাকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। তাঁর শাসনামলে হিরার একজন মুসলমান একজন যিম্মিকে হত্যা করেছে। তখন তিনি সেখানকার শাসনকর্তাকে এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের নিকট হস্তান্তর করার নির্দেশ দিলেন। ইসলামের বিধান হলো এ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী 'দিয়ত' তথা রক্তপণ নিয়ে ক্ষমা করে দিতে পারে অথবা হত্যার বিনিময়ে হত্যা করবে। এ ক্ষেত্রে তাদের উপর কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। ইসলামের বিধান অনুসারে তারা হত্যাকারী ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল।[১২৬] আইনের দৃষ্টিতে সকলের অধিকার যে সমান ছিল তার অন্যতম প্রমাণ হলো খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের স্ত্রীর ভাই এবং খলিফা আবদুল মালিকের পুত্র মুসলিমার সাথে এক ঈসায়ীর ঝগড়া হয়েছিল। তারা উভয়ে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট অভিযোগ নিয়ে হাজির

---

[১২৩] Allama Yusuf Alqarzavi, Abu Masud Azhar Nadvi, *op.cit*, p. 172

[১২৪] Von Kremer, *op.cit*, pp.217-218; ড. মফিজুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফত*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২১০

[১২৫] S. M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1984, p. 59

[১২৬] রশীদ আখতার নদভী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৩; Rafi Ahmad Fidai, Vol. II, *op.cit*, p. 88

হলেন। মুসলিমা তাঁর শান-শওকত ও পদ মর্যাদা অনুযায়ী একটি আসনে বসলেন। আর ঈসায়ী খলিফার সামনে দণ্ডায়মান। তখন খলিফা বললেন, তুমি দরবারি প্রথা অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা করে আসনে উপবিষ্ট হতে পার না; বরং তুমি তোমার পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত করতে পার কিন্তু বসার অধিকার পাবে না। তখন তিনি মুসলিমাকে বসা থেকে উঠিয়ে দিলেন। কেননা ইসলামের বিধান সকলের জন্য সমান। এখানে কে বাদী আর কে বিবাদী বিবেচনা করা হয় না। উভয়ের মর্যাদা সমান। মুসলিমা উঠে গিয়ে তার পক্ষে উকিল নিযুক্ত করলেন। উকিল বিবাদীর মতো তার সামনে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য পেশ করলেন। খলিফা উভয়ের যুক্তি-তর্ক শুনে মুসলিমা তথা শ্যালকের বিপক্ষে রায় দেন।[১২৭] আইনের দৃষ্টিতে সকলের অধিকার সমান হওয়ায় নিজের শ্যালককে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। ইসলামের বিধান অনুযায়ী নিজের ছেলেও যদি অপরাধী হয় তাহলে সে অপরাধের জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ব্যক্তিগত আইন

ইসলাম অমুসলিমদেরকে তাদের পারিবারিক কর্মকাণ্ড যথা বিয়ে, তালাক কিংবা এ ধরনের অন্যান্য কার্যাবলি তাদের ব্যক্তিগত আইন অনুসারে সম্পাদন করার স্বাধীনতা প্রদান করেছে। উমাইয়া সাধু নামে পরিচিত মহানুভবতা ও উদারতার মূর্ত প্রতীক উমর ইবনে আবদুল আজিজ লক্ষ করলেন অমুসলিমদের সামাজিক আচার-আচরণ ইসলাম বিরোধী হচ্ছে। তখন তিনি হযরত হাসান বসরী (রহ.) এর কাছে একটি চিঠি লিখেন, অমুসলমান মাজুসিরা তাদের কন্যা ও বিমাতার যে পাণিগ্রহণ করে অর্থাৎ তারা মাহরামকে বিয়ে করে, মদ পান করে এবং শূকরের মাংস আহার করে থাকে, এতে আমাদের পূর্বেকার খলিফাগণ কেনো বাধা প্রদান করিলেন না, তাহার কারণ কি? উত্তরে হাসান বসরী (রহ.) উত্তরে হাসান বসরী জানিয়েছেন, রাসূল (স.) বাইরাইনে বসবাসরত মাজুসীদের কাছ থেকে জিয্ইয়া গ্রহণ করেছেন এবং তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণের স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১২৮] সুতরাং চুক্তিবদ্ধ লোকেরা তাদের ধর্মীয় নিয়মানুযায়ী ব্যক্তিগত আইন পরিচালনা করবে। এতে ব্যতিক্রম করার অধিকার কোনো মুসলমান এমন কী রাষ্ট্রপ্রধানেরও নেই। যতদিন পর্যন্ত তাদের সাথে চুক্তি বলবৎ থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাদের নিয়মানুসারে ব্যক্তিগত সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

অমুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক

কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশিদ এর শাসনকাল স্মরণীয় হয়ে আছে। যে সকল কারণে খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনকাল গৌরব ও ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিল তার মাঝে অমুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক অন্যতম ছিল। ন্যায়বিচারক, প্রজারঞ্জক, জনদরদি,

[১২৭] রশীদ আখতার নদভী, *পূর্বোক্ত*, ২০১২, পৃ. ২০৩-২০৪
[১২৮] শামসুদ্দীন আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খণ্ড-১০, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, পৃ. ৩৯; আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩১

বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ নরপতি হিসেবে তাঁর সুনাম, সুখ্যাতি , প্রভাব-প্রতিপত্তি তৎকালীন সমসাময়িক বিশ্বে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন,

> Faithful in the observance of his religious duties, abstemious in his life, unostentaiously pious and charitable, and yet fond of surrounding himself with the pomp and insignia of grandeur, he impressed his personality on popular imagination, and exercised a great influence by his character on society.[129]

খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে চীন সম্রাট ফাগফূর (Faghfur) ও ফ্রান্সের নৃপতি শার্লিমেন (Charlemagne) খলিফা হারুন-অর-রশিদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন। তিনি এসব দূতকে সাদরে বরণ করে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যে দূরদর্শিতা প্রদর্শন করেন তা ইতোপূর্বে কোনো মুসলিম খলিফা দেখাতে পারে নি। ফলে তিনিই হলেন মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম খলিফা যিনি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে আব্বাসীয়দের গৌরব বৃদ্ধি করেন। উভয় দেশের সাথে খলিফা হারুন-অর-রশিদের দূত ও উপঢৌকন আদান-প্রদান হয়। চীন সম্রাট ফাগফূর সাথে কোনো কারণ ছাড়াই কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় কিন্তু ফ্রান্সের নৃপতি শার্লিমেনের সাথে মৈত্রী স্থাপনের ক্ষেত্রে উভয়েরই স্বার্থসিদ্ধি ছিল। বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে হারুন যেভাবে মোকাবিলা করেছিলেন তাতে ফ্রান্সের নৃপতি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাইজান্টাইদের বিরুদ্ধে হারুনকে পাবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন আবার অন্যদিকে খলিফা হারুন স্পেনে নব প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া সাম্রাজ্যের সুরক্ষার জন্য শার্লিমেনকে মিত্র হিসেবে পাবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। ফলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুপক্ষই একে অন্যের কাছাকাছি আসে এবং বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ৭৯৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ৮০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রদূত ও উপহার-উপঢৌকন আদান-প্রদান করতে থাকে।

পোশাক-পরিচ্ছদ

মুসলিম ও অমুসলিমদের ক্ষেত্রে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে পার্থক্য করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিল পোশাক-পরিচ্ছদের ভিন্নতা। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে উমাইয়া খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ অমুসলিমদেরকে মুসলমানদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছিলেন। আর আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশিদ মুসলমানদের মতো পোশাক পরতে নিষেধ করেছিলেন। তবে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে খলিফাদের ভিন্নতার কারণে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সমাজে চলমান অবস্থায় পরিবর্তিত হতে দেখি। অমুসলিমদের পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে একই ধরনের আইন প্রচলিত থাকার কথা থাকলেও কোনো কোনো খলিফার সময় অমুসলিমদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে পোশাকের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। আবার অনেক সময়

১২৯ Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens, op.cit*, pp. 237-238

প্রচলিত আইনে তেমন পরিবর্তন না ঘটলেও শাসকভেদে আইনের প্রয়োগে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার অনেক সময় সম্পদ ও সচ্ছলতার দিকে লক্ষ করে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম উমাইয়া খলিফা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রোম ও পারস্যের অনুকরণে রেশম ও মুক্তার মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। মূলত অভিজাত নাগরিকরা রেশমী বস্ত্রে সজ্জিত থাকত। এ সময় মূলত খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের মতো অমুসলিমরা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। তবে তিনি অমুসলিমদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের ব্যাপারে কোনো বাধা-নিষেধ আরোপ করেন নি। উমাইয়া রাজকবি আল-আখতাল খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নিকট যাওয়ার সময় গায়ে রেশমের জুব্বা পড়ে যেতেন। দরবারে প্রবেশের সময় সিল্কের পোশাকে স্বর্ণখচিত ক্রস গলায় পরিধান করে খলিফার সাথে সাক্ষাত করতেন এবং খলিফা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন।[১৩০] এতে প্রমাণিত হয় যে, উমাইয়া খিলাফতের প্রথম দিকে মুসলিম-অমুসলিমের পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কোনো নির্দেশনা ছিল না। কেননা হযরত মুয়াবিয়া ও কবি আখতাল উভয়ে রেশমের পোশাক পরিধান করছেন। ৮৯ হিজরিতে সিরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ‘জারাহেমা’ সম্প্রদায় মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে মুসলমানদের ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে।[১৩১]

উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ পোশাকের বিষয়ে বেশ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেন। তিনি অমুসলিমদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতা, ঘোড়ার জিন প্রভৃতিতে মুসলমানদের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এবং অমুসলিমদেরকে যেন মুসলমানদের মতো দেখা না যায় সেজন্য পাগড়ি পরা নিষিদ্ধ করেন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, সে সময় মহিলারা পিঠে জিন ব্যবহার করতে পারতো। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যিম্মিদের কুবা নামক পারসিক খাটো জ্যাকেট, রেশমি পোশাক এবং আলকেল্লা পরিধানে নিষেধাজ্ঞা দেন। তবে পাগড়ি পরিধানে কোনো আপত্তি নেই এবং তারা ইচ্ছামতো লম্বা চুল রাখতে পারতো।[১৩২] আর ইবনে আসকরীর মতে, তাদের কপালে লম্বা চুল অবস্থায় জনসম্মুখে আসা নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং এটা প্রমাণিত যে, তিনি কুবা, তালিসান, পাজামার বিশেষ কাট, ঘোড়ার জিন, কারুকার্যপূর্ণ পাদুকা, পাগড়ি পরা ও রেশমী বস্ত্র পরা নিষিদ্ধ করেন।[১৩৩] আর এ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এ জন্য যে, তখন ধর্ম পার্থক্য করার একমাত্র উপায় ছিল পোশাক-পরিচ্ছদ। মুসলিমদের জন্য এক ধরনের পোশাক আর ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজারীদের জন্য ভিন্ন পোশাক। খলিফা দ্বিতীয় উমর ইসলামের কোনো বিধি-বিধানের কারণে মুসলিম-অমুসলিমদের পোশাকের ক্ষেত্রে এ পার্থক্য করেন নি।

---

[১৩০] Allama Yusuf Alqarzavi, Abu Masud Azhar Nadvi, *op.cit*, p. 160; Philip K Hitti, *op.cit*, p. 196
[১৩১] A. S. Tritton, *op.cit*, p. 116
[১৩২] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৭-১২৮
[১৩৩] A. S. Tritton, *op.cit*, p. 116

আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশিদ অমুসলিমদেরকে মুসলমানদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর শাসনামলে তারা কালানসুয়া (লম্বা টুপি) ও ফিতাওয়ালা সেণ্ডেল তারা পরিধান করতে পারত।[১৩৪] খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টান-ইহুদিদের পার্থক্যকরণের জন্য পৃথক পোশাক-পরিচ্ছদের নির্দেশ দেন। খলিফা হারুন-অর-রশিদ এর শাসনামলে লম্বা টুপি পরিধানের নির্দেশনা দিয়েছিলেন কিন্তু কোনো রংয়ের টুপি পরিধান করতে হবে এ নির্দেশনা দেন নি। খলিফা মুতাওয়াক্কিল নির্দেশনা দেন যে, কেউ যদি লম্বা টুপি পড়তে চায় তাহলে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তা অবশ্যই হলুদ রংয়ের হতে হবে।[১৩৫] পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের বিষয়টি হযরত উমর (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়ে পরবর্তীতে সময়ের পরিক্রমায় বিবর্তিত হতে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানবতাবোধের বাণী প্রচারকারী আরব শাসকরা জাতিগতভাবে ছিল শাসিতদের থেকে আলাদা। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার রাসূল (স.)- এর হাত ধরে শুরু হয়ে চার খলিফার আমলে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়ায় যা পরবর্তীতে উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে আরো গতিশীল হয়। সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ, সংস্কৃতির বিবর্তন হলেও অমুসলিমদের ক্ষেত্রে কোনো অবহেলার নীতি প্রয়োগ হয়নি। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে যে চর্চার শুরু হয় পরবর্তী শাসক ও প্রশাসন সে ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করেছে। এ সময়ে ইহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নি-উপাসক (পারসিক) এবং অপরাপর আশ্রিত অমুসলমানগণ সাধারণত সামরিক বাহিনীতে যোগদান হতে বিরত থাকতো। তবে তারা যে বছর সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতো সে বছর তাদের থেকে কোনো জিয্ইয়া নেওয়া হতো না। জিয্ইয়া নামক একপ্রকার সামরিক করের বিনিময়ে তারা রাষ্ট্রের পূর্ণ নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভ করতো। এক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হতো না। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ও উমর ইবনে আবদুল আজিজের সময়ে চাকুরি ক্ষেত্রে বঞ্চিত হলেও অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা তাদের অধিকার পূর্ণাঙ্গরূপে লাভ করে। অমুসলিমদের জন্য মাঝে মাঝে বৈষম্যমূলক নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হলেও এগুলো বাস্তবে পালিত হতো কম। কখনও কখনও অতি উৎসাহী শাসক অথবা ধর্ম নেতাদের কারণে এ সকল আইন-কানুন প্রবর্তিত হতো। এ সকল আইন-কানুনগুলোর স্থায়িত্বকাল খুব বেশি দিন না টিকলেও সে সময়ে অমুসলিমগণ নির্যাতন ও নিপীড়নের স্বীকার হতেন একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে অধিকাংশই খলিফার শাসনামলে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, খলিফাগণ তাদের গির্জা, মন্দির ও অন্যান্য উপাসনালয়গুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং এমনকি রাষ্ট্রীয় অর্থ খরচ করে পুরাতন উপাসনালয়গুলো পুন:নির্মাণ করতেন এবং নতুন উপাসনালয় তৈরি করে দিতেন।

---

[১৩৪] A. S. Tritton, *op.cit*, p. 117
[১৩৫] A. S. Tritton, *Ibid*, p. 118

সপ্তম অধ্যায়

খিলাফত আমলে অমুসলিম নাগরিকদের দায়-দায়িত্ব

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, এই পৃথিবীতে মানব-জাতির অস্তিত্ব যত প্রাচীন, ইসলামে মানুষের অধিকারের ধারণাও তত প্রাচীন। কোরআন মজিদ এই সত্যেরই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে যে, মানুষকে এই দুনিয়ায় পাঠানো এবং খেলাফতের পদে সমাসীন করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাকে অধিকার ও কর্তব্যের চেতনাশক্তি দান করেছিলেন এবং জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে জীবনের সৌজন্যবোধ ও আচরণবিধিও শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যক্তি, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান আচরণ, যাবতীয় অন্যায় অবিচার আর তোষণনীতির পরিবর্তে ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্যতা ও প্রযোজ্যতার নির্দেশনা দিয়ে ইসলাম যে সুনির্দিষ্ট চিন্তাচেতনার পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করে মানবসমাজের কল্যাণার্থে তা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তারপরেও মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস সংখ্যালঘুদের সমস্যা থেকে মুক্ত ছিল না। মহানবি (স.)-এর তিরোধানের পর খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যের সাথে সঙ্গতি রেখে একটি উন্নত শাসন কাঠামোও প্রণীত হয়েছিল। এ সময় বিভিন্ন অঞ্চল বিজয়ের সাথে সাথে সে অঞ্চলের জনগণও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে। বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মাঝে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে। আর যারা তাদের পূর্বের ধর্মেই অটল থাকে, সে সকল অমুসলিম জনগণ স্বাধীন ভাবে তাদের নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম করতে পারতো। তাদের উপর কোনো রূপ জোর-জবরদস্তি করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হতো না। আরব, অনারব, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকল জনগণের মাঝে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং জনগণকে অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করাই ছিল খলিফাদের শাসন নীতির মূল বৈশিষ্ট্য। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য ইসলামের কতিপয় অধিকার রয়েছে, যা একটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তা হলো তা-ই, যা মুসলমানদের জন্য রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সে ধরনের ব্যবস্থা থাকবে, যা মূলত মুসলমানদের বিরুদ্ধে রয়েছে। এর ব্যতিক্রম ঘটবে তখনই, যখন শরিয়াতের কোনো আলাদা নস (নির্দেশ প্রদানকারী দলিল), কিংবা ইজমা[১] থাকবে। ইসলামি আইনতত্ত্ববিদগণের ভাষায়

[১] ইসলাম বিশ্বমানবতাকে সর্বকালের উপযোগী সার্বজনীন প্রগতিশীল একটি শরিয়াত (আইন বিজ্ঞান) উপহার দিয়েছে। ইসলামি কানুনের চারটি মৌলিক উৎসের তৃতীয় ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ইজমা। ইজমা শব্দটি জামউন ধাতু থেকে নির্গত বাবে ইফআল-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় ইজমা হলো-হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মতগণের মধ্য হতে সমসাময়িককালের নেককার মুজতাহিদগণের কোনো কাজ বা কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করা। কোরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নি এমন বিষয়সমূহের সমাধানের জন্য ইজমার প্রয়োজন হতো। ইজমা দুই শ্রেণির হয়ে থাকে। যথা– ইজমা-ই-আজিমা এবং ইজমা-ই-রুখসাহ। উম্মাতে মুহাম্মাদীর সমকালীন সকল মুজতাহিদ কোনো বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা কিংবা একযোগে সকলে কাজটি শুরু করার নাম ইজমা-ই-আজিমা। আর কোনো বিষয়ে ফয়সালায় সকল মুজতাহিদ একমত না হন এবং সে ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ মুজতাহিদের মতকে সমাজের সকলেই গ্রহণ করে তবে সেই ইজমাকে বলা হয় ইজমা-ই-রুখসাহ। কালের বিবর্তনে মানব জীবনে এমন অসংখ্য সমস্যার উদ্ভব হয়েছে যার প্রত্যক্ষ সমাধান কোরআন ও হাদিসে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় প্রয়োজন হয় কোরআন-হাদিসের পরোক্ষ সমর্থনপুষ্ট মানব রচিত সাদৃশ্যমান আইন বা ইজমার। হযরতের ওফাতের পরই ইজমার প্রয়োজন অনুভূত হয়। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে ইজমার নীতি অবলম্বিত হতো। ইজমা কোরআন ও হাদিসের বিরোধী নয়, বরং এটি এদেরই ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণমূলক পরিপূরক নীতি। ইজমা সংঘটিত হওয়ার পর ইজমার মাধ্যমে প্রাপ্ত হুকুমটি মানা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। বিস্তারিত

"মুসলিমদের জন্য (রাষ্ট্রে) যে রূপ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তাদের জন্যও ঠিক একই রূপ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে। উপরন্তু, মুসলিমরা যে রূপ শাস্তি ও দণ্ডের সম্মুখীন হবে, তারাও অনুরূপ শাস্তি ও দণ্ডের সম্মুখীন হবে।"[২] খলিফাদের শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকরা সভ্যতার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে প্রচুর অবদান রেখেছে। রাষ্ট্র নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় পদ-পদবী দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম হিসেবে নিয়োগ দেয় নি। তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যোগ্যতার ভিত্তিতে। রাষ্ট্রের সাথে ওয়াদাকৃত চুক্তি ভঙ্গ করলে চুক্তি ভঙ্গের জন্য শাস্তি নিপতিত হতো। সংখ্যালঘুরা মুসলিমদের শত্রুর পক্ষ হয়ে কাজ করলে কখনও কখনও তাদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ হতো। এতসব বিষয় সত্ত্বেও অমুসলিম নাগরিকরা খলিফাদের শাসনামলে তাদের ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত বিষয়ে পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করতো। কার্ল ওয়েন্ট্রব (Karl weintraub) মন্তব্য করেন

> Islam moreover was tolerant. The Arabs and Turks were among the world's mildest conquerors. The sultans permits Christian churches in their land; what Christian ruler tolerates mosques on his soil?[3]

ইসলাম ভাষা ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ ও পার্থক্য করে না। ইসলামে জাতিসমূহের মধ্যে যাবতীয় অবনিবনা, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ ও সকল প্রকার আগ্রাসন অথবা শোষণনীতি অবলম্বনের কোনো স্বীকৃতি নেই। এক সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং এক আদমের উত্তরসূরী হিসেবে ইসলাম সার্বজনীন মানবতাবাদে বিশ্বাসী। আর এজন্যই মুসলিম ও অমুসলিম নিজেদের অধিকারের সীমারেখার মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার পক্ষে। খলিফাদের শাসনামলে (৬৩২-১২৫৮ খ্রি.) রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। এ সময় রাষ্ট্র যেমন তাদের জীবন, ধন-সম্পদ, ইযযাত-আব্রু রক্ষায় ভূমিকা রেখেছে, তেমনি তাদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনেরও ব্যবস্থা করেছে। এ সময় রাষ্ট্র অমুসলিমদের নিজস্ব আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ কোনো বিধি নিষেধ আরোপ করেনি বরং সকল জাতি তথা মতাবলম্বীদের নিজ নিজ ঐতিহ্য, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠান ধ্যান-ধারণার প্রতি উদার মনোভাব পোষণের শিক্ষা ইসলামের। মুসলিম-অমুসলিম একে অপরের প্রতি বৈরী আচরণ ও শত্রুতা করবে না বরং একে অপরের শুভাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকামী হবে। এ প্রসঙ্গে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করা যেতে পারে :

দেখুন,শায়খ হাফেজ আহমদ উরফে মোল্লা জীয়ন ইবনে আবু সাঈদ আল-হিন্দী, অনু. মাওলানা আবুল কালাম মোঃ আবদুল লতিফ চৌধুরী, *নূরুল আনোয়ার*, এমদাদিয়া পুস্তকালয় লিঃ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ.৩১৬-৩২২; Dr. Shaikh Shaukat Hussain, *Human Rights in Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2001, pp. 29-31; মুহম্মদ নুরুল করিম, *ইসলাম ও জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৪০; মোঃ আবু তাহের, *ইসলামে ধর্ম দর্শন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি*, কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৯৭-১০৩

[২] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্‌ন মাস'উদ আল কা'সানী, *বাদায়েউস সানা'য়ে ফী তারতীবিশ শারা'য়ে*, খণ্ড-৭, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৮৬, পৃ.২৮৮

[৩] Karl Weintraub, *Visions of Culture*, University of Chicago Press, Chicago, 1969, p. 59

لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرخوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم- ان الله يحب المقسطين-

"দীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করে নাই তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করিতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।"[৪] নির্ভরযোগ্য সূত্র, মজবুত ও শক্তিমান দলিলের ভিত্তিতে উক্ত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, খলিফাদের শাসনামলে রাষ্ট্র ও সমাজে অমুসলিম নাগরিকদের প্রাপ্য অধিকারের বিনিময়ে তাদের দায়-দায়িত্ব ও করণীয় কি? অমুসলিমরা যুগ যুগ ধরে কিভাবে খলিফাদের তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তায় জীবনযাপন করেছিল? খিলাফত রাষ্ট্রের নাগরিকগণ রাষ্ট্রে শুধু অধিকারই ভোগ করেন না বরং তাদেরকে কিছু দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। কেননা রাষ্ট্র নাগরিকদের নিয়েই গঠিত হয়। ফলে রাষ্ট্র নাগরিকদের যে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে তার বিনিময়ে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য নাগরিকরা যথাযথভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং এটি ভঙ্গুর রাষ্ট্রে পরিণত হবে। খিলাফত শাসনামলে রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের দায়-দায়িত্ব মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ে সীমিত। তাদের মৌলিক দায়-দায়িত্বগুলো হলো: ১. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা। ২. জিয্ইয়া, খারাজ ও উশূর পরিশোধ করা। এটি হলো আর্থিক দায়-দায়িত্ব। ৩. রাষ্ট্রের আইন-কানুনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন। ৪. মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-আচরণ, নিদর্শন ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। নিম্নে খিলাফত আমলে রাষ্ট্রের নাগরিকদের দায়-দায়িত্বগুলো আলোচনা করা হলো।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের প্রধান দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করা। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও আনুগত্য মেনে নেওয়া ছাড়া রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও আনুগত্য মেনে নেওয়া। রাষ্ট্রের বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকলে রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার পাশাপাশি সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবে। রাষ্ট্রের আনুগত্য মেনে নিলে নাগরিকরা ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য নেতা নির্বাচিত করতে পারবেন। রাষ্ট্রপরিচালনায় সকল নাগরিকরা যেমন অংশীদার, তেমনিভাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষায় সকল নাগরিককে শুধুমাত্র ধন-সম্পদ দিয়ে নয়, প্রয়োজন হলে নর-নারীসহ সকলকে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আল্লাহ্ বলেন,

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم فى سبيل الله- ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون-

---

[৪] *আল-কুর'আন*, ৬০ : ৮

“অভিযানে বাহির হইয়া পড়, হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায় এবং সংগ্রাম কর আল্লাহ্র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। উহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানিতে।”[৫]

রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনার জন্য দেশবাসীর নেতা হিসেবে মজলিসে শূরার[৬] পরামর্শেক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র মুসলিম-অমুসলিম সকলের জীবন, সম্পদ ও ইযযাতের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান কখনো মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে পার্থক্য করে না। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব হলো সার্বভৌম আল্লাহ তা'য়ালার প্রদত্ত বিধি-বিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। রাষ্ট্রপ্রধান ইসলামের বিধি-বিধান মতো শাসনকার্য পরিচালনা করলে নাগরিকগণ তার প্রতি অনুগত থেকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم- فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر- ذلك خير واحسن تاويلا-

“হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের, যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (রাষ্ট্রপ্রধানের); কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উহা উপস্থাপন কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।”[৭]

রাষ্ট্রের আনুগত্য যথাযথভাবে মেনে নিলে রাষ্ট্র অমুসলিমদের অধিকার সংশোধন বা বাতিল করার কোনো ইখতিয়ার রাখে না। রাষ্ট্রীয় অধিকার মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য সমান। রাষ্ট্র যদি মুসলমানদের কোনো অধিকার হ্রাস-বৃদ্ধি করতে না পারে তাহলে অমুসলিমদেরও কোনো অধিকার হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে না। এককথায় রাষ্ট্রীয় আনুগত্য মেনে নিলে সকল অমুসলিম ব্যক্তিগত ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ

[৫] *আল-কুর'আন*, ০৯ : ৪১

[৬] আরবি শব্দ মজলিস এর আভিধানিক অর্থ হলো সভা, সমিতি, পরিষদ বা সংস্থা। আর শূরার আভিধানিক অর্থ হলো পরামর্শ। সুতরাং মজলিসে শূরার অর্থ হলো পরামর্শ পরিষদ। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে মজলিসে শূরা বলতে এমন একটি সংস্থাকে বুঝায়, যা রাষ্ট্রপ্রধানকে সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের সকল কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন। রাসূল (স.), খোলাফায়ে রাশেদিন ও পরবর্তী সময়ে এ পরামর্শ সভাকে ‘মজলিসে শূরা’ বলা হয়, যাকে আধুনিক পরিভাষায় আইন বিভাগ বা পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদ বা জাতীয় সংসদ বলা হয়। মজলিসে শূরা দুই প্রকারের ছিল। যথা: মজলিস আল-আম বা সাধারণ সভা এবং মজলিস আল-খাস বা বিশেষ সভা। শূরার গঠন সম্পর্কে মহানবি (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে কোনো নির্দিষ্ট বিধি-বিধান ছিল না। জ্ঞান ও গুণের দিক দিয়ে যাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (স.) অগ্রণী মনে করতেন তাদেরকে শূরার সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতেন। তবে শূরার সদস্যগণ সকল নাগরিকগণ কর্তৃক সমাদৃত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগেও শূরার সদস্যবৃন্দের নির্বাচনের পদ্ধতি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পদ্ধতির মতোই ছিল। খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আদর্শ ধরে চলতেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শূরার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। হযরত উমর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হয়ে ঘোষণা করেন, পরামর্শ ছাড়া খিলাফত চলতে পারে না। উমাইয়া খলিফাদের মাঝে খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ ছাড়া অন্য কোনো খলিফা শূরার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেননি। উমাইয়া খলিফারা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আত্মীয়-স্বজন নিয়ে পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। আব্বাসীয় শাসকগণ স্ববংশের বা তাদের অনুগত বংশের গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে পরামর্শ সভা গঠন করেন। আব্বাসীয় খলিফাদের মাঝে খলিফা আল-মামুন হলেন প্রথম আব্বাসীয় শাসক যিনি শূরা বা পরামর্শ সভাকে একটি নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি রাষ্ট্রের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে পরামর্শ সভা গঠন করেন। মূলত মজলিসে শূরা হলো খিলাফত রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, A. H. Qasmi, *Islamic Governments*, Isha Books, Delhi, 2008, p. 88; মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৪৭-৩৬৫; ডঃ মহম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান, শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, বুকশ প্যাভিলিয়ন, রাজশাহী, ২০০১, পৃ. ৭৭-৮৪

[৭] *আল কোরআন*, ০৪:৫৯

নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পালন করতে পারবে। তাদেরকে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান পালনে বাধা দেওয়া যাবে না। এক কথায় অমুসলিম নাগরিকরা খিলাফত রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব লাভ করার পর রাষ্ট্রকর্তৃক আরোপিত সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সম্পূর্ণরূপে ভোগ করবে। এক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

অমুসলিমদের আর্থিক দায়-দায়িত্ব

ইসলামি রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকদের প্রাপ্য অধিকার পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। অঙ্গীকার রক্ষা করা ইসলামি রাষ্ট্র তথা মুসলমানদের আবশ্যকীয় ধর্মীয় কর্তব্য। ইসলামে অঙ্গীকারের মর্যাদা সহজে ভঙ্গ করা যায় না। ফলে রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকদের যে দায়ভার গ্রহণ করে এবং তারা রাষ্ট্রের যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এর বিনিময় হিসেবে তাদের উপর কতিপয় বিশেষ কর আরোপ করা হয়। অমুসলিমদের যে সকল বিশেষ কর পরিশোধ করতে হয় সেগুলো হলো: ক. জিয্ইয়া খ. খারাজ ও গ. উশূর।

ক. জিয্ইয়া (নিরাপত্তা কর)

জিয্ইয়া শব্দটি আরবি। এটি মূলত আরবি শব্দ জাযা হইতে নির্গত। এর অর্থ হলো বদলা বা বিনিময়। তাঁর মতে জিয্ইয়া হলো সেই সম্পদ, যার উপর সে নিরাপত্তা এবং যিম্মাদারির আওতাভুক্ত হওয়ার চুক্তি সম্পাদিত করে।[৮] আল্লামা যামাখশারীর মতে, জিয্ইয়া শব্দটির মূল শব্দ হলো জাযা। তাঁর মতে, ইহাকে এজন্য জিয্ইয়া বলা হয় যে, যিম্মিদের কর্তব্যসমূহের একটি কর্তব্য যাহা তারা পালন করে।[৯]

ইবনে কুদামা বলেন,

هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام-

“ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করার জন্য অমুসলিমদের থেকে সংগৃহীত বার্ষিক করকে জিয্ইয়া বলে।”[১০]

মাওয়ার্দী বলেন,

فأما الجزية مشتقة من الجراء، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا ، وإما جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا-

“জিয্ইয়া শব্দটি ‘জাযা’ ধাতু নির্গত। এর মূল অর্থ হলো বিনিময়, প্রতিদান। যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরা সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা লাভ করে, তাই এর বিনিময়ে হিসেবে তাদের উপর আরোপিত করকে ‘জিয্ইয়া’ বলা হয়।”[১১]

---

[৮] ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, দারুল মা'আরিফ, কায়রো, তা. বি., পৃ. ৬২১

[৯] আল্লামা যামাখশারী, *আল-কাশ্শাফ*, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, ৩য় সংস্করন, ২০০৯, পৃ. ৪২৯

[১০] মুওয়াফফাকুদ্দীন আবি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু কুদামা, (বিশ্লেষক ড. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুহসীন আত্-তুর্কী, ড. আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ), *আল মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ-১৩, দারু আলামিল কুতুব, রিয়াদ, ১৯৯৭, পৃ. ২০২

খিলাফত শাসনামলে রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের জান-মাল শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করা ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণ খিলাফত রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল। রাষ্ট্র এর বিনিময়ে তাদের নিকট থেকে প্রয়োজন পরিমাণে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর আদায়ের অধিকার লাভ করে থাকে। এটি একটি নামমাত্র কর। জিয্ইয়া নামক এ কর অমুসলমান প্রজার উপর ধার্যকৃত সামরিক কর।[১২] ইসলামের নীতি ছিল এই যে, অমুসলিম প্রজাগণ জিয্ইয়া প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে বসবাস করার পাশাপাশি সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করতো। মূলত জিয্ইয়া ছিল মাথাপিছু আরোপিত বার্ষিক কর। সকল অমুসলিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জিয্ইয়া নেওয়া হতো। চাই সে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খ্রিস্টান) অগ্নি উপাসক অথবা অন্য কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত হোক বা চাই সে আরব অথবা অনারব হোক। তবে যারা জিয্ইয়া আদায় করবে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করার বিধান রয়েছে জিয্ইয়া পরিশোধ না করা পর্যন্ত। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون مل حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون-

“যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, শেষদিনেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিয্ইয়া দেয়।”[১৩]

জিয্ইয়া আদায় করার ফলে অমুসলিমরা দুটি অধিকার লাভ করে। প্রথমত: জিয্ইয়া আদায় করার ফলে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা যে আর কখনো যুদ্ধ করবে না এটা স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত: ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করার পূর্ণাঙ্গ অধিকার তারা প্রাপ্ত হবে। তাদের ধন-সম্পদ, ইয্যত-আব্রুর হেফাজত করা হবে, যাতে তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে।

বিভিন্ন যুগে জিয্ইয়া

জিয্ইয়া মাথাপিছু আরোপিত বার্ষিক কর। এটি নতুন কোনো কর নয়। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই ইরান ও রোমীয় সাম্রাজ্যে জিয্ইয়া প্রচলন ছিল। পারস্যের সাসানী সম্রাটগণ আশ্রিত সম্প্রদায়সমূহের ওপর জিয্ইয়ার অনুরূপ গেজিত (Gezit) এবং রোমানগণ তাদের আশ্রিত প্রজাদের উপর ট্রাইবিউটাম ক্যাপিটিস (Tributum Capitis) নামক এক প্রকার ব্যক্তিগত কর ধার্য

[১১] আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল বাসরী আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকাম আল-সুলতানীয়া*, দারুল হাদিস, কায়রো, ২০০৬, পৃ. ২২১

[১২] Dr. Nejatullah Siddiqi, *Islamic Public Economic*, Tr. Dr. Sayed Afzal Peerzade, Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 2001, pp. 26-27

[১৩] *আল-কুর'আন*, ০৯:২৯

করতেন।[১৪] ব্যক্তিগত কর আরোপ ছাড়াও সাসানীয় সম্রাটগণ মহাবিষুব ও জলবিষুব সংক্রান্তিতে অর্থাৎ বৎসরে নওরোজ ও মিহরযান উৎসবের দিনে বিশেষ করারোপ করতেন। এ করারোপের মাধ্যমে সম্রাটকে বিশেষ অভিবাদন জানানো হতো। এ সকল করভারে আশ্রিত প্রজাগণ জর্জরিত ছিলেন। যাবতীয় কর প্রাপ্তির পরও তারা তাদের অধীনে শাসিত প্রজার কোনো দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতেন না। অন্যদিকে খিলাফত শাসনামলে অমুসলিম প্রজারা বার্ষিক মাথাপিছু কর তথা জিয্ইয়া প্রদানের মাধ্যমে খিলাফত রাষ্ট্রে নিরাপদে বসবাস এবং জান-মাল ও ইযযাত-আব্রুর নিরাপত্তা লাভ করতেন। মুসলমান শাসকগণ অমুসলিম প্রজাদের প্রতি জিয্ইয়ার বিনিময়ে তাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করতেন। জিয্ইয়া প্রদানের বিনিময়ে তাদেরকে সামরিক বাহিনীতে যোগদান হতে অব্যাহতি দেওয়া হতো। তাছাড়া অমুসলিম প্রজা যারা মুসলমানদের সাথে সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ করতো কিংবা মুসলিম বাহিনীতে জিহাদে কোনোভাবে সাহায্য করতো অথবা সামরিক বাহিনীতে চাকুরি করতো তাদেরকে জিয্ইয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতো।[১৫]

মহানবি (স.)-এর আমলে জিয্ইয়া

মুসলিম সমাজ অমুসলিমদের নিরাপত্তাদানে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলাম পূর্বযুগে আরবদেশে বিভিন্ন গোত্রে মধ্যে অনাক্রমণ ও নিরাপত্তামূলক চুক্তি সম্পাদনের রীতি প্রচলিত ছিল। মহানবি (স.) আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সময়কে ‘আইয়ামে জাহেলিয়া’[১৬] বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে আরবের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা খুবই ভঙ্গুর ছিল। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত আরবদেশের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এ রকম নিরাপত্তামূলক চুক্তি সম্পাদন করার রীতি চালু ছিল। সে সময়ে আরবের দুর্বল গোত্রগুলো শক্তিশালী গোত্রের সাথে আত্মরক্ষামূলক চুক্তি সম্পাদন করতো। চুক্তি অনুসারে চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলি পরস্পর পরস্পরকে যে কোনো বিপদ-আপদে সহযোগিতা করতো। অধিকাংশ সময়ই লক্ষ

[১৪] Von Kremer, *The Orient Under the Caliphs,* Tr. S. Khuda Bukhsh, Idarah-I Adabiyat-I Delli, New Delhi, 1983, p. 67

[১৫] Dr. Mohammad Muslehuddin, *Islam and its Political System*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1999, p. 56

[১৬] আরবি শব্দ আইয়াম শব্দের অর্থ কাল, যুগ বা সময় আর জাহেলিয়া শব্দের অর্থ অজ্ঞতা, অন্ধকারাচ্ছন্ন। সুতরাং আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কুসংস্কারের যুগ, বর্বরতার যগ, অজ্ঞতার যুগ বা তমসার যুগ বলা হয়। জাহেলিয়া যুগ বলতে ঐতিহাসিক P. K. Hitti এর মতে,“The term *jahiliyah,* usually rendered ‘time of ignorance’ or ‘barbarisam’, in reality means the period in which Arabia had no dispensation, no inspired prophet, no revealed book.” Philip K Hitti, *History of the Arabs,* Macmillan St Martin’s Press, London, Tenth edition, Reprinted 1972, p. 87 কোন সময়কালকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয় তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, হযরত আদম (আ.) এর সৃষ্টির পর থেকে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়কালকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী একশত বছর সময়কালকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়। প্রফেসর হিট্টি এ মতকে সমর্থন করেন। জাহেলিয়া যুগে আরবদেশে লেখার প্রচলন ছিল না বললেই চলে। বর্তমান সময়ের মতো সুষ্ঠু শিক্ষা পদ্ধতি না থাকলেও আরবি ভাষা, বাগ্মিতা ও কাব্যচর্চায় আরববাসী বিখ্যাত ছিল। সে সময় আরবের অধিবাসীগণ প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা: মরুবাসী ও শহরবাসী। জাহেলিয়া যুগে আরবের অধিকাংশ লোক বেদুঈন ছিল। বিদ্যা-বুদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে ছিল। তাদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিল। অত্যাচার, অনাচার, কুসংস্কার তাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ছিল। জাহেলিয়া যুগে কন্যা সন্তান জন্মদানকে তারা অভিশাপ মনে করতো এবং অনেকেই কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে কবর দিত। তবে সে সময় কাব্যচর্চার ব্যাপক প্রচলন ছিল। তবে সে সময় বহু বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে তাদের ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ ছিল। বিস্তারিত দেখুন, *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১১শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৫৫৩-৫৫৪; Philip K. Hitti, *op.cit,* p. 87-88

করা যায়, শক্তিশালী গোত্রগুলো দুর্বল গোত্রগুলোকে শত্রুর আক্রমণের হাত হতে রক্ষা করতো। মহানবি (স.) মক্কা থেকে হিজরত করে যখন মদিনায় যান তখন সেখানে তিনি মদিনা রাষ্ট্রের দায়িত্ব লাভ করেন। মহানবি (স.) মদিনা সনদের মাধ্যমে তাঁর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি দলের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ লিপিবদ্ধ করেন।[১৭] ইসলামের ছায়াতলে তাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তাদান এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা পবিত্র কোরআন ও রাসূল (স.)-এর হাদিস কর্তৃক নির্ধারিত। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আরবের ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে নিরাপত্তামূলক চুক্তি সম্পাদন করেন। তাদের বলা হতো "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত" বা সংক্ষেপে আহল আল-যিম্মাহ বা যিম্মি। মহানবি (স.) পবিত্র আল-কোরআনের নির্দেশ অনুসারে অমুসলিম প্রজাদের উপর জিয্ইয়া ধার্য করেন। মহানবি (স.) তাঁর শাসনামলে আরবের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে মাথাপিছু ১ (এক) দীনার জিয্ইয়ার বিনিময়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। মহানবি (স.)-এর সময়ে তিনি যে জিয্ইয়া নির্ধারণ করেছিলেন তার পরিমাণ ছিল নামমাত্র। শিশু, মহিলা, উন্মাদ, গরিব, ধর্মযাজক, প্রতিবন্ধী, অতি বয়োবৃদ্ধ, জিয্ইয়া প্রদানে অক্ষম, পীড়িত ও দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জিয্ইয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। মহানবি (স.) এর সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের উপর মাথাপিছু এক দিনার জিয্ইয়া ধার্য করেন। তবে জিয্ইয়া প্রদানে অক্ষম হলে তাঁর সাধ্যানুসারে ধার্য হতো।[১৮] মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মুয়াজ ইবনে জাবালকে ইয়ামেনে যিম্মিদের সকল প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ হতে মাথাপিছু এক দিনার বা তার সমমান মূল্যের কাপড় আদায় করতে চিঠিতে নির্দেশ দেন। উক্ত পত্রে রাসূল (স.) নারী ও শিশুদের জিয্ইয়া হতে বাদ দিতে বলেন।[১৯] মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন, জিয্ইয়া অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত কর। মুসলমানদের উপর যে জিয্ইয়া নেই এ সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেন, ليس على مسلم جزية অর্থাৎ "মুসলমানদের উপর কোন জিয্ইয়া কর নেই।"[২০] জিয্ইয়ার বিনিময়ে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার মূল বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপঃ

ক. উক্ত সম্প্রদায় দুটি বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে রাসূল (স.) তাঁর অনুচরদের সাথে নিয়ে তাদেরকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

খ. তাদের সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। তারা তাদের ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও গির্জাদির কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। কোনো যাজক বা তপস্বীকে উত্ত্যক্ত করা যাবে না।

---

[১৭] Reuben Levy, *The Social Structure of Islam,* Cambridge at the University Press, London, 1969, p. 273

[১৮] Yahya Ben Adam's, *Kitab Al Kharaj,* (Taxation in Islam, Vol. I, Edited, Translated and Provided with an Introduction and Notes A. Ben Shemesh), E. J. Brill, Leiden, 1958, p. 58

[১৯] Qudama B. Jafar, *Kitab Al Kharaj,* (Taxation in Islam, Vol. II, Edited, Translated and Provided with an Introduction and Notes A. Ben Shemesh), E. J. Brill, Leiden, 1965, p.43

[২০] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস্‌সিজিস্তানী (র), অনু. ডঃ আফ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক, *আবু দাউদ শরীফ,* হাদিস নং- ৩০৪২, চতুর্থ খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২২৭

গ. যতদিন পর্যন্ত তারা চুক্তিবদ্ধ থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা যাবে না।

ঘ. চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় তারা মুসলমানদের সাথে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করলে বা সামরিক কাজে তথা যুদ্ধে সহযোগিতা করলে তাদেরকে সে বছরের জিয্ইয়া প্রদান করতে হবে না।

ঙ. তাদেরকে সামরিক বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা যাবে না। কারণ তারা জিয্ইয়া নামক করটি প্রদান করে থাকে তারা সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে থাকে।

চ. তাদের জান, মাল, ধর্ম রক্ষাসহ সকল প্রকার নিরাপত্তা দান।

ছ. ধর্ম তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। ধর্মীয় বিশ্বাস প্রত্যেকের নিজস্ব। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।

এককথায় ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-কানুন মেনে নিয়ে অমুসলিম নাগরিকগণ জিয্ইয়া প্রদান করে ইসলামি রাষ্ট্রে তাদের জান-মাল, ইয্যাত আব্রুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। রাসূলে করিম (স.) বলেছেন,

من ظلم معاهدا كنت خصمه يوم القيامة-

"যে ব্যক্তি কোনো যিম্মি তথা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের প্রতি অবিচার করল, তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন (আল্লাহর দরবারে) আমি নিজেই ফরিয়াদি হবো।"[২১] হযরত মুহাম্মদ (স.) ইয়েমেন দেশীয় নাজরানের অধিবাসীদের সাথে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেছিলেন, এতে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, তাদের পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তাদের কোনো পুরোহিতকে পদ থেকে সরানো যাবে না। তাদের ধর্মীয় সাধু-সন্ন্যাসীদেরকে উত্যক্ত ও ব্রত পালন হতে বিরত রাখা যাবে না।[২২] হযরত মুহাম্মদ (স.) ইয়েমেনবাসীর জন্য এক দিনার জিয্ইয়া নির্ধারণ করেছিলেন। কারণ, তাদের সিংহভাগই ছিল অসচ্ছল ও হত দরিদ্র। আর জিয্ইয়া ওয়াজিব হওয়ার মূলে রয়েছে পবিত্র কোরআনের সূরা তাওবার মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অমীয় বাণী। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আহলে কিতাব ছাড়া অগ্নি উপাসকদের কাছ হতে জিয্ইয়া আদায় করতেন। কিন্তু তাদের সাথে শর্ত ছিল যে, তাদের খাবার ভাগাভাগি এবং মুসলমানরা তাদের মহিলাদের বিয়ে করতে পারবে না।[২৩] পরবর্তীকালে মুসলিম শাসকগণ অমুসলিম প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও অনুরূপ নিরাপত্তামূলক চুক্তি সম্পাদন করতেন।

---

[২১] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে মুসা ইবনে হাম্মাদ আল আকিলী আল মাক্কী, (বিশ্লেষক, ড. আবদুল মুতী আমিন), *আদ দুয়াফা আল কাবীর*, তৃতীয় খণ্ড, হাদিস নং- ১০০১, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তা.বি, পৃ. ৪৪

[২২] আবু উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সালাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, আল মাকতাবাতু তিজারিয়্যাহ আল কুবরা, কায়রো, ১৩৫৩ হি., পৃ. ১৮৮

[২৩] Qudama B. Jafar, Vol. II, *op.cit*, p.42

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে জিয্ইয়া

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় রাজস্বের যে সকল উৎসসমূহ ছিল তার মধ্যে জিয্ইয়া অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হতো। 'জিয্ইয়া' নামক প্রতিরক্ষা কর প্রদান করে অমুসলিম নাগরিকরা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার মুসলমানদের ন্যায় সমানভাগে ভোগ করার পাশাপাশি সামরিক বাহিনীতে যোগদান হতে অব্যাহতি পেয়েছিল। অমুসলিম নাগরিকদের দেশরক্ষার কাজে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল তবে এ অংশগ্রহণ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে নয়। কেননা অমুসলিম নাগরিকরা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে শত্রুদের সাথে মিলিত হয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের বিপদ ঘটাতে পারেন। সেজন্য তাদের নিকট থেকে দেশ রক্ষার কার্যে ব্যয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা হতো। এ আর্থিক সাহায্য বা দেশ রক্ষা করাকেই ইসলামি পরিভাষায় 'জিয্ইয়া' বলা হয়। তাদের এ অর্থ দিয়ে দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত সৈনিকদের বৃত্তি দেওয়া হতো।[২৪] এ কর কেবল যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদের থেকে দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দানের বিনিময়ে প্রতি বছর আদায় করা হতো। অতএব যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম নয় বা যুদ্ধ করতে অপারগ যেমন- শিশু, কিশোর, নারী, প্রতিবন্ধী, পাগল, দাস-দাসী, সন্ন্যাসী, উপাসনালয়ের সেবক, ভিক্ষু, সামরিক বিভাগে কর্মরত অমুসলিম, অতি বয়োবৃদ্ধ এবং অতিশয় পীড়িত ও দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত এমন রোগীকে জিয্ইয়া দিতে হবে না।[২৫] হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তার সেনাপ্রধানকে পত্রে নির্দেশ দেন যে, তাদের সাথেই যুদ্ধ করবে যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম। কোনো নারী ও শিশুকে হত্যা করবে না। প্রাপ্ত বয়স্কদের উপর জিয্ইয়া আরোপ করবে।[২৬] প্রশংসনীয় জনকল্যাণকর কাজের জন্য হযরত উমর (রা.) একজন অমুসলিম প্রজাকে চিরজীবনের জন্য জিয্ইয়া মাফ করে দিয়েছিলেন। একজন অমুসলিম হযরত উমর (রা.) কে কায়রো থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল খনন করার সময় খালের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে সহযোগিতা করায় তাকে সারা জীবনের জন্য জিয্ইয়া মাফ করে দিয়ে পুরুস্কৃত করেছিলেন।[২৭] আর কখনও যদি ইসলামি সরকার বা মুসলিমরা তাদের জান-মাল, মান-সম্মান এবং সকল ধরনের স্বাধীনতা দিতে অপারগ হয়, তাহলে তাদের থেকে জিয্ইয়া আদায় করা যাবে না বরং তাদের নিকট থেকে আদায়কৃত জিয্ইয়া তথা ঐ কর ফেরত দিতে হবে।[২৮] রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়ারমুকের প্রান্তরে মুসলমানদের মোকাবিলা করতে সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তখন 'হিম্স' থেকে উত্তোলিত জিয্ইয়া অধিবাসীদের মধ্যে প্রখ্যাত সিপাহসালার আবু উবায়দা নিজের অধীন সেনাপতিদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা যেসব জিয্ইয়া অমুসলিমদের নিকট থেকে আদায় করেছিল তা তাদের ফিরিয়ে দাও। তাদেরকে বলো

---

[২৪] শামসুদ্দীন আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খণ্ড-১০, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, পৃ. ৮৭; Philip K Hitti, *op.cit*, p. 170

[২৫] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল কা'সানী, খ-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১১১

[২৬] Qudama B. Jafar, Vol. II, *op.cit*, p.43

[২৭] As-Suyuti "حسن المحاضرة فی اخبار مصر والقاهرة" ch. خليخ امير المؤمنين quoted in Muhammad Hamidullah, *Muslim conduct of State*, SH. Muhammad Ashraf, Lahore, 1977, p. 114

[২৮] S. A. Siddiqi, *Public Finance in Islam*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2007, p. 97

যে, আমরা রোমানদের মোকাবেলায় ব্যস্ত, এই সময়ে নিজেদের রক্ষা কর। জিয্ইয়া ছিল হিফাজতের বিনিময়ে। তোমরা তোমাদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব আমাদের উপর আরোপ করেছিলে। এটা এখন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যই তোমাদের অর্থ ফেরত দেওয়া হলো। আমরা তোমাদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বহাল আছি এবং থাকবো। যদি আল্লাহ তাদের উপর আমাদের বিজয়ী করেন। আবু উবায়দার এ নির্দেশ মোতাবেক সকল সেনাপতি আদায় করা অর্থ ফেরত দিলেন।[২৯] এ সময় অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে ঐতিহাসিক বালাযুরী লিখেছেন, মুসলিম সেনাপতিগণ যখন সিরিয়ার হিম্‌স নগরীতে জিয্ইয়ার অর্থ ফেরত দেন, তখন সেখানকার অধিবাসীরা সমস্বরে বলে উঠে, আমরা পূর্বের তুলনায় অনেক ভালো আছি। আমরা অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী হলেও তোমাদের শাসন ও ন্যায়বিচারকে অনেক বেশি পছন্দ করি এবং মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করি। আমরা তোমাদের সঙ্গে থেকে হিরাক্লিয়াসের মোকাবিলা করবো। এ সময় ইহুদিরা শপথ করে বলে যে, আমাদের হত্যা বা পরাজিত না করে হিরাক্লিয়াসের কোনো গভর্নরকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। মুসলিম শাসিত অন্যান্য শহরের অবস্থাও একই রকম ছিল। তারা বলতে শুরু করে যে, যদি আবার রোমান শাসন চালু হয়, তাহলে তাদের অবস্থা আবার আগের মতোই হবে। সুতরাং যে করেই হোক তা প্রতিহত করতে হবে। মুসলিম শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। যখন মুসলমানদের হাতে রোমানদের পরাজয় ঘটলো তখন তারা বাদ্যযন্ত্র সহকারে আনন্দ উল্লাস করে শহরের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলো।[৩০] তবে কোন অমুসলিম যদি নিজের সম্মতিতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাহলে তাকে কোনো জিয্ইয়া প্রদান করতে হয় না এবং যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যের আনুপাতিকভাবে গণিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাবে।[৩১] অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের যে চুক্তি হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অমুসলিমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জিয্ইয়া প্রদান করবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারা যায়। যদি তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে তাদের নিকট কোনো প্রকার কর তথা জিয্ইয়া আদায় করা যাবে না তথা মওকুফ থাকবে।

অমুসলমান প্রজাবর্গের উপর জিয্ইয়া পবিত্র কোরআন নির্দেশিত কর হলেও অবস্থা বিশেষ এই কর বিজিত প্রজাবর্গের উপর ধার্য করা হতো না। যেসব অমুসলিম অধিবাসী জীবিকা উপার্জনে অক্ষম, দারিদ্র্যের শিকার ও পরের উপর নির্ভর করে চলে, তাদের জিয্ইয়া তো মাফ হবেই উপরন্তু তাদের জন্য 'বায়তুল মাল' হতে বৃত্তি প্রদান করা হবে।[৩২] খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে সেনাপতি খালিদ বিন ওলীদ (রা.) ইরাকের 'আল হিরা' অঞ্চল জয় করে তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে উল্লেখ করেছিলেন যে,

[২৯] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *কিতাবুল খারাজ* (আরবি), দারুল মারেফা, লেবানন, বৈরুত, ১৯৭৯, পৃ. ১৩৯

[৩০] আহমাদ ইবন্ ইয়াহইয়া ইব্‌ন জাবির আল বাগদাদী আল-বালাযুরী, *ফুতহুল বুলদান*, তবউল কুতুব আল আরাবিয়্যাহ, কায়রো, ১৯০১,পৃ. ১৪৩-১৪৪

[৩১] S. A. Siddiqi, *op.cit*, p. 97; ড. মুহাম্মদ ইউসুফ উদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, অনু., আবদুল মতীন জালালাবাদী, ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ২১৮

[৩২] মুওয়াফফাকুদ্দীন আবি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু কুদামা, খ. ১৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৬

> যদি কোনো অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে কোনো লোক কর্মক্ষমহীন বৃদ্ধ হয়ে পড়ে, অথবা কোনো বিপদে পতিত হয় অথবা কোনো সম্পদশালী প্রাকৃতিক কোনো বিপদ-আপদের কারণে বা অন্য কোনো কারণে যদি এমন ভাবে দরিদ্র হয়ে পড়ে যে তাঁর বংশীয় লোকেরা তাঁকে দান-খয়রাত করতে শুরু করে, তাহলে তার নিকট থেকে জিয্ইয়া নেওয়া থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। উপরন্তু রাষ্ট্রপ্রধান বাইতুলমাল থেকে মুসলিমদের বাইতুলমাল থেকে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যতদিন সে মদিনায় বা ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করবে।[৩৩]

হযরত উমর (রা.) মদিনাতে হাঁটাহাঁটি করার সময় লক্ষ করলেন যে, এক বৃদ্ধ অন্ধলোক ভিক্ষা করছে। তিনি লোকটির কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন :

> তুমি কোন ধর্মে বিশ্বাস করো? উত্তরে বৃদ্ধটি বলল, আমি একজন ইহুদি। হযরত উমর (রা.) বললেন, তুমি ভিক্ষা করছ কেন? সে বলল, আমার কাছে জিয্ইয়া তলব করা হচ্ছে অথচ তা পরিশোধ করার সামর্থ্য আমার নেই। আর ভিক্ষা করেই আমি আমার জীবিকা নির্বাহ করি। বৃদ্ধটির কথা শুনে উমর তাকে নিজ গৃহে নিয়ে যান, সেখানে তিনি বৃদ্ধকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে কিছু অর্থ দান করেন। এ সময় তিনি বৃদ্ধের হাতে একটি চিঠি দিয়ে বায়তুল মালের খাজাঞ্চির নিকট পাঠালেন। তিনি বাইতুল মাল কর্মকর্তাকে লিখলেন, তার এবং তার মতো লোকদের (শোচনীয়) অবস্থা দেখ এবং তার জন্য বায়তুল মাল থেকে কিছু নির্ধারণ করো, আর তার এবং তার মতো লোকদের কাছ থেকে জিয্ইয়া আদায় করো না। আমরা তাদের যৌবনকাল দ্বারা উপকৃত হব, আর বার্ধক্যে তাদেরকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব, এটা কখনো সুবিচার হতে পারে না।[৩৪]

যদি কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তার জিয্ইয়া মাফ হয়ে যাবে। আর কোনো অমুসলিম তার প্রাপ্য বকেয়া জিয্ইয়া রেখে মারা গেলে তা তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আদায় করা হবে না এবং তার উত্তরাধিকারীদের উপর এর দায়ভার চাপানো যাবে না।[৩৫] Nicolas P. Aghnides উল্লিখিত তথ্যের আলোকে ইমাম আবু হানিফার বর্ণনার উল্লেখ করে বলেন, সুনির্দিষ্ট দুটি কারণে জিয্ইয়া মাফ হবে। ১. যিম্মি ইসলাম গ্রহণ করলে। ২. যিম্মি মারা গেলে।[৩৬] উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু ইউসুফ বর্ণনা করেন, বানু তাগলিব গোত্র ও নাজরানের খ্রিস্টানদের জন্য জিয্ইয়া অবশ্য দেয় ছিল না। হযরত উমর (রা.) ও বনি তাগলিবের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকালে ওবাদা নু'মান তাগলিবি (মুসলমান) উমর (রা.)-কে বলেন. "আমিরুল মো'মেনিন ! আপনি বনি তাগলিবের শক্তি সম্পর্কে অবগত আছেন। যদি তারা শত্রুদের সাথে মিলে যায়, তাহলে শত্রুদের

---

[৩৩] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৪
[৩৪] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬, ; আবু 'উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সালাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬
[৩৫] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল কা'সানী, খ-৭, পৃ.১১২; মুওয়াফফাকুদ্দীন আবি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু কুদামা, খ- ১৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২১
[৩৬] Nicolas P. Aghnides, *Mohammedan Theories of Finance*, Idarah-I-Adabiyat-I-Delli, Delhi, 2002, p. 404

শক্তি বৃদ্ধি পাবে। অতএব আপনি ইচ্ছা করলে তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু বিবেচনা করতে পারেন।" এ কারণে হযরত উমর (রা.) তাদেরকে জিয্ইয়া হতে অব্যাহতি দিয়ে মুসলমানদের ন্যায় তাদের উপর 'সদকা' নির্ধারিত করে দেন।[৩৭] উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা.) একাকী সিদ্ধান্ত নেননি। হযরত উমর (রা.) তাঁর সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করলে তাঁরা তখন বলেন, তারা যদি শত্রু সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়ে যায়, তাহলে শত্রু সৈন্যরা সম্মিলিতভাবে মুসলিমদের ক্ষতি করতে পারে।[৩৮] ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলে সাইপ্রাস বিজিত হলে সেখানকার অধিবাসীদের উপর জিয্ইয়া ধার্য করা হয়নি। কারণ দ্বীপটি খলিফা রোমানদের আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন।[৩৯]

জিয্ইয়া করের নির্ধারিত কোনো পরিমাণ নেই। ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী এর পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে জিয্ইয়ার পরিমাণ নির্ধারণে অমুসলিমদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে। অমুসলিমদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জিয্ইয়ার পরিমাণ ধার্য করা হয়। হযরত আবু বকর (রা.) জিয্ইয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে রাসূল করিম (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ করেন। তাঁর সময়ে আরব উপদ্বীপের বাইরে একমাত্র বিজিত শহর ছিল বুসরা। তিনি সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি দুটি শর্ত আরোপ করেন। প্রথমত: তিনি সেখানকার অধিবাসীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান জানান। দ্বিতীয়ত: যদি তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে তাহলে তিনি তাদেরকে জিয্ইয়া প্রদান করার আহব্বান জানান। তারা এ দুটি শর্তের মাঝে দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ জিয্ইয়া প্রদানের শর্তে রাজি হয়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাদের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উপর এক দিনার এবং বার্ষিক এক জারিব পরিমাণ গম জিয্ইয়া হিসেবে আরোপ করেন।[৪০] হযরত উমর (রা.) তাঁর শাসনামলে অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় জিয্ইয়ার পরিমাণের ক্ষেত্রেও সংস্কার সাধন করেন। মূলত তিনি সাসানি সাম্রাজ্যের প্রচলিত রীতির অনুসরণে জিয্ইয়া প্রদানকারীদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। এ সময় উচ্চবিত্ত অমুসলিম ধনীদের জন্য বার্ষিক ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের জন্য বার্ষিক ২৪ দিরহাম ও নিম্নবিত্তদের জন্য বার্ষিক ১২ দিরহাম জিয্ইয়া ধার্য করা হয়।[৪১] অবশ্য হযরত উমর (রা.) কোনো কোনো অঞ্চলে অমুসলিম ধনীদের সম্পদের তারতম্য অনুসারে ৪৮ দিরহামের স্থলে ৫০ দিরহাম ধার্য করেছিলেন।[৪২] তবে হযরত উমর (রা.)- এর শাসনামলে বিজয়ের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকায় বিভিন্ন শহরের লোকদের উপর জিয্ইয়া আরোপের পরিমাণে ভিন্নতা লক্ষ করা গেলেও মোটামুটি সকল শহরে তিনি উপরোল্লিখিত শ্রেণিবিভাগই বজায় রাখার চেষ্টা করেন। অবশ্য সকল শহরের

[৩৭] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০

[৩৮] Jurji Zayadan, *History of Islamic Civilization Umayyads and Abbasids,* Tr. D.S. Margoliouth, Kitab Bhavan, 2006, New Delhi, p. 31

[৩৯] S. A. Q. Husaini, *Arab Administration*, M. Abdur Rahman, Madras, 1949, p. 38

[৪০] আবু 'উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সালাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০-৩১

[৪১] Yahya Ben Adam's, Vol. I, *op.cit*, p. 28

[৪২] আবু 'উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সালাম,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০

অধিবাসীদের উপর উপরোল্লখিত শ্রেণিবিভাগ ঠিক রেখে কোথাও কোথাও অতিরিক্ত গম বা মধু অথবা তৈলের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আরোপিত করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে জিয্‌ইয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর সময়ে জিয্‌ইয়ার পরিমাণ হযরত উমর (রা.) এর ন্যায় ছিল।

জিয্‌ইয়া সংগ্রহ পদ্ধতি ও সময় সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদিনের খলিফাগণের বিবরণী মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি রাষ্ট্র জিয্‌ইয়া সংগ্রহ, উসুল ও সময়ের ব্যাপারে কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতার নীতি অবলম্বন করেছে। জিয্‌ইয়া বছরে একবার সংগ্রহ করা হবে। বৎসরের হিসাব ধরা হবে আরবি সন অনুযায়ী তথা চন্দ্র বৎসর অনুসারে। নগদ অর্থ অথবা সমমূল্যের সম্পদের মাধ্যমে জিয্‌ইয়া পরিশোধ করা যাবে। কিন্তু মৃতজন্তু, শূকর, মদ প্রভৃতির মাধ্যমে জিয্‌ইয়া আদায় করা যাবে না।[৪৩] হযরত আলী (রা.) যিম্মি কারিগরদের নিকট হতে তাদের তৈরি বস্ত্রসামগ্রী জিয্‌ইয়া হিসেবে গ্রহণ করতেন। তাছাড়া ঘরে বসে যেন অমুসলিম নাগরিকগণ জিয্‌ইয়া পরিশোধ করতে পারেন সেজন্য জিয্‌ইয়া প্রদানের সুবিধার্থে পশু ও শিল্পদ্রব্য দ্বারা জিয্‌ইয়া পরিশোধ করা যাবে।[৪৪] জিয্‌ইয়া আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীরা কখনো কখনো জিয্‌ইয়ার অর্থ না পেলে তাদের গরু, গাধা, কাপড়-চোপড় বিক্রি করে এবং ধন-সম্পদ নিলামে চড়িয়ে জিয্‌ইয়ার অর্থ পরিশোধ করতেন। অথচ জিয্‌ইয়া আদায়ের ব্যাপারে ইসলামি নির্দেশনা হলো অমুসলিমদেরকে জমির ফসল উৎপাদন পর্যন্ত বিলম্ব করা বা সময় দেওয়া। যেন তারা সহজে জিয্‌ইয়া আদায় করতে পারে। বিলম্ব করার কারণ তাদের বোঝা লাঘব করা। হযরত উমর (রা.) অমুসলিমদের বোঝা সহজ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "যে জিয্‌ইয়া আদায়ে অক্ষম তার বোঝা হালকা করে দাও। আর যে অপারগ তাকে সাহায্য কর। কারণ, আমরা তাদের থেকে মাত্র এক-দুই বছরের জন্য তা গ্রহণ করছি না।"[৪৫] হযরত উমর (রা.)-এর শাসনকালে একবার তাঁর কর্মচারীরা প্রচুর পরিমাণে জিয্‌ইয়ার মাল উপস্থিত করলে তাঁর নিকট অধিক মনে হলো। তখন তিনি কর্মচারীদেরকে বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা লোকদের সর্বনাশ করেছ। উত্তরে তারা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা জিয্‌ইয়া উসুল করতে গিয়ে কাউকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দেইনি এবং বিনম্রতার নীতি অবলম্বন করেছি। উমর (রা.) বললেন, তোমরা কি লাঠিসোঠা ব্যবহার করোনি অর্থাৎ মার-ধর করোনি? উত্তরে তারা বলল- না, আমরা লাঠি-সোঠার ব্যবহার করেনি। অতঃপর তিনি তাঁর অধীনে এইরূপ করা হচ্ছে না, তজ্জন্য আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।[৪৬]

---

[৪৩] ড. ইউসুফ কারযাভী, *অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের উদারতা*, আশরাফিয়া লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম, ১৯৯৪, পৃ. ৪৮

[৪৪] আবু 'উবায়দ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫

[৪৫] Allama Yusuf Alqarzavi, Abu Masud Azhar Nadvi, *Islam Muslims & non Muslims*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2010, p. 132

[৪৬] আবু 'উবায়দ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩

উমাইয়া শাসনামলে জিয্ইয়া

উমাইয়াগণের আমলে খিলাফতের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় রাষ্ট্রের আয়ও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময় যে সকল খাত থেকে অধিক পরিমাণে রাজস্ব আসতো, তার মধ্যে অন্যতম ছিল অমুসলমান প্রজাদের নিকট থেকে আদায়কৃত জিয্ইয়া। ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য বিধর্মীগণ সামরিক বাহিনীতে যোগদান হতে বিরত থেকে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত জান-মালের নিরাপত্তার জন্য জিয্ইয়া প্রদান করতো। উমাইয়া শাসনামলে জিয্ইয়া রাজস্বে অনেক অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। এ সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যে কোনো উপায়ে কর সংগ্রহ করতেন।[৪৭] ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে কোনোভাবেই মুসলমানদের নিকট থেকে জিয্ইয়া আদায় করার বিধান নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, উমাইয়া শাসনামলে অনারব মুসলমানদের তথা মাওয়ালী (নবদীক্ষিত মুসলমান) নিকট হতে অনেক সময় জিয্ইয়া নেওয়া হতো। খলিফা আবদুল মালিকের (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত জিয্ইয়া অমুসলিমদের নিকট থেকে আদায় করা হতো। কিন্তু খলিফা আবদুল মালিকের আমলে নও মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাওয়ালীদের উপর জিয্ইয়া ধার্য করা হয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নও মুসলিমদের উপর সর্বপ্রথম জিয্ইয়া ধার্য করেন।[৪৮] এ কারণে নও মুসলিমরা অসন্তুষ্ট হয়। খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ (দ্বিতীয় উমর) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর মাওয়ালী বা নবদীক্ষিত মুসলমানদের উপর হতে জিয্ইয়া কর মওকুফ করেন এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা মুসলমানদের ন্যায় প্রদান করেন।[৪৯] এতে উমাইয়াগণ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। খলিফার এ নীতির কারণে জিয্ইয়ার পরিমাণ কমে রাজস্ব ঘাটতি দেখা যায়। পরবর্তী খলিফাগণ রাজস্ব ঘাটতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য পূর্ববর্তী পন্থায় ফিরে যায়। এতে সবচেয়ে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয় উমাইয়াগণ। কেননা, উমাইয়া খলিফাগণের বিমাতাসুলভ আচরণের কারণে ইরাক, পারস্য ও খোরাসানের মাওয়ালীগণ তাদের উপর রুষ্ট হয়ে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে হটানোর জন্য আন্দোলনে নামেন। তবে শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সময় খোরাসান প্রদেশের গভর্নর 'নাসর বিন সাইয়ার'[৫০] কর ব্যবস্থায় পুনরায় সংস্কার সাধন করেন। কিন্তু উক্ত সংস্কার কার্যকর হওয়ার পূর্বেই উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটে।

---

৪৭ Jurji Zayadan, *op.cit*, p. 97

৪৮ Danial C. Dennett, *Conversion and Poll Tax in Early Islam*, Idarah-i Adabyat-i Delli, Delhi, 1950, p. 40; Jurji Zayadan, *op.cit*, p. 97

৪৯ Danial C. Dennett, *op.cit*, p. 39

৫০ উমাইয়া বংশের শেষ গৌরব খলিফা হিশাম ৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে নাসর বিন-সাইয়ারকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। স্বীয় মেধা ও রণকুশলতার মাধ্যমে উমাইয়া বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্য তিনি অত্যন্ত কঠোর হস্তে খাজার, তুর্কি ও সগোদের বিদ্রোহ দমন করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের শাসনকালে (৭৪৪-৫০ খ্রি.) খোরাসানের বিখ্যাত গভর্নর নাসর বিন-সাইয়ার ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায় যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করেন। তিনি খ্রিস্টান ও ইহুদিদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং মুসলিম-অমুসলিম, আরব-অনারব সকল জোতদারদের উপর ভূমিরাজস্ব ধার্য করাসহ খারাজ ও জিয্ইয়ার পার্থক্য নিরূপণ করে মাওয়ালীদের বিদ্রোহ দমন করেন। মাওয়ালীদেরকে জিয্ইয়া হতে মুক্তি দেন এবং যিম্মি প্রজাদের জিয্ইয়া ধার্য করে তা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁর এ সংস্কার উমাইয়া রাজত্বের শেষদিকে হওয়ায় তা

উমাইয়া আমলে জিয্ইয়া কর মাথাপিছু কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে আদায় করা হতো না। খিলাফতের সকল জায়গায় একই নিয়মে রাজস্ব আদায় করা হতো না। উমাইয়া খিলাফতের শেষের দিকে আমরা লক্ষ করি যে, খলিফাগণ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে 'জিয্ইয়া' মাথা প্রতি ধার্য করার পরিবর্তে গ্রামভিত্তিক কোটা ধার্য করেন। সে গ্রামে যিম্মির সংখ্যা মৃত্যু, ধর্মান্তর বা স্থানান্তরের কারণে কমে গেলেও নির্ধারিত কোটা কমানো হতো না।[৫১] সে সময়ে অমুসলিমগণ জিয্ইয়া থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন রকম ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতো। কেউ কেউ যাজক বা সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করতো।

আব্বাসীয় শাসনামলে জিয্ইয়া

আব্বাসীয় খলিফাগণ ইসলামের বিধি-বিধান অনুসারে জিয্ইয়া কেবলমাত্র অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে আদায় করতেন। এ সময় অনারব মুসলমানগণ জিয্ইয়া কর থেকে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি পায়। আব্বাসীয়দের রাজক্ষমতায় আসার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মাওয়ালীগণ। উমাইয়া খলিফাগণ মাওয়ালী তথা নও মুসলিমদের প্রতি যদি ইসলামি শরিয়াত নির্ধারিত আচার-আচরণ করতেন, তাহলে আব্বাসীয় আন্দোলনের উৎপত্তি হলেও এ আন্দোলনের সাথে মাওয়ালীদের একাত্ম হওয়ার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যেত না অথবা পাওয়া গেলেও মাওয়ালীদের এত শক্তিশালী অবস্থান থাকতো না। আব্বাসীয়দের রাজক্ষমতায় আনার পেছনে যেহেতু মাওয়ালীদের অনেক অবদান, সেহেতু আব্বাসীয়রা রাজক্ষমতায় বসে অনারব মুসলমানদের উপর জিয্ইয়া নামক কর আরোপ করেন নি। পূর্ববর্তী খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের মতো আব্বাসীয় শাসনামলেও জিয্ইয়া অমুসলিমদের ধার্যকৃত সামরিক কর হিসেবে গণ্য ছিল। দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) অমুসলিমদের উপর যে হারে জিয্ইয়া ধার্য করেছিলেন, ঠিক একই নিয়মে আব্বাসীয় যুগে নির্দিষ্টহারে মাথাপিছু ধার্য করা হয়। ধনীদের উপর ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের উপর ২৪ দিরহাম এবং নিম্নবিত্তদের উপর ১২ দিরহাম হারে বার্ষিক জিয্ইয়া ধার্য করা হয়।[৫২]

জিয্ইয়ার পরিমাণ নির্ধারণে ঐতিহাসিক ও ইমামদের মতামত

জিয্ইয়া কর আদায়ের নির্ধারিত কোনো পরিমাণ নেই। আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী জিয্ইয়া আদায় করতে হবে। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা লক্ষ করি যে, ইসলাম যে জিয্ইয়া অমুসলিমদের উপর ধার্য করেছে তা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ও ইনসাফভিত্তিক। অধিকাংশ ইমামদের মতে, ইসলামি সরকার রাষ্ট্রের অমুসলিম জনগণের

উমাইয়া খিলাফতকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি। ৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে নাসর যখন খারিজি বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, তখন আব্বাসীয় আন্দোলনের উদ্যোক্তা আবু মুসলিম খোরাসানী খোরাসানের রাজধানী মার্ভ দখল করে তথায় আব্বাসীয় কালো পতাকা উড্ডীয়ন করেন। এ সময় তিনি দ্বিতীয় মারওয়ানের নিকট সহযোগিতা চেয়েও কোনো রূপ সাহায্য না পেয়ে বীর বিক্রমে আব্বাসীয় বাহিনীর সাথে জীবন বিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। মারওয়ানের সাহায্য সহযোগিতা না পেয়ে আব্বাসীয়দের হাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। বিস্তারিত দেখুন, M. A. Shaban, *The Abbasid Revolution*, Cambridge University Press, London, 1970, pp. 127-131; ডঃ মহম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান, শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৭

[৫১] মো: আবু তাহের, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং*, চলক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৪০

[৫২] T.W.Arnold, *The Preaching of Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1999, p. 55

সাথে আলোচনা করে জিয্ইয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করবে। পরিমাণ এমন হওয়া উচিত, যাতে সহজে পরিশোধ করা যায়। উমাইয়া শাসনামলের মতো জিয্ইয়া আরোপ করলে জিয্ইয়া আদায় করা সম্ভব নয়। এ কর আদায় করার ক্ষেত্রে কারো উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করা যাবে না। হানাফী ইমামগণের মতে, উচ্চবিত্তদের জন্য ৪৮ দিরহাম , মধ্যবিত্তদের জন্য ২৪ দিরহাম আর নিম্নবিত্তদের জন্য ১২ দিরহাম জিয্ইয়া আদায় করা হবে। ইমাম মালিকের মতে, ধনীদের থেকে বার্ষিক ৪০ দিরহাম আর গরিবদের জন্য বার্ষিক ১০ দিরহাম জিয্ইয়া আদায় করা হবে। শাফীইগণের মতে, মাথা পিছু ন্যূনতমপক্ষে ১ দীনার আদায় করা বাধ্যতামূলক।[৫৩]

পশ্চিমা ঐতিহাসিক এডম স্মিথ বলেন- "অমুসলিমরা মুসলমানদের প্রদত্ত নিরাপত্তা, সদাচারের বিনিময়ে জিয্ইয়া প্রদান করবে স্ব স্ব সামর্থ্যনুসারে। এ কর দেশ রক্ষার কর। এটা অস্ত্র বহনে সক্ষম ব্যক্তির উপরই কেবল প্রযোজ্য।"[৫৪]

খ. খারাজ

খারাজ শব্দটি গ্রিক মূল শব্দ Khoregia হতে সিরিয়াক ভাষার মাধ্যমে উদ্ভূত একটি শব্দ। উক্ত ভাষায় খারাজ এর অর্থ হলো শুল্ক বা কর। আরবগণ এটিকে স্থানীয় শব্দ 'খারাজ'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট করে। খারাজ আরবে প্রাচীনকাল হতে প্রচলিত একটি উপভাষা। যার অর্থ ভাড়া বা শষ্য উৎপাদন।[৫৫] মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশে বর্তমানে এ শব্দটির অর্থ 'কর' হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। আরবি ভাষায় অভিধান ও আইন সম্বন্ধীয় রচনাবলিতে ইসলামি ফিক্হবিদগণএর অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে ভূমিকর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং এর আভিধানিক অর্থ হলো 'ভূমিকর'।

সাধারণত ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের ভূমির উপর অধিকার এবং তার উৎপাদনে উপর আরোপিত করকে 'খারাজ' বলা হয়। আরো বিস্তারিতভাবে বলা যায়, মুসলমানগণ যুদ্ধের মাধ্যমে কিংবা সন্ধির ভিত্তিতে যে সকল অঞ্চল দখলে আসতো, ঐ সকল জমিজমা মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন না করে সে অঞ্চলের পূর্ব মালিকদের দখলে থাকতে দেওয়ার শর্তে বা অন্যত্র হতে আগত অমুসলিম বসবাসকারীদের মধ্যে বণ্টন করে তার উপর যা কিছু ধার্য করে, তাই খারাজ নামে অভিহিত।[৫৬]

---

[৫৩] আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল বাসরী আল-মাওয়ার্দী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৪; আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল কা'সানী, খ.৭, পৃ.১১২; ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ.৯, পৃ. ২৬৭-৬৮

[৫৪] Islami Tahzeeb, Vol. I, p. 96, quoted in Allama Yusuf Alqarzavi, Abu Masud Azhar Nadvi, *op.cit*, p. 130

[৫৫] Qudama B. Jafar, Vol. II, *op.cit*, p.26

[৫৬] Allama Yusuf Alqarzavi, Abu Masud Azhar Nadvi, *op.cit*, p. 8

বিভিন্ন যুগে খারাজ

রাজস্ব সংগ্রহের গুরত্বপূর্ণ উৎসসমূহের মাঝে খারাজের অবদান অনস্বীকার্য। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক তথা যিম্মির উপর সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মদ (স.) ভূমিকর হিসেবে খারাজ ধার্য করেনি। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে জমির মালিকানা রাজা-বাদশাহরাই ভোগ করেছেন। পারস্যে ভূমি রাজস্বকে 'খারাজ' (Kharag) এবং রোমান সাম্রাজ্যে ভূমি রাজস্বকে 'ট্রাইবিউটাম সোলি' (Tributum Soli) বলা হতো।[৫৭] নিম্নে বিভিন্ন যুগে খারাজি ভূমি ও খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হলো।

মহানবি (স.)-এর আমলে খারাজ

প্রাক-ইসলামি যুগে আরব দেশে কোনোরূপ সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর মদিনা রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনা রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করে সমগ্র আরব জাতিকে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেন। মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে ভূমিকর হিসেবে খারাজ ধার্য করেন। যদিও আরবরা প্রাক-ইসলামি যুগে 'খারাজ' হিসেবে কোনো কর দিতে অভ্যস্ত ছিল না। কেননা প্রাক-ইসলামি যুগে অনেক রাজবংশ আরবে অধিকার বিস্তার করে দীর্ঘদিন রাজত্ব করার সময় ভূ-সম্পত্তি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকায় সেগুলোর উৎপাদন থেকে নিজেদের পারিবারিক ও সরকারি প্রয়োজনাদি পূরণ করায় তাদের কোনো রূপ করারোপ করার প্রয়োজন হতো না। হযরত মুহাম্মদ (স.) সময় খায়বরের বিস্তৃত এলাকা বিজিত হওয়ায় তথাকার ইহুদিগণ এসে রাসূল (স.)-এর নিকট এসে বলে, আমরা কৃষিকাজে বেশ অভিজ্ঞ। সুতরাং শস্য উৎপাদনের ভার আমাদের উপর ছেড়ে দিন। হযরত মুহাম্মদ (স.) ইহুদিগণকে ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ায় খারাজ প্রদানের ফলে কৃষিভূমি চাষাবাদের অধিকার প্রদান করেন।[৫৮] অমুসলিম যিম্মি কৃষি প্রজার উপর যে কর ধার্য করা হয় তার পরিমাণ ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের ১/২ অংশ অর্থাৎ অর্ধাংশ।[৫৯] হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সময় খারাজ ভূমি ছিল অতি অল্প। খারাজী ভূমি মুসলিম প্রজার নিকট গেলেই তার খারাজ রহিত হয়ে যেত এবং তার উপর খারাজ ধার্য না হয়ে তার পরিবর্তে তার উপর 'উশর' ধার্য হতো। অমুসলিমের নিকট যে ভূমি খারাজি ভূমি তা মুসলমানদের নিকট হস্তান্তরিত হওয়া মাত্র উশরি ভূমিতে রূপান্তরিত হতো। আর উশরের পরিমাণ ছিল ১/১০ বা এক দশমাংশ।

---

[৫৭] Von Kremer, *op.cit*, p. 67

[৫৮] আবুল হাসান বুরহানউদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর আল-মুরগিয়ানী, *আল হিদায়া শরহু বিদায়াতিল মুবতাদি*, খণ্ড-৭, ইদারাতুল কোরআন ওয়াল উলুমাল ইসলামিয়্যাহ, পাকিস্তান, ১৪১৭ হি., পৃ. ৯৫

[৫৯] আহমাদ ইবন্ ইয়াহইয়া ইব্ন জাবির আল বাগদাদী আল-বালাযুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩; আবুল হাসান বুরহানউদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর আল-মুরগিয়ানী, খণ্ড-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে খারাজ

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আমলে যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে একই নীতি অনুসরণ করে খারাজ বা ভূমিকর নির্ধারণ করা হয়। তবে খারাজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছে করলে ভূমির আয়তন ও ফসলের প্রকৃতি বিচার করে বার্ষিক একটা পরিমাণ ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে নির্ধারণ করে দিতে পারেন অথবা খারাজ ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আরোপ করতে পারেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ভূমিনীতিকেই বহাল রাখেন। হযরত খালিদ-বিন-ওয়ালিদ বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে ইরাক জয় করলে ইরাকের ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করার দাবি উত্থাপিত হয়। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) ইরাকের বিরাট অঞ্চলকে সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন না করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেন। উক্ত ভূমির চাষাবাদের দায়িত্ব ইতোপূর্বে যারা ভোগ দখল করেছেন তাদের উপরই ন্যস্ত করেন। কিন্তু তথায় জমিনের উপর এককালীন কিছু টাকা আদায় ব্যতীত নির্দিষ্ট কোনো প্রকার কর ধার্য করা হয় নাই।[৬০] ইমাম আবু হানিফার মতে, যদি মুসলিম প্রশাসক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকৃত ভূমি বণ্টন করে দেন তাহলে তা উশর হিসেবে গণ্য হবে এবং তার পূর্ববর্তী মালিক দাসে পরিণত হবে। আর যদি তা না করা হয় তাহলে তা খারাজ ভূমি হিসেবে পূর্বতন মালিক ভোগ করবে।[৬১]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) শাসননীতি ও শাসনব্যবস্থায় আমূল সংস্কারের পাশাপাশি রাজস্বব্যবস্থায়ও নানাবিধ সংস্কার আনয়ন করেন। হযরত উমর (রা.)-এর সময়ে মিসর, ইরান, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল বিজিত হয়। বিজিত দেশসমূহের নিবর্তনমূলক কৃষিব্যবস্থার বিলোপ সাধনপূর্বক রাজস্বব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। আল্লামা শিবলী নোমানী বলেন,-

> The greatest reform, which was in fact a revolution, which Omar effected in revenue administration, and which resulted in sudden and phenomenal improvement in the prosperity and economic condition of the subject peoples, was the abolition of the oppressive agrarian system that had prevailed in the conquered countries before Islam.[62]

হযরত উমর (রা.) হিজরি ১৬শ সনে সমগ্র ইরাক চূড়ান্তভাবে জয় করে খারাজ ব্যবস্থার দিকে মনোযোগী হন। এ বিজিতি এলাকার বিশাল জায়গা-জমি কাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এ নিয়ে হযরত উমর (রা.)

---

৬০ Prof. Shibli Nu'mani, *Al-Farooq The Life of Omar the Great,* Tr. Maulana Zafar Ali Khan, International Islamic Publishers, New Delhi,1992, p. 242
৬১ Qudama B. Jafar, Vol. II, *op.cit,* p.26
৬২ Prof. Shibli Nu'mani, *op.cit,* p. 251

দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। এ ক্ষেত্রে সৈন্য বিভাগের অধিকাংশ সৈন্যেরই দাবি ছিল যে, সমস্ত বিজিত এলাকার জায়গা-জমিগুলো গণীমতের মাল হিসেবে তাদের মধ্যে বণ্টন করে যেন দেওয়া হয়। ইরাক বিজয়ী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.), মিসর বিজয়ী সেনাপতি আমর ইবনুল আস (রা.) এবং সিরিয়া বিজয়ী সেনাপতি আবু উবায়দা (রা.) এ সকল জায়গা-জমিগুলোকে গণীমতের মাল হিসেবে আখ্যায়িত করে বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করার আহ্বান জানিয়ে খলিফাকে পত্র দেন এবং সে সমস্ত এলাকার অমুসলমান অধিবাসীগণ সকলেই তাদের সেবা দাস হিসেবে গণ্য হবে। হযরত উমর (রা.) ইরাক বিজয়ের সাথে সাথে সেনাপতি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) কে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে ইরাকের আদম শুমারি করার নির্দেশ দেন। সেনাপতি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস আদম শুমারি করে খলিফার দরবারে জমা দেন। ইরাকের আদম শুমারিতে লক্ষ করা যায় যে, প্রতি একজন মুসলমান সৈন্যের বিপরীতে তিনজন করে অমুসলিম লোক ভাগে পড়ে। তখন তিনি সাহাবিদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ শুরু করেন। তখন অধিকাংশ সাহাবি তাকে পরামর্শ দেন যেন তিনি এ সকল ভূমি সৈনিকদের মাঝে বণ্টন না করেন এবং তিনি নিজেও স্থির সিদ্ধান্ত নেন যে, এ সকল ভূমি স্থানীয়দের মাঝে বণ্টন করে কৃষকদেরকে স্বাধীন করে দেওয়া উচিত।[৬৩] কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবি জায়গীরদারীর পক্ষে ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ও হযরত বেলাল (রা.) অন্যতম ছিলেন।[৬৪] এমতাবস্থায় হযরত উমর (রা.) উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য 'মজলিসে শূরা' আহ্বান করলেন। হযরত উমর (রা.) এ সকল ভূমি কেন স্থানীয় কৃষকদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে এ ব্যাপারে একটি দীর্ঘ মতামত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ সকল ভূমি স্থানীয় অমুসলিম অধিবাসীদের হাতে থাকলে তারা চাষাবাদ করবে এবং উক্ত ভূমি থেকে প্রদত্ত খাজনা থেকে বিজয়ীরা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মুসলমানগণই উপকৃত হবে। এ ঘোষণার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে এ ভূমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। তিনি আরও বলেন, এ সকল সম্পদ যদি বিজয়ীদের মাঝ বণ্টন করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে জায়গিরদারি বা সামন্তবাদের সৃষ্টি হবে এবং অমুসলিমরা তাদের সেবাদাসে পরিণত হবে যা কখনো কাম্য নয়। তাছাড়া আরব জাতিকে বিশুদ্ধ ধর্মীয় সামরিক জাতিতে পরিণত করার জন্য বিজিত অঞ্চলে আরবদের ভূমিবণ্টনের বিরোধী ছিলেন। এ সভায় হযরত আলী, হযরত উসমান ও হযরত তালহা প্রমুখ সাহাবিগণ হযরত উমরের মত সমর্থন করলেও কয়েকদিন বিতর্ক সমানভাবে চলতে থাকলো। এমতাবস্থায় হযরত উমর (রা.) কোরআন শরিফের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করলে সমস্যার সমাধান হয়। মহান আল্লাহর বাণী, "এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যাহারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হইতে উৎখাত

---

[৬৩] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩-২৪; Maulana Mohd. Taqi Amini, *The Agrarian System of Islam,* Tr. Syed Ahmad Ali, Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 1991, pp. 40-41

[৬৪] Prof. Shibli Nu'mani, *op.cit,* pp. 242-243; Maulana Mohd. Taqi Amini, *op.cit,* p. 40

হইয়াছে।"[৬৫] হযরত উমর (রা.) উক্ত আয়াতের প্রমাণসহ সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়ার পর 'মজলিসে শূরা' থেকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিজিত এলাকা সবসময় সাবেক মালিকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হবে। মজলিসে শুরার সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত উমর (রা.) বিজিত অঞ্চলের ভূমির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এ ভূমি বিজিত সৈন্যরা ভোগ দখল করতে পারবে না। বিজিত সৈন্যগণ এ সকল ভূ-সম্পদ ক্রয় করার অধিকার রাখেনা এবং এ সম্পদ কখনো তাদের মাঝে বিলি-বণ্টন করা যাবে না। এ সম্পদের মালিক হবে পূর্ববর্তী স্বত্বাধিকারীগণ এবং এ সকল ভূমির রাজস্ব পাবে রাষ্ট্র।[৬৬] এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মূলনীতি নির্ধারণের পর হযরত উমর (রা.) গণিমতের মাল উপস্থিত মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে সমস্ত বিজিত এলাকার চাষাবাদের ভূমি ও নদী চাষাবাদকারীদের মাঝে বণ্টনের বন্দোবস্ত করেন যাতে করে মুসলমানদের ভাতা প্রদানে কোনো সমস্যা না হয়। যদি সকল ভূমি বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলে পরবর্তীতে বণ্টন করার মতো কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।[৬৭] হযরত উমর (রা.)-এর এই সিদ্ধান্ত তাঁর শাসনকাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। হযরত উমর (রা.) সময় এক যিম্মি ইসলাম গ্রহণ করে খলিফার নিকট এসে বলল, আমি মুসলমান হয়েছি। আমার উপর থেকে খারাজ তুলে দেন। উমর (রা.) বলেন, তোমার ভূমি আনওয়াতন। তোমার তত্ত্বাবধানে ভূমি থাকলে তার উপর খারাজ দিতে হবে। শান্তিচুক্তিভুক্ত ভূমিতে কোনো পরিবর্তন আসবে না।[৬৮] পরবর্তী খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর সময় সেই আইনের বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে যায় এবং আরবরা বিজিত দেশে ভূমি ক্রয় করবার সুযোগ লাভ করে।

ভূমি জরিপ

হযরত উমর (রা.) ইরাক অঞ্চল জয় করার পর তাঁর ভূমি সম্পর্কিত নীতি সর্বপ্রথম ইরাকে কার্যকর করেন। ইরাকে সর্বপ্রথম ভূমিনীতি কার্যকর করার অন্যতম কারণ ছিল ইরাক আরবের নিকটবর্তী দেশ হওয়ার কারণে পূর্ব থেকেই ইরাকের সাথে আরবের যোগাযোগ ছিল এবং ইরাক সম্পর্কে যতটুকু ধারণা ছিল অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা তার চেয়ে কম ছিল। ইরাকের ভূমি রাজস্ব নীতি প্রথম পারস্য সম্রাট কুবাদ কর্তৃক প্রবর্তিত হয় এবং পরবর্তীতে নওশেরওয়াঁ এতে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। হযরত উমর (রা.) পারস্য সম্রাট কুবাদ এর ভূমি রাজস্ব নীতি বলবৎ রাখলেও বিস্তারিত তথ্যের জন্য রাসূল (স.)-এর বিশিষ্ট সাহাবা হযরত উসমান ইবনে হানিফকে জরিপ বিভাগের প্রধান ও হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামানকে জরিপ বিভাগের সহকারী হিসেবে নির্বাচিত করেন। তাঁরা দীর্ঘদিন ইরাকে বসবাস করার ফলে ইরাকের ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের ব্যাপক ধারণা

---

[৬৫] *আল কোরআন*, ৫৯:০৮
[৬৬] Danial C. Dennett, *op.cit,* p. 20
[৬৭] Yahya Ben Adam's, Vol. I, *op.cit,* p. 31
[৬৮] Yahya Ben Adam's, Vol. I, *op.cit,* p. 47

ছিল।[৬৯] তাছাড়া হযরত উসমান ইবনে হানিফ জমির জরিপ সংক্রান্ত কার্যাবলি ও খাজনা নির্ধারণে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি দীর্ঘ কয়েক মাস সময় ব্যয় করে ইরাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে জরিপ কার্য সম্পাদন করেন। উসমান ইবনে হানিফ ৯০,০০০ বর্গমাইল এলাকা অতি সূক্ষ্মভাবে জরিপ করেন অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ৩৭৫ মাইল, প্রস্থ ২৪০ মাইল। পাহাড়, জঙ্গল ও জলাভূমি বাদ দিয়ে তিন কোটি ষাট লক্ষ 'জরিব' (প্রতি জরিব প্রায় এক বিঘা) কৃষিযোগ্য জমি বের হয়। অবশ্য হযরত উমর (রা.) নিজ হাতে জরিপের জন্য মাপযন্ত্র নির্ধারিত করে দেন।[৭০] এর মাঝে প্রাক্তন রাজপরিবারের বিভিন্ন জায়গির তথা রাজভূমি (Crownlands), বেদাবী ভূমি তথা উত্তরাধিকারীহীন ভূমি, অগ্নি মন্দিরে ওয়াক্‌ফকৃত ভূমি, পলাতকদের ভূমি, সশস্ত্র বাধাদানকারীদের ভূমি, বিদ্রোহীদের নিকট হতে বাজেয়াপ্তকৃত ভূমি, পথ নির্মাণ ও ডাক বিভাগে অর্পিত ভূমি, গোচারণ ভূমি, সর্বপ্রকার জলজ ও বনজ ভূমি সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন না করে সরাসরি সরকারের দখলে 'আল-ফাই'[৭১] হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ বিরাট সম্পত্তির বার্ষিক আয় দাঁড়ায় মোট ৭,০০০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা। তবে আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর গ্রন্থে সত্তর হাজার স্বর্ণমুদ্রার স্থলে সত্তর হাজার টাকার বর্ণনা দেন।[৭২] খলিফা হযরত উমর (রা.) এ সকল সম্পত্তির আয় জনহিতকর কার্যের জন্য নির্দিষ্ট করে পৃথক তহবিলে রাখেন। তাছাড়া খিলাফতের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে তিনি খারাজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য 'দিওয়ানুল খারাজ' নামে একটি পৃথক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন।

খারাজের হার

খারাজের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে হযরত উমর (রা.) কৃষিযোগ্য ভূমির উপর খারাজ নির্ধারণ করেছেন। তিনি করনীতি বাস্তবায়নের জন্য ইরাকের ভূমি জরিপ করে উহার উপযুক্ততা অনুসারে খারাজ ধার্য করেছিলেন। জমির উর্বরতার তারতম্য অনুযায়ী খারাজের তারতম্য হতো। ফসলের অনুপযোগী অনাবাদি জমি এবং ঘড়-বাড়ি খারাজের আওতা হতে বাদ দেওয়া হয়েছিল।[৭৩] ফসলের উপযোগী ভূমিতে ইচ্ছা করে ফসল ফলানো না হলে খারাজ আদায় বাধ্যতামূলক। খারাজ প্রদানের ক্ষেত্রে ছোট-বড়, নারী-পুরুষে কোনো বৈষম্য

---

[৬৯] Maulana Mohd. Taqi Amini, *op.cit,*p. 46; Prof. Shibli Nu'mani, *op.cit,* p. 244; Sayed Afzal Peerzade, *On Islamic Taxation,* Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 2009, p. 90

[৭০] Prof. Shibli Nu'mani, Vol. II, *op.cit,* p. 245

[৭১] বিজিত দেশের সরকারি জমি, দাবিদারহীন জমি, বিদ্রোহীদের নিকট হতে বাজেয়াপ্ত জমি, অনাবাদি ও অরণ্যভূমি সরাসরি রাষ্ট্রের দখলে নেওয়া হতো। ঐ সকল ভূমিকে 'আল-ফাই' বা রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তি বলা হতো। আল-ফাই বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির প্রকৃতিতে কোনো প্রকার পরিবর্তন হতো না। এ প্রকার জমি হতে রাষ্ট্রের যথেষ্ট আয় হতো। ভূমির প্রকৃত মালিক তাঁর জমি চাষাবাদের জন্য বর্গাদারকে দিলে ভূমির মালিক যে রকম আয় পেতেন ঠিক তেমনি রাষ্ট্র হুবহু সে রকম আয় উক্ত ভূমি থেকে পেতেন। উহার যাবতীয় আয় বায়তুল মালে জমা দেওয়া হতো। উক্ত জমি মুসলিম বা অমুসলিম যার নিকট থাকুক না কেন তার আয় সবসময় সমান ছিল। কেননা উক্ত আয়ে কখনও কোনো পরিবর্তন হতো না। আল-ফে জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য ব্যয় হতো। বিস্তারিত দেখুন, Philip K. Hitti, *op.cit,* p. 172;শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, ইসলাম রাষ্ট্র ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৫২-৫৩

[৭২] Prof. Shibli Nu'mani, *op.cit,* p. 245

[৭৩] আবু 'উবায়দ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮ ; Sayed Afzal Peerzade, *op.cit,* p. 147

নেই। যার নিকট খারাজের ভূমি থাকবে তাকেই খারাজ প্রদান করতে হবে।[৭৪] খারাজি ভূমির খারাজ ফসলের রকমারি হিসাবে নির্ধারিত হয়। নিম্নমানের ভূমির উপর নামমাত্র খারাজ নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে সারণির মাধ্যমে বার্ষিক খারাজের পরিমাণ দেখানো হলো ঃ

ফসলের নাম	**পরিমাণ নির্ধারণ (জরিব)**	**টাকার পরিমাণ(দেরহাম)**
যব	প্রতি ‘জরিব’	বার্ষিক এক দেরহাম
গম	প্রতি ‘জরিব’	বার্ষিক দুই দেরহাম
শাক-সবজী	প্রতি ‘জরিব’	বার্ষিক তিন দেরহাম
তুলা	প্রতি ‘জরিব’	বার্ষিক পাঁচ দেরহাম
ইক্ষু	প্রতি ‘জরিব’	বার্ষিক ছয় দেরহাম
তিল/তিষি	প্রতি ‘জরিব’	বার্ষিক আট দেরহাম
আঙ্গুর	প্রতি ‘জরিব’	বার্ষিক দশ দেরহাম
খেজুরের বাগান	প্রতি ‘জরিব’	বার্ষিক দশ দেরহাম

সূত্র-[৭৫]

উপরোল্লিখিত সারণিটি হলো খারাজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি। তবে খারাজ নির্ধারিত হতো জমির গুণাগুণ, উর্বরতার তারতম্য, পানিসেচ, শ্রমিকের মূল্য ও অন্যান্য ব্যয়, শহর বা বাজার থেকে ভূমির দূরত্বের উপর নির্ভর করে।[৭৬] তবে অপেক্ষাকৃত উর্বর ভূমিতে গম প্রতি ‘জরিব’ ভূমিতে চার দেরহাম এবং যব প্রতি ‘জরিব’ ভূমিতে দুই দিরহাম পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল।[৭৭] ইরাকে ভূমি জরিপের প্রথম বছর রাজস্বের পরিমাণ ছিল আট কোটি ষাট লক্ষ দেরহাম। কিন্তু পরবর্তী বৎসরগুলিতে ভূমি রাজস্ব বেড়ে দাঁড়ায় বার কোটি আটষট্টি লক্ষ দেরহাম।

প্রাচীন মিসরে ফেরআউনিগণ[৭৮] ভূমি জরিপ করে যে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করেন তা তৎপরবর্তী শাসনকালে ‘টলেমিজ’ নরপতিগণও বহাল রাখেন। ধার্যকৃত কর নগদ অর্থ বা উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে দেওয়া যেতো।

---

[৭৪] শামসুদ্দীন আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খণ্ড-১০, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৯-৮৩

[৭৫] আবু ‘উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সালাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮-৬৯; Muhammad Taqi Amini, *op.cit,* p. 229

[৭৬] Sayed Afzal Peerzade, *op.cit,* p. 94

[৭৭] Prof. Shibli Nu’mani, *op.cit,* p. 245

[৭৮] প্রাচীন যুগে মিসররাজ, বিশেষত আমালিকার বাদশাহদিগের উপাধি হলো ফেরাউন। বিস্তৃত পরিসরে বনি ইসরাইলিদের যুগের রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ধর্মযাজক এবং অভিজাত ও সম্মানিত পরিবারের কর্তা ব্যক্তিদের উপাধি ছিল ফেরাউন। ফেরাউন কারো নাম নয়। ফেরআউন শব্দটি অনারবি। মাজদু’দ-দীন তাঁর আল-কামুস গ্রন্থের শিরোনামে লিখেছেন যে, প্রত্যেক বিদ্রোহী ও অবাধ্য ব্যক্তিকেও ফেরআউন বলা হয়। পবিত্র কোরআন শরিফে ফেরাউনের কীর্তিকলাপের সবিস্তার আলোচনা রয়েছে। উক্ত আলোচনায় যে বিষয়টি ফুটে উঠে তা হলো, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতায় তারা সীমা লঙ্ঘন করেছিল। বনি ইসরাইলরা পরবর্তীতে রাজক্ষমতা হারালে তখন ঐ অঞ্চলে যারা রাজক্ষমতায় বসে রাজ্যপরিচালনা করতেন তাদেরকে ফেরাউন বলে ডাকা হতো। ফেরাউন উপাধি পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। সে সময়ে যারা শাসনক্ষমতায় বসতেন তারা সকলেই পুরুষ ছিলেন। তারপরেও মহিলাদের ক্ষেত্রে এ উপাধি ব্যবহার করতে দেখা যায়। কারণ তারা নিজেদেরকে সূর্যের বংশধর বলে দাবি করতেন। তারা নিজেদেরকে দেবতার বংশধর বলে দাবি করতো বলে দেশের সমস্ত সম্পদ শাসনকর্তার অধীনে থাকতো এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো কিছু ব্যবহার করার ক্ষমতা কারো ছিল না। নিজেদেরকে দেবতা বা দেবতার বংশধর ভাবতো বলেই তারা নিজ বংশে বিবাহ করতো। ফলে বিবাহ ভাই-বোনদের মাঝে সম্পন্ন হতো। তাদের বৈচিত্র্যময় পোশাক ছিল। তাদের পছন্দনীয় পোশাকের মাঝে অন্যতম ছিল সাদা এবং লাল রংয়ের মুকুট। তাদের ধর্মমতে, মৃত্যু পরবর্তীকালে জীবনের অস্তিত্ব ছিল। এ জন্য তারা তাদের দেহে যেন পচন না ধরে সে জন্য তারা দেহকে মমি বানিয়ে রাখত। পরজীবনের প্রয়োজনে মৃতদেহের সাথে প্রচুর পরিমাণে দৈনন্দিন জীবনের ভোগ-বাসনার সমস্ত সরঞ্জাম দেওয়া হতো। তাদের দেহ ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র পিরামিড

কোন ধরনের ফসলের দ্বারা কর পরিশোধ করা হবে তা নিয়ে কোনো ঐকমত্য নেই। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে আটা, বার্লি, খেজুর, ভুট্টা, মিহি বার্লি, জলপাইসহ একই ধরনের শস্যের মাধ্যমে খারাজ আদায় করা যাবে।[৭৯] রোমানদের শাসনকালে রোমীয় সম্রাটগণও প্রায়ই পূববর্তী নিয়মই বহাল রাখেন কিন্তু তাদের আমলে মিশরের উৎপন্ন ফসলের একটি বিরাট অংশ রাজধানী কুসতুনতুনিয়ায় প্রেরণ করা হতো। আরবগণ কর্তৃক মিসর বিজিত হওয়ার প্রথমদিকে কিছুদিন উক্ত প্রথা চালু থাকে। খলিফা উমর (রা.) মিসরে ভূমি জরিপ করে পূববর্তী শাসনকর্তাদের শাসনামলে যে অতিরিক্ত কর আদায় করা হতো তা রহিত করেন। তাছাড়া মিশরে ফসল উৎপাদন নির্ভর করতো নীলনদের জোয়ার-ভাটার উপর। আবহাওয়াজনিত কারণে মিশরে কখনো প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদিত হতো আবার কখনো জলাভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো। ফলে কয়েক বৎসরের উৎপন্ন দ্রব্যের হিসাবের একটি গড় বের করে সেই অনুপাতে কর ধার্য করা ইসলামি শরিয়ত পরিপন্থি না হওয়ায় হযরত উমর (রা.) প্রতি বৎসরের ফসল দেখে তাদের উপর খারাজ ধার্যকরণ নীতি গ্রহণ করেন। ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল এক দিনার (প্রতি জারিবে)। এই হারে প্রতি বৎসর মিসরে গড়ে আদায় হতো ১২,৩০০,০০০ দীনার।[৮০]

প্রাচীনকালে জনৈক গ্রিক নরপতি স্বীয় অধিকৃত রাজ্যের সর্বত্র ভূমি জরিপ করে ভূমির শ্রেনিবিন্যাস অনুযায়ী কর ধার্য করেন। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উক্ত আইন গ্রিক ভাষা হতে সিরীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে সিরিয়ায় প্রবর্তিত হয়েছিল। রোমানরা সেখানে সামন্তপ্রথার সৃষ্টি করলে সেখান হতে কৃষি প্রজার রায়তি স্বত্ব লোপ পায়। খলিফা উমর (রা.) সেখানে সামন্ত প্রথা রহিত করে ভূমিতে কৃষকদের মালিকানা প্রদান করেন। তিনি সেখানকার ভাষাও পরিবর্তন করেন নাই এবং পূর্ববর্তী রাজস্ব ব্যবস্থা বহাল রাখেন। হযরত উমরের যুগে সিরিয়া হতে বার্ষিক রাজস্ব আদায় হতো এক কোটি চল্লিশ লক্ষ দিনার বা পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ টাকা। ইরাক, মিসর ও সিরিয়া ব্যতীত অন্যান্য বিজিত এলাকা যেমন- মূল পারস্য, কেরমান, আরমেনিয়া প্রভৃতি প্রদেশে খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর রাজস্বনীতি সম্পর্কে আমরা কোনো তথ্য পাই না।[৮১] তবে এ সকল অঞ্চলে তিনি যে জরিপ কার্য পরিচালনা করতে পারেননি এটা নিশ্চিত। এ সকল প্রদেশে তিনি সাবেক নিয়ম বহাল রাখেন। শাসনের সুবিধার জন্য তিনি কোনো প্রদেশে ভাষারও পরিবর্তন করেন নাই। তবে বিজিত অঞ্চলে জরিপ কার্য পরিচালনা করতে না পারলেও তিনি সকল পতিত জমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। পতিত ও অনাবাদি ভূমি সম্পর্কে তিনি বলেন, যে যতটুকু পতিত ও অনাবাদি ভূমি চাষ করবে সে ভূমির মালিক সেই

বানিয়ে তার নিচে সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত করা হতো। মূলত ফেরাউন কারো নাম নয়, ফেরাউন হলো তৎকালীন শাসকদের উপাধি। বিস্তারিত দেখুন, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১০০৪, পৃ. ১১৭-১২২

[৭৯] Qudama B. Jafar, Vol. II, *op.cit,* p. 39

[৮০] আহমাদ ইবন্ ইয়াহইয়া ইব্‌ন জাবির আল বাগদাদী আল-বালাযুরী,পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

[৮১] Prof. Shibli Nu’mani, *op.cit,* p. 250

হবে। তবে জমি দখল করার তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত ভূমি আবাদ করতে না পারলে তার স্বত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে প্রচুর অনাবাদি ভূমি আবাদি ভূমিতে রূপান্তরিত হয়।

খলিফা হযরত উমর (রা.) ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী সংস্কার সাধন করেছিলেন পরবর্তী খলিফা হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এ ক্ষেত্রে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন করেননি।[৮২] অবশ্য হযরত আলী (রা.)-এর শাসনামলে ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে ভূমির শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী তিনি খারাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিলেন।[৮৩]

উমাইয়া শাসনামলে খারাজ

উমাইয়া শাসনামলে খিলাফতের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় খারাজ বা ভূমি রাজস্ব রাষ্ট্রের তৃতীয় আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। খোলাফায়ে রাশেদিনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) তাঁর সমগ্র খিলাফতি সাম্রাজ্যে একই ধরনের ইসলামি আইনানুসারে প্রযোজ্য এক সুমহান এবং ন্যায়সঙ্গত রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করে জনগণের সামগ্রিক মঙ্গল সাধন করেন। ঐতিহাসিক মুর বলেন-

> A people dividing amongst them the whole revenues, spoil, and conquests of the State, on the basis of an equal brotherhood, is a spectacle propably without parallel in the world.[84]

তাঁর রাজস্বব্যবস্থা পুর্ণগঠনের ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্বের সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উমাইয়া খলিফাগণ হযরত উমরের কর ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারে নাই। উমাইয়া খলিফারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অধিক মাত্রায় উমাইয়াদের হাতে চলে যায়। তাঁরা দান ও উপহার সামগ্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তির একটি বিরাট অংশ দখল করে। রাষ্ট্রীয় এ সম্পত্তি হতে রাষ্ট্র নিয়মানুসারে খারাজ পেত কিন্তু বেসরকারি মালিকানায় উমাইয়াদের হাতে উক্ত ভূমি চলে যাওয়ায় এ সকল সম্পত্তি উশরি সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ফলে উমাইয়াদের প্রথম খলিফা মুয়াবিয়া (রা.) থেকে উশরি ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং খারাজি ভূমির পরিমাণ কম হওয়ায় খারাজে ঘাটতি পড়ে। খারাজ রাজস্বে ঘাটতি পড়লেও অন্যান্য রাজস্বসহ খলিফা মুয়াবিয়া প্রদেশ ভিত্তিক যে রাজস্ব উঠত তা উক্ত প্রদেশের কার্যে ব্যয় করতেন। তাঁর সময় কিছু প্রদেশ পুরোপুরি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করলেও সকল প্রদেশকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি নির্দিষ্ট অংশ দামাস্কাসের কোষাগারে প্রেরণ করতে হতো।[৮৫] উমাইয়ারা ধনদৌলতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিজিত অঞ্চলের

---

[৮২] Danial C. Dennett, *op.cit*, p. 33
[৮৩] Sayed Afzal Peerzade, Vol. II, *op.cit*, p. 93
[৮৪] William Muir, *The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall*, Khayats, Beirut,1963, p. 160
[৮৫] Danial C. Dennett, *op.cit*, p. 31

ভূমি মালিকানা গ্রহণ করে। মুসলমানদিগকে যেহেতু জিয্ইয়া ও খারাজ দিতে হতো না সেহেতু অমুসলিমগণ উক্ত প্রকারের কর হতে রেয়াত পাবার জন্য দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে এসে সরকারি ভাতা গ্রহণ করতো। এতে রাষ্ট্রের আয় হুমকির মুখে পড়ে। ভূমি রাজস্ব প্রশাসনে এ রকম অরাজকতা খলিফা আবদুল মালিকের শাসনকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। উমাইয়া খলিফাগণ এ অরাজকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গ্রামভিত্তিক খারাজ ধার্য ও আদায়ের নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু একটি পর্যায়ে লক্ষ করা যায় যে, উমাইয়াদের গ্রামভিত্তিক খারাজ ধার্যকরণ নীতির কারণে গ্রাম শূন্য হয়ে পড়ে। ফলে ভূমি রাজস্বব্যবস্থায় গ্রামভিত্তিক কোটা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

রাজস্বের উক্ত সমস্যা দূরীকরণার্থে খলিফা আবদুল মালিক খারাজ রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেন। রাজস্বব্যবস্থায় সংস্কার আনয়ন করা ছাড়া এ সমস্যা থেকে উত্তরণের কোনো উপায় ছিল না। তিনি রাজস্বব্যবস্থায় সংস্কার আনয়ন ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি ও ইরাকের ভাইসরয় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উপর রাজস্ব সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হাজ্জাজ অত্যন্ত কঠোরতার সাথে মাওয়ালীদেরকে ভাতার তালিকা হতে বাদ দিয়ে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য করেন এবং খারাজি ভূমি চাষাবাদ করে খারাজ প্রদানে বাধ্য করেন। ভূমির শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ পর্যন্ত খারাজ ধার্য করা হতো। তাঁর এ সংস্কারের ফলে সাময়িকভাবে রাজস্ব ঘাটতি পূরণ হলেও মাওয়ালীগণ উমাইয়াদের পতন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় উমর (র.) খোলাফায়ে রাশেদিনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর নীতিতে প্রত্যাবর্তন করায় মাওয়ালীদের উপর থেকে খারাজ ও জিয্ইয়া রহিত হয়ে যায় এবং ভাতার তালিকায় তাদের অন্তর্ভুক্তি হয়। এ সময় নও মুসলিমদের সংখ্যা আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে রাজকোষ শূন্য হয়। খলিফা রাজস্বব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল কৃষি প্রজার উপর ভূমি রাজস্ব ধার্য করেন। এতে রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতি হয়।[৮৬] তাঁর মৃত্যুর পর উমাইয়া শাসকগণ পুনরায় হাজ্জাজের নীতিতে ফিরে গেলে মাওয়ালী সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং উমাইয়া আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের শাসনকালে (৭৪৪-৭৫০ খ্রি.) খোরাসানের গভর্নর নাসর বিন সাইয়ার ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংস্কার আনয়ন করে মুসলিম-অমুসলিম, আরব-অনারব সকল জোতদারের উপর ভূমি রাজস্ব ধার্য করেন।[৮৭] কিন্তু অন্তিম মুহূর্তের সংস্কার উমাইয়াদিগকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নাই।

---

[৮৬] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩১
[৮৭] J. Wellhausen, *The Arab Kingdom and its Fall*, Khayats, Beirut, 1927, pp. 282-283

আব্বাসীয় শাসনামলে খারাজ

উমাইয়া শাসনামলে আরব-অনারবদের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার, রাষ্ট্রের প্রতি অবহেলা, অমুসলিমদের প্রতি দুর্ব্যবহার প্রভৃতি কারণে আব্বাসীয় আন্দোলন দানা বাধে। শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের শাসনকালে (৭৪৪-৭৫০ খ্রি.) খোরাসানের গভর্নর নাসর বিন সাইয়ার ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেও উমাইয়াদের পতন ঠেকাতে পারেননি। আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসার পর ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে উমাইয়াদের দুর্নীতি রহিত করে রাজস্ব ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। উমাইয়া খলিফাদের শাসনামলে খারাজি ভূমি মুসলমানদের অধীনে আসলে তা উশরি জমিতে রূপান্তরিত হতো। কিন্তু আব্বাসীয় যুগে খারাজি জমি উশরি জমিতে রূপান্তর বন্ধ করা হয়। এ যুগে জমির শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এ যুগে খারাজি ভূমি যাদের দখলেই থাকত তাদেরকে খারাজ প্রদান করতে হতো। খারাজ রাজস্বে আব্বাসীয়রা সাসানীয় ও বিজান্তীয় পদ্ধতি অনুকরণ করেন যা ইতোপূর্বে খোলাফায়ে রাশেদিন ও উমাইয়া শাসনামলে প্রচলিত ছিল।[৮৮] সাসানীয় শাসনামলের ন্যায় আব্বাসীয়রা শাসনামলেও তিন প্রকারের খারাজ পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। তিন প্রকারের খারাজ আদায়ের পন্থাগুলো হলো- ক. মুকাসিমা পদ্ধতি। একে ভাগাভাগি পদ্ধতি বলে। ইহা উৎপন্ন ফসলের উপর নির্ভরশীল ছিল। খ. ওয়াযীফা পদ্ধতি। একে জরিপ পদ্ধতি বলে। জমির আয়তনের উপর ভিত্তি করে প্রদেয় এ কর নির্ধারিত হতো। গ. মুকাতিয়া পদ্ধতি। একে নির্দিষ্ট অংকের টাকা ধার্যকরণ পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে প্রদেয় কর এক কিস্তিতে পরিশোধিত এবং নগদ অথবা পণ্য অথবা উভয় মাধ্যমে পরিশোধ করতে হতো।[৮৯] খারাজ রাজস্বের প্রাথমিক কাল হতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত একই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। উমাইয়া শাসনামলে মুকাসিমা পদ্ধতিতে খারাজ নির্ধারিত হতো ফসলের অর্ধেক। কিন্তু আব্বাসীয়রা শাসনক্ষমতায় আসার পর মুকাসিমা পদ্ধতিতে ফসলের অর্ধেক হতে ১/৫ অংশ খারাজ ধার্য করেন। মুকাসিমা পদ্ধতি খারাজ আদায় করা অত্যন্ত সহজতর। এ পদ্ধতিতে খারাজ ফসলের মাধ্যমে আদায় করা হতো বলে রাজস্ব কর্মচারীদের হাতে কৃষকদের প্রতারিত এবং হয়রানি হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর এবং খলিফা আল মাহদী এ পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসরণ করেন।[৯০] আব্বসীয় খলিফারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষিকাজই রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম। সেজন্য তারা চাষাবাদের দিকে গুরুত্বারোপ করেন। তাছাড়া আব্বাসীয় অঞ্চল ছিল মূলত কৃষিপ্রধান অঞ্চল। তাদের রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধির জন্য তারা চাষাবাদের দিকে গুরুত্ব দেন। চাষাবাদের দিকে গুরুত্বারোপ করার কারণে তাদের রাষ্ট্রীয় আয় বেড়ে যায়। সে সময়ে রাষ্ট্রীয় আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ খারাজ হতে আদায় হতো। আব্বাসীয়রা খারাজ রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সৌর বৎসর হতে হিসাব গণনা করতেন। তারা মূলত শস্য কাটার পর খারাজ পরিশোধ

---

[৮৮] মো: আবু তাহের, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৫
[৮৯] ইসলামী বিশ্বকোষ, নবম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪১-৬৪৩
[৯০] Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, Kitab Bhawan, New Delhi, 1977, p. 427

করতেন। খারাজ দিনার ও দিরহামের মাধ্যমে পরিশোধ করা হতো। কর নির্ধারণ করবার উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো কম বা বেশি মাত্রায় আইনবেত্তাগণের দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছিল। খারাজুল মুকাসিমার ক্ষেত্রে ফসল উঠা মাত্রই শস্য থেকে খারাজ প্রদান করতে হতো কিন্তু খারাজুল ওয়াজিফা ও খারাজুল মুকাতিয়ার ক্ষেত্রে বছরব্যাপী জমিতে ফসল উৎপাদিত হলেও খারাজ বছরে মাত্র একবার পরিশোধ করতে হয়। তবে জমির মালিকের জমি চাষ করার সামর্থ থাকার পরও যদি সে জমি চাষ না করে তাহলে তাকে খারাজ বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করতে হয়। এ ক্ষেত্রে জমি কর্ষিত হোক বা না হোক খারাজ জমির উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য অনুসারে আদায় করতে হয়। খারাজি ভূমি দখলদারিত্বের ভিত্তিতে খারাজ আদায় করতে হতো। পুরুষ, মহিলা, বালক, বালিকা, পঙ্গু যাই হোক না কেন যার অধীনে খারাজি ভূমি থাকবে তাকেই খারাজ পরিশোধ করতে হতো।[৯১]

খারাজ আদায়ে সতর্কতা

খারাজ ব্যক্তিগতভাবে দেয় কর। খারাজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমির সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা, গুণাগুণ, খারাজি ভূমির শ্রেণিবিভাগ, সেচের সুবিধা, হাট-বাজার ও শহর-বন্দরের নৈকট্য ও দূরত্ব তাতে বিবেচ্য হয়। প্রত্যেক ভূমির সম্ভাব্য উৎপাদনের প্রতি লক্ষ রেখে খারাজ নির্ধারিত হয়। কার্যত কর্ষিত জমির উপর খারাজ ধার্য হতো না। চাষযোগ্য ও ফসল দিতে সক্ষম জমির উপর খারাজ ধার্য হতো। খারাজ ধার্য ও উসুলের ব্যাপারে সর্বদা অমুসলমানদের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে যেন কোনো অবস্থাতেই তাদের উপর কোনো প্রকার কষ্ট না হয়। খারাজ আদায়ের ব্যাপারে হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং তাদের প্রতি কোমল ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন। করদাতাদের উপর যেন কোনো প্রকার অত্যাচার না হয়, সেজন্য প্রত্যেক বছর খারাজ মদিনায় আসার পর কুফা ও বসরা হতে নির্ভরযোগ্য ১০ জন ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে আসতেন। খারাজ আদায় করতে কোনো মুসলমান বা যিম্মির উপর কোনো অত্যাচার-অবিচার করা হয়েছে কিনা এ সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য তাদেরকে শরিয়ত অনুযায়ী চারবার শপথ করিয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন।[৯২] হযরত উমর (রা.) ইরাকের ভূমি জরিপের জন্য হযরত উসমান বিন হানিফ ও হযরত হুযাইফা বিন ইয়মনকে তাদের বিশেষ দক্ষতার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাদের জরিপ কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি ইরাকের ভূমি বণ্টন ও খারাজের হার নির্ধারণ করে দেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে হযরত উমর (রা.) এ দুজনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তারা জমির উৎপাদন শক্তির তারতম্য অনুসারে খারাজ নির্ধারণ করেছেন কিনা? উত্তরে হযরত উসমান বিন হানিফ বলেন, 'যা নির্ধারণ করা হয়েছে যদি তার দ্বিগুণও আরোপ করা হতো, তাহলেও তারা দিতে সক্ষম ছিল।'

---

[৯১] মো: আবু তাহের, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৬-২৩৩
[৯২] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

হযরত হুযাইফা বিন ইয়মন বলেন, 'যা আরোপ করা হয়েছে তার অধিক গুণ রাখা হয়েছে।'[৯৩] রাজস্ব আদায়কারীগণ রাজস্ব আদায়ের জন্য জনগণকে অহেতুক অপমান, হয়রানি, অত্যাচার ও নির্যাতন করতেন। তারা রাজস্ব আদায়ের জন্য গ্রামে গেলে তাদের খাওয়া-দাওয়া, অবস্থান খরচ, প্রদানে বাধ্য করতেন। কখনো তাদের গরু, গাধা, ধন-সম্পদ নিলামে চড়ানো হতো যদি তারা খারাজ আদায়ে অপারগ হতো। হযরত আলী (রা.) উক্‌বারায় নিযুক্ত খারাজ আদায়কারী কর্মচারীকে পাঠানোর সময় নির্দেশ দিলেন,"দেখ, খারাজের জন্য তাদের গরু-মহিষ, ধন-সম্পদ নিলামে চড়াবে না ও শীত গ্রীষ্মের পোশাক বাজেয়াপ্ত করবে না এবং তাদের প্রতি কোমল ব্যবহার করবে! কোমল ব্যবহার করবে! কোমল ব্যবহার করবে! আমার কথার ব্যতিক্রম হলে তোমাকে অপসারিত করা হবে।"[৯৪] উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ তাঁর কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ভূমির তারতম্য অনুসারে জমির খারাজ ধার্য করিবে। সকল জমির উপর একই প্রকার খারাজ ধার্য করবে না। তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করবে। তাদের নিকট থেকে কোনো প্রকার অতিরিক্ত কর আদায় করবে না।[৯৫] তবে খারাজের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে খলিফাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। একমাত্র খলিফারই অধিকার ছিল খারাজের পরিমাণ কম বা বৃদ্ধি করার।[৯৬]

জিয্ইয়া ও খারাজ

ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের উপর দু'ধরনের করারোপ করা হতো। একটি হলো জিয্ইয়া আর অন্যটি হলো খারাজ। জিয্ইয়া হলো বার্ষিক মাথাপিছু কর আর খারাজ হলো ভূমিকর। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মূলত জিয্ইয়া ও খারাজের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো না বরং এরা একে অন্যের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার হতো। জিয্ইয়া বলতে সাধারণভাবে কর বুঝানো হতো আর খারাজ বলতে ভূমি রাজস্ব ও জিয্ইয়া বুঝানো হতো। আব্বাসীয় শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত জিয্ইয়া ও খারাজের মাঝে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো না। উমাইয়া শাসনামলে যিম্মির বেলায় খারাজকে বলা হতো "আল-খারাজ আলা রইস আহল আল-যিম্মাহ" বা যিম্মিদের প্রতি মাথাপিছু খারাজ নির্ধারিত হতো।[৯৭] উমাইয়া যুগে উশ্‌র ও খারাজ রাজস্বের ক্ষেত্রে আরব মুসলমান, অনারব মুসলমান ও অমুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হওয়ায় ফলে শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের শাসনকালে (৭৪৪-৭৫০ খ্রি.) খোরাসানের বিখ্যাত উমাইয়া গভর্নর নসর-বিন-সাইয়ার ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। তিনি মুসলিম, অমুসলিম, আরব-অনারব সকল জোতদারদের উপর ভূমি রাজস্ব সমানভাবে ধার্য করেন আর জিয্ইয়া কেবল

---

[৯৩] আবু 'উবায়দ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম, *পূর্বোক্ত*,পৃ. ৪০-৪১

[৯৪] আবু 'উবায়দ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪

[৯৫] আবু 'উবায়দ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭

[৯৬] Danial C. Dennett, *op.cit*, p. 35

[৯৭] R. Levy, *A Baghdad Chronicle*, Cambridge, 1929, p. 311; W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, Oxford University Press, London, 1956, pp. 115-116, 128

অমুসলিম প্রজার ক্ষেত্রে আরোপ করেন।[৯৮] আব্বাসীয়রা শাসনক্ষমতায় আসার পর উশরি জমি ও খারাজি জমির শ্রেণিভাগ স্পষ্ট ও স্থায়িভাবে করার ফলে উমাইয়া শাসনামলে আরব মুসলমান, অনারব মুসলমান ও অমুসলিমদের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল সে বৈষম্য দূরীভূত হয়।

গ. উশূর (বাণিজ্যকর)

উশূর শব্দটি বহুবচন, একবচন হলো উশর। এর আভিধানিক অর্থ হলো এক দশমাংশ। উশূর হলো বাণিজ্য কর। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সময় বিদেশি বণিকদের নিকট হতে কোনো প্রকার বাণিজ্য শুল্ক আদায় করার রীতি ছিল না। কিন্তু মুসলমান ব্যবসায়ী ও যিম্মিগণকে প্রতিবেশী দেশসমূহে বাণিজ্য করতে গিয়ে এক দশমাংস বাণিজ্য শুল্ক আদায় করতে হতো। ইসলামি অর্থনীতি স্বাধীন ও অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষপাতী। এক দেশের অতিরিক্ত পণ্য অন্য দেশে রপ্তানি করা ইসলাম বিরুদ্ধ নয় বরং ইসলাম এ ক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) অনুকরণে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়ে কোনো আমদানি শুল্ক আদায় করা হতো না। বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের ব্যাপারে হযরত আবু মুসা আশআরী খোলাফায়ে রাশেদিনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৯৯] হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমা বৃদ্ধি পায় এবং ইরাক, সিরিয়া, মিসরসহ অন্যান্য অঞ্চলগুলো মুসলমানদের অধিকারে আসলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়া মাম্বাজ বিজিত হওয়ার পূর্বে তথাকার খ্রিস্টানগণ লিখিতভাবে আবেদন করে যেন তাদেরকে ইসলামি রাষ্ট্রে বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া হয়। তখন হযরত উমর (রা.) তাদের চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন এবং তাদেরকে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন।[১০০] হযরত উমর (রা.) হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তুমি তাদের নিকট থেকে ঠিক তাই আদায় করবে, যা তারা আমাদের ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে।"[১০১] মুসলমান, যিম্মি ও বিদেশি বণিকদের মালের উপর উশূর ধার্য করা হয়। যাকাতের নিসাবের মতোই উশূরের নিসাব ছিল। ফলে ২০০ দিরহাম কম মূল্যের সম্পদের উপর উশূর ধার্য হতো না। ইহা ছিল প্রকৃত পক্ষে মুসলমান বণিকদের উপর যাকাত, আর অমুসলমান ও বিদেশি বণিকদের জন্য বাণিজ্য শুল্ক। মুসলিম-অমুসলিম ও বিদেশি বণিক সকলের উপর বৎসরে তাদের বাণিজ্য পণ্যের উপর একবার উশূর প্রদান করা বাধ্যতামূলক। বৎসরে একবার বাণিজ্য শুল্ক দিয়ে সারা বছর অবাধ বাণিজ্য করতে পারতো। তিনি বিদেশি বণিকদের জন্য ১০%, যিম্মি বণিকদের উপর ৫% এবং মুসলিম বণিকদের উপর ২.৫% উশূর ধার্য

---

[৯৮] J. Wellhausen, *op.cit,* pp. 281-88

[৯৯] Prof. Shibli Nu'mani, *op.cit,* p. 256; S. M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration,* Kitab Bhavan, New Delhi, 1984, p. 35

[১০০] Prof. Shibli Nu'mani, *op.cit,* p. 256

[১০১] আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্‌ন মাস'উদ আল কা'সানী, খ-২, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৩০, পৃ. ১০৮

করেন।[১০২] শুল্ক আদায়ের ক্ষেত্রে যেন কোনো প্রকার হয়রানি না করা হয় সেজন্য তিনি শুল্ক আদায়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্রের আইন-কানুনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন

ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল অমুসলিম নাগরিকদের অন্যতম দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে নিজেদের জীবন পরিচালনা করা। খিলাফত রাষ্ট্রের আইন পরিচালিত হয় ইসলামি শরিয়াহ্ মোতাবেক। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে চাইলে এ আইন মেনেই রাষ্ট্রেই বসবাস করতে হবে। তবে মুসলমানদের উপর আবশ্যকীয় পালনীয় ইবাদত অমুসলিমদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন- মুসলমানদের নামাজ, রোযা, যাকাত, জিহাদ এসকল ইবাদতগুলো অমুসলিমদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে তারা তাদের ধর্মের বৈধ বিষয়গুলো তাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে পালন করবে। ইসলামি আইন অনুযায়ী যা নিষিদ্ধ কিন্তু যদি তা তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বৈধ হয় তাহলে তা করতে তাদেরকে কোনো প্রকার বাধা দেওয়া যাবে না। ইসলাম অমুসলিমদেরকে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী বিয়ে, তালাক, পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা, শূকরের মাংস ভক্ষণ , মদ্য পান কিংবা এ ধরনের অন্যান্য কার্যাবলিতে নিজস্ব আইন প্রয়োগ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।[১০৩] যেমন- সাক্ষী ব্যতীরেকে বিয়ে, ইদ্দত চলাকালে দ্বিতীয় বিয়ে, মুহরিম মহিলাদের সাথে বিয়ে অথবা মোহর ব্যতীরেকে বিয়ে যদি তাদের ধর্মে বৈধ হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে এসব কাজ করতে বাধা দেওয়া যাবে না যদিও তা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। অমুসলিমদের পারিবারিক কর্মকাণ্ড তাদের ‘পারিবারিক আইন তথা ব্যক্তিগত আইন’ অনুসারে নিষ্পত্তি হবে। তবে কখনো যদি তারা ইসলামি শরিয়ি আদালতে বিচার প্রার্থনা করে তাহলে তাদের ইসলামি আইন অনুসারে বিচারকার্য সম্পন্ন হবে। ফৌজদারি ও দেউয়ানি আইনে মুসলিম-অমুসলিমের অধিকার সমান। তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। যিম্মিরা নিজেদের মাঝে যিনায় লিপ্ত হলে তাদেরকে তাদের আইন অনুসারে বিচার করতে হবে। মদ পান যেহেতু তাদের ধর্মে বৈধ সেহেতু তারা ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করেও মদপানের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে।[১০৪] চুরি, হত্যা, ছিনতাই, রাহাজানি, ব্যভিচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম সকলের শাস্তি সমান। মদ ও শূকরের ব্যবসা ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যবসাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ইসলামি অনুশাসন মেনে চলতে হবে।

---

[১০২] S. M. Imamuddin, *op.cit*, p. 35; M. A. Shaban, *op.cit*, p. 19; Philip K Hitti, *op.cit*, p. 132
[১০৩] সাইয়্যেদ সাবেক, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড-৩, পৃ. ৩২
[১০৪] শামসুদ্দীন আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খণ্ড-৯, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৮

মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-আচরণ, নিদর্শন ও মুল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা

ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যেহেতু সার্বক্ষণিক মুসলমানদের সাথে চলাফেরা করতে হয় সেজন্য তাদেরকে কোনোভাবেই রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না। প্রতিটি নাগরিক যে রাষ্ট্রে বসবাস করে তার উচিত সে রাষ্ট্রের সুনাগরিক হয়ে বসবাস করা। ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আল্লাহ, রাসূল ও কোরআনের প্রতি অবমাননাকর কোনো কটূক্তিপূর্ণ মন্তব্য করা যাবে না। ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রের পরিপন্থি যা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এরকম কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যাবে না। সুদি ব্যবসা মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য নিষিদ্ধ হলেও মদ ও শূকরের ব্যবসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বৈধ। অমুসলিমরা নিজেদের জনপদে শূকর লালন-পালন, কেনাবেচা, খাওয়া এবং মদ বানানো, পান করা ও কেনাবেচা করতে পারবে। তবে কোনো মুসলমানের কাছে তা বিক্রয় করতে পারবে না।[১০৫] পবিত্র রমযান মাসের রোযা রাখা মুসলমানদের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্যসমূহের মাঝে অন্যতম কর্তব্য। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আসবে যদি অমুসলিমরা দিনের বেলায় মুসলিমদের সামনে প্রকাশ্য পানাহার করে। সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উচিত মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আসে এমন বিষয় থেকে বিরত থাকা। তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতেও আঘাত করা যাবে না। কেননা তাদের সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা যাবে না।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকরা ইসলামি আদর্শ ও মূলনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস না রাখলেও ইসলামি রাষ্ট্র তাদের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ও মর্যাদা দিতে বাধ্য। ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক শুধু অধিকারই ভোগ করে না তাকে রাষ্ট্রে বসবাস করলে কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোনো নাগরিক তার প্রতি অবিচার করলে ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করে তার প্রতিকার পেতে পারেন বলেই তাকে সবসময় সুনাগরিক হয়ে চলার পাশাপাশি রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না। ইসলামি রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকদের যে দায়ভার গ্রহণ করে ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তার বিনিময়ে তারা জিয্ইয়া, খারাজ ও উশূর নামক কর প্রদান করে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করে। বিশ্বের সকল সংবিধানে সংখ্যালঘুদের অধিকারের নিশ্চয়তা সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকা সত্ত্বেও নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুরা কালে কালে ও যুগে যুগে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। শুধুমাত্র ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে তারা পূর্ণাঙ্গ

---

[১০৫] Allama Yusuf Alqarzavi, Abu Masud Azhar Nadvi, *op.cit,* p. 139

স্বাধীনতা ভোগ করে। ইসলামি রাষ্ট্রে সকল মানুষ একই রকম সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কারণে সকলে নিজ নিজ যোগ্যতা, দক্ষতা ও শক্তি অনুযায়ী আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করে। খিলাফত শাসনামলে রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করে রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

ইসলাম নিছক কোনো ধর্ম নয়, এটি আল্লাহ্‌র দেওয়া একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এ জীবনবিধান মানব জীবনের শুধু নীতিমালাই পেশ করেনি বরং সকল দিক ও বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ সমাধান দিয়েছে। এর আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি বিশ্বের অন্যান্য ধর্মীয় দর্শন থেকে একে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ইসলামের প্রবর্তক সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরতের মাধ্যমে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় আগমনের মাধ্যমে ইসলামের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পথচলা শুরু হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) এ নগরে পদার্পণ করার পর এর নাম হলো 'মদিনাতু-ন্নবি' বা নবির শহর অথবা সংক্ষেপে মদিনা যা ইতোপূর্বে ইয়াসরিব নামে পরিচিত ছিল। মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আগমনের পূর্বে এ নগরে কোনো সর্বজন স্বীকৃত শাসন-ব্যবস্থা চালু ছিল না। তিনি এ নগরে পৌঁছে মদিনাকে একটি নগর রাষ্ট্রে পরিণত করে অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দেন। এ নগরীর মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করে এক বৈঠকে বসেন এবং সকলের সম্মতিক্রমে ৬২৪ সালে এক সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন। এ সন্ধিপত্র ইতিহাসে 'মদিনার সনদ' নামে পরিচিত এবং এটি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান। মহানবি (স.) প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি ছিল সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধের মিশেলে একটি চেতনার সমন্বয়। এ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো রচিত হয় ইসলামি সমাজের প্রকৃতি, কর্মসূচি, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে। ইসলামি শরিয়া মোতাবেক পরিচালিত রাসূল (স.)-এর শাসনব্যবস্থা তাঁর ওফাতের পর পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারীদের কর্তৃক গৃহীত, অনুসৃত ও পরিচালিত হয় যা খিলাফত হিসেবে বিবেচিত। ইসলামি চিন্তাবিদগণ খিলাফতকে ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করেন যা মহানবি (স.) এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ওফাতের পর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ইসলামে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটে আর হযরত আবু বকর (রা.) অন্যান্য সাহাবিদের আনুগত্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁর রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে খিলাফত নামক প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। ইসলামি চিন্তাবিদগণ এর স্বরূপ ও ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এটি মূলত ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান খলিফা হিসেবে বিবেচিত। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে এর যাত্রা শুরু হলেও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ খলিফা সুলতান আবদুল মজিদের রাজত্বকাল ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খিলাফত ব্যবস্থা বজায় ছিল। নব্য

তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা কামাল আতাতুর্ক ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে আইন জারি করে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে খিলাফত ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটালে এর আনুষ্ঠানিক মৃত্যু ঘটে।

হযরত মুহাম্মদ (স.) কোনো উত্তরাধিকারী রেখে না যাওয়ায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্তরাধিকারী নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সাহাবিগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবু বকর (রা.) কে খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) এর হাত ধরে ইসলামে খিলাফত ব্যবস্থার যাত্রা শুরু। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক বিবর্তন নিয়ে গবেষণা ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। খিলাফত ও এর বিবর্তন নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা এবং এর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চরিত্র চিত্রায়নের চেষ্টা খিলাফত প্রতিষ্ঠান যাত্রার শুরু থেকে অদ্যাবধি চলছে। সুন্নি, শিয়া ও খারেজি সম্প্রদায় খিলাফতের ব্যাখ্যা এবং খিলাফত সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী হওয়ায় পশ্চিমা বিশ্ব এর চরিত্র চিত্রায়নে আরো অধিক সুযোগ পেয়েছে। যুগের পরিবর্তনে খিলাফতকে গোত্রীয় ও রাষ্ট্রীয়করণ করায় খিলাফতের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য লোপ পায়। অতি সম্প্রতি ইরাক ও সিরিয়ার বিস্তৃত ভূ-খণ্ড নিয়ে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত খিলাফত ও কার্যক্রমের সাথে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়কার খিলাফত ব্যবস্থার কোনো মিল না থাকলেও এতদসত্ত্বেও একদল উৎসাহী লোক বা মিডিয়া ইরাক ও সিরিয়ার খিলাফত কার্যক্রমের সাথে ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থার সামঞ্জস্যতা দেখানোর চেষ্টা করে যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মূলত ইসলাম রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে কাঠামো প্রবর্তন করেছে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ইন্তেকালের পর তা খিলাফত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। আর এ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি হলেন খলিফা। ইসলামি রাষ্ট্রের আইনগত ও বৈধ প্রতিনিধি খলিফা একাধারে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্‌র ঐশ্বরিক প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রীয় প্রধান হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে কোনো খলিফার বংশ-গোত্র কিংবা পরিবারভিত্তিক অধিকার প্রাধান্যের কোনো অবকাশ ছিল না। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে সাহাবারা খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই রকম পদ্ধতি অবলম্বন না করলেও প্রথম চার খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, তৎকালীন সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে খলিফা নির্বাচন করা হতো। পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে সে সময় খলিফা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও মদিনা রাষ্ট্রের প্রায় সকল জনগণ খলিফার অধীনে বায়’আত বা শপথ গ্রহণ করে খলিফার কর্তৃত্ব মেনে নিতো। সে সময় খলিফা ও সাম্রাজ্যের কোনো সাধারণ নাগরিকের মাঝে পার্থক্য ছিল না। আইনের দৃষ্টিতে সবাইকে সমান মনে করা হতো। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে পবিত্র কোরআন, হাদিস এবং ইজমার ভিত্তিতে মদিনা রাষ্ট্র পরিচালিত হতো বিধায় এ রাষ্ট্রে রাসূল (স.) এর শাসনামলের আদর্শ পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষণীয়।

মদিনায় সাহাবিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খিলাফত পরবর্তীতে অনেক পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। পরবর্তীকালে খিলাফত প্রতিষ্ঠানটি তার প্রকৃত অবস্থান বা কাঠামো ধরে রাখতে পারেনি। শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে এটা পরিলক্ষিত হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনব্যবস্থা থেকে পরবর্তী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উমাইয়া শাসনামলে ইসলামি গণতন্ত্র ও শরিয়তের বিধির পরিবর্তে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজ্যলাভ নির্বাচনকে নির্মূল করে। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগের ন্যায় মজলিস-উস-শূরা ব্যবস্থা চালু না থাকলেও উমাইয়া খলিফারা নিজ দল ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে সভাসদ নির্বাচিত করতেন। এ সময় বায়তুল মাল খলিফার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং সেখান হতে খলিফা নিজ ইচ্ছানুযায়ী খরচ করতেন। এ সময়ে ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করা হয় বলে খলিফাগণ কেবল পার্থিব নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন, যদিও উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় উমর খেলাফতকে খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনতান্ত্রিক পদ্বতিতে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। খলিফাগণ সে সময় আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করে কেবল আরব জাতিকে রাষ্ট্রীয় সকল কাজে নিয়োগ প্রদান করে বিশুদ্ধ আরবীয় শাসনব্যবস্থা চালু করেন। উমাইয়াদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো তারা রাষ্ট্রকে জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে সুসংহত করেন। এ সময় তারা রাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠিত গোলযোগ বা বিভাজন কঠোর হস্তে দমন করে উমাইয়া শাসনকে শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করেন।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয়গণ বাগদাদে তাদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করে উমাইয়াদের ন্যায় উত্তরাধিকারী ভিত্তিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিছু পার্থক্য ছাড়া খলিফা মনোনয়নের ক্ষেত্রে আব্বাসীয়গণ মূলত উমাইয়াদের নীতি অনুসরণ করেন। আব্বাসীয় শাসনামলের শেষদিকে দুর্বল আব্বাসীয় খলিফাগণ খলিফা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি অবলম্বন না করায় তাদের মাঝে খিলাফত প্রশ্নে অনৈক্য লক্ষ করা যায়। আব্বাসীয়গণ খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ায় মাওয়ালীগণ সরকারে প্রাধান্য বিস্তার করে, ফলে আরবদের সুযোগ-সুবিধা ও প্রাধান্য খর্ব হয়ে পড়ে। আব্বাসীয় শাসনামলে খিলাফত ধর্মরাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো খলিফাগণ মনে করতেন যে, তাঁরাই ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দিকে সর্বাধিক উন্নতি লাভ করলেও উমাইয়া খলিফাগণ যেভাবে রাষ্ট্রকে সুসংহত করেছিলেন আব্বাসীয়রা খিলাফতের এ ধারাকে ধরে রাখতে পারেন নি। ফলে এ সময় ইসলামি সাম্রাজ্য স্বাধীন, অর্ধ-স্বাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি দুর্বল আব্বাসীয় খলিফাদের কারণে রাজনৈতিক বিভাজন সংকটাপন্ন হয়ে পড়লে বিভিন্ন অঞ্চলের সেনাপতিরা নিজেদের শাসিত অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে শুরু করে। তবে এ কথা সত্য যে, একটানা ৫০৮ বছরের রাজত্বকালের কারণে আব্বাসীয় খিলাফত মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজবংশের মর্যাদা লাভ করে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে মানুষের সকল অধিকার ও সামগ্রিক কল্যাণকে সমভাবে গুরুত্বারোপ করে বিবেক, বিশ্বাস, চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ও উন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে। বিশ্বমানবতা, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। এখানে কোনো বর্ণ, বংশ, গোত্র, জাতি, অঞ্চল, দেশ ও ভাষার প্রাধান্য নেই। ইসলাম সার্বজনীনভাবে সংকীর্ণ মানসিকতা ও প্রভেদ থেকে মুক্ত। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানুষের কল্যাণ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকারসহ সকল ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদাহরণ। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বর্ণহীন সমাজ বিনির্মাণে ইসলামের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান বিশ্বে এখনো মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানামুখী আন্দোলন চোখে পড়ে। অধিকার প্রতিষ্ঠার এ সকল আন্দোলনে বহু চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক অধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং অধিকার রক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এমন একটি জীবনবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থা রেখে যান যেখানে মানবাধিকারের যতগুলো দিক ও রূপ রয়েছে, তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছিল। এ সকল অধিকারগুলো কখনও এবং কোনোভাবেই মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত নয়। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে মানবাধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা বিদ্যমান। বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত মানবাধিকারের ধারণা ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। মানবাধিকার সার্বজনীন বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার পরও মানবসভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে মানবাধিকারের ধারণাও সমান্তরালভাবে পরিবর্তন ঘটছে। ইসলাম মানবাধিকার সম্পর্কিত বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে এর উৎকর্ষতাদানে ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামে মানবাধিকার কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বরং মানবাধিকারের ধারণা ও অধিকারগুলো মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স.) প্রদত্ত, যা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় হিসেবে সকল মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত। ব্যক্তি স্বাধীনতা, জীবন ও জীবিকার অধিকার, নাগরিকদের মাঝে কোনো পার্থক্য না থাকা, সম্পত্তির অধিকার, মান-ইয্যত রক্ষার অধিকার, শ্রম ও শ্রমিকের অধিকার, চিকিৎসা, বাসস্থান, সমতা, ন্যায়বিচার ও শিক্ষা-জ্ঞানার্জনে অধিকার, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার এবং প্রতিবেশীর অধিকারসহ সকল মৌলিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত হওয়ায় এগুলো শাশ্বত সত্য। এ সকল অধিকারগুলো আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে আইনগতভাবে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিধান অনুসারে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। অথচ বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার বিষয়ক ধারণা ও অধিকারগুলো রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীভেদে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত ও প্রয়োগ হতে দেখা যায়। জাতিসংঘ মৌলিক মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র তৈরি করলেও তা বিভিন্ন দেশ তাদের ইচ্ছামতো এর প্রয়োগ করছে। রাষ্ট্র শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বিভিন্ন রাজনৈতিক সুবিধা আদায় ও বিরোধীদের দমনের ক্ষেত্রে এসব নির্দেশনা তেমন কাজে আসে না। আজ থেকে প্রায় ৭২ বছর পূর্বে জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকার সনদ প্রণীত হলেও এ সকল

ঘোষণাপত্র যে কোনো সময়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র ও সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হতে পারে অথচ ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারসমূহ কখনও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে না। আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনবিধান ইসলাম মানুষের মুক্তির বাণী নিয়ে বিশ্বসমাজকে বিকশিত করতে সহায়তা করেছে। ইসলামে সার্বজনীন মানবাধিকার নীতি, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও মূল্যবোধ এবং আদর্শিক ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসী মানবাধিকারের সুফল ভোগ করতে পারে।

খিলাফত যুগে রাষ্ট্রের নাগরিকদের দু'শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা: মুসলিম নাগরিক ও অমুসলিম নাগরিক। এক সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং এক আদমের উত্তরসূরী হিসেবে মানুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলাম ধর্মমতে সকল মানুষ এক সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং প্রথম মানব আদমের উত্তরসূরী হিসেবে সবাই সমান এবং মানুষের মাঝে শ্রেণি বিভাজনের কোনো সুযোগ নেই। আশরাফ-আতরাফ, সাদা-কালো, ভাষা ও বর্ণের ভিত্তিতে ইসলাম মানুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করে না। ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির ফলে অমুসলিম জনগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। এ অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে খিলাফত যুগে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা, আহলুয যিম্মাহ, মু'আহাদ, মুস্তা'মান ও হারবি। আহলুয যিম্মাহ ও মু'আহাদ হলো ইসলামি রাষ্ট্রের চুক্তিবদ্ধ নাগরিক। সন্ধিপত্রের শর্তানুযায়ী তাদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করতে হবে। মুসলিমগণ কখনো তাদের সাথে যে সকল চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন, তা কখনো ভঙ্গ করতে পারবে না। চুক্তিবদ্ধ নাগরিকদের সকল নিরাপত্তা দিবেন রাষ্ট্র তথা মুসলিমগণ। মুস্তামান রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা কোনো মুসলিমের অনুমতি নিয়ে সাময়িকভাবে বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে সাময়িক সময়ের জন্য মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করবে। অনুমতি ব্যতীত মুস্তামান ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবে না। অনুমতি সাপেক্ষে বসবাসকারী নাগরিক যতদিন পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা আহলুয যিম্মাহ বা যিম্মি নাগরিকরা যে সকল সুযোগ-সুবিধা পায়, সে সকল সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করবে। মুস্তামান এক বছরের বেশি সময় ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবে না। দারুল হারবের কোনো নাগরিক অনুমতি ব্যতীত ইসলামি রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে তাকে মুসলিম রাষ্ট্রের গুপ্তচর হিসেবে ধরে নেবে। রাষ্ট্রপ্রধান তার বিরুদ্ধে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। তবে উপরিউক্ত চার শ্রেণির অমুসলিম ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব পেলে তাদের মর্যাদা মুসলিমদের মতো। মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে সমস্ত অধিকার তাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এ অধিকার শুধুমাত্র স্থানীয় অধিবাসীদের জন্যই নয়, বরং যারা সাময়িকভাবে আশ্রয় লাভ করেন তাদের জন্যও প্রযোজ্য। এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা, আশ্রয় ও দেখাশোনার অধিকার। রাষ্ট্র কখনও মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারবে না। তাদের জীবন, সম্পদ, ইয্যত ও আব্রু মুসলিম নাগরিকদের জীবন, সম্পদ, ইয্যত ও আব্রুর মতোই মূল্যবান ও পবিত্র। অমুসলিম নাগরিকরা ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস না করে যদি শত্রু রাষ্ট্রে গিয়ে বসবাস করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি

করলে তারা ইসলামি রাষ্ট্রের স্থায়ী শত্রুতে পরিণত হবে এবং তাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যাবে। এককথায় ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকত্বলাভ ও নাগরিকত্ব বাতিলের সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি আছে। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে যেমনি নাগরিকত্ব লাভ করা যায় ঠিক তেমনি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ না করলে নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়। বস্তুত ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম সমাজ তারা স্থায়ী নাগরিক হোক বা আশ্রিত হোক কিংবা দারুল হারবের চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক হোক, তাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা, তাদের নাগরিক ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার খর্ব হওয়ার মতো নজির তেমন নেই। তাদের অধিকার রক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের যে সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে, তাতে অমুসলিমরা মুসলমানদেরকে সম্মান জানানোসহ তাদের যথাযথ নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করেছে। যদিও খোলাফায়ে রাশেদিনগণ অন্যান্য বিজিত বাহিনীর মতো বিজিত অঞ্চলের লোকদের প্রতি কূটকৌশল অবলম্বন, তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ, অত্যাচার ও অবিচার করতে পারতেন। অথবা ইসলামকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে ইসলাম গ্রহণের জন্য জোর জবরদস্তি করতে পারতেন। কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগের খলিফাগণ অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির গুণে এ পথ এড়িয়ে চলেছেন। কারণ কোনো মতাদর্শ অথবা পদ্ধতি মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আর ইসলাম জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ধর্ম নয় এবং কোনো অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ করা ইসলামে বৈধ নয়। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে কখনো খলিফাগণ তার অধীনের লোকদেরকে চাপ প্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করেন নি। খলিফা হযরত উমর (রা.) এর বিশ্বস্ত খ্রিস্টান গোলাম ওসাক রুমীকে খলিফা কখনো তার নিজস্ব ধর্মমত পরিবর্তনের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন নি এবং তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি। ইসলামের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে ভিন্ন কথা। এ সময় লক্ষ করা যায় যে, খলিফাগণ যখন আরবের বাইরে অভিযান পরিচালনা করে দেশ জয় করেছেন, তখন তারা সেখানকার লোকদের প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী ও দয়াদ্র ছিলেন। এ সময় মানবসভ্যতার ধারায় যে পরিবর্তন আনে তা সকল মানুষের সমান অধিকারকে নিশ্চিত করে তোলে। মুসলমানদের বিজয়কে অমুসলিমরা সে সময় মনে-প্রাণে গ্রহণ করতো এবং মুসলিম শাসনের প্রতি তারা সর্বদা খুশি ছিল। অমুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে মুসলিমরা ব্যর্থ হবে মনে করলে তাদের থেকে আদায়কৃত জিযইয়া ফেরত দিত যা কখনো মুসলিম শাসন ব্যতীত অন্য কোনো শাসনামলে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মুসলিমদের শাসনে অমুসলিমরা এতই খুশি ছিলো যে, অনেক অমুসলিম মুসলমানদের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুসলিম সেনাবাহিনীকে অগ্রযাত্রায় নানাভাবে সাহায্য করে বিজয় রক্ষায় এগিয়ে নিয়ে গেছে। অনেক সময় নিজেদের অর্থ খরচ করে রাস্তা ও সেতু

নির্মাণ করে মুসলিম সেনাদলকে সহযোগিতা করেছে। সে সময় তাদেরকে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি বরং তাদের বিশ্বাস, সামাজিক অনুষ্ঠান, জান-মাল রক্ষা, রাজনৈতিক অধিকার, আইন ও বিচারসহ সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। অমুসলিমরা তাদের প্রচলিত আইনেই ধর্ম-কর্ম ও বিচারকার্য চালাত, রাষ্ট্র থেকে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হতো না। অমুসলিমদের প্রতি রাষ্ট্র ও সরকারের এই কর্তব্যপরায়ণতা ও দায়িত্ববোধ তাদের মধ্যে নিরঙ্কুশ আনুগত্য তৈরি করে দেয়। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ এবং তাদের প্রতি করণীয় তৎকালীন ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা ভালোভাবে গ্রহণ করার ফলেই রাষ্ট্রের সীমানার ভেতর বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছিল।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপান্তর প্রত্যক্ষ করি। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক জীবন খলিফা হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে শুরু হয়। রাজনৈতিক জীবনে তিনি অত্যন্ত সফল ব্যক্তি ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের শেষ খলিফা হযরত আলী (রা.) এর শাহাদত বরণের পর কৌশলে ইমাম হাসানকে খিলাফত হতে অপসারিত করে মুয়াবিয়া সমগ্র মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া ইসলামের খিলাফত লাভের সাথে সাথেই খিলাফত রাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব হওয়ায় খিলাফতের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর বিবর্তনের পাশাপাশি এর আদর্শিক পরিবর্তন ঘটে। ইসলামে সাদা-কালো, ধনী-গরিব, আমির-প্রজার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ধর্ম-বর্ণ ও মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলে একই আদমের বংশধর হিসেবে ইসলামে কোনো শ্রেণি বৈষম্য নেই। অথচ এ সময় হতে সমাজে অমুসলিমদের পাশাপাশি মুসলিমদের মাঝেও শ্রেণিকরণ দেখা দেয়। চরম জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের দ্বারা নও মুসলিম ও অনারব মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় যা খিলাফত তথা ধর্মীয় চেতনার পরিপন্থি।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে অমুসলিমদের প্রতি কখনো কখনো ধর্মীয় বৈষম্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। তবে কেনো সে সময় ধর্মীয় বৈষম্যমূলক আচরণ কখনো কখনো লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তা বিশ্লেষনের দাবি রাখে। উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ এবং আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশিদ ও মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে অমুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক আইন জারি করায় অনেক অমুসলিম নিজেদের জীবন, ধন-সম্পদ এবং ইয্যত-আব্রু রক্ষা করার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তারা কখনো কখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। তবে এসব ঘটনার পেছনে বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচ্য। এ সকল খলিফাগণ নিজেদের ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রকাশের জন্য অমুসলিমদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন এবং বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের প্রচেষ্টা চালায়। তবে কতিপয় শাসকের শাসনামলে অমুসলিমদের অধিকারের ক্ষেত্র সীমিত করা

হলেও তা সবসময় বহাল থাকে নি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, কারো অতি উৎসাহী পদক্ষেপ বা গোড়া ধর্মবেত্তাদের প্রভাবে অনেক সময় কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও সার্বিক দিক বিবেচনায় তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। খলিফা হারুন-অর-রশিদ বাইজান্টাইনদের সাথে যখন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন জ্যাকবী প্রজাদেরকে বাইজান্টাইনদের সমর্থক হিসেবে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। তবে এ বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যুদ্ধকালীন বাস্তবতায় তাদের সাথে এরূপ আচরণ করা হয়েছিল। তবে তাদের সাথে সে সময় যে আচরণ করা হয়েছিল তা ছিল রাজনৈতিক ব্যবস্থামাত্র, ধর্মীয় বৈষম্যমূলক আচরণ নয়। তাছাড়া নাগরিক অধিকার হরণের ঘটনাবলির বেশিরভাগ ঘটেছে মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে। এসব ঘটনার প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন, বিজিত সেনাদের অতি উৎসাহী সদস্য বা স্থানীয় গভর্নর ব্যক্তিগতভাবে এর জন্য দায়ী। এর মাধ্যমে পুরো সাম্রাজ্যকে বিচার করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তবে খলিফা ওয়ালিদ, হারুন ও মুতাওয়াক্কিলের নীতি উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে সার্বজনীন হয়নি বলেই অমুসলিমরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে অমুসলিমরা ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা করতে পারত।

উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া ও আবদুল মালিক এবং আব্বাসীয় খলিফা মাহদী ও আল-মামুনের শাসনামলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের বিবেকের ও মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। তাদের শাসনামলে ধর্মীয় বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হতো। এ সকল ধর্মীয় বিতর্ক সভায় ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হতো। সকল খলিফার শাসনামলে ধর্মীয় বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত না হলেও কোনো সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য বা পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায় না।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে অমুসলিমরা সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে আসীন হওয়াটা অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। বিভিন্ন দফতরের সর্বোচ্চ পদটি যোগ্যতার কারণে তাদের দখলে ছিল। আব্বাসীয় শাসনামলে উজিরের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদেও তারা আসীন হয়েছিল। অমুসলিমদের ব্যক্তিগত বিচার তাদের ধর্মীয় আইনানুসারে করা হতো। তাদের ধর্মীয় বিষয়াবলিতে অন্য কারো মতামত গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় তাদেরকে ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। বল প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামি আইন-কানুন কোনো অমুসলিম সম্প্রদায়ের উপর চাপানো হয় নি। এ সময় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের অধিকার সমান ছিল।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সময়কাল হতে অমুসলিম নাগরিকদের রাষ্ট্রে বসবাসের বিনিময়ে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা , ইয্যত-আব্রু ও ধন-সম্পত্তির অধিকার বজায় রাখার জন্য জিয্ইয়া, খারাজ ও উশূরের মতো বিশেষ কর পরিশোধ করতে হতো। জিয্ইয়া নামক অমুসলিম প্রজার উপর ধার্যকৃত সামরিক করের মাধ্যমে

অমুসলিম প্রজাগণ মুসলিম রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ লাভ করতো। রাষ্ট্র এ করের বিনিময়ে তাদের সকল ধরনের ধন-সম্পদ, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করতো। তবে কোনো অমুসলিম যদি সামরিক বাহিনীকে সহযোগিতা করতো বা সামরিক বাহিনীতে চাকুরি করতো তাদেরকে জিয্ইয়া দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতো। জিয্ইয়া করের পরিমাণ রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী নির্ধারণ করতেন। জিয্ইয়া করের নির্ধারিত কোনো পরিমাণ না থাকলেও কর নির্ধারণের সময় অমুসলিমদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হতো। আর অমুসলিমদের ভূমির ক্ষেত্রে খারাজ কর ধার্য ছিল। ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে ভূমিকর হিসেবে খারাজ ধার্য করা হয়। ভূমির সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা, গুণাগুণ, সেচের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে চাষযোগ্য ও ফসল দিতে সক্ষম জমির উপর খারাজ ধার্য হতো। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের আদলে জিয্ইয়া ও খারাজ ধার্য করা হলেও রাসূল (স.), খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে এর পদ্ধতিগত সংস্করণ চোখে পড়ে। খিলাফত শাসনামলের রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে অন্য সাধারণ রাষ্ট্র তুলনা করা সমীচীন হবে না। কারণ উভয়ের পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক দিক থেকে বিস্তর ফারাক। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ঐশ্বরিক ধারণাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। ইসলাম মানবতার জয়গান গায়, মানুষের আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করে। ইসলাম কখনো মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভাজনকে উস্‌কে দেয় না বরং সকলের অধিকারের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর এখানেই ইসলামের স্বাতন্ত্রতা যা অন্য ধর্ম থেকে একে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে ইসলামের ভূমিকা অপরিসীম। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এমন একটি রাষ্ট্রকাঠামো রেখে গেছেন যেখানে ধর্ম বা বর্ণের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোনো বৈষম্য তৈরি করা হয়নি। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীদের শাসনামলে এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। ইসলামি রাষ্ট্রের পথচলায় মুসলমানদের ন্যায় অমুসলিম নাগরিকরাও সমভাবে অংশগ্রহণ করে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করেছে।

পরিশিষ্ট ১

খিলাফত ও খলিফাদের নাম

খিলাফত (৬৩২-১২৫৮ খ্রি.)

১. খোলাফায়ে রাশেদীন (৬৩২-৬৬০ খ্রি.)

ক্রমিক নং	খলিফাদের নাম	শাসনকাল
১	হযরত আবু বকর	(১১-১৩ হি./ ৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)
২	হযরত উমর	(১৩-২৩ হি./ ৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)
৩	হযরত উসমান	(২৩-৩৫ হি./ ৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)
৪	হযরত আলী	(৩৫-৪০ হি./ ৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)

বিশেষ দ্র. হযরত আলী (রা.) এর শাহাদত বরণের পর হযরত হাসান (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেও উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর অনুকূলে খিলাফত ত্যাগ করায় তাঁকে ইতিহাসে খলিফা হিসেবে গণ্য করা হয় না।

২. উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০ খ্রি.)

ক্রমিক নং	খলিফাদের নাম	শাসনকাল
১	হযরত মুয়াবিয়া	(৪১-৬০ হি./ ৬৬১-৬৮০ খ্রি.)
২	ইয়াজিদ	(৬০-৬৩ হি./ ৬৮০-৬৮৩ খ্রি.)
৩	মুয়াবিয়া ২য়	(৬৩ হি./ ৬৮৩ খ্রি.)
৪	মারওয়ান	(৬৪ হি./ ৬৮৪ খ্রি.)
৫	আবদুল মালিক	(৬৫-৮৬ হি./ ৬৮৫-৭০৫ খ্রি.)
৬	ওয়ালিদ	(৮৬-৯৬ হি./ ৭০৫-৭১৫ খ্রি.)
৭	সুলায়মান	(৯৬-৯৯ হি./ ৭১৫-৭১৭ খ্রি.)
৮	উমর ২য়	(৯৯-১০১ হি./ ৭১৭-৭১৯ খ্রি.)
৯	ইয়াজিদ ২য়	(১০১-১০৫ হি./ ৭২০-৭২৪ খ্রি.)
১০	হিশাম	(১০৫-১২৫ হি./ ৭২৪-৭৪৩ খ্রি.)
১১	ওয়ালিদ ২য়	(১২৫ হি./ ৭৪৩ খ্রি.)
১২	ইয়াজিদ ৩য়	(১২৬ হি./ ৭৪৪ খ্রি.)
১৩	ইব্রাহিম	(১২৭ হি./ ৭৪৪ খ্রি.)
১৪	মারওয়ান ২য়	(১২৮-১৩২ হি./ ৭৪৫-৭৪৯ খ্রি.)

৩. আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০ - ১২৫৮ খ্রি.)

ক্রমিক নং	খলিফাদের নাম	শাসনকাল
১	আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ আস্-সাফ্ফাহ	(১৩২-১৩৬ হি./ ৭৫০-৭৫৪ খ্রি.)
২	আবু জাফর আবদুল্লাহ আল্ মনসুর	(১৩৬-১৫৮ হি./ ৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)
৩	মুহাম্মদ আল্-মাহ্দী	(১৫৮-১৬৯ হি./ ৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.)
৪	মুসা আল-হাদী	(১৬৯-১৭০ হি./ ৭৮৫-৭৮৬ খ্রি.)
৫	হারুন-অর-রশিদ	(১৭০-১৯৩ হি./ ৭৮৬-৮০৮ খ্রি.)
৬	মুহাম্মদ আল-আমিন	(১৯৩-১৯৮ হি./ ৮০৯-৮১৩ খ্রি.)
৭	আল-মামুন	(১৯৮-২১৮ হি./ ৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)
৮	আবু ইসহাক মুহাম্মদ আল-মুতাসিম বিল্লাহ	(২১৮-২২৭ হি./ ৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)
৯	আবু জাফর হারুন আল-ওয়াসিক বিল্লাহ	(২২৮-২৩২ হি./ ৮৪২-৮৪৭ খ্রি.)
১০	আল-মুতাওয়াক্কিল	(২৩২-২৪৭ হি./ ৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)
১১	আল-মুনতাসির বিল্লাহ	(২৪৭-২৪৮ হি./ ৮৬১-৮৬২ খ্রি.)
১২	আবুল আব্বাস আহমদ আল-মুস্তাইন বিল্লাহ	(২৪৮-২৫২ হি./ ৮৬২-৮৬৬ খ্রি.)
১৩	আল-মু'তায বিল্লাহ	(২৫২-২৫৫ হি./ ৮৬৬-৮৬৮ খ্রি.)
১৪	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল মুহ্তাদী বিল্লাহ	(২৫৫-২৫৬ হি./ ৮৬৯-৮৭০ খ্রি.)
১৫	আবুল আব্বাস আহমদ মু'তামিদ আলাল্লাহ	(২৫৬-২৭৯ হি./ ৮৭০-৮৯২ খ্রি.)
১৬	আবুল আব্বাস আহমদ মুতাজিদ বিল্লাহ	(২৭৯-২৮৯ হি./ ৮৯২-৯০১ খ্রি.)
১৭	আবু মুহাম্মদ আলী আল-মুক্তাফি বিল্লাহ	(২৮৯-২৯৫ হি./ ৯০২-৯০৭ খ্রি.)
১৮	আবুল ফজল জাফর আল-মুকতাদির বিল্লাহ্	(২৯৫-৩২০ হি./ ৯০৮-৯৩২ খ্রি.)
১৯	আবু মনসুর মুহাম্মদ আল-কাহির বিল্লাহ্	(৩২০-৩২২ হি./ ৯৩২-৯৩৪ খ্রি.)
২০	আবুল আব্বাস মুহাম্মদ আর-রাজী বিল্লাহ্	(৩২২-৩২৯ হি./ ৯৩৪-৯৪০ খ্রি.)
২১	আবু ইসহাক ইব্রাহিম আল-মুত্তাকী বিল্লাহ্	(৩২৯-৩৩৩ হি./ ৯৪০-৯৪৪ খ্রি.)
২২	আবুল কাসেম আবদুল্লাহ আল-মুস্তাক্ফি বিল্লাহ্	(৩৩৩-৩৩৪ হি./ ৯৪৪-৯৪৫ খ্রি.)
২৩	আবুল কাসেম আল ফজল আল-মুতী বিল্লাহ্	(৩৩৪-৩৬৩ হি./ ৯৪৬-৯৭৩ খ্রি.)
২৪	আবু বকর আবদুল করীম আত্-তায়ী বিল্লাহ	(৩৬৩-৩৮১ হি./ ৯৭৩-৯৯১ খ্রি.)
২৫	আবুল আব্বাস আহমদ আল-কাদির বিল্লাহ্	(৩৮১-৪২২ হি./ ৯৯১-১০৩০ খ্রি.)
২৬	আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-কায়িম বি-আমরিল্লাহ	(৪২২-৪৬৭ হি./ ১০৩০-১০৭৪ খ্রি.)
২৭	আবুল কাসিম আবদুল্লাহ আল-মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ্	(৪৬৭-৪৮৭ হি./ ১০৭৫-১০৯৪ খ্রি.)
২৮	আবুল আব্বাস আহমদ আল মুস্তাজহির বিল্লাহ্	(৪৮৭-৫১২ হি./ ১০৯৪-১১১৮ খ্রি.)
২৯	আবু মনসুর আল্ ফজল আল-মুস্তারশিদ বিল্লাহ্	(৫১২-৫২৯ হি./ ১১১৮-১১৩৪ খ্রি.)
৩০	আবু জাফর মনসুর আর-রশিদ বিল্লাহ	(৫২৯-৫৩০ হি./ ১১৩৪-১১৩৫ খ্রি.)
৩১	আবু আবদুল্লাহ আল-মুক্তাফি বি আমরিল্লাহ্	(৫৩০-৫৫৫ হি./ ১১৩৫-১১৬০ খ্রি.)
৩২	আবুল মুজাফ্ফর ইউসুফ আল-মুস্তানজিদ বিল্লাহ	(৫৫৫-৫৬৬ হি./ ১১৬০-১১৭০ খ্রি.)
৩৩	আবু মুহাম্মদ হাসান আল-মুসতাদী বি-আমরিল্লাহ্	(৫৬৬-৫৭৫ হি./ ১১৭০-১১৭৯ খ্রি.)
৩৪	আহ্মদ আবুল আব্বাস আন্-নাসির লি দীনিল্লাহ	(৫৭৫-৬২২ হি./ ১১৭৯-১২২৫ খ্রি.)
৩৫	আবু নসর মুহাম্মদ আজ্-জাহির বি আমরিল্লাহ্	(৬২২-৬২৩ হি./ ১২২৫-১২২৬ খ্রি.)

পরিশিষ্ট ২

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর শাসনামলের মানচিত্র

সূত্র: ইন্টারনেট

পরিশিষ্ট ৩

খোলাফায়ে রাশিদীনের শাসনামলের মানচিত্র

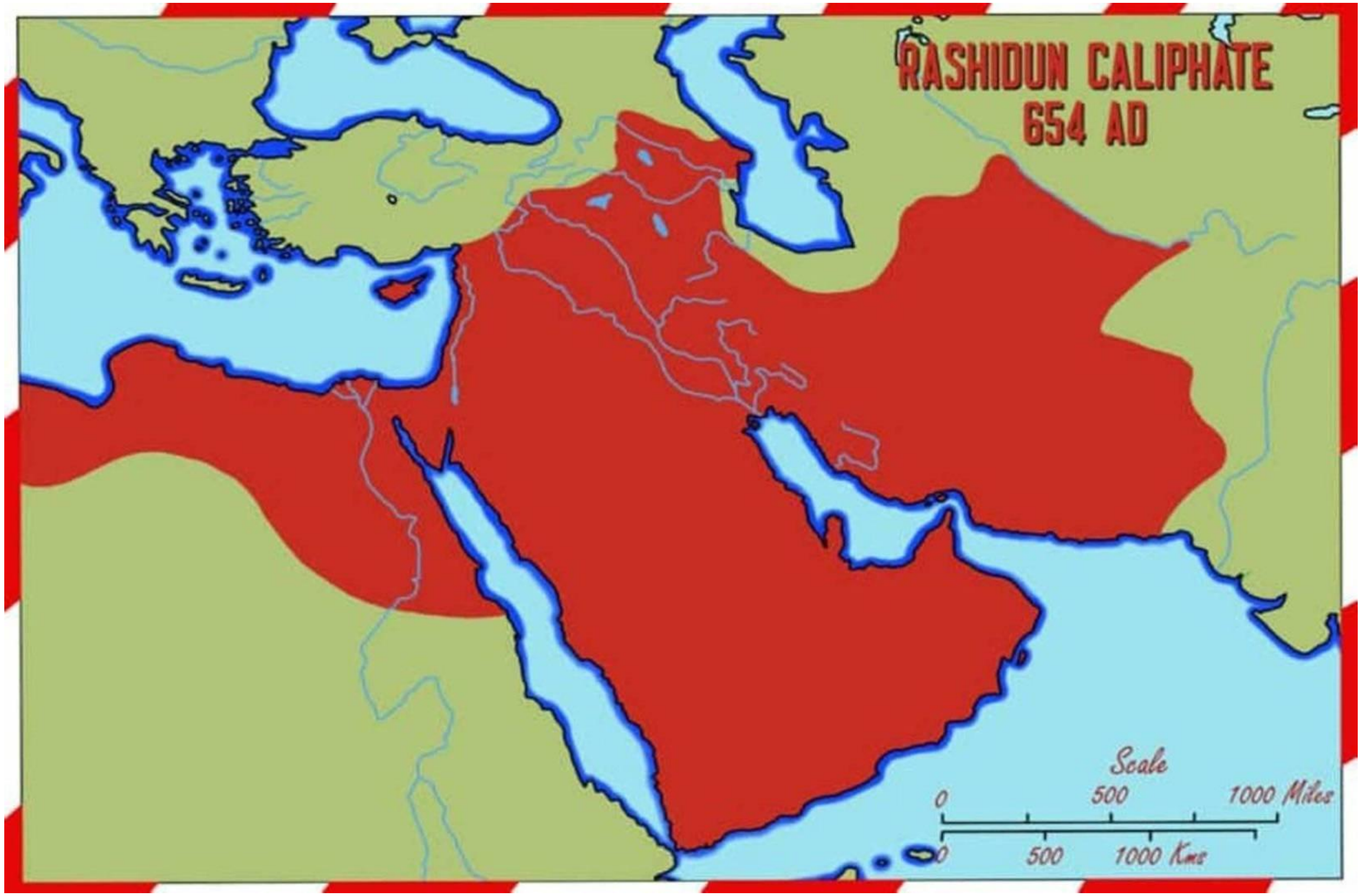

সূত্র: ইন্টারনেট

পরিশিষ্ট ৪

উমাইয়া শাসনামলের মানচিত্র

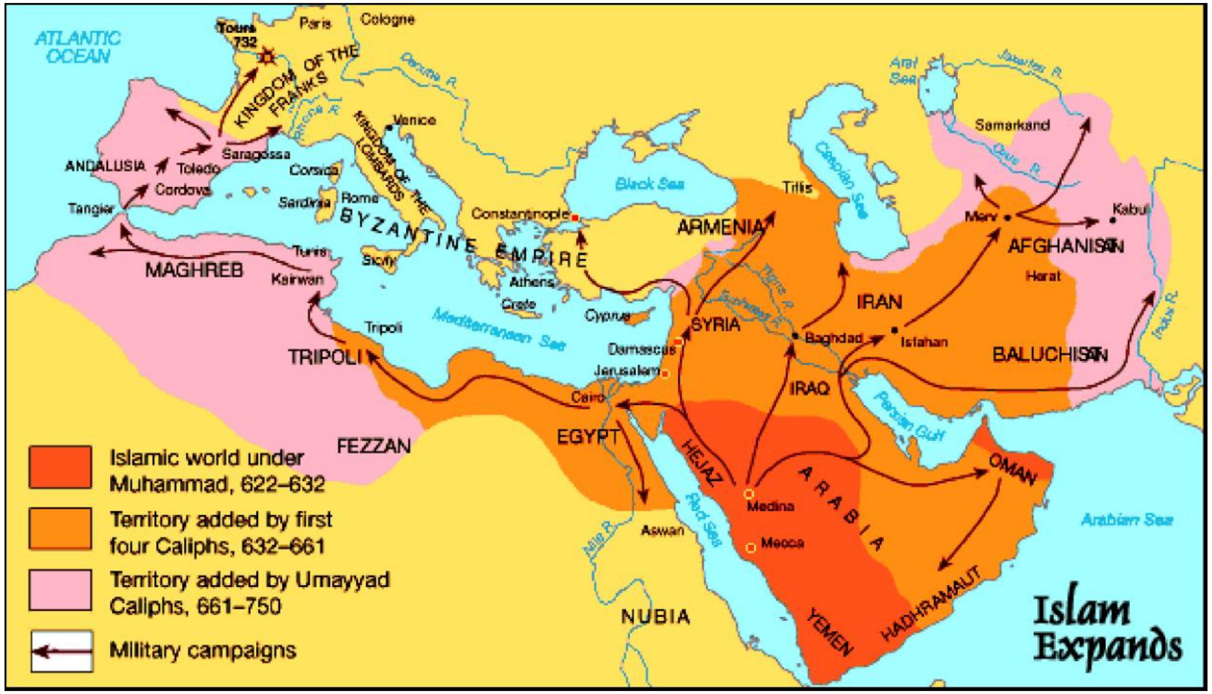

সূত্রঃ ইন্টারনেট

পরিশিষ্ট ৫

উমাইয়া শাসনামলের মানচিত্র

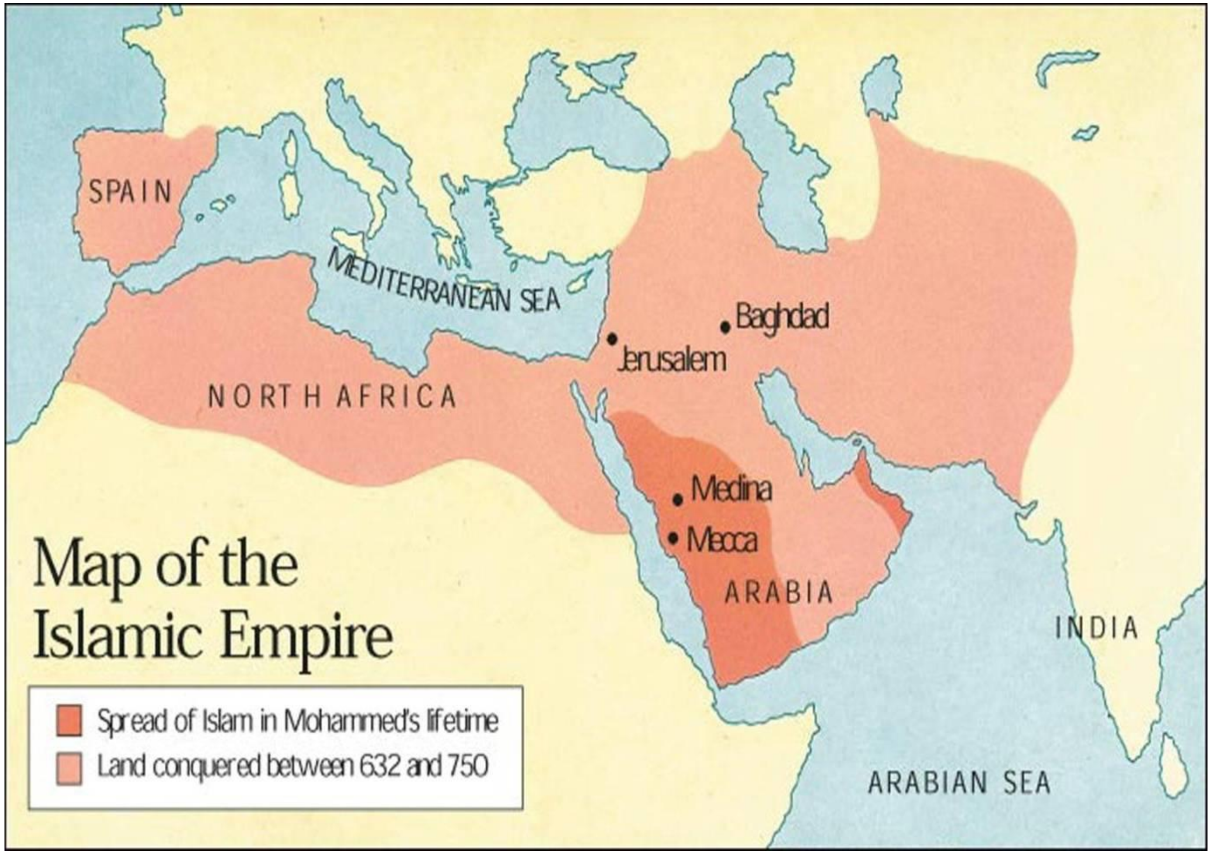

সূত্র: ইন্টারনেট

পরিশিষ্ট ৬

আব্বাসীয় শাসনামলের মানচিত্র

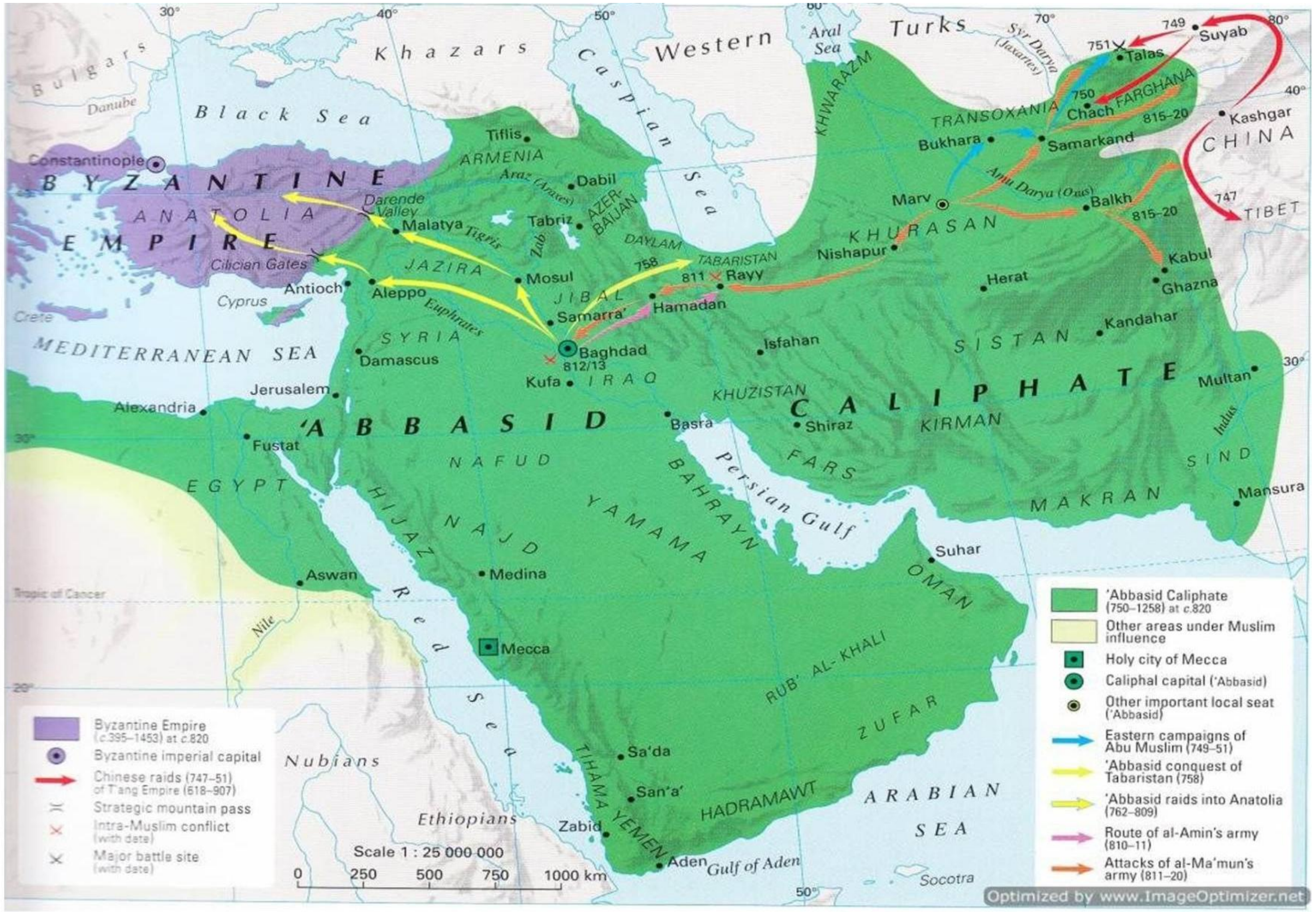

সূত্রঃ ইন্টারনেট

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎসসমূহ (Primary Sources)

আল-কুর'আন

আল-হাদীস

ক. সিহাহ্ সিত্তাহ

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, অনু, ডঃ আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম, *সুনানু ইবনু মাজাহ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৬

ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র), অনু. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস্‌সিজিস্তানী (র), অনু. ডঃ আফ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক, *আবু দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), অনু. মাওলানা আফলাতুন কায়সার, *সহীহ মুসলিম*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০২

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৭

খ. অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ

আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে মুসা ইবনে হাম্মাদ আল আকিলী আল মাক্কী, (বিশ্লেষক, ড. আবদুল মুতী আমিন), *আদ দুয়াফা আল কাবীর*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তা.বি

আবু বকর আহমদ ইবনু আল হোসাইন আলী আল বাইহাকী, (বিশ্লেষক, মুহাম্মদ আবদুল কাদের আতা), *আস-সুনানুল কুবরা*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ২০০৩

আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ আত তাবরানী, (বিশ্লেষক, হামাদি আব্দুল মাজিদ ইবনে ইসমাঈল) *আল মু'জামুল কবীর*, ২য় সংস্করন, মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া, কায়রো, ১৯৮৩

আল ইমামুল আল হাফেজ আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খণ্ড-১২, তয় সংস্করন, আল মাকতাবাতু তাওফিকিয়্যাহ, কায়রো, ২০১২

আল্লামা আলাউদ্দিন আলী আল মুত্তাকী ইবনে হুসামউদ্দিন আল হিন্দী, (বিশ্লেষক, হাসসান আবদুল মান্নান), *কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল*, ৫ম সংস্করন, মুওআসসাতুল রিসালাহ, বৈরূত, ১৯৮৫

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, (বিশ্লেষক, শোয়াইব আল আরনাবুত), *মুসনাদুল ইমামে আহমদ ইবনু হাম্বল*, মুয়াসাসাতু আর রিসালা, বইরুত, ১৯৯৫

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতিব আল-তাবরিযী, (বিশ্লেষক, নাসির উদ্দিন আলবানী), *মিশকাতুল মাসাবিহ*, ২য় সংস্করন, আল মাকতাবাতুল ইসলামী, বইরূত, ১৯৭৯

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইবনে সায়াদ ইবনে মুনী, *কিতাবুত তবাকাত আল-কাবীর*, মাকতাবাতুল খামজী, কায়রো, ২০০১

মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী, *ইউরাউল গালীল ফি তাখরিজী আহাদিসি মানারিস সাবিল*, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ১৯৭৯

মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী, *সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, মাকতাবুল মা'আরিফ, রিয়াদ, ২০০০

মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী, *গায়াতুল মারাম ফি তাখরিজী আহাদিসীল হালাল ওয়াল হারাম*, হাদিস নং- ৪৬৯, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ১৯৮০

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী, *আল জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু*, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৮,

সমসাময়িক গ্রন্থসমূহ

Yahya Ben Adam's, *Kitab Al Kharaj,* (Taxation in Islam, Vol. I, Edited, Translated and Provided with an Introduction and Notes A. Ben Shemesh), E. J. Brill, Leiden, 1958

Qudama B. Jafar, *Kitab Al Kharaj,* (Taxation in Islam, Vol. II, Edited, Translated and Provided with an Introduction and Notes A. Ben Shemesh), E. J. Brill, Leiden, 1965

আহমাদ ইবন্ ইয়াহইয়া ইব্‌ন জাবির আল বাগদাদী আল-বালাযুরী, *ফুতহুল বুলদান*, তবউল কুতুব আল আরাবিয়্যাহ, কায়রো, ১৯০১

আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম, *কিতাবুল খারাজ* (আরবি), দারুল মারেফা, লেবানন, বৈরুত, ১৯৭৯

আবু উবায়দ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, আল মাকতাবাতু তিজারিয়্যাহ আল কুবরা, কায়রো, ১৩৫৩ হি.

আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, *তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক*, দারুল মা'রিফ, মিসর, ১৯৬৭

আবুল হাসান আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী আল মাসুদী, *মুরুয আয-যাহাব ওয়া মা'আদিন আল যাওয়াহিরহ্*, আল মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ২০০৫

আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল বাসরী আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকাম আল-সুলতানীয়া*, দারুল হাদিস, কায়রো, ২০০৬

আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ওয়াজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শূয়ূন আল-ইসলামিয়্যাহ, কাতার, ২০১৫

আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্‌ন মাস'উদ আল কা'সানী, *বাদায়েউস সানা'য়ে ফী তারতীবিশ শারা'য়ে*, খ.৭, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৮৬

আল্লামা যামাখশারী, *আল-কাশ্‌শাফ*, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, ৩য় সংস্করন, ২০০৯

ইবনুল আছির, আল কামিল ফিত-তারিখ, *বায়তুল আফকার আদ্ দাওলিয়্যাহ*, জর্ডান, আম্মান, তা. বি.

মুওয়াফফাকুদ্দীন আবি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু কুদামা, (বিশ্লেষক ড. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুহসীন আত্-তুর্কী, ড. আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ), *আল মুগনী*, দারু আলামিল কুতুব, রিয়াদ, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, দারুল ফিক্‌র, বয়রূত, লেবানন, ১৯৮৩

শাম্‌স আল দীন আবু বকর মুহাম্মদ বিন আহম্মদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খণ্ড ৭, মাতবা'আ আস-সাআদা,মিশর, ১৩২৪ হি

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Sources)

A. A. Dixon, *The Umayyad Caliphate*, London, 1971

Abul Hasan Ali al-Nadvi, *Al-Murtadha*, Lucknow, 1989

Abdullah Kannoun, *Islam as The First Anti-Slavery Religious System of the World,* The Islam Review Journal, 1966, UK

Afzal Iqbal, *The Culture of Islam,* Idarah-i Adabiyat-i Delli,Delhi, 1985

Afzal Iqbal, *The Prophet's Diplomacy,* Idarah-i Adabiyat-i Delli,Delhi, 1984

A. H. Qasmi, *Islamic Governments,* Isha Books, Delhi, 2008

A. K. Brohoi, *Quotation in United Nations and Human Rights*, Karachi, 1968

Akram Diya al Umri, Tr. Huda Kattab, *Medinan Society at the time of the Prophet*, The International Institute of Islamic Thought, Herndon, USA, 1991

Alan Gealirth, *Human Rights : Eassys on Justification and Applications,* Chicago University Press, 1982

Albert Bebbe White, *Notes on the Name Megna Carta,* The English Historical Review, London, 1917

Al-Haj Mahomed Ullah, *The Administration of Justice in Islam,* Kitab Bhavan, New Delhi, 1990

Allama Yusuf Alqarzavi, Abu Masud Azhar Nadvi, *Islam Muslims & non Muslims,* Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2010

Amir Hasan Siddiqi, *Islamic State,* Karachi, 1961

Anwar G. Chejne, *Succession to the Rule in Islam,* Lahore, 1960

A. S. Tritton, *The Caliphs and their non-Muslim Subjects*, Frank Cass and Company Limited, London, 1970

Asghar Ali, *The Islamic State,* Vikas Publishing House pvt. Ltd., New Delhi, 1980

Breay Claire, *Megna Carta: Manuscripts and Myths*, British Library, London, 2010

Carl Brockelmann, *History of the Islamic peoples,* Routledge & Kegan Paul Limited, London, 1949

D. L. O'Leary, *Arabic though and its place in history,* London, 1939

Dhaka University Institutional Repository

Danial C. Dennett, *Conversion and Poll tax in Early Islam,* Idarah-i Adabyat-i Delli, Delhi, 1950

Danny Danzeger & John Gillingham, *1215 The Year of Megna Carta*, Touchton, New York, 2004

Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development,* Little Brown, Boston, 1970

Douglas Richardson, *Megna Carta Ancestry: A Study in Colonial Medieval Families,* North Soltlake City, 2011

Dr. Anwar Chejne, *The Role of Arabic in present Arab Society,* The Islamic Literature, Lahore, 1958

Dr. Arnold Toyenbee, *Islam Answers Most Powerful Demand of this Age.* The Islamic Review, Woking Mosque, London, September, 1961

Dr. Ghulam Nabi, *Khilafat In Theory and Practice,* Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 208

Dr. Mehboob Desai, *Islam and Non-violence,* Gyan Publishing House, New Delhi, 2009

Dr. Mohammad Ali Al-Haj Salmin, *The Holy Prophet Mohammad,* Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 2002

Dr. Mohammad Muslehuddin, *Islam and its Political System*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1999

Dr. Muhammad Hamidullah, *Introduction to Islam,* Kitab Bhavan, New Delhi, 2003

Dr. Muhammad Hamidullah, *Introduction to Islam,* Kitab Bhavan, New Delhi, 2003

Dr. Muhammad Hamidullah, *The first written constitution the world*, Lahore : Shah Muhammad Ashraf, 1981

Dr. Nejatullah Siddiqi, *Islamic Public Economic*, Tr. Dr. Sayed Afzal Peerzade, Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 2001

Dr. Shaikh Shaukat Hussain, *Human Rights in Islam,* Kitab Bhavan, New Dheli, 2001

Dr. Sheikh Mohammad Iqbal, *Islamic Toleration & Justice* : Non-Muslims under Muslim Rule, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2007

Dr. Towqueer Alam Falahi, *Studies in Muslim Theology*, Aligarh Muslim University Press, Aligarh, 1999

Farid Younos, *Principles of Islamic Sociology,* Author House, Bloomington, 2011

G.C. Deb. "*Buddha*" The Humanist, Dhaka, 1969

G. E. Von Grunebaum, *Classical Islam A History 600-1258,* Tr. Katherine Watson, George Allen and Unwin Ltd., London, 1970

G. W. F Hegel, *Introduction to the Philosophy of History*, Hackett Publishing Company, Cambridge, 1988

Dhaka University Institutional Repository

Gail Minault, *The Khelafat Movement, Religions Symbolism and Political Mobilization in India*, New Delhi, 1982

Ghulam Haider Aasi, *Muslim Understanding of Other Religions,* Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2010

Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought,* Macmillan Press, London, 1982

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern written Arabic,* Macdonald and Evants Ltd, London, 1980

Harold J. Laski, *Grammar of Politics,* New South Wales: Unwin Hyman, 5th edition, 1967

Harold J. Laski, *Grammar of Politics,* New South Wales: Unwin Hyman, 5th edition, 1967

Henry Marsh, *Documents of Liberty,* David & Charls, New Town Abbot, England, 1971

Ian Morris, *Burial and Ancient Society: The rise of the Greek City State*, Cambridge University Press, 1987

IFSW & IASSW, *Teaching and larning about Human Rights : A Manual for Schools for Social Work Profession.* UN Centre for Human Rights, Geneva, 1992

Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India,* The Indian Press (Publication) Private Ltd., Allahabad, 1994

J. Wellhausen, *The Arab Kingdom and its Fall,* Khayats, Beirut, 1927

Jalaluddin A's Suyuti, *History of the Caliphs,* Tr. Major H.S. Jarrett, Kitab Bhavan, New Delhi, 2010

John L. Esposito, *Islam and Politics,* Syrcunse University Press, New York, 1991

Joseph Hell, *The Arab Civilization,* Tr. S. Khuda Bakhsh, Idarah-I Adabiyat-I Delli, Delhi, 1980

Joseph P. Pickett, (Ed.),*The American Heritage College Dictionary,* Houghton Mifflin Company, New York, Fourth Edition, 2002

Jurji Zayadan, *History of Islamic Civilization Umayyads and Abbasids,* Tr. D.S. Margoliouth, Kitab Bhavan, 2006, New Delhi

Justice Hamoodur Rahman, *Islamic Concept of State*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 2005

K. A. C Creswell, *A Short Account of Early Muslim Architecture*, Penguin books Ltd., U.S.A., 1958

Karel Vask, *The international Dimaension of Human Rights*, Vol, 1

Karl Weintraub, *Visions of culture*, Chicago, University of Chicago Press, 1969

K.D. Bhargava *A Survey of Islamic Culture and Institutions*, Kitab Mahal, Allahabad, 1981

Khalil Ur Rehman, *The Concept of labor in Islam,* Xlibris Corporation, New York, 2010

Dhaka University Institutional Repository

Lini S. May, *The Evolution on Indo-Muslim Thought After 1857*, Lahore, 1970

M. A. Shaban, *Islamic History*,Cambidge, 1992

M. A. Shaban, *The Abbasid Revolution*, Cambridge University Press, London, 1970

M. M. Picthall, *The Cultural Side of Islam,* Kitab Bhavan, New Delhi, 2007

M. M. Sharif, *Muslim Thought: its Origin and Achievements*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2007

M. N. Roy , *The Historical Role of Islam*, Bombay, 1942

Mahmud Ghazi. *Studies in the political and Constitutional thought of Islam*, Lahore, Pakistan, 1992

Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Johns Hopkings University, Baltimore, 1984

Marion Holmes Katz, The problem of abortion in classical sunni fiqh, *Islamic Ethics of life: Abortion, War and Euthansia*, Jonathan E. Brockopp (ed.),University of South Carolina Press, 2003

Maulana Mohd. Taqi Amini, *The Agrarian System of Islam,* Tr. Syed Ahmad Ali, Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 1991

Maulana Muhammad Ali, *Early Caliphate*, Ahmadiyya Anjuman-i-Isha'at-i-Islam, Lahore, 1947

Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam,* The Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam, Lahore, 4th edition,1951

Max. Weber, *Economy and Society: An outline of interpretive sociology*, Eds. G. Roth and Wittich, Vols. 2, Berkely: University of California Press, 1978

Mohammad Hashim Kamali, *The Right to life, Security, Privacy and Ownership in Islam*, Islamic Tex Society, Kualalampur, 2008

Morris Stockhammer, *Plato Dictionary*, Philosophical Library, New York, 1903

Muhammad Hamidullah, *Muslim conduct of State*, SH. Muhammad Ashraf, Lahore, 1977

Muhammad Munir, *Islam in History*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2005

Muhammad Zamir, *Human Rights : Issues and International Law*, University Press Limited, Dhaka, 1990

Nicolas P. Aghnides, *Mohammedan Theories of Finance*, Idarah-I-Adabiyat-I-Delli, Delhi, 2002

Oran, Ahmed and Salim Rshid, *Fiscal Policy in Early Islam,* Public Finance/ Finance Publique, Vol. 44, No. 1, 1989

Paul Sieghart, *The international law of Human Rights*, Vol, 1

Dhaka University Institutional Repository

Pauline Maier, *American Scripture: Making the Declaration of Indepenence*, Knopf Doubleday Publishing, New York, 2012

Philip k Hitti, *History of the Arabs,* Macmillan St Martin's Press, London, Tenth edition, Reprinted 1972

Prof. Muhammad Siddique Qureshi, *Foreign Policy of Hadrat Muhammad (Saw),* Kitab Bhavan, New Delhi, 1991

R. A. Nicholson, *A literary History of the Arabs*, Cambridge, 1953

R.C. Agarwal, *Political Theory*, S. Chand & Co. Ltd., New Delhi, 2002

R. C. Majumdar, H.G. Raychaudhuri, Kalikinkar Datta, *An Advanced History of India*, Macmillan, New Delhi, 1978

R. Levy, *A Baghdad Chronicle,* Cambridge, 1929

R. N. Sharma, *Fundamental Rights, Liberty and Social Order*, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1996

R.P Tripathi, *Some Aspects of Muslim Administration*, Central Book Depot, Allahabad, 1964

Rafi Ahmad Fidai, *Concise History of Muslim World*, Vol. I-III, Kitab Bhavan, New Delhi, 2004

Reuben Levy, *The Social Structure of Islam,* Cambridge at the University Press, London, 1969

Rev. Bosworth Smith, *Mohammad and Mohammedanism*, London, 1875

Robert Durie Osborn, *Islam Under the Khalifs of Baghdad*, Longman, London,1878

Robert L. Barker (edt.), *The Social Work Dictionary*, NASW, New York, 1995

S. A. Q. Husaini, *Arab Administration*, M. Abdur Rahman, Madras, 1949

S. A. Siddiqi, *Public Finance in Islam,* Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2007

Sayed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens,* Kitab Bhawan, New Delhi, 1977

Sayed Ameer Ali, *The Spirit of Islam,* Cosimo Classics, New York, 2010

S. Khuda Bakhsh, *Politics in Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2003

S. Khuda Bukhsh, *A History of the Islamic Peoples,* Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 1983

S. M. Bijli, *Dharmic Culture and Islam*, Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 1999

S. M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims*, Vol. II, Najmahsons, Dacca, 1977

S. M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1984

S. M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration,* Kitab Bhavan, New Delhi, 1984

S. M. Yusuf, *Economic Justice in Islam,* Kitab Bhavan, New Delhi, 2009

Dhaka University Institutional Repository

Sahibzada Masud-ul-Hassan Khan Sabri, *History of Muslim Spain,* Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2004

Sailendra Nath Sen, *Ancient Indian History and Civilization*, (2nd ed.), New Age International (Pvt.) Ltd., Calcutta, 1999

Sayed Afzal Peerzade, *Islamic Principles of Public Finance and Policy,* Idarah-i Adabiyat-i Delli,Delhi, 2004

Sayed Afzal Peerzade, *On Islamic Taxation,* Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delhi, 2009

Sayed Athar Hussain, *The Glorius Caliphate,* Academy of Islamic Research and Publication, Lucknow, 1974

Shibli Nu'mani, *Al-Farooq The Life of Omar The Great*, Eng. Tr. By Maulana Zafar Ali Khan, International Islamic Publishers, New Delhi, 1992

Shiv Kumar Sharma, *Life Profile and Biography of Bhuddu*, Diamond Pocket Books, New Delhi, 2002

Sir Thomas Arnold, Alfred Guillaume, *The Legacy of Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 2009

Sir Thomas W. Arnold, *The Caliphate,* Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1965

Social Work Dictionary, NASW, New York, 1995

Stanley A. Cook, *The Laws of Moses and the Code of Hammurabi,* Cosmo Classics, New York, 2010

Syed Abdul Hai, *Muslim Philosophy,* Vol. I, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1982

Syed Mahmudunnasir, *Islam its Concepts & History,* Kitab Bhavan, New Delhi, 1981

T. W. Arnold, *The Preaching of Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1999

The Encyclopaedia of Religion, (Ed.) Mircea Eliade,Vol. 5, Macmillan Publishing Company, New York, 1987

The New Encyclopaedia Britannica,Micropaedia,Vol.6, Encyclopaedia Britannica; Inc, London, 2002

Thomas Patrick Huges, *A Dictionary of Islam*, Vol. 1, Cosmo Publications, New Delhi, 2004

V. A. Smith, *Asoka: The Buddhist Emperor of India*, Asian Educational Services, New Delhi, 1997

Von Kremer, *The Orient Under the Caliphs,* Tr. S. Khuda Bukhsh, Idarah-I Adabiyat-I Delli, New Delhi, 1983

W. Az. Zahili, *Islam and non-Muslims*

W. M. Watt; *Islam and the Integration of Society*, London, 1961

W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, Oxford at the Clarendon Press, London, 1956

William Muir, *The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall*, Khayats, Beirut,1963

Dhaka University Institutional Repository

William R. Trumble, Angus Stevenson, (Ed.), *Shorter Oxford English Dictionary*, Vol. 1, Oxford University Press, New York, Fifth edition, 2002

আবদুর রহমান আবদুল খালেক, *আশ-শূরা ফী যিল্লি নিযা-মিল হুকমিল ইসলামী* কুয়েতঃ দার সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮/১৯৮৮

আবদুর রহমান কীলানী, *খিলাফত ও জামহুরিয়াত*, লাহোর, মাজলিসূত তাহক্বীক্বিল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৫

আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন হিশাম আল হুমায়রী, *আসসীরাতুন নববিয়্যা*, ১ম খন্ড, মিসর; মাতবা'আ মুস্তফা, ১৯৯৫

আবুল কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনুল হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আসাকির, *তারিখু মদিনাতু দিমাস্ক*, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, ১৯৯৫

আবুল হাসান বুরহানউদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর আল-মুরগিয়ানী, *আল হিদায়া শরহু বিদায়াতিল মুবতাদি*, ইদারাতুল কোরআন ওয়াল উলুমাল ইসলামিয়্যাহ, পাকিস্তান, ১৪১৭ হি

আল-কাওসার, (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান), ৩য় সং, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৯

আল-কাল্ কাশান্দী, *সুবহ্ আল-আ'শা*, কায়রো, ১৯১৬

আল কুরাফী, *আল-ফুরূক*, খ. ৩, *মাকতাবাত আল-ফালাহ্*, বৈরূত

আল-মাওসু' আতুল ফিকহিয়্যাহ, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬

আল-মু'জামুল ওয়াসীত, (আরবী), দেওবন্দ, উত্তর প্রদেশ, কুতুবখানা হোসাইনিয়া, ১৯৯৬

আল-হিদায়া, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২০১৪

আলী আবদুর রাযিক, *আল ইসলাম ওয়া উসুলিল হুক্কান*, বৈরূত, ১৯৬৬

আহমদ ইবনে আবি ইয়াকুব ইবনে জাফর, *তারীখুল ইয়াকুবী*, মাতবাআতুল গারী, নাজফ, ১৩৫৮ হি.

ইবনে কুতায়বা, *আল-ইমামাহ ওয়া আল-সিয়াসাহ*, কায়রো, ১৯২৭

ইবনে সাআদ, *আত্-তাবাকাত*, বৈরূত, ১৯৫৭

ইয়াহ্ইয়া নাবাবী, *আল-মাজমূ শারহুল মুহায্যাব*, আল-মাত'বাআতুল মুনীরিয়্যাহ, খ. ২

কামাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়াহ*, দারুল ফিকর, লেবানন, তা.বি.

ফার্দিনান্দ তোতাল, *আল-মুঞ্জিদ ফিল আ'লাম*, বৈরুত, দারুল মাশরিক, ১৬ তম সংস্করণ, ১৯৮৮

মুহাম্মদ আমীন ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, দারু আলামিল কুতুব, রিয়াদ, ২০০৩

মুহাম্মদ আল খাদ্দুরী বেগ, *তারিখুল উমাম আল ইসলামিয়া*, দারুল কলম, বৈরুত, ১৯৮৬

মুহাম্মদ আলী আল-সারূনী : *সাফাওয়াত আল-তাফসীর*, দার আল-কালাম, জিদ্দাহ, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস সরখসী, *শরহে সিয়ারুল কাবীর*, খ. ১ম, বৈরূত, দারুল কুতবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭

মুহাম্মদ ইবনে সায়াদ ইবনে মুনী, *কিতাবুত তবাকাত আল-কাবীর*, মাকতাবাতুল খামজী, কায়রো, ২০০১

মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহাব, *মুখতাসার সীরাত আর রাসূল*, ১০৪৬ হিজরী, সৌদিয়া ইসলামী বিশ্ব, সৌদি আরব

মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাররাম ইব্ন মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, দারুল মা'আরিফ,কায়রো, তা.বি.

মুহীউদ্দিন আত তাবারী, *আর-রিয়াযুন ফী মানাকিবিল আশারা*, ২য় খন্ড, পৃ. ৭৬, হোসাইনিয়া প্রেস, মিসর, ১৩২৭ হিজরী। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃ. ১২৫।

আহমদ উরফে মোল্লা জীয়ন ইবনে আবু সাঈদ আল-হিন্দী, অন. মাওলানা আবুল কালাম মো: আবদুল লতিফ চৌধুরী, *নূরুল আনোয়ার*, এমদাদিয়া পুস্তকালয় লিঃ, ঢাকা, ২০০৫

শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী, অনু. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা ইসহাক ফরিদী, শেখ আহম্মদ মুল্লাযিযুন, *আত-তাফসীরতে আল-আহ মাদীয় ফী-বায়ান-ই-আল আয়াতে আল শারইয়া*, করিমী মুদ্রণালয়, মোম্বাই, ১৩২৭ হিজরী

সফিউর রহমান মুবারকপুরি, *আররাহীকুল মাখতুম*, সৌদি আরব, ১৯৯৩

সাঈদ আহমদ, *আর রিক্ব ফিল ইসলাম*, দিল্লী, ১৯৬০

সুলাইমান ইব্ন আহমদ আত্-তিবরানী, *আল-মু'জামুস সাগীর*, দিল্লী, আল-মাতবা'আ আল-আনসারী, তা.বি.

স্যার সাইয়েদ আহমদ, *মাকালাত*, ভল্যুম-৪, লাহোর, ১৯৬২

ড. আবদুল করিম যায়দান, *আদ দাওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ*, দারুল ইসলামিয়্যাহ, মিশর, তা.বি

ড. আবদুল করিম যায়দান, *আহকাম আল যিম্মীইন ওয়াল মুস্তামিনিন ফি দার আল-ইসলাম*, মুয়াস্সাসাত আল রিসালা, বৈরুত, ১৯৮২

ড. আলী আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফী, *আল-মুসাওয়াত ফী আল-ইসলাম*, দার আল-মা'আরিফ, বৈরূত, ১৯৯৩

ড. মুস্তফা আল-সুবায়ী, *ইশতিরাকিয়্যাত আল-ইসলাম*, মাতবা'আত আল-শা'ব, কায়রো, ১৯৮৮

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, ৬ষ্ঠ সংস্করন, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

অধ্যাপক হাসান আইয়ূব, অনু. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪

আ. ত. ম. মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মে, ২০০৭

আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল্ মান্নান, *ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা*, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ঢাকা, তা.বি

আবু সাঈদ চৌধুরী, *মানবাধিকার*, বাংলা একাডেমী, ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা, ২য় প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৮

আবু তাহের, *ইসলামে ধর্ম দর্শন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি*, কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, *ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র*, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮১

আল-কাওসার, (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান), ৩য় সং, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৯

আল্লামা শিবলী নুমানী, *সিরাতুন্নবী (সা.)*, অনু. মাওলানা মহিউদ্দিন খান, ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৪১৩ হি.

ইবন ইসহাক, *সীরাতু রাসূলুল্লাহ*, ইংরেজী অনুবাদ, এ গুইলেউম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, ১৯৫৫

ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০

ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬

এ কে এম সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে নারী ও মানবাধিকার*, মা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪

এ. এ. এম. হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, হক প্রিন্টার্স, ঢাকা, ৭ম সংস্করণ, ২০১৬

এ. বি. এম, মোহ্সীন উল্লাহ, *ইসলামের আলো ও বিশ্বে মুসলমান*, ঢাকা, ২০০৩

এস. এ. কিউ হোসাইনী, অনু. প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক ও প্রফেসর সুরাইয়া জেবুন্নেসা, *আরব সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্র ও সরকার*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮

কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, অনু. মাওলানা লিয়াকত আলী, *খেলাফতে রাশেদা*, মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ২০০৬

গাজী শামসুর রহমান, *কোরআন ও সুন্নাহের আলোকে ফৌজদারি আইনের সংশোধন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ১৯৯২

গাজী শামসুর রহমান, *ইসলামী আইনতত্ত্ব*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০

গাজী শামসুর রহমান, *মানবাধিকারের ভাষ্য*, ১ম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা : ৫ম সং, ১৯৭৮

নূর মোহাম্মদ আযমী, *ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা*, সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডীজ, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৭০

ফরীদুদ্দীন মাস্‌উদ, *ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২৩ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৩ (প্রবন্ধ)

ফজলুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফত*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০১

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

মরহুম আবদুল কাদের, *অপরাধের ইসলামী আইন*, ১ম খন্ড

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামে মানবাধিকার*, ২য় সংস্করণ, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

মজিদ কাদ্‌দুরী, অনু: অধ্যাপক হাসান জামান, *ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, অনু. মুফতী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, আশরাফিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯

মুরাদ হফম্যান, *ইসলাম দি অলটারনেটিভ*, বাংলা অনু. মঈন বিন নাসির, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৯

মুসা আনসারী, *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, চয়নিকা, ঢাকা, ২০০৭

মুহম্মদ আহ্সানউল্লাহ, (অনু.মোহাম্মদ আব্দুল জাব্বার সিদ্দিকী), *খিলাফতের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩

মুহম্মদ নুরুল করিম, *ইসলাম ও জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা,* আহসান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৯

মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন, *ইসলামে মানবাধিকার*, অনু. মুহাম্মদ আবুত তাওয়াম, মুহাম্মদ আবূ নুসরত হেলালী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩

রশীদ আখতার নদভী, অনু. মাওলানা আবুল বাশার, *ওমর ইবনে আবদুল আজীজ,* ঢাকা বুক কর্ণার, ২০১২

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিভাষা, *বাংলা একাডেমী,* ঢাকা, ১৯৭৪

শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬

সালেহ হুসাইন আল-আয়েদ, *মুসলিম বিশ্বে অমুসলিমদের অধিকার*, অনু. ইউসুফ ইয়াসীন, আল্লামা আলীমুদ্দীন একাডেমী, ঢাকা, ২০১০

সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিয়া, আল খিলাফত, কায়রো, ১৩৪১ হি.

সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিক্হুস সুন্নাহ,* অনু. আকরাম ফারুক, খণ্ড ২, শতাব্দী প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০

ড. অনাধিকুমার মহাপাত্র, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান,* সুহৃদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ২০০১

ড. আবদুল করিম যায়দান, *ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা,* অনু, মাওলানা মুহাম্মাদ আবুদর রহীম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

ড. আবদুল বাছির, *মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তার রূপরেখা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৮

ড. আহমদ আবদুল কাদের, *আধুনিক যুগে খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা*, বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, তা.বি.

ড. আহমদ আলী, *ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদ,* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০১০

ড. আহমদ আলী, *সার্বভৌমত্ব ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোন,* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০১১

ড. এমাজউদ্দিন আহমেদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা,* বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ঢাকা, ১৯৯০

ড. ওসমান গনী, *আব্বাসীয় খিলাফত*, বুকস ওয়ে, কলকাতা, ২০১২

ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফত*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ উদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, অনু., আবদুল মতীন জালালাবাদী, ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫

ডঃ মুহম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান, শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, বুকশ প্যাভিলিয়ন, রাজশাহী, ২০০১

ড. মোঃ আযহাব আলী, *শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৬

ডক্টর মোঃ শফিকুল ইসলাম, *ইসলাম ও ধর্মীয় স্বাধীনতা*, বর্ষা প্রাইভেট লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৫

ড. মোঃ শাহজাহান কবির, *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, দিক দিগন্ত, ঢাকা, ২০০৯

সিরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬

সিলভানো গারোল্লা, *খ্রিস্ট ধর্মীয় শব্দার্থ*, জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ১৯৯৬

জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০

ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর সরকার কাঠামো*, অনু. মুহাম্মদ ইবরাহীম ভূঁইয়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪

তমিজুল হক, *ইসলামে নাগরিক ও মানবাধিকার*, এ্যাবকো প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৮১

মোঃ আবু তাহের, *ইসলামের সামাজিক ইতিহাস*, কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৮

মোঃ মাহবুব উল হক জোয়াদ্দার, *আন্তজার্তিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

মোঃ মাহমুদ বিন সাঈদ, *ইসলামের উদারতা ও অমুসলিমদের অধিকার*, পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫

মোঃ সিরাজুল ইসলাম, *মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮

মোস্তফা জামান ভুট্টো, '*মানবাধিকার নিয়ে ভাবনা*' Amity- A voice of Humanity Vol-1, No.-1,May 2002

রেবা মন্ডল ও সাহজাহান মন্ডল, *মানবাধিকার আইন*, সংবিধান, ইসলাম ও এনজিও,চট্রগ্রামঃ প্রাইভেট লিঃ, ১৯৯৯

শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *ইসলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

প্রবন্ধাবলি

Robert Trar, *Human Rights in Islam*, Journal of Islamic Research Institute, vol. 28, No. 1-4, Islamic University, Islamabad, Pakistan, 1989

Abdur Razzaq, *Human Rights in Islam-Historical perspective*, Paper Presented at International Seminar on Human Rights in Islam, 5th October, 1994, Sonargaon Panpacific Hotel, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম রঞ্জন দে, *বুদ্ধ ও মানবতাবাদ*, ১০ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮, মুক্তকন্ঠ

ড. আ. ক. ম আব্দুল কাদের, *মদিনা সনদ : একটি পর্যালোচনা*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব ল, ১৯৯৯

ড. এ বি এম মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী ও মোঃ আখতারুজ্জামান, *মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তা দানের মূলনীতি*, হিউম্যানিষ্ট এবং ইথিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, এপ্রিল, ২০০১

মোঃ ইব্রাহিম খলিল ও মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, *মানবাধিকার ও ইসলাম : পর্যালোচনা*,ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭

মহাম্মদ শফিক আহমেদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *ইসলামে মানবাধিকার নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা ৪৭, ৪৮, ৪৯, অক্টোবর ১৯৯৩